সুবর্ণলতা

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

একাল-সেকাল নিয়ে তর্ক তো চিরকালের, কিন্তু কেমন করে চিহ্নিত করা যায় সেই 'কাল'কে? এক-একটা কালের আয়ু শেষ হলেই কি এক-একবার যবনিকা পড়ে? যেমন যবনিকা পড়ে নাট্যমঞ্চে?

না, যবনিকার অবকাশ কোথায়? অবিচ্ছিন্ন স্রোত। তবু 'একাল সেকাল, এযুগ সেযুগ' বলে অভিহিতও করা হয়। সমাজ, মানুষের রীতিনীতি, চলন-বলন, এরাই ধরে রাখে কালের এক-একটা টুকরোকে, ইতিহাস নাম দেয় 'অমুক যুগ, তমুক যুগ'।

কিন্তু কালকে অতিক্রম করতেও থাকে বৈকি কেউ কেউ, নইলে কারা এগিয়ে দেবে সেই প্রবহমাণ ধারাকে? সে ধারা মাঝে মাঝেই স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। তবু এরা বর্তমানের পুজো কদাচিৎ পায়, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহসিত হয়, বিরক্ত-ভাজন হয়।

এদের জন্যে কাঁটার মুকুট।

এদের জন্যে জুতোর মালা।

তবু এরা আসে।

হয়তো প্রকৃতির প্রয়োজনেই আসে।

তবে কোথা থেকে যে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। আসে রাজরক্তের নীল আভিজাত্য থেকে, আসে বিদ্যাবৈভবের প্রতিষ্ঠিত স্তর থেকে। আসে নাম-গোত্রহীন মূক মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে, আসে আরো ঘন অন্ধকার থেকে।

তাদের অভ্যুদয় হয়তো বা রাজপথের বিস্তৃতিতে, হয়তো বা অন্তঃপুরের সংকীর্ণতায়।

কিন্তু সবাই কি সফল হয়?

সবাইয়েরই কি হাতিয়ার এক?

না।

প্রকৃতি কৃপণ, তাই কাউকে পাঠায় ধারালো তলওয়ার হাতে দিয়ে, কাউকে পাঠায় ভোঁতা বল্লম দিয়ে। তাই কেউ সফল সার্থক, কেউ অসফল ব্যর্থ। তবু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কিছুই হয়তো ব্যর্থ নয়। আপাত-ব্যর্থতার গ্লানি হয়তো পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত করে রাখে শক্তি-সাহস।

সুবর্ণলতা এসব কথা জানতো না। সুবর্ণলতা তার গৃহত্যাগিনী মার নিন্দার সম্বল নিয়ে সংসারে নেমেছিল।

তাই সে জেনেছিল সে কেবল তার অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। জেনেছিল তার জন্য কারো কিছু এসে যাবে না।

সুবর্ণলতার মৃত্যুতে যে সুবর্ণলতার সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায় নি, এ খবর জেনে যায় নি সুবর্ণলতা। জেনে যেতে পারে নি ওই মেয়েটার কাছে সুবর্ণলতার মৃত্যুদিনই জন্মদিন।

দক্ষিণের এই চওড়া বারান্দাটায়, যেখানে শুয়ে থাকতো সুবর্ণলতা সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে, সেখানটা থেকে মেয়েটা যেন আর নড়তে চায় না। সুবর্ণলতাকে নতুন চোখে দেখতে শিখল বুঝি সে জায়গাটা শূন্য হয়ে যাবার পর।

দেখতে শিখল বলেই ভাবতে শুরু করল, জীবন শুরু করবার সময়ে যদি সুবর্ণলতা একখানা দক্ষিণের বারান্দা পেত, হয়তো জীবনের ইতিহাস অন্য হতো সুবর্ণলতার।

হয়তো ওই মেয়েটার চিন্তায় কিছু সত্য ছিল, হয়তো তাই হতো। কিন্তু তা হয় নি। দক্ষিণের বারান্দার দাক্ষিণ্য জোটে নি সুবর্ণলতার কপালে।

অথচ জুটলে জুটতে পারতো।

সে বাড়িখানাও তো সুবর্ণলতার চোখের সামনেই তৈরি হয়েছিল। ওদের পুরনো এজমালি বাড়ির অংশের দরুন টাকাটা হাতে পেতেই সুবর্ণলতার বুদ্ধিমান ভাসুর, দেবর, স্বামী তাড়াতাড়ি বাড়িখানা ফেঁদে ফেলল। বলল, টাকার পাখা আছে। ওকে পুঁতে ফেলাই বুদ্ধির কাজ। গলির মধ্যে, তা হোক, বড় রাস্তার মুখেই, দুবার মোড় ঘুরতে হয় না।

সেই বাড়িতেই তো ত্রিশটা বছর কাটিয়ে গেছে সুবর্ণলতা, সেখান থেকেই বার আণ্টেক আঁতুড়ে গেছে, কেঁদেছে, হেসেছে, খেটেছে, বিশ্রাম করেছে, সংসারলীলার যাবতীয় লীলাতেই অংশগ্রহণ করেছে, তবু পিঞ্জরের যন্ত্রণাবোধে অহরহই ছট্‌ফট করেছে।

সুবর্ণলতার স্বামী ক্ষুব্ধ গর্জনে বলতো, 'যেচে দুঃখ ডেকে আনা! সেধে কষ্ট ভোগ করা! শত সুখের মধ্যিখানে রাতদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে মানুষের! আর কী চাই তোমার? আর কত চাই?'

সুবর্ণলতা বলতো, 'আমি তো কিছু চাই না।'

'তা চাইবে কেন, না বলতে যখন সব কিছু হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছ। তোমার অন্য জায়েদের সঙ্গে অবস্থা মিলিয়ে দেখেছ কোনোদিন?'

সুবর্ণলতা মৃদু হেসে বলতো, 'দেখেছি বৈকি!'

'তবু রাতদিন নিঃশ্বাস! যেমন মা তেমনি ছা হবে তো!'

সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলতো, 'আবার?'

ওর বর তখন ভয় পেয়ে বলতো, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আর বলবো না।'

ওই তীব্রতার পিছনে যে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ভয় পাবে

বৈকি।

কিন্তু এসব তো অনেক দিন পরের কথা। যখন সুবর্ণলতার রগের কাছে রুপোলী তারের আভাস, যখন সুবর্ণলতার সেই দীর্ঘ উন্নত বাড়-বাড়ন্ত গড়নে ক্ষয় ধরেছে।

আগে যখন সুবর্ণলতা তার স্বামীত্যাগিনী মায়ের নিন্দনীয় ইতিহাসের সম্বল নিয়ে মাথা হেঁট করে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিল, যখন কোনো একটা উপলক্ষ পেলেই সুবর্ণলতার শাশুড়ী সুবর্ণলতাকে তার বিয়ের দরুন পাওয়া জরিতে জবড়জঙ বেগুনী রঙা বেনারসী শাড়ী আর বড় বড় কলকাদার লাল মখমলের জ্যাকেট পরিয়ে সাজিয়ে ফেলত, আব বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই তার সামনে সাতখানা করে নিন্দে করতো বৌয়ের আর বৌয়ের বাপের বাড়ির— তখন?

তখন এত সাহস কোথা সুবর্ণর? নিজের বাড়িতেই তখন আড্ডা ছিল মুক্তকেশীর, যেতে হত না কোথাও। পাড়ার সবাই আসতো মুক্তকেশীর কাছে। অলিখিত আইনে পাড়ার মহিলাকুল সবাই ছিল মুক্তকেশীর প্রজা।

বাড়িটা তিনতলা, ঘরদালানের সংখ্যা কম নয়, দুদিকে দুটো রান্নাঘর, শান-বাঁধানো উঠোন, গোটা তিন-চার কল-চৌবাচ্ছা, অসুবিধের কিছু নেই কোথাও। তবে ওই পর্যন্তই। বাড়িটা যেন সাদামাটার একটা প্রতীক, না আছে শ্রী না আছে ছাঁদ, বাড়ি না বাড়ি!

বাস করতে হলে কতটুকু কি আবশ্যক, শুধু এই চিন্তাটুকু ছাড়া বাড়ি বানাবার সময় আর কোনো চিন্তা যে এদের মাথায় এসেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মঠ নয়, মন্দির নয়, বড়মানুষের বাগানবাড়িও নয়, গেরস্ত লোকের বস-বাসের বাড়ি। তার মধ্যে শোভা সৌন্দর্য শিল্প-রুচি এ সবের সম্পর্ক কি এদের বুদ্ধির বাইরে।

সুবর্ণলতাকে তাই এরা পাগল বলে। বলবে না কেন? সুবর্ণলতা যে ওই সব অদ্ভুত জিনিসগুলো খুঁজে বেড়ায়।

খুঁজে বেড়ায় বলেই বাড়ি বানানোর মধ্যপথে পুলকিত আনন্দে বরের কাছে রোজ ধর্ণা দিয়েছে তাকে একবার দেখিয়ে আনতে বাড়িটা। তারপর নতুন সংযোজনার প্ল্যান যোগাবে সুবর্ণলতা।

বর অবশ্য উড়িয়ে দিত আবদারটা। সুবর্ণ বলতো, 'বাঃ, তোমাদের আর কি? কতক্ষণই বা বাড়িতে থাকো? খাওয়া-নাওয়া আর ঘুম, এই তো! বাড়ি ভোগ করতে তো আমরা মেয়েমানুষরাই। আমাদের মত নিয়ে করলে—'

'করলে আর কি? লোকে বলবে স্ত্রৈণ! তবে যেতে চাও মাকে বল গে!'

'মাকে' যে বলতেই হবে এ সত্য জানতো বৈকি সুবর্ণ, তবু বরের কাছে আবদার করায় আমোদ আছে, মিষ্টত্ব আছে, আশা আছে। হ্যাঁ, ছিল বৈকি আশা। বরের উপর না হোক, নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল তখন সুবর্ণলতার। তখন সুবর্ণলতা কানে ইয়ারিং পরতো, তিন-পেড়ে ডুরে শাড়ি পরতো, আর অনেক কসরৎ করে কাঁচপোকা ধরে তাকে কেটে কেটে টিপ করতো।

ইচ্ছেটাই তখন প্রবল তার, সব বিষয়ে।

অতএব মুক্তকেশীকেই গিয়ে ধরলো, 'বাড়িটা একবার দেখতে চলুন না মা,

বেশি তো দূর নয়।'

মুক্তকেশী অবশ্য সে আগ্রহে জল ঢাললেন, 'হাঁ-হাঁ' করে উঠে বললেন, 'শোনো কথা, এখন যাবে কি? অদিনে অক্ষণে গেলেই হল? ভিটে বলে কথা। ঠাকুরমশাই শুভদিন দেখে দেবেন, বাস্তুপুজো করে তবে তো গৃহপ্রবেশ!'

তার্কিক-স্বভাব সুবর্ণলতা অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই দুম করে বলে বসেছিল, 'আর এই যে আপনার ছেলেরা নিত্য-দিন যাচ্ছেন, তার বেলা দোষ হয় না?'

মুক্তকেশী অভ্যস্ত বিরক্তির গলায় বলেছিলেন, 'তর্ক করা রোগটা ছাড়ো তো বাছা, এই রোগেই আমার হাড় পুড়িয়ে খেলে তুমি। বেটাছেলের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি? মেয়েমানুষকেই সব কিছু মেনে-শুনে চলতে হয়।'

অতএব বাড়ি তৈরি হতে হতে আর সে বাড়িকে দেখা ঘটে ওঠে নি সুবর্ণলতার, কারণ সুবর্ণলতা যে মেয়েমানুষ এটা তো অস্বীকার করবার নয়।

অগত্যা আবার বরকেই ধরা, 'সামনের দিকে একটা বারান্দা রাখতে হবে কিন্তু, ঝুলবারান্দা। যাতে রাস্তা দেখা যায়।'

সুবর্ণলতার বর চোখ কুঁচকে বলে উঠেছিল, 'কেন? রাস্তার দিকে খোলা বারান্দার হঠাৎ কি এত দরকার পড়ল? বিকেলবেলা বাহার দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে?'

সুবর্ণলতা তখনও ছেলেমানুষ, তখনও ওর 'সন্দেহবাই' বরের কুটিল কথাগুলোর অন্তর্নিহিত কদর্য অর্থগুলো ধরতে পারত না, তাই বলে উঠেছিল, 'বা রে, বাহার দেওয়া আবার কি? রাস্তার দিকে বারান্দা থাকলে রাস্তাটা কেমন দেখা যায়! ঠাকুরভাসান, মহরম, বর-কনে যাওয়া, ঘটার মড়ার হরি সংকীর্তন, কত কি দৃশ্য রাস্তায়—'

বর অবশ্য এবার হেসে ফেলেছিল। ওই এক কুটিল বাতিকগ্রস্ত হলেও বয়সে সে-ও ছেলেমানুষই। হেসে বলেছিল, 'আর কিছু না হোক, শেষেরটা একটা দ্রষ্টব্য বটে। বিশেষণটা দিয়েছ ভাল, "ঘটার মড়া"।'

সুবর্ণলতা অতঃপর মুখঝামটা দিতে কসুর করে নি। বলেছিল, 'ভুল কি বললাম, ঘটা-পটা করে মড়া নিয়ে যায় না লোকে?'

'তা যায় বটে।'

'আমাকেও তাই নিয়ে যাবে তো?' আবদেরে গলায় বলে ওঠে সুবর্ণলতা, 'আমি যখন মরে যাব, ঘটা করে সংকীর্তন করে নিয়ে যাবে?'

বর মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'সর্বনাশ! কে আগে মরে তার ঠিক আছে? আমি তোমার থেকে কত বড়, আমিই নির্ঘাত আগে মরবো—'

সুবর্ণলতা নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'ইস্। মরলেই হল আর কি? সেদিন মার সেই কালীঘাটের দৈবজ্ঞি আমার হাত দেখে কী বলে গেল মনে নেই?'

'না, মনে নেই তো—', বর অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'কী বলেছিল? আমি অমর হবো?'

যদিও বৌয়ের বয়েস মাত্র চোদ্দ এবং তার বাইশ, তথাচ অসহিষ্ণুতায় খুব একটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। অন্তত বরপক্ষে তো নয়ই।

কিন্তু 'কথার ভটচায' সুবর্ণলতাকে যে এই রাত্তিরেই যত কথায় পায়, তাই সে বলে ওঠে, 'আহা! কলিযুগে যেন অমর বর আছে! বলেছে আমি সধবা মরবো।'

'বাঃ, বেড়ে! তা এই সুখবরটি দিতে বোধ হয় বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়ে গেছে তোমার কাছ থেকে?'

'আমার কাছ থেকে?'

সুবর্ণলতা আকাশ থেকে পড়ে, 'আমি আবার কোথায় কী পাবো? মা সবাইয়ের হাত দেখালেন, চাল দিলেন, পয়সা দিলেন, নতুন গামছা দিলেন—'

না, দিনের বেলায় নয়, দিনের বেলায় ছেলেমানুষ বৌ বরের সঙ্গে গল্প জুড়বে, এমন অনাচার আর যার সংসারে হয় হোক, মুক্তকেশীর সংসারে কদাপি ঘটতে পারে না।

এ নাটক রাত্রেরই।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

অবশ্যই বর এই মধুর ক্ষণটুকু এমন অকারণে অপব্যয় করতে রাজী নয়, তাই ওই তুচ্ছ কথায় যবনিকা টানতে বলে ওঠে, 'ভালই করেছেন। ওরা সব লোক সুবিধের নয়। ওদের সন্তুষ্ট রাখাই ভাল।'

এ মন্তব্যের পরই বর একটু অনুচ্চ হাসির শব্দ শুনতে পায়।

সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর গলায় বলে ওঠে, 'হাসলে যে?'

'এমনি।'

'এমনি মানে? এমনি কেউ হাসে?'

'পাগলে হাসে।'

'তা তুমি কি পাগল?'

'ছিলাম না, তোমাদের সংসারে এসে হয়েছি'—চতুর্দশী সুবর্ণলতা প্রায় পাকা গিন্নীদের মতই ঝঙ্কার দেয়, 'দেখে-শুনেই পাগল। মার কোন্ কাজটাই বা তোমাদের কাছে ভুল? মা যদি ওকে কিচ্ছু না দিতেন, নির্ঘাত বলতে, "দেন নি বেশ করেছেন, যত সব ভণ্ড"!'

বলা বাহুল্য 'সুবর্ণ-পতি' এতে খুব প্রীত হয় না, তীব্রস্বরে বলে, 'তবে কী করা উচিত? মাকে "থো" করে বৌয়ের পাদোদক খাওয়া?'

সুবর্ণলতা 'দুর্গা দুর্গা' করে উঠে বলে, 'যা নয় তাই মুখে আনা! তার মানে আমায় রাগিয়ে দিয়ে কাজটি পণ্ড করার চেষ্টা। আমি কিন্তু রাগছি না, আমি হচ্ছি "ভবি"। এই তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি সামনে বারান্দা না করলে তোমাদের সে বাড়িতে যাবই না আমি।'

বর তখনকার মত বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে। এখন শোও তো এসে।'

অন্ধকারের আবরণ তাই রক্ষে, নইলে বরের আদরের ডাকে তরুণী পত্নীর বিরক্তি-তিক্ত মুখভঙ্গীটুকু দেখতে পেলে বোধ করি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত বর।

তবু গলাটায় মাধুর্যের ঘাটতি ধরতে পারলো বৈকি। সুবর্ণ যখন নীরস গলায় বলল, 'তোমার তো "দেখা যাবে"! যা দেখবে তা জানাই আছে। একের নম্বরের মিথ্যুক! বাড়ি করতে আর জমি পেল না—গলির মধ্যে!' তখন সেও সমান নীরস গলায় বলে ওঠে, 'বাড়ি আমার একলার নয়। মাথার ওপর মা দাদা এদিকে ভাইয়েরা, আমি আবদার করিগে—ওগো আমার বৌ গড়ের মাঠের ওপর বাড়ি চায়। যত সব!'

'গড়ের মাঠ বলি নি আমি, শুধু বড় রাস্তাটা দেখতে চাই। মাথার ওপর ওপরওলা থাকলে একটা কথাও বলতে নেই বুঝি? আমি বলে রাখছি বারান্দা

আমার চাই-ই চাই।'

'আমার চাই-ই, চাই!

বাঙালী গেরস্ত ঘরের বৌয়ের মুখের এই ভাষা! 'আস্পদ্দা' বটে একখানা! এত 'আস্পদ্দা' পেল কোথায় সুবর্ণলতা? এই ক'টা বছর শ্বশুর-বাড়ির ভাত খেয়েই কি ওর মার ইতিহাস ভুলে গেছে? ভুলে গেছে তার লজ্জার গ্লানি? দিব্যি একখানি হয়ে উঠেছে!

'আস্পদ্দা'টা তাহলে ওই জন্মসূত্রেই পাওয়া? তা ছাড়া আর কি? আরো তো বৌ রয়েছে মুক্তকেশীর, তারা তো রাতদিন ভয়ে কাঁটা।

যখন-তখন তাই উদ্দেশে গালি পাড়েন মুক্তকেশী। 'কি করবো দুই বুড়ীই যে মরে হাতছাড়া হয়ে গেছে, নইলে আমার মাকে আর সইমাটিকে নিতাম এক হাত! নিজের নাতনীর গুণ জানতো না বুড়ী? জানতো, জেনে বুঝেই আমার গলায় এই অপরূপ মালাটি গছিয়ে দিয়েছিল। পূর্বজন্মের ঘোরতর শত্রুতা ছিল আর কি!'

আবার এও বলেন কখনো কখনো, 'বুড়ীদের আর দোষ দিই কেন, মা-টির গুণই গাই। কেমন মা! আমড়া গাছে কি আর ল্যাংড়া ফলবে!'

তবু সুবর্ণ তখনও চোটপাট উত্তর করতে শেখে নি। শাশুড়ী মায়ের প্রসঙ্গ তুললেই মরমে মরে যেত, আর শেষ অবধি যত আক্রোশ আর অভিযোগ গিয়ে পড়তো মায়ের উপরেই।

কেন, কেন তার মা আর সকলের মায়ের মত নয়? কেন তার মা স্বামী-ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে ছেলেমেয়ের মুখ হাসিয়ে গেছে?

সন্তানস্নেহ কিছুই নয় তা হলে? জেদটাই সব চেয়ে বড় তার কাছে? এমন কি একখানা চিঠি দিয়ে পর্যন্ত উদ্দিশ করে না? সুবর্ণর যে অনেক বাধা সে কি মা বোঝে না? সুবর্ণ যদি তার মাকে একখানা চিঠি লিখতে বসে, বাড়িতে কোর্ট-কাছারি বসে যাবে না?

আইনজারি হবে না?

নিষেধাজ্ঞা?

একেই তো ওই অপরাধে কেউ তাকে দেখতে পারে না।

জবড়জং গাঢ় বেগুনী রঙা বেনারসী শাড়ি, আর জড়ির কল্কাদার লাল মখমলের জ্যাকেট পরা ন বছরের সুবর্ণলতা যখন ভাগ্যতাড়িতের মত এদের বৌ হয়ে এসে ঢুকলো, তখন তো একদিনেই তিন-তিনটে বছর বয়েস বেড়ে গেল তার। ঘরে পরে সবাই বলে উঠল, 'ন বছর? ওই ধাঁইপেয়ে দশাসই মেয়ের বয়স ন বছর? ন বছর ও তিন বছর আগে ছিল।'

সেই বিরূপতার দৃষ্টি আজও ঘুচল না সংসারের। বলতে গেলে 'পতিতে'র দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে তাকে। হতে পারে মা 'খারাপ' হয়ে বেরিয়ে যান নি, তবু কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, স্বামীত্যাগ, এও কি সোজা অপরাধ নাকি?

তা অনেক দিন পর্যন্ত অপরাধিনী-অপরাধিনী হয়েই ছিল সুবর্ণ। তারপর দেখল এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম! যত নীচু হও ততই মাথায় চড়ে এরা, অতএব শক্ত হতে শিখল।

কিন্তু শক্ত হয়ে কি রাস্তার দিকের বারান্দা আদায় করতে পেরেছিল সুবর্ণ?

না, পারে নি।

ওর স্বামী প্রবোধ বুঝি চুপি চুপি একবার মায়ের কাছে তুলেছিল কথাটা, মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'না না, ওর গোড়ে গোড় দিয়ে মরিস নি তুই পেবা! ঘরের ভেতর খেমটা নাচছে বৌ, আবার বারান্দায় গলা ঝোলালে আরও কত বাড় বাড়বে তা আন্দাজ করতে পারছিস? তোর ভ্যাড়াকান্ত শ্বশুরটা পরিবারকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে শেষে পরিণামে কি ফল পেল দেখেছিস্ তো? চাই-ই চাই! মেয়েমানুষের মুখে এমন বাক্যি বাবার জন্মে শুনি নি।'

এরপর আর কি বলবে প্রবোধ? তবে চালাকি একটু খেলে সে। প্রতিদিনই প্রবোধ দেয় সুবর্ণলতাকে, 'হচ্ছে গো, শুধু বারান্দা হচ্ছে।'

পরিণামে যা হয় হোক, এখন তো বাড়তি কিছু সুখলাভ হয়ে যাচ্ছে, সুবর্ণলতার মুখে আহ্লাদের আলো খেলছে, সুবর্ণলতা উৎসাহে অধীর হচ্ছে, সুবর্ণলতা আত্মসমর্পণে নমনীয় হচ্ছে।

হচ্ছে।

চৌদ্দ বছরের সুবর্ণলতার পক্ষে এ সন্দেহ করা শক্ত ছিল, এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে ধাপ্পা দেওয়া যায়। বরের প্রেম প্রীতি ভালবাসার পরিচয়ে মুগ্ধ হচ্ছে তখন ও। আর কল্পনায় স্বর্গ গড়ছে।

এই ভাঙা পচা বাড়িটা ছেড়ে নতুন বাড়িতে গিয়েছে সে, বারান্দার ধারে চমৎকার সুন্দর একখানি ঘর, বড় বড় জানলা, লাল টুকটুকে মেঝে, সেই ঘরটিকে নিজের মনের মত সাজাবে সুবর্ণ। দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তাকের উপর ঠাকুর-দেবতার পুতুল, বাক্স-প্যাঁটরায় ফুলকাটা ঘেরাটোপ, ঝালর দেওয়া বালিশ, ফর্সা বিছানা। সেই ঘরে বসে কাঁথায় ফুল তুলবে সুবর্ণ চুপি চুপি লুকিয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে।

কাঁথার প্রয়োজনের সূচনা নাকি দেখা দিয়েছে সুবর্ণর দেহের অন্তঃপুরে। সুবর্ণ বোঝে না অতশত, গিন্নীরা বোঝেন। ভয়ও করছে, বেশ একটা মজা-মজাও লাগছে।

অনেক দোলায় দুলছে এখন সুবর্ণ। ন বছরে এসেছে এদের বাড়ি, সেই থেকেই স্থিতি, মা নেই, কেই বা নিয়ে যায়? বাপ সাহসই করে নি। পিসি একটা আছে কাছে-পিঠে, নিয়ে যেতে চেয়েছিল একবার, এরা পাঠায় নি। এরা বলেছে, 'সে-কুলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখে কাজ নেই।' বাপ দেখতে আসে মাঝে-মধ্যেই ওই ঢের! তাও তো এদের সামনে ঘোমটা দিয়ে একবার দেখা। বোধ হয় সেই দুঃখে বাপও এখন আর আসে না বেশি। অতএব এদের নিয়েই থাকতে হবে সুবর্ণকে, তাই এদের 'মানুষ' করে তুলতে ইচ্ছে করে সুবর্ণর। ইচ্ছে করে এরা শৌখিন হোক, সভ্য হোক, রুচি-পছন্দর মানে বুঝুক। এদের নিয়ে সুন্দর করে সংসার করবে সুবর্ণ।

রেষারেষি, ঝগড়াঝগড়ি, স্বার্থ নিয়ে মারামারি, এসব দু চক্ষের বিষ সুবর্ণর, দু চক্ষের বিষ সারাক্ষণ ওই রান্নাঘরে পড়ে থাকাও। উদার আবহাওয়ার স্বাদ জানে না এরা। জানে না বই পড়তে, পদ্য মুখস্থ করতে। ...ভাবতে ভাবতে মনটা হারিয়ে যায় সুবর্ণর, মনে পড়ে যায় তার আকস্মিক বিয়েটার কথা। বিয়েটা না হয়ে গেলে হয়তো এতদিন পাসের পড়া পড়তো সুবর্ণ।

মা তো বলতো তাকে, 'তোকে আমি তোর দাদাদের মতন পাসের পড়া

পড়াবো।'

সুবর্ণর ভাগ্যে ভগবান তেঁতুল গুললো।

যাক, এই জীবনের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে সুবর্ণকে। আর দাঁড়ানোর প্রথম সোপানই তো সুন্দর একটা বাড়ি। পরিবেশটা সুন্দর না হলে জীবনটা সুন্দর হবে কিসের উপর?

চোদ্দ বছরের সুবর্ণর কাছে জীবনসৌন্দর্যের মাপকাঠি তখন ওই রাস্তা দেখতে পাওয়া বারান্দা দেওয়া একখানি ঘর।

বারে-বারেই সে তাই বরকে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁগো, কতখানি চওড়া হচ্ছে?'

বর ভুরু কুঁচকে বলে, 'তা অনেকখানি।'

'তা বেশ। কারণ হঠাৎ একটা বরকনে কি ঠাকুর গেল, সবাই মিলে দেখতে হবে তো বারান্দায় ঝুঁকে?'

বর তীক্ষ্ম হয়।

বলে, 'সবাই তোমার মতন অমন বারান্দা-পাগল নয়।'

'তা সত্যি।' সুবর্ণর চোখেমুখে আলো ঝলসে ওঠে, 'পাগলই আছি আমি একটু! কী আহ্লাদ যে হচ্ছে ভেবে! হ্যাঁগো, রেলিঙে সবুজ রঙ দেওয়া থাকবে তো?'

'তা সবুজ বল সবুজ, লাল বল লাল, তোমার ইচ্ছেতেই হচ্ছে যখন—'

সুবর্ণ গলে পড়ে।

সুবর্ণ তার বরের মধ্যে সেই প্রেম দেখতে পায়, যা সে বইতে পড়েছে। বই অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হয়, শাশুড়ী ননদ দেখলে মেরে ফেলবে।

কিন্তু যোগান দেয় এদেরই একজন।

সুবর্ণর কাছে সে মানুষ দেবতা-সদৃশ। এদের সঙ্গে তুলনা করলে স্বর্গের দেবতাই মনে হয় তাকে সুবর্ণর। হায়, তার সঙ্গে যদি কথা কইতে পেত সুবর্ণ!

কইবার হুকুম নেই।

এদের রাশ বড় কড়া। বিশেষ করে প্রবোধ পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, তাকানো পর্যন্ত পছন্দ করে না। সুযোগ পেলেই যে মেয়েমানুষগুলো খারাপ হয়ে যায়, এ তার বদ্ধমূল ধারণা। ওই বই দেওয়াটা টের পেলে কী যে ঘটতো কে জানে! কিন্তু সুবর্ণ সাবধানী।

তবু সুবর্ণর ইচ্ছে করে সেই দেবতুল্য মানুষটার সঙ্গে একটু কথা কয়। কথা কইতে পেলে সুবর্ণ তাঁকেই পাঠাতো বাড়িটা কেমন হচ্ছে দেখতে, প্রশ্ন করতো—বারান্দাটা কি রং হলে ভাল হয়!

কিন্তু সে হবার জো নেই যখন, তখন বরের মুখেই ঝাল খাওয়া! যে বর বলেছে, 'বারান্দার কথা যেন তুমি এখন কাউকে গল্প করে বোসো না। শুধু তুমি জানছো আর আমি জানছি, আর জানছে মিস্ত্রীরা!

কিন্তু তার পর?

গৃহপ্রবেশের দিন-ক্ষণ দেখে মুক্তকেশী যখন দুখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আর লক্ষ্মীর হাঁড়ি কোলে করে সপরিবারে এসে উঠলেন নতুন বাড়িতে?

॥ ২ ॥

মুক্তকেশীর সংসার এমন কিছু বিপুল নয়, ছেলে মেয়ে বৌ নাতি নিজে সবাইকে নিয়ে সদস্য-সংখ্যা মাত্র দশ, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বিবাহিতা দুই মেয়ে আর কুচি একটা নাতনী এসেছে এই যা। এই ক'টা লোককে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে ভরে ফেলা খুব একটা শক্ত ছিল না, পুরুষ দু-তিনজন গাড়ির ছাতে উঠে বসলেই স্থান-সংকুলান এবং ভাশুর-ভাদ্রবৌ সমস্যা, দুটোরই সমাধান হত। তবু যে হিসেবী মুক্তকেশী দুটো গাড়ির আদেশ দিয়েছিলেন সে কেবল লক্ষ্মীর হাঁড়ির শুচিতা বাঁচাতে।

মেয়ে-বৌদের না হয় এক-একখানা চেলির শাড়ি পরিয়ে নেওয়া হল, কিন্তু ছেলেদের বেলায়? তাদের তো কোট-কামিজ-জুতো ছেড়ে একবস্ত্রে যেতে বলা যায় না? যতই 'পুরুষ পরশ-পাথর' হোক, লক্ষ্মীর হাঁড়ি বলে কথা! যার মধ্যে সমগ্র সংসারটার ভাগ্য নিহিত!

কুতার্কিক মেজবৌটা অবিশ্যি তুলেছিল তর্ক, বলেছিল, 'তবে যে আপনি বলেন, পুরুষ আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ—', দাবড়ানি দিয়ে থামিয়েছেন তাকে।

তর্ক তুললেও মেজ বৌ সুবর্ণও অবশ্য দুটো গাড়ির ব্যাপারে উৎসাহিতই। কারণ গাড়িভাড়ার ব্যাপারেও মুক্তকেশীর কার্পণ্যের অবধি নেই। যখনই যেখানে যাওয়া হয়—নেমন্তন্নবাড়ি, কি যোগে গঙ্গা নাইতে, চিড়িয়াখানায়, কি মরা যাদুঘরে, ওই গুড়ের নাগরী ঠাসা হয়ে। ননদরা যখন বাপের বাড়ি আসে তখনই এসব আমোদ-আহ্লাদ হয়, লোকসংখ্যাও তখন বাড়ে, বেড়াতে যাওয়ার সব সুখই যেন সুবর্ণর লুপ্ত হয়ে যায়। তাছাড়া জানলার একটি 'পাখি' খোলবারও তো জো নেই, মুক্তকেশী তাহলে বৌকে 'বাবার বিয়ে খুড়োর নাচন' দেখিয়ে ছাড়বেন।

দুই জা, দুই ননদ আর শাশুড়ী, মাত্র এই পাঁচজন পুরো একখানা গাড়িতে, ছোট দ্যাওর তো গাড়ির মাথায় আছে পথপ্রদর্শক হিসেবে। সুবর্ণ যেন হাত-পা মেলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে! আর সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব একটা পুলক আবেগে মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে তার। হ্যাঁ তাই, এটাই হচ্ছে সেই আসন্ন ভাগ্যের সূচনা। খোলামেলা বারান্দার ধারের ঘর, অথবা ঘরের ধারে বারান্দা অপেক্ষা করছে সুবর্ণর জন্যে!...

যে বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে সুবর্ণ বড় রাস্তা দেখতে পাবে। এখন মনে হয় সুবর্ণর, একটু যে গলির মধ্যে, সেটাই বরং ভাল, অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না বোধ হয়। একেবারে বড় রাস্তার ধারে হলে হয় তো সে শাসনের ভয় ছিল।

চেলির শাড়িতে আগাগোড়া মোড়া, মাথায় একগলা ঘোমটা, শাশুড়ী ননদ বড় জায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুবর্ণ হেঁটমুণ্ডে নতুন বাড়ির দরজায় ঢুকে পড়ে, তবু মাথার উপরে অবস্থিত সবুজ রেলিং-ঘেরা বারান্দার অনুভূতি রোমাঞ্চিত করে তোলে তাকে, সমস্ত মন উদগ্র হয়ে থাকে সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু সহজে সিঁড়ির দিকে যাওয়া হয় না, কারণ নীচের তলায় ঠাকুরঘরে বহুবিধ নিয়মকর্মের পালা চলতে থাকে, 'শান্তিজল' না নিয়ে উঠে পড়বার প্রশ্নই নেই।

তবু একসময় সে পালা সাঙ্গ হয়।

শান্তিজল মাথায় নিয়েই টুক করে অন্যজনেদের মাঝখান থেকে সরে আসে সুবর্ণ, পা টিপে টিপে দোতলায় ওঠে।

ননদরা বাড়ি ঢুকেই হুল্লোড় করে ওপরতলা দেখে গেছে। পুরুষরা দেখার প্রয়োজন অনুভব করে নি, কারণ তারা তো রোজই দেখেছে। তারা শান্তিজল মাথায় নিয়েই ছুটেছে বাজারে দোকানে। পুরো ওপরতলাটা আপাতত খাঁ খাঁ করছে।

খানচারেক ঘর, মাঝখানে টানা দালান, এদিকে ওদিকে খোঁচা-খোঁচা একটু একটু ঘরের মত, এরই মাঝখানে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খায় সুবর্ণ, এ দরজা ও দরজা পার হয়ে একই ঘরে বার বার আসে বিমূঢ়ের মত, বুঝতে পারে না কোন্ দরজাটা দিয়ে বেরোতে পারলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্চর্য-লোকের দরজাটি দেখতে পাবে!

ঘুরেফিরে তো শুধু দেয়াল।

রিক্ত শূন্য খাঁ খাঁ করা, সাদা দেয়াল, উগ্র নতুন চুনের গন্ধবাহী।

তবে কি বারান্দাটা তিনতলায়? আরে তাই নিশ্চয়! তাহলে তো আরোই ভাল।

ইস্! এইটা খেয়াল করে নি এতক্ষণ হাঁদা-বোকা সুবর্ণ! একই ঘরে দালানে পাঁচবার ঘুরপাক খেয়ে মরছে! চেলির কাপড় সামলাতে সামলাতে তিনতলায় ছুট দিল সুবর্ণ। কেউ তো নেই এখানে, ছুটতে বাধা কি! একেবারে ছাত পর্যন্তই তো ছুট দেওয়া যায়।

না। ছাত পর্যন্ত ছুট দেওয়া গেল না, ছাতের সিঁড়ি বানানো হয় নি। খরচে কুলোয় নি বলে আপাতত বাড়ির ওই অপ্রয়োজনীয় অংশটা বাকি রাখা হয়েছে।

কিন্তু বারান্দা?

যেটা নাকি সুবর্ণর ভালবাসার স্বামী সবাইকে লুকিয়ে শুধু মিস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে গাঁথিয়েছে? কোথায় সেটা?

সুবর্ণ কি একটা গোলকধাঁধার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে?

'এর মানে? তুমি এই ওপরচূড়োয় এসে বসে আছ মানে?'

নিরালার সুযোগে প্রবোধচন্দ্র এই প্রকাশ্য দিবালোকেই স্ত্রীর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়। যদিও তার ভুরুতে কুঞ্চন-রেখা, কণ্ঠে বিরক্তির আভাস, "মেজবৌ মেজবৌ।" করে হল্লা উঠে গেল নীচে, একা তুমি এখানে কী করছ?'

সুবর্ণ সে কথার উত্তর দেয় না।

সুবর্ণ পাথরের চোখে তাকায়।

'বারান্দা কই?'

'বারান্দা!'

প্রবোধ একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিস্ময়ের গলায় বলে ওঠে, 'সে কী! খুঁজে পাও নি? আরে তাই তো! ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি?'

সুবর্ণর চোখ ফেটে জল আসে, তবু সে-জলকে নামতে দেয় না সে, কঠোর গলায় বলে, 'মিথ্যে কথা বললো কেন আমার সঙ্গে?'

প্রবোধ তবু দমে না।

হেসে হেসে বলে, 'মিথ্যে কি গো, সত্যি সত্যি! ছিল, ভূতে কিবা কাগে নিয়ে পালিয়েছে! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—'

বলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে খপ করে সেই দুঃসাহসিক কাজটা করে নেয়, গা-টা একবার ছুঁয়ে নেয়। একটু বেশি করেই নেয়।

এর পর আর চোখের জল বাধা মানে না! সুবর্ণ দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে বলে, 'তুমি আমায় ঠকালে কেন? কেন ঠকালে আমায়? জানো বাবা মাকে ঠকিয়েছিল বলেই মা—'

'থাক থাক!' এবার প্রবোধ বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'তোমার মার বাহাদুরির কথা আর বড় মুখ করে বলতে হবে না। বেটাছেলে পুরুষ-বাচ্ছা ভেড়ুয়ার মতন পরিবারের কথায় ওঠবোস করবে, কেমন? বারান্দা, বারান্দা! বারান্দার জন্যে এত বুক-ফাটাফাটি কেন শুনি! কই, বড়বৌ তো একবারও ওকথা মুখে আনে নি? তার মানে সে ভালঘরের মেয়ে, তোমার মতন এমন ছক্কা-পঞ্জা নয়! বারান্দায় গলা ঝুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে চোখোচোখির সাধ নেই তার! আর ইনি বারান্দার বিরহে তিনতলায় উঠে এসে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন! নীচে ওদিকে বড়বৌ কুটনো-বাটনা, রান্না, মাছ-কোটা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। যাও শীগগির নীচে নেমে যাও।'

হ্যাঁ, নীচে সুবর্ণকে নেমে যেতে হয়েই ছিল। নীচের তলায় সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যের ছবি কল্পনাচক্ষে দেখার পর আর বসে থাকার সাহস হয় নি তার, শুধু অপরিসীম একটা ধিক্কারে দীর্ণ-বিদীর্ণ হতে হতে সে মনে মনে বলেছে, 'ভগবান তুমি সাক্ষী, বারান্দা দেওয়া ভাল বাড়ি আমি করবো করবো করবো! আমার ছেলেরা বড় হলে, মানুষ হলে, এ অপমানের শোধ নেব!'

প্রতিজ্ঞা!

কিন্তু সুবর্ণলতার সেই আগের প্রতিজ্ঞা? ও যে বলেছিল, বারান্দা না থাকলে সে বাড়িতেই আমি থাকবোই না! হায় রে বাঙালী-ঘরের বো, তাঁর আবার প্রতিজ্ঞা! শুধু চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত বাড়ির মধ্যে সব থেকে ওঁচা ঘরটা নিজের জন্যে প্রার্থনা করেছিল বোকা অভিমানিনীটা।

বাড়ির পিছনদিকের উত্তর-পশ্চিম কোণের সেই ঘরটা কারুর প্রার্থনীয় হতে পারে এটা মুক্তকেশীর ধারণাতীত। ঘর বিলি করার ব্যাপারে তিনি তখনো মনে মনে হিসেব করছিলেন। 'জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ' এ নীতিতে বড় ছেলেকে পূর্ব-দক্ষিণের সেরা ঘরখানাই দিতে হয়, সেজ ছোট দুই ছেলেই তাঁর একটু শোখিন। তা ছাড়া আজই না হয় তারা আইবুড়ো আছে, দুদিন বাদে তো বিয়ে হবে? তিনতলার ঘর থাকলে ভাল হয় তাদের। এদিকে আবার নিজেরও মাথা-গরমের বাতিক, ঘুপটি ঘরে ভয়, তাছাড়া তাঁর ঘরেই তো তাঁর আইবুড়ো মেয়ের স্থিতি। খারাপ ঘরটা নিলে রেগে মরে যাবে না সে?

ওদিকে আবার মেয়ে-জামাই আসাআসি আছে। মেয়েদের আঁতুড় তোলা আছে। তাদের থাকা আছে।

খপ করে তাই কোনো কিছু ঘোষণা করে বসে নি মুক্তকেশী।

এহেন সময়, যখন খাওয়া-দাওয়ার পর সবাইকে নিয়ে দোতলায় উঠেছেন তিনি, তখনই এই প্রার্থনা জানায় সুবর্ণ।

মুক্তকেশী একটু অবাক না হয়ে পারেন না, তারপর মনে মনে হাসেন। এদিকে একটু তর্কবাগীশ হলেও স্বার্থের ব্যাপারে বোকা-হাবা আছে বৌটা! তবু বিস্ময়টা প্রকাশ করেন না। শুধু প্রীতকণ্ঠে বলেন, 'তা এটাই যদি তোমার পছন্দ তো তাই থাক। তবে হাওয়া কি তেমন খেলবে? "পেবো"র একটু গরম হবে না?'

ছেলের গরমের প্রশ্নই করেন মুক্তকেশী, বৌয়ের অবশ্যই নয়।

সুবর্ণ মাথা নেড়ে বলে, 'গরম আর কি, হাতপাখা তো আছেই।'

'তবে তাই! তোমার বিছানা-তোরঙ্গগুলো এ ঘরে তুলে দিক তাহলে।'

তুলে দেবার লোক আছে।

ঝি খুদু একটা জোয়ান পুরুষের শক্তি ধরে। সেও তো এসেছে ঘোড়ার গাড়ির মাথায় চড়ে। খুদুর বলেই বলীয়ান মুক্তকেশী।

তা বলে বিছানা পেতে সে দেবে না, দোতলায় তুলে দিয়েই খালাস। সুবর্ণই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল, বিছানা পেতে নিল। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাবে।

কিন্তু প্রবোধের তো আর নিরাসক্ত আসে নি, তাই রাত্রে ঘরে ঢুকেই ফেটে পড়ে সে, 'শুনলাম মেজগিন্নী শখ করে এই ওঁচা ঘরটা বেছে নিয়েছেন! মানেটা কি?'

প্রবোধের বয়েস চব্বিশ, কিন্তু কথার বাঁধুনি শুনলে চল্লিশ ভাবতে বাধা হয় না। না হবে কেন, তিনপুরুষে খাস কলকাত্তাই ওরা—যে কলকাত্তাইরা 'ধান গাছের তক্তা'র প্রশ্নে উত্তর খুঁজে পায় না, চাষ করে শুধু কথার।

তা ছাড়া মুক্তকেশীর ছেলেমেয়েদের সকলেরই ধরণ-ধারণ পাকা পাকা। তারুণ্যকে ওরা লজ্জার বস্তু মনে করে, সভ্যতাকে বলে 'ফ্যাশান'!

রুচি পছন্দ সৌন্দর্যবোধ এসব হাস্যকর শব্দগুলো ওদের অভিধানে নেই। আর জগতের সারবস্তু যে 'পয়সা' এ বিষয়েও কারো দ্বিমত নেই। তা বলে সবাই যে লোক খারাপ তা মোটেই নয়। সুবর্ণর ভাসুর সুবোধ তো দেবতুল্য, সাতে নেই, পাঁচে নেই, কারোর সঙ্গে মতান্তর নেই, স্নেহ মমতা সহৃদয়তা সব কিছু গুণেই তার মধ্যে আছে।

সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত মেজ ভাইকে মাঝে মাঝেই বকে সে, 'কী যে বলিস পাগলের মতন! মানুষ কি খাঁচার পাখী যে রাতদিন বন্ধ থাকবে? সবাই চিড়িয়াখানায় যাবে, মেজবৌমা যাবেন না? এমন বাতিকগ্রস্ত হলি কেন তুই বল্ দেখি!'

সুবোধের এই ক্ষুব্ধ প্রশ্নের ফলেই সুবর্ণর তার জা-ননদদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ঘটে, নচেৎ তো হয়েই গিয়েছিল বারণ।

যাত্রার তোড়জোড় শুনলেই তো রায় দিয়ে বসেন তার পতি পরমগুরু 'যে যায় যাক্, তোমার যাওয়া-ফাওয়া হবে না!'

কিন্তু দাদা বললে না করতে পারে না।

সেটা আবার সেকালের শিক্ষার গুণ। যত অপছন্দকর ব্যাপারই হোক, বাপ-দাদার আদেশ ঠেলবার কথা ভাবতেই পারত না কেউ।

সুবর্ণ এর জন্যে ভাসুরের উপর কৃতজ্ঞ ছিল।

কিন্তু এদিকে এত উদার হলেও 'পয়সা'র ব্যাপারে কার্পণ্যের কমতি ছিল না সুবোধের। মাসকাবারী বাজার এনে মুটেকে দুটোর জায়গায় তিনটে পয়সা দিতে আধ ঘণ্টা বকাবকি করতে আলস্য ছিল না তার, মুক্তকেশীর গঙ্গাস্নানের পালকি-বেহারারা দুই আনার বেশি পয়সা চাইলে তাদের নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে দ্বিধামাত্র করতে দেখা যেত না।

দ্বিধা অবশ্য আরো অনেক কিছুতেই করে না সে। যেমন, বাড়ির বাইরের রকে গামছা পরে বসে তেল মাখতে দ্বিধা করে না, উঠোনের চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে স্নান করতে দ্বিধা করে না।

দেখে সুবর্ণর মনটা যেন কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে। এ যেন দেবদূতের গায়ে ছেঁড়া পোশাক, ফুলের গায়ে কাদা?

তবু ভাসুরকে সুবর্ণ ভক্তি করে।

ভক্তি করে বড় ননদকে।

সেই ছোট্ট বেলায় বেগুনী বেনারসী মোড়া সুবর্ণ যখন কাঁদতে কাঁদতে এদের বাড়িতে এসে দুধে-আলতার পাথরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ডুকরে উঠে বলেছিল, 'আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও গো, তোমাদের পায়ে পড়ি', তখন চারিদিক থেকে ছি-ছিক্কারের অগ্নিবাণে সুবর্ণ তো প্রায় ভস্ম হতে বসেছিল, মুক্তকেশী তো এই মারে কি সেই মারে, সেই দুঃসময়ে ওই বড় ননদই রক্ষা করে-ছিল তাকে। বলেছিল, 'তোমরা সব কী গো! দুধের বাছা একটা, আর ভেতরের ঘটনাও জেনেছ সবাই, ওর প্রাণটার দিকে তাকাচ্ছ না?'

বাড়ির বড় মেয়ে, জামাই দ্বিতীয় পক্ষের হলেও একটা কেষ্টবিষ্টু, কেউ তাই আর তাকে দাবড়াতে পারে নি, কিন্তু বৌকে 'কচি বাচ্ছা' বলায় হেসেছিল সবাই। বলেছিল, 'আসছে জন্মে আবার ন বছরের হবে ও মেয়ে।'

ননদ আবারও তাড়া দিয়েছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, বয়সের হিসেব পরে হবে, 'প্রবো'র চাইতে তো আর বড় নয়? এখন বরণটা কর!'

তদবধি বড় ননদকে দেবীজ্ঞান করে সুবর্ণ। সে যখন আসে, যেন হাতে চাঁদ পায়। সে যে হিতৈষী, অন্য ননদদের মত ছুতো-ধরা নয়, সেটা বুঝতে দেরি হয় না সুবর্ণর।

আজও তো সে ননদ সুবর্ণকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেছিল, 'তুই অমন হাবা কেন রে মেজ বৌ? চেয়ে-চিন্তে অখাদ্য ঘরখানা নিলি!'

মেজ বৌ অবলীলায় বলেছিল, 'তা একজনকে তো নিতেই হবে।'

কিন্তু এখন ননদের ভাইয়ের তীব্র প্রশ্নের উত্তরে অবলীলায় যা বললো সেটা অন্য কথা। এখন বললো, 'কেন, ঘরটা খারাপ কিসে? ভালই তো! একটা জানলা খুললে পড়শীর ভাঙা দেয়াল, আর একটা জানলা খুললে গেরস্তর কল-পাইখানা, মিটে গেল ল্যাঠা। সব দিক দিয়ে নির্ভয়! পরপুরুষের সঙ্গে চোখোচোখির বাসনা থাকলেও সে বাসনা মিটবে না।'

'ওঃ!' প্রবোধ তীব্র চাপা গলায় বলে, 'সেই বিষ মনে পুষে আক্রোশ মেটানো হল! আচ্ছা মেয়েমানুষ তো?'

সুবর্ণ বালিশটা উল্টে-পাল্টে ঠিক করতে করতে বলে, 'কথাতেই আছে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস"! বিষ-পুঁটুলির সঙ্গগুণে জমছে বিষ!'

প্রবোধও পাল্টা জবাব দেয়, 'আমার মনে বিষ? আর নিজের জিভখানি? সে তো একেবারে বিষের ছুরি!'

সুবর্ণ শুয়ে পড়ে বলে. 'তা সেটা যখন বুঝেই ফেলেছ. ছুরি-ছোরার থেকে সাবধান থাকাই মঙ্গল।'

'বটে? আমি পুরুষবাচ্ছা, আমি শালা সাবধান হতে যাবো পরিবারের "মুখ" আছে বলে?'

'তা হলে হয়ো না!' সুবর্ণ অবলীলায় বলে. 'ছোটলোকের মতন হাড়াই-ডোমাই করো রাতদিন!'

'তবু তুমি তোমার জিভ সামলাবে না?'

'হক্ কথায় সামলাবো না।'

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে।

প্রবোধচন্দ্র বীরপুরুষের ভঙ্গীতে উঠে বসে স্ত্রীর মাথার তালের মত খোঁপাটা ধরে সজোরে নেড়ে দিয়ে বলে. 'তোমার আস্পদ্দার মাত্রা বাড়তে বাড়তে বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি! গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতে পারি তা জানো?'

'তুমি আমার চুলের মুঠি ধরলে!' সুবর্ণ উঠে বসে।

সুবর্ণর ফর্সা ধপধপে গালের উপর বড় বড় কালো চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে. ভয়ানক কিছু একটা বুঝি বলতে চায় সুবর্ণ. তারপর সহসাই গম্ভীর গলায় বলে, 'জানবো না কেন? খুব জানি। বাঙালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর এটুকু জানবো না?'

প্রবোধ বোঝে বেগতিক. গৃহপ্রবেশের সুখের দিনের রাতটাই মাটি। তাই সহসাই সুর বদলায়। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বলে. 'কেবল রাগ বাড়িয়ে দিয়ে মন্দ কথাগুলো শোনার সাধ। এই কটু কথাগুলো তুমিই মুখ দিয়ে বার করাও। আমি শালা এদিকে সারাদিন "হাপু গুনছি" কখন রাত আসবে. আর মহারাণী মেজাজ দেখিয়ে—নাঃ. তুমি বড্ড বেরসিক!'

সুবর্ণর বয়েস চোদ্দ বছর।

অতএব প্রবোধের জয় হতে দেরি হয় না।

কিন্তু সে কি সত্যিই জয়?

জয় যদি তো অনেক রাত্রে পরিতৃপ্ত পুরুষটা যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকে. ঘরের বাতাস উষ্ণ হয়ে ওঠে কেন একটা ভয়ঙ্কর আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাসে?

যে দীর্ঘশ্বাসটা কথা হয়ে উঠলে এই রকম দাঁড়ায়, 'এরা এরকম কেন? সারাজীবন এদের নিয়ে কাটাতে হবে আমায়!'

কিন্তু এটা সুবর্ণলতারই বাড়াবাড়ি বৈকি।

সাধারণ ঘরসংসারী মানুষ এ ছাড়া আর কি হয়? সবাই তো এই কথাই জানে. মানুষকে খেতে হয়. ঘুমুতে হয়. বংশবৃদ্ধি করতে হয় এবং সেই কাজ-গুলো নিশ্চিন্তে সমাধা করবার উপায় হিসাবে টাকা রোজগার করতে হয়।

আবার খেটেখুটে ক্লান্ত হলে তাস-পাশা খেলতে হয়. মাছ ধরতে হয়. রকে বসে রাজনীতি করতে হয়. ছেলে শাসন করতে হয়, মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, আর বুড়ো হলে তীর্থ-ধর্ম গুরুগোবিন্দ করতে হয়।

এরা জানে মাকে ভক্তি করতে হয়, স্ত্রীকে শাসন করতে হয় এবং সর্ব বিষয়ে মেয়েমানুষ জাতটাকে তাঁবে রাখতে হয়। শুধু মুক্তকেশীর ছেলেরাই এরকম, একথা বললে অন্যায় বলা হবে। অধিকাংশই এরকম। তারতম্য যা সে কেবল ব্যবহারবিধিতে।

সুবর্ণ বৃথাই দুষছে তার শ্বশুরবাড়িকে। অকারণেই ভাবছে—হায়, মন্ত্রবলে সমস্ত পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে গিয়ে যদি মাঝখানের এই দিনগুলো মুছে যেত! যদি রাত পোহালেই দেখতে পেত সুবর্ণ, ন বছরের সুবর্ণ তাদের সেই মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে স্কুলে যাচ্ছে বই-খাতা নিয়ে! সুবর্ণর মা হাসি-হাসি মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে!

একবার যদি এমন হয়, জীবনে আর কখনো সুবর্ণ তার ঠাকুমার ছায়া মাড়াবে না। ঠাকুমার কাছে দেশের বাড়িতে একা না গেলে তো মাকে লুকিয়ে এমন হুটুক্কারি বিয়ে দিয়ে বসতো না কেউ সুবর্ণর!

এতদিনে তা হলে হয়তো পাসের পড়া পড়তো সুবর্ণ।

না, মা কক্ষনো তার বিয়ে দিতো না তাড়াতাড়ি। বাবু বললেও না। ঠাকুমাই তার শনি। ঠাকুমা তাঁর সইয়ের মেয়েকে নাতনীর শাশুড়ী করে দিয়ে সইয়ের কাছে সুয়ো হলেন। সাথে কি আর ঠাকুমার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না সুবর্ণর? মানুষটাকে যেন তার জীবনের শনি মনে হয়!

যেদিন বড় দুঃখ হয়, অপমান হয়, রাতদুপুরে এইসব চিন্তায় ছট্‌ফট করে মরে সুবর্ণ, আর সমস্ত ছাপিয়ে মায়ের উপর একটা দুরন্ত অভিমানে দীর্ণ হতে থাকে।

মা তো দিব্যি চলে গেল!

সুবর্ণ মরলো কি বাঁচলো একবার ভাবলও না। মা যদি কলকাতায় থাকতো, সুবর্ণকে এমন করে একদুয়োরী হয়ে পড়ে থাকতে হতো!

বিয়ে হয়ে এসে মায়ের জন্যে কি কম গঞ্জনা সইতে হয়েছে সুবর্ণকে? তখন মানে বুঝতো না সব কথার, এখন তো বোঝে! বোঝে তো কী কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে সুবর্ণর জীবন শুরু!

সুবর্ণর সামনেই তো গিন্নীরা বলাবলি করেছে, 'হ্যাগা ঘরণী গিন্নী, "সংসারী" বিয়ের যুগ্যি দু-দুটো ব্যাটা, অমন শিবতুল্য স্বামী, আর মাগী কি না কুলে কালি দিয়ে চলে গেল!'

মুক্তকেশী বেয়ানের দোষ ঢাকতে যত না হোক, নিজের বংশের মান সামলাতেই তাড়াতাড়ি বলতেন, 'কুলে কালি অবিশ্যি নয়, তবে স্বামী-পুত্তুরের মুখে চুনকালি দিয়ে তো বটেই। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়ে হাতী করবেন, এই বাসনায় ছাই পড়লো, শাশুড়ী বেগতিক দেখে নাতনীটাকে নিজের কাছে আনিয়ে নিয়ে ঝটপট বে দিয়ে ফেলল, এই রাগে গরগরিয়ে মানুষ ঠিকরে চলে গেলেন কাশীবাস করতে।'

'কাশীবাস! হুঁ! এই বয়সে কাশীবাস!'

মহিলারা নাক সিঁটকোন। অর্থাৎ পুরোপুরি অগ্রাহ্যই করেন কথাটা। এতক্ষণ যে সুবর্ণর মা'র 'বয়েসে'র ব্যাখ্যায় তৎপর হচ্ছিলেন, তা মনে রাখেন না।

মুক্তকেশী আবার সামলান।

বলেন, 'কাশীতে যে বাপ বুড়ো আছেন গো মাগীর!'

'থাকুক'। ঝঙ্কার দিয়েছেন তাঁরা, 'বলি স্বামী-পরিত্যাগিনী তো বটে! সে মেয়েমানুষের আর রইল কি? তুমি ভাই মহৎ, তাই আবার ওই বৌকে ঘরে তুলেছ, কোন্ না হাতেও জল খাবে।'

মুক্তকেশী সদর্পে ঘোষণা করেছেন, 'জল? জল আমি কোনো বেটির হাতেই

খাই না। আপন পেটের মেয়েদের হাতেই খাই নাকি? যেদিন থেকে হাত শুধু করেছি, একবেলা স্বপাক হবিষ্যি, আর একবেলা কাঁচা দুধ গঙ্গাজল, ব্যস!'

গরবিনী মুক্তকেশী অতঃপর আপন কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা করতে বসতেন, সুবর্ণ হাঁ করে শুনতো। 'হাঁ' করেই, কারণ তখন তো জানতো না সুবর্ণ, 'আচমনী খাদ্য' মানে কি, অম্বুবাচী কাকে বলে, নিরম্বু উপোসের দিন বছরে ক'টা?

দীর্ঘশ্বাস-মর্মরিত ঘর ক্রমশ স্থির হয়ে আসে, সারাদিনের পরিশ্রান্ত মেয়েটার চোখে ঘুম আসে নেমে, সংকুচিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষটার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে সে। লোকটার ওই পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে কেমন ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে লোকটাকে।

এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে।

কিন্তু কী করবে সুবর্ণ?

চারিদিকে কত লোক, বিদ্রোহ করে কি লোক-জানাজানি কেলেঙ্কারি করবে? তা ছাড়া সব দিনগুলোই তো আজকের মত নয়? সব দিনেই কিছু আর বিদ্রোহ আসে না। নিজের মধ্যেও কি নেই ভালবাসার আর ভালবাসা পাবার বাসনা?

কী করবে তবে সে? ওকে ছাড়া আর কাকে? আর ওই মানুষটা ভালবাসার একটাই অর্থ জানে, আদর করবার একটাই পদ্ধতি।

'নেব না' বললে দাঁড়াবে কোথায় সুবর্ণ?

॥ ৩ ॥

মুক্তকেশীর চার ছেলে।

সুবোধ, প্রবোধ, প্রভাস, প্রকাশ।

বড় সুবোধ বাপ থাকতেই মানুষ হয়ে গিয়েছিল, বাপই নিজের অফিসে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, কালক্রমে সেই মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবুর পরবর্তী আসনটিতে এসে পৌঁচেছে সুবোধ, প্রকৃতপক্ষে তার টাকাতেই সংসার চলে।

মেজ প্রবোধ এনট্রান্স পাস করে অনেকদিন খেয়ে খেলিয়ে বেড়িয়ে এই কিছুদিন হল এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা ফেঁদেছে। টাকাটা বন্ধুর, খাটুনিটা প্রবোধের। সেজ প্রভাস হচ্ছে বাড়ির মধ্যে সেরা বিদ্বান ছেলে, এফ-এ পাস করে ফেলে সে ওকালতি পড়বে পড়বে করছে আর প্রকাশ গোটা পাঁচ-ছয় ক্লাস পর্যন্ত পড়েই পাড়ার শখের থিয়েটারে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করছে আর চুলের কেয়ারি করছে। সুবর্ণর বিয়ের সময় সংসারের অবস্থা প্রায় এই ছিল।

অনেকদিন পর্যন্ত সুবর্ণ এদের সকলের পুরো নাম জানত না। 'সুবো,

পেবো, পেভা, পেকা' এই ছিল মুক্তকেশীর সম্বোধনের ভাষা। ছোট ননদ বিরাজকে ডেকে একদিন ধরে বসলো সুবর্ণ, 'তোমাদের সব নাম কি বল তো শুনি! মা তো তোমায় "রাজু রাজু" করেন, রাজবালা বুঝি?'

'শোনো কথা!' রাজু অবাক হয়ে বলে, 'এতদিন বে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির লোকের নাম জানো না? মেজদা বলে নি?'

সত্যি বলতে, রাজুর মেজদাকে কোনোদিন এ কথা জিজ্ঞেসও করে নি সুবর্ণ। মনেও পড়ে নি জিজ্ঞেস করতে। এখনই হঠাৎ মনে পড়লো, জিজ্ঞেস করে বসলো। কিন্তু সেকথা না ভেঙে সুবর্ণ ঠোঁট উল্টে বলে, 'তোমার মেজদাকে জিজ্ঞেস করতে আমার দায় পড়েছে। তুমি রয়েছো হাতের কাছে, অন্যের খোশামোদ করতে যাবো কেন?'

বয়সে তিন বছরের ছোট ননদকেও এই তোয়াজটুকু করে নেয় সুবর্ণ।

রাজু অবশ্য তাতে প্রীতই হয়। আঙুল গুনে বলে, 'বড়দির নাম হচ্ছে সুশীলা, মেজদির নাম সুবালা, সেজদি হচ্ছে সুরাজ, আমি বিরাজ, আর দাদাদের নাম হচ্ছে—'

মহোৎসাহেই গল্প হচ্ছিল ননদ-ভাজে। হঠাৎ সমস্ত পরিস্থিতিটাই গেল বদলে। বিরাজ রেগে ঠরঠরিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে এবং তৎক্ষণাৎ মেজ বৌয়ের দুঃসাহসিক স্পর্ধার কথা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

ভাসুর-দেওরদের নাম নিয়ে তামাশা করেছে সুবর্ণ, ননদের নাম নিয়ে ভেঙিয়েছে!

করেছে। সত্যই করেছে সেটা সুবর্ণ।

কিন্তু সুবর্ণ কি জানতো একটু কৌতুকে এত দোষ ঘটবে? আর নামের মানে জিজ্ঞেস করলে অপমান করা হয়?

'সুরাজ' শুনে বলে উঠেছিল সে, 'ওমা, সুরাজ আবার কি রকম নাম? ও নামের মানে কি?'

একে যদি ভেঙানো বলে তো ভেঙানো।

তবে হ্যাঁ, দেওরদের সম্পর্কে বলেছে বটে একটা কথা তামাশা করে। পর পর চারজনের নাম শুনে হি হি করে হেসে বলে উঠেছে, 'তা চার ভাইয়েরই মিল করে নাম রাখলে হতো!'

বিরাজ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'সুবোধ-প্রবোধের সঙ্গে আর মিল কই?'

সুবর্ণ হেসে কুটি কুটি হয়েছিল, 'কেন, অবোধ-নির্বোধ!'

সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে উঠেছিল বিরাজ, বয়সের থেকে অনেকখানি জোরালো ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'এত আস্পদ্দা তোমার মেজ বৌ? সেজদা ছোড়দাকে তুমি নির্বুদ্ধি বলতে সাহস পাও? রোসো, মাকে বলে দিয়ে আসছি!'

মাকে বলে দেওয়ার নামে অবশ্য সুবর্ণর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'ওমা, তুমি রাগ করছ কেন, ভাই? আমি তো ঠাট্টা করেছি—'

কিন্তু বিরাজ হাত ধরার মান রাখে নি, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য মুক্তকেশীর আবির্ভাব।

চেঁচানো না, ধমকানো না, থমথমে গলায় বললেন, 'কোন্ লক্ষ্মীছাড়া ঘরে মানুষ হয়েছিলে মেজবৌমা, শিক্ষা-সহবৎ নেই? এদিকে পাকা পাকা কথার জাহাজ? বলি পেবা-পেকার নাম নিয়ে ধিক্ দিয়েছ কেন শুনি?'

সুবর্ণ এবার সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে, 'আমি তো ঠাট্টা করেছি।'

'ঠাট্টা? ঠাট্টা করেছ? বলি মেজবৌমা, ঠাট্টাটা কাকে করেছ? এই শাশুড়ীমাগীকে, আর সেই মরা শ্বশুরকে তো? নামকরণ তো ওরা নিজেরা করতে যায় নি, এই আমরাই করেছি। সাতজন্মে এমন কথা শুনি নি যে, পুটকে একটা বৌ এসে ঠিকুজি-কুলুজি চাইতে বসে, নাম নিয়ে ব্যাখ্যানা করে। এ্যা, পেবা-পেকা শুনলে কী বলবে গো!'

সুবর্ণলতা বলে ফেলে, 'সবাইকে যদি শুনিয়ে বেড়ান, তবে আর কি করবো? আমি তো কাউকে শোনাতে যাই নি। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, ছোট-ঠাকুরঝি লাগিয়ে দিতে গেল কেন?'

বৌয়ের মুখ থেকে এমন স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষা শোনার অভ্যাস মুক্তকেশীর নেই। বড়বৌ উমাশশীর মুখ দিয়ে সাত চড়ে 'রা' বেরোয় না। বোনপো-বৌ ভাগ্নে-বৌ তা-ও অনেক দেখেছেন, পেটে পেটে বজ্জাতি, হাড়-হারামজাদা হলেও মুখে এমন খই ফোটায় না কেউ।

আরো থমথমে গলায় বলেন, 'আমার গর্ভের মেয়ের অমন লাগানো-ভাঙানো স্বভাব নয় মেজবৌমা। ভাইদের ঘেন্না দেওয়া দেখে প্রাণে বড় লেগেছে তাই বলে ফেলেছে। তোমার চরণেই কোটি কোটি নমস্কার মা। নামের আবার মানে চাই! বাপের কালে শুনি নি এমন কথা। জানতাম না তো ঘরে আমার এমন বিদ্যেবতী বৌ আসবে, তা হলে মানে খুঁজে খুঁজে নাম রাখতাম। আচ্ছা আসুক আজ পেভা, সে তো দুটো পাস করে তিনটে পাসের পড়া ধরছে, শুনছি নাকি ওকালতি পড়বে। তাকেই জিজ্ঞেস করবো কোন্ নামের কী মানে? আর বলবো, এত বিদ্যে করেও তোদের বিদ্যেবতী বৌয়ের কাছে অবুদ্ধি-নির্বুদ্ধি হলি!'

সুবর্ণ অভিমানী, কিন্তু সুবর্ণ কথায় খই ফোটায়, আত্মস্থ থাকতে পারে না। রাগ হলে চাপবার ক্ষমতা নেই সুবর্ণর। তাই সুবর্ণ ফের শাশুড়ীর মুখের উপর বলে বসে, 'আপনারা বড্ড তিলকে তাল করেন, তুচ্ছ কথা নিয়ে এত হৈ-চৈ করতে ভাল লাগে!'

মুক্তকেশী বসে পড়েন।

মুক্তকেশী বলেন, 'রাজু, এক ঘটি জল আন, মাথায় থাবড়াই। সই-মা আমার কত জন্মের শত্রু ছিল গো, এই মেয়ে গছিয়েছে আমায়!'

বিরাজ ছুটে জলের ঘটি নিয়ে আসে, মুক্তকেশী থাবলে থাবলে খানিক মাথায় থাবড়ে বলেন, 'এ বৌ নিয়ে ঘর করা হবে না আমার, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি সেই ভবিষ্যৎ। রাজু দোরটা দে, আমি একবার বাদুড়বাগান ঘুরে আসি। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল।'

মাথার মধ্যে আগুন যখন-তখনই জ্বলে ওঠে মুক্তকেশীর। একটা মাত্র ছেলেকে স্বামী দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এই পর্যন্ত। বাকী তিন-তিনটে ছেলেকে টেনে তুলতে হয়েছে, শেষ মেয়েটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল।

এখন তবু দুই ছেলে রোজগার করছে, বড়র মাইনেও বেড়েছে। তখন যে টানাটানিতে চলেছে, ঈশ্বর জানেন আর মুক্তকেশী জানেন। সেই সব কষ্টই আগুনের উপাদান হয়ে মজুত আছে ভিতরে। একটু এদিক-ওদিকেই জ্বলে ওঠে সেই আগুন।

কিন্তু ঘরসংসারে তো এতদিন এদিক-ওদিক ছিল না। যা কিছু বাইরে। ঘরে ছেলেরা জোড়হস্ত, বড় বৌ তো মাটির ঘট, মেজ বৌ এসে ঢোকা পর্যন্ত থেকে থেকেই আগুন জ্বলে। আর উঠতে বসতে সেই পরলোকগতা 'সইমা'র উদ্দেশ্যে অভিযোগবাণী বর্ষণ করেন।

তাও কি পার আছে?

মুখরা মেজ বৌ কিনা বলে বসে, 'মরা মানুষটাকে আর কত গাল দেবেন? সেখানে বসে জিভ কামড়ে কামড়ে নতুন করে মরবে যে! একে তো আমি পৌত্রী হয়ে রাতদিন শাপ দিচ্ছি—'

'তুমি শাপ দিচ্ছ!' মুক্তকেশী হঠাৎ থতিয়ে গিয়েছিলেন, ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'তুমি শাপ দিচ্ছ কোন্ দুঃখে?'

'যে দুঃখে আপনি দিচ্ছেন সেই দুঃখে', সুবর্ণ আকাশপানে তাকিয়ে উদাস গলায় বলেছিল, 'আর এখন দোষ দিই না, অদেষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।'

সুবর্ণর এই সব কথা শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, পুরুষদের কানেও ওঠে। মুক্তকেশীই ওঠান, রোজ একবার করে হাতজোড় করে সংসার থেকে ছুটি চান।

শুনে মুক্তকেশীর বড় ছেলে মাঝে মাঝেই বলে, 'তোমরাই বা মেজ বৌমাকে অত ঘাঁটাও কেন বুঝি না। বুঝতেই তো পারো, একটু তেজী প্রকৃতির আছেন উনি—'

কিন্তু মেজ-সেজ-ছোট এই মারে তো এই কাটে করে ওঠে। বয়সে বড় দেবরদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা কওয়া চলে না, তাই দেবররা একতরফা গর্জন করে, 'মাকে অপমান? ভেবেছেন কি মেজ বৌ? মেজদার যাই রাজা দশরথের অবস্থা তাই পার পেয়ে যাচ্ছেন, আর কেউ হলে অমন পরিবারের মুখ জুতিয়ে ছিঁড়ে দিত। তেজী প্রকৃতি আছেন উনি বলে তো দাদা তুমি দিব্যি আস্কারা দিলে, বলি মা'র অপমানটা গায়ে বাজল না তোমার?'

সুবোধ সহাস্যে বলে, 'আহা, এক-ফোঁটা মেয়ের কথায় মা'র আবার অপমান কিসের? গ্রাহ্য করেন কেন?'

কিন্তু প্রবোধ থাকলে দাদার বদলে ছোট ভাইদের সমর্থন করে। বলে, 'দিয়ে আসতে হবে একদিন বিদেয় করে।'

বলে, তবে গলাটা একটু নামিয়ে বলে। বৌকে নেহাৎ চটিয়ে রাখলে অসুবিধে আছে। বৌ বিগড়োলে নিজের স্বভাব-চরিত্র ভাল রাখতে পারা যাবে কি বিগড়ে বসবে কে বলতে পারে? পুরুষমানুষ তো?

বাদুড়বাগানে মুক্তকেশীর সমবয়সী মাসতুতো বোন হেমাঙ্গিনীর বাড়ি। মাথা গরম হয়ে উঠলেই এখানে চলে আসেন মুক্তকেশী। কারণ হেমার কথাবার্তা প্রাণ-জুড়োনো, হেমার কাছে জল উঁচু তো জল উঁচু, জল নীচু তো জল নীচু।

মুক্তকেশী যদি বলেন, 'আমার বড় বৌটার মত ভালোমানুষ আর হয় না—'

হেমা বলেন, 'আহা তা আর বলতে! বৌ দেখলে চোখ জুড়োয়।'

মুক্তকেশী যদি বলেন, 'আমার বড় বৌটার মতন বোকা আর ত্রিভুবনে নেই—'

হেমা বলেন, 'তা যা বলেছ, দেখছি তো সব! তুই যাই তাই ওই বোকাকে নিয়ে ঘর করছিস!'

তবে মুক্তকেশীর মেজ বৌ সম্পর্কে সুরফের্তা করতে হয় না কখনো হেমাকে। সব সময়েই বলা চলে, 'সত্যি মুক্ত, কী করে যে তুই বৌ নিয়ে ঘর করছিস!'

মুক্তকেশী কপালে করাঘাত করে বলেন, 'উপায়? পেবোর তো শুধু মুখে হুমকি, ভেতরে ভেতরে রূপসী বৌয়ের ছিচরণের গোলাম! আমার অবস্থাটি কেমন? সেই যে বলে না—

মেয়ে বিয়োলাম, জামাইকে দিলাম,
বেটা বিয়োলাম বৌকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী,
ইচ্ছে হয় যে, দুয়োরে বসে
ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদি!

সেই তাই, চোর হয়ে আছি।'

সমবয়সী হলেও মুক্ত নাকি দু-চার মাসের ছোট, তাই হেমাঙ্গিনীর বর কাশীনাথ তাঁর সঙ্গে ছোট শালীজনোচিত কৌতুক-পরিহাস করে থাকেন, এবং দুই বোনে একত্র হলেই ঠিক এসে জোটেন। ভাল চাকরি করতেন, দিল্লী-সিমলের কাজ ছিল, সম্প্রতি রিটায়ার করে সাবেকী বাড়িতে এসে বসবাস করছেন। হেমাঙ্গিনী অবশ্য কখনো স্বামীর সঙ্গে সেই দিল্লী-সিমলের সুখাস্বাদন করতে যান নি। বরের সঙ্গে বাসায় যাওয়ার নিন্দের ভয়েই শুধু নয়, নিজের দিকেও জাত-যাওয়ার ভয় ছিল প্রবল। ওসব দেশে গেলে যে জাত-যাওয়া অনিবার্য এ কথা হেমাঙ্গিনীর ছেলেবেলা থেকে শোনা। কাশীনাথের গৃহসুখ ছিল শুধু ছুটি-ছাটায়।

কাশীনাথ হেসে হেসে বলতেন, 'জাতটা আর বাঁচলো কই? এই জাত-যাওয়া লোকটার ঘরে এসে তো শুচ্ছ!'

হেমাঙ্গিনী ভ্রূভঙ্গী করত, 'যত সব বিটকেল কথা!'

'আমি চলে গেলে গঙ্গাস্নান কর? না শুধু লুকিয়ে একটু গোবর খেয়ে ফেল?'

হেমাঙ্গিনী আরো ভুরু কোঁচকাতো।

বেশি কথা বলতে জানতো না কখনো, এখনো না। সব কথাই মুক্তকেশীর। মাঝে-সাঝে কাশীনাথ এসে জোটেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত।

'তুমি চোর হয়ে আছ? বল কি মুক্ত? তা হলে ডাকাত আবার কেমন দেখতে?'

হেমাঙ্গিনী বলে ওঠেন, 'আবার তুমি মস্করা করতে এলে? ও মরছে নিজের জ্বালায়---'

কাশীনাথ হুঁকো খেতে খেতে মিটিমিটি হেসে বলেন, 'লঙ্কাও মরে নিজের জ্বালায়! তার জ্বলুনি ঘোচাবে, এমন সাধ্যি মা গঙ্গারও নেই! বলি, হচ্ছে তো? পরের মেয়েদের কুচ্ছো হচ্ছে তো? আশ্চায্যি, বুড়ো বুড়ো দুটো গিন্নী তোমরা, আপন আপন দোষ দেখতে পাও না, ওই দুধের মেয়েগুলোর মধ্যে এত দোষও দেখো!'

মুক্তকেশীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, তবু বলেন, 'বুড়ো মাগীদের দোষ দেখতে তো জগৎ আছে জামাইবাবু! এই তুমিই তো কত দোষ দেখছ! তবে ওদেরও শিক্ষেদীক্ষের দরকার। কুচ্ছো আমরা করি না, হক্ কথা বলি। এই যেমন

তোমাদের ঘরের ছোটটি, তেমনি আমার ঘরের মেজটি, তুল্যমূল্য। ওরা আমাদের দেশত্যাগী করতে পারবে।'

'তা বললে কী হবে?' হেমাঙ্গিনী অসন্তোষের গলায় বলেন, 'বুড়ো বয়সে উনি এখন ক্ষুদে ক্ষুদে বৌদের মনরাখা কথা বলতে আরম্ভ করেছেন! মনে করেছেন হাতে রাখি! আমি মরে গেলে বৌরা যত্ন-আত্তি করবে! মনেও করো না তা, বুঝলে? বাঘিনীর চোখের সামনে আছে, তাই এখন এত ঠাকুরসেবা। মরি একবার, তখন দেখো। বলবে ভাল আপদ হয়েছে, ঘাড়ে একটা বুড়ো শ্বশুর!'

কাশীনাথ হেসে ওঠেন, 'বালাই বালাই, তুমি মরবে আর আমি জিন্দা থেকে সেই দৃশ্য দেখবো? ছিঃ! তুমি দু-দশ দিন মুক্তর মতন মাথা মুড়িয়ে হাত নেড়া করে স্বাধীনতার সুখটা ভোল করে নাও। বৈধব্যকালটাই তো মেয়েমানুষের আসল সুখের কাল গো! তাতে আবার যদি বয়েসকালটা একটু ভাঁটিয়ে আসে! কার সাধ্যি হক কথা বলে!'

'জামাইবাবুর যেমন কথা!'

মুক্তকেশী কোপ প্রকাশ করেন।

কাশীনাথ দমেন না। বলেন, 'হক্ কথা কও ভাই মুক্ত, ভায়রাভাই যখন বেঁচে ছিল এত পা ছিল তোমার? এত স্বাধীনতা?'

এইরকম হাড়জ্বালানো কথাবার্তা কাশীনাথের। কিন্তু শুনতেই হয়, উপায় কি? হেমা যে তাঁর প্রাণের সখী, হেমার সঙ্গেই যত শলা-পরামর্শ। শিষ্যাও বটে।

বৌদের কিসে জব্দ রাখতে হয়, আর ছেলেদের কি করে বশে রাখতে হয়, সে বিদ্যাকৌশল মুক্তকেশী শেখান হেমাঙ্গিনীকে।

আজ কিন্তু মুক্তকেশীই পরামর্শ চান, 'ওই বেহেড বৌকে কি করে দাবে আনি বল দিকি হেমা?'

হেমাঙ্গিনীরও বোধ করি হঠাৎ গুরুর পোস্ট পেয়ে বুদ্ধি খুলে যায়। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'দাবে আনা যায় "ভাতে মারলে"! বরের সোহাগেই তো ধরাখানা সরাখানা। তুমি একটা কোনো কৌশল করে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে শোবে, দেখো দুদিনে ঢিট হয়ে যাবে।'

মুক্তকেশীর কৌশলটা মনঃপূত হয়, কিন্তু সম্ভব মনে হয় না। বলেন, 'ছোঁড়া যে তা হলে বুক ফেটে মরবে!'

'বরং উল্টো রে মুক্ত, ডাকিনীদের খপ্পর থেকে দুদিন সরিয়ে নিলে বাঁচবে। তুই একটা বানানো কথা বল্। বল্ যে স্বপ্ন দেখলাম, তোর সময় খারাপ আসছে। মাতৃমন্তর জপলে আর মায়ের আওতায় থাকলে তবেই রক্ষে।'

'তবেই রক্ষে বুঝলে বড় বৌমা—', মুক্তকেশী বড় বৌমার কাছে ফিসফিস করেন, 'এই বাক্যিটি ভালমত করে বুঝিও তো তোমার মেজ জাটিকে। আমি বলতে গেলে মন্দ হবো। তবে আমাকে তো আমার ছেলের কল্যেণ-অকল্যেণ দেখতে হবে।'

না, তখনো সুবর্ণলতার চোদ্দ বছর বয়েস হয় নি, তখনো তার অন্তরালে একটি প্রাণকণা আশ্রয়লাভ করে নি। তখনো সুবর্ণরা সেই ওঁদের পুরনো বাড়িতে ছিল, যে বাড়ির উঠোনে দেয়াল তুলে তুলে তার জেঠশ্বশুর-খুড়-

শ্বশুররা নিজ নিজ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে নিয়ে বসবাস করতেন এবং শাশুড়ী-কুল খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই এ বাড়িতে বেড়াতে এসে সংসারের সর্বত্র শ্যেনদৃষ্টি ফেলতেন।

কিন্তু সকলেই এক দলে নয়।

ছোট খুড়শাশুড়ীর শ্যেনদৃষ্টি এই নতুন ব্যবস্থার ওপর পড়তেই তিনি মুক্তকেশীকে এসে চেপে ধরলেন, 'হ্যাগো নদি, এ আবার কি আদিখ্যেতা তোমার? ঘরে ডবকা বৌ, প্রবোধ কেন তোমার আঁচলতলায় শুতে আসে?'

মুক্তকেশী যদিও দজ্জাল, তবু জা-ননদকে কিছুটা মেনে চলেই আসছেন। তাই 'বেশ করেছি তোমার তাতে কি'—না বলে সংক্ষেপেই বলেন, 'স্বপন পেয়েছি।'

'স্বপন পেয়েছ? ওমা! স্বপন পাবার বস্তু-বিষয় পেলে না তুমি? কী স্বপন পেয়েছ শুনি?'

মুক্তকেশী আরো সংক্ষেপে বলেন, 'স্বপন বলা নিষেধ।'

ছোট বৌ ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'জেগে স্বপন দেখলে বলতে নিষেধ হবে বৈকি। তবে এও বলে রাখছি নদি, বজ্রআঁটুনি করলেই গেরো ফসকায়। এখন তোমার বৌ মনের খেদ মনে চেপে তোমার অন্যায় বিধেন মেনে চলছে, ভবিষ্যতে এর শোধ নেবে তা জেনো। বুড়ো তো হতে হবে, ওদের হাতে তো পড়তে হবে।'

মুক্তকেশী সদর্পে বলেন, 'কেন? মানুষের হাতে পড়তে যাবো কেন? মা গঙ্গা নেই? যতক্ষণ চক্ষুছরদ থাকবে, ততক্ষণ দাপট করে সংসারে থাকবো। ক্ষ্যামতা গেলে গঙ্গা-গর্ভে ঠাঁই নেব। তবে এ কথাটি বলে রাখি ছোট বৌ, যার দুঃখে চোখে নোনাপানি ঝরছে তোমার, সেটি সোজা নয়। খেদ! খেদে তো মরে যাচ্ছে! বড়বৌমার কাছে কী বলেছে জানো? "আঃ, শুনে বাঁচলাম, হাড়ে বাতাস লাগলো। কিছুদিন তবু ঘুমিয়ে বাঁচবো। মা-দুগ্‌গার কাছে বর চাইবো সময় ওর যেন বরাবর খারাপ থাকে।" শুনলে? এর পরও করবে খেদ?'

'ওটা তেজ করে বলেছে', ছোটগিন্নী হেসে ফেলে বলেন, 'দুঃখু জানিয়ে খেলো হবে না এই আর কী! তা তোমার ছেলের অবস্থা কি?'

মুক্তকেশীও তেজী।

মুক্তকেশী খেলো হবার ভয়ে মটমটিয়ে কথা বলেন। তবু আচমকা মুক্তকেশী একটু অসতর্ক হয়ে যান। বলে ফেলেন, 'ছেলের কথা আর বলিসনে, কামরূপ কামিখ্যের জন্তু। ছটফটিয়ে মরছেন, সারারাত্রি ঘুম নেই। এই উঠছে, এই জল খাচ্ছে, আমি তেমন মড়া হয়ে ঘুমোলে পারলে পালায়। আমিও বাবা তেমনি ঘুঘু, যেই উসখুস করে সাড়া করি, জল খাবি? মশা কামড়াচ্ছে? গরম হচ্ছে?'

ছোটগিন্নী হেসে ফেলে বলেন, 'তা মা হয়ে তো কম শাস্তি করছ না তুমি ছেলের?'

'সেই তো! সেই তো হয়েছে জ্বালা, কুলাঙ্গার হয়েছে একটা। আমার সুবো অমন নয়। এই হতভাগার জন্যেই আবার মান খুইয়ে ঘরে পাঠাতে হবে। মানিনী তো গরবে আছেন। শুনলে অবাক হবে, রাজুকে কাছে শুতে বলেছিলাম, নিল না ঘরে! বলে একলা খিল দিয়ে বেশ শোবো!'

হ্যাঁ, বলেছিল সুবর্ণ।

তেরো বছরের সুবর্ণ।

'আমার অমন ভূতের ভয় নেই। একলা বেশ শোবো। বরং সুখে ঘুমুবো, সারারাত একজনকে বাতাস করে মরতে হবে না।'

কিন্তু মুক্তকেশীর গর্ভের কুলাঙ্গার এই অপমানের পরও মান খোয়ায়। আড়ালে আবডালে হাত ধরতে আসে। বলে, 'তোমার প্রাণে কী একফোঁটা মায়া-মমতা নেই মেজ বৌ? ফাঁদে-ফন্দীতে একবার দেখা করতেও ইচ্ছে হয় না?'

সুবর্ণ হাত ধরতে না দিয়ে বলে, 'কেন, দেখছি না নাকি? সর্বদাই তো দেখতে পাচ্ছি।'

'আহা সে দেখা আবার দেখা! রাতেই না হয় ঘরে আসা বারণ, অন্য সময় একটু দেখা করতে দোষ কী?'

'আমার অত সাধ নেই।'

'ভারি নির্মায়িক তুমি।'

'তোমাদের সবাই তো খুব মায়াবান!'

'আহা, মায়ের একটা কারণ ঘটেছে তাই—'

'আমিও তো তাই বলছি। তুমিই হাঁপাচ্ছ।'

'হাঁপাচ্ছি সাধে মেজ বৌ? মানুষের কলজে আছে তাই হাঁপাচ্ছি।'

'আমার তবে নেই সে কলজে! হল তো?'

'দোহাই তোমার, কাল দুপুরে একটিবার যেন চিলেকোঠার ঘরে দেখা পাই।'

'দুপুরে? আপিস নেই?'

'আপিস পালিয়ে চলে আসতে হবে, উপায় কি?'

'তোমার মাথা খারাপ বলে তো আর আমার খারাপ হয় নি?'

'ওঃ, আচ্ছা! তার মানে স্বামীর প্রতি মন নেই। তার মানে মনে অন্য চিন্তা আছে। বেশ আমিও পুরুষমানুষ।'

'শুনে বাঁচলাম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কিনা।'

প্রবোধ ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'এইটুকু বয়সে এত কথা শিখলে কি করে বল তো?'

'কি জা—নি!'

হঠাৎ দালানে কার ছায়া পড়ে। প্রবোধ তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঝগড়া থাক। দোহাই তোমার, মনে থাকে কাল দুপুরে, চিলে-কোঠার ঘরে! আপিস পালিয়ে এসে যেন হতাশ না হই!'

কিন্তু আশা কি পূর্ণ হয়েছিল প্রবোধের? চিলেকোঠার ঘরে এসেছিল সুবর্ণ?

॥ ৪ ॥

হ্যাঁ, এসেছিল সুবর্ণ সেই চিলেকোঠার ঘরে। যখন সংসারের সব পাট চুকিয়ে মুক্তকেশী নিত্যনিয়মে দ্বিপ্রাহরিক পাড়া বেড়ানোয় বেরিয়েছেন, উমাশশী গেছে ছেলে ঘুম পাড়ানোর ছুতোয় একটু গা গড়িয়ে নিতে, খুদু আঁশ-নিরামিষ দু প্রস্থের বাসনের পাহাড় নিয়ে উঠোনে বসেছে গুছিয়ে, তখন এই নিরিবিলির অবসরে পা টিপে টিপে সিঁড়িতে এল সুবর্ণ, আরো পা টিপে টিপে সিঁড়ি উঠতে লাগল অভিসারের ভঙ্গিতে পায়ের মল খুলে রেখে।

কিন্তু পায়ের মল কি একা সুবর্ণই খুলেছিল?

তা যেই খুলুক প্রবোধের সেটা জানার কথা নয়, প্রবোধ তাই প্রতি মুহূর্তে একটি মলের রুনুঝুনুর অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে হয়ে ক্রমশ হতাশ হচ্ছে, ক্রুদ্ধ হচ্ছে, ক্ষিপ্ত হচ্ছে।

গরমে গলগলিয়ে ঘাম ঝরছে, মশার কামড়ে আরো গা ফুলে উঠেছে, নিজের হাতের চড় খেয়ে খেয়ে গায়ে ব্যথা হবার যোগাড়! তবু বেরিয়ে পড়বার উপায় নেই। কারণ আশা ছলনাময়ী। তা ছাড়া বেরোবেই বা কোন্ লজ্জায়? ও যে আজ অফিস পালিয়েছে সেটা তো আর ঢাক পিটিয়ে লোক-জানাজানি করবার কথা নয়।

অফিস পালানো বলে পালানো, প্রায় ছেলেবেলায় স্কুল পালানোর মতই কাণ্ড করে বসেছে। দাদার সঙ্গে পাশাপাশি বসে ভাত খেয়ে, দাদার সঙ্গে এক-সঙ্গে বেরিয়ে, দাদার চোখে ধুলো দিয়ে ফিরে এসেছে। ধুলো দেওয়ার সুবিধেও আছে, প্রবোধ যায় ট্রামে, সুবোধ যায় শেয়ারের ঘোড়ার গাড়িতে। মোড়ের মাথায় ছাড়াছাড়ি হয়ই।

দাদাকে দেখিয়ে ট্রামে উঠে, একটু পরে টুপ করে নেমে আসে গুটি গুটি বাড়িপানে। এ সময় কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় কম, কারণ পাড়া ঝেঁটিয়েই তো সব পুরুষ জাতীয়েরা অফিস ইস্কুলে চলে গেছে। মেয়েমানুষরা তো আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না যে দেখে ফেলবে?

তবু যদি কারো বাড়ির ঝি-চাকর কি স্বয়ং খুদুর সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়, কোন্ কথাটা বলে মান রক্ষা করবে, সেটা তৈরি করেই রেখেছে! বলবে, 'ওরে বাবারে, পেটের মধ্যেটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল, মাঝপথে ফিরে আসতে হল।'

না, এর থেকে সভ্য কোনো মিথ্যে কথা বানাতে পারে নি সুবর্ণলতার স্বামী। কিন্তু বিধি তখনও পর্যন্ত তার প্রতি সদয়। তাই কোনো চেনা মুখের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হল না প্রবোধচন্দ্রকে। অবিশ্যি সদর দোর দিয়েও ঢোকে নি সে। কি জানি দৈবদুর্বিপাকে যদি আজই মুক্তকেশী এত বেলায় গঙ্গাস্নানে যান!

হ্যাঁ, নিত্য গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করে চলেছেন মুক্তকেশী বিধবা হয়ে পর্যন্ত। বিরাজ তখনো নিতান্ত শিশু, তত্রাচ মুক্তকেশী বৈধব্য ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈধব্যের সর্ববিধ শুচিতা এবং কঠোরতা পালন করে আসছেন। চুল কেটেছেন, হাত শুধু করেছেন, পান ছেড়েছেন, রাত্রে আচমনী খাদ্য ছেড়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেদের অফিস পাঠিয়ে মুক্তকেশী ঘটি-গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সে আন্দাজে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু কে বলতে পারে প্রবোধের ভাগ্যেই আজ--

পাশের ওই মেথর আসার গলি দিয়ে ঢুকে পড়লে আর কোনো ভয় নাই। মুক্তকেশী এর ধারে-কাছেও উঁকি দেন না কোনোদিন। প্রবোধ? সে তো আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ। আড়াই পায়ের কসরৎ ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস করা আছে মুক্তকেশীর ছেলেদের।

অতএব প্রবোধ নিষ্কণ্টকে বাড়ি ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝপ করে ছাতের সিঁড়ি ধরেছে। ধরেছে মানেই মরেছে। সেই বেলা এগারটা থেকে এই বেলা আড়াইটে! চিলেকোঠার এই ঘরটাতেই কি জমাতে হয় ছাই সংসারের যাবতীয় ওঁচা মাল?

পায়াভাঙা চৌকি, কলভাঙা তোরঙ্গ, ডালাভাঙা হাতবাক্স, এসব ছাড়াও ছেঁড়া মশারি, পুরানো কাঁথা, বাতিল তোশক, ফুটো ঘড়া, কাঁচফাটা ছবির ফ্রেম —কী আছে আর কী নেই! ফেলবার নয়, ফেলবার নয়, এই সব বস্তুর আর গতিই বা কি?

অবশ্য ভবিষ্যতে ওদের আবার টেনেটুনে কাজে লাগাবার আশা আছেও কিছু কিছু। যেমন, সময় সুবিধে করে ধুনুরি ডেকে ছেঁড়া তোশক ধুনিয়ে, নতুন একটু খেরো কিনে তোশক বানিয়ে নেওয়া, কাঁথাগুলোর উপর আবার একপ্রস্থ করে কাপড় বসিয়ে গোটাকতক ফোঁড় চালিয়ে নিয়ে কাজ চালানো, বাসন-ওলা এলে ঘড়াগুলো বদল দেওয়া, আর বাসনওয়ালী এলে ছেঁড়া মশারির বদলে দু-একখানা পাথরের খোরা, কি কাঁসার বাটি, নয়তো একটা পেতলের গামলা কি মোটা চিরুনি আর হাত-আয়না কিনে ফেলা!

ফাটা ছবির ফ্রেমেরও সদ্‌গতি হয় বৈ কি! ভাঙা কাঁচেরও খদ্দের আছে। ভরদুপুরে বেরোয় তারা 'কাঁচ ভাঙা—কাঁচ ভাঙা' হাঁক পেড়ে। চোর সামলাতে পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচ পুঁততে কেনা হয় ওগুলো।

মোটা কথা, গেরস্ত বাড়িতে চট্‌ করে কিছু ফেলে দেওয়ার কথা ওঠে না। ফেলাছড়ায় মা-লক্ষ্মী বিমুখ হন এ আর কোন্‌ গেরস্তর গিন্নী না জানে? অথচ ওই সব কুদর্শন বস্তুগুলো, সময়সাপেক্ষে যাদের সদ্‌গতি হবে, তাদের কিছু আর সর্বদা চোখের সামনে বিছিয়ে রাখা যায় না! তাদের জন্যেই চোরকুঠুরি, চিলেকোঠা, চালি, সাঙ্গা!

মুক্তকেশীও গেরস্তর গিন্নীর পদ্ধতিতেই চিলেকোঠাটাকে বোঝাই করে রেখেছেন। কোনো একদিন এ ঘরে তার আদরের পুত্ররত্ন 'পেবো' এসে বসে বসে মশার কামড় খাবে আর নিজের গাল নিজে চড়াবে, এ কথা মুক্তকেশীর স্বপ্নের অগোচর।

অথচ সেটাই ঘটছে।

পেবো মশার ছুতোয় নিজের গালে নিজে চড়াচ্ছে, নিজের কান নিজে মুলছে, এবং নেহাৎ মাটিতে শতবর্ষের ধুলো বলে নাক ঘষটে নাকে খৎ দিতে না পারায় মনে মনে সেটা দিচ্ছে শতবার!

ভরসা বলতে, আশ্রয় বলতে ভাঙা এই তক্তপোশটা। সেটাকে প্রবোধ ফুঁ দিয়ে দিয়ে আলতো করে কোঁচার আগার ঝাপটা মেরে বসবার যোগ্য করে নিয়েছে। সুবর্ণলতাকে নিয়ে যদি দুদণ্ড বসতে হয় এখানে, বিরহজ্বালা মেটাতে, চৌকির ক্যাঁচকোঁচ শব্দটা নিয়ে না মুশকিলে পড়তে হয়, এই ভাবনাতেই কাতর

ছিল প্রথম দিকে, ক্রমশ সেটা চলে গেছে, এখন শুধু ভাবনা সুবর্ণ এলে কী কী কটু কথায় মনের ঝাল মেটাবে।

কী ভেবেছে সে নিজেকে?

মহারাণী?

তাই তীর্থের কাকের মতন, রাস্তার হ্যাংলা কুকুরের মতন হা-পিত্যেশ করে বসে আছে প্রবোধ, যে নাকি সুবর্ণর স্বামী! জগতের সেরা গুরুজন! জাপান থেকে চিরুনি আসে, তাতে পর্যন্ত লেখা থাকে 'পতি পরম গুরু'। তার মানে তাদের দেশের মেয়েরাও এ উপদেশ শিরোধার্য করে। আর সুবর্ণ হিন্দুর মেয়ে হয়ে, বাঙালীর মেয়ে হয়ে এই কষ্টটা দিচ্ছে স্বামীকে?

প্রবোধ পারে না অমন পরিবারকে ত্যাগ করে দিতে? একবার যদি মায়ের কাছে মুখের কথাটি খসায় প্রবোধ, যদি বলে, 'তোমার মেজবৌ তোমারই থাক মা, আমার দরকার নেই, আমার জন্যে চিমটে আছে, লোটা আছে, গেরিমাটি আছে—' মা দূর দূর করে বিদেয় করে দেবে না অমন অলক্ষ্মী বৌকে? আর ছেলেকে ঘরবাসী করতে নতুন করে মেয়ে দেখে বিয়ে দেবে না?

ভেবে দেখে না এসব গর্বিনী দেমাকী!

নাকি ভাবে প্রবোধের আর বৌ জুটবে না?

পুরুষ বেটাছেলে, আস্ত চারখানা হাত-পা আছে, তার আবার বৌয়ের অভাব? ত্যাগ দিতেই বা ছুতোর অভাব কি? মস্ত ছুতো তো রয়েইছে।

মা!

মা'র নামে বদনাম তুললেই তো চুকে গেল।

এতদিন ত্যাগ করা হয় নি কেন? জানতাম না!

ভেতরের কথা জানতাম না। ব্যস!

অদৃশ্য সেই অপরাধিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করতে থাকে প্রবোধ, যথেচ্ছ কটুকাটব্য! করবে না কি করবে, মশার কামড়ে চাকা চাকা হয়ে গেল না সর্বাঙ্গ? ঘামতে ঘামতে লোনা হয়ে গেল না দেহটা? এত জিনিস আছে ঘরে, এত জঞ্জাল, একখানা ভাঙা হাতপাখা নেই! যেটা থাকলে নাকি প্রাণটা এমন ঠোঁটের আগায় আসত না, আর হয়তো মেজাজ এত সপ্তমে উঠত না!

কিন্তু নেই।

একখানা ফাটা ছবির কাঁচ নিয়ে নেড়ে নেড়ে বাতাস খেতে গেল হতভাগ্য বেচারা, ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল সেটা! রাগের মধ্যে কাঁচের টুকরোর বিভীষিকা ছড়িয়ে রইল চৌকির উপর।

লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটা আসুক একবার, আগে এই কাঁচগুলোর ব্যবস্থা করিয়ে তবে অন্য কাজ।

রাগতে রাগতে হঠাৎ একসময় চোখে জলই এসে যায় প্রবোধের। শুধু কী ওই পাজী মেয়েমানুষটা?

নিজের মা তার শত্রু নয়?

গর্ভধারিণী মা!

আরো তিনটে ছেলেও তো রয়েছে তাঁর? আর কাউকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখতে পারলেন না? এই হতভাগ্য পেবোই তাঁর স্বপ্নে ঠাঁই পেতে গেল!

কেন?

কোন্ অপরাধে?

মা যদি ওই কিম্ভূতকিমাকার স্বপ্নটি দেখে না বসতেন, আজ কি এই দুর্গতি ঘটতো প্রবোধের? পনের-বিশ দিন উপোসী রাত কাটাতে কাটাতে তবেই না এমন মরীয়া হয়ে উঠেছে প্রবোধ? বিনিদ্র রজনীতে মা আসেন গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, পাখার বাতাস করতে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! সেই নুনের ছিটের জ্বালায় মা'র পায়ে মাথা খুঁড়ে বলতে ইচ্ছে হয়, 'মা, তোমার স্নেহ সংবরণ কর মা। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা বসিও না।'

তা সত্যিই তো বলা যায় না, তাই সব আক্রোশ জমা হয় গিয়ে সেই ঘোমটা-ধারিণীর ওপর। এদিকে তো ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ, শুধু স্বামীর বেলাতেই যত লজ্জা!

সুবর্ণ যদি চালাকি চাতুরী খেলিয়ে একটু অগ্রণী হতো, এক-আধবার কি সুযোগ জুটতো না? তা নয়, মহারাণী যেই ঘরে ঢুকলেন, শব্দ করে খিল ঠুকলেন, ব্যস! হয়ে গেল রাত কাবার!

প্রথম যখন শোনা গেল সুবর্ণ একলা শুতে চেয়েছে, বলেছে তার অত ভয় নেই, প্রবোধ আশায় কম্পিত হয়েছিল, আহ্লাদে পুলকিত হয়েছিল।

বোঝা গেছে!

মানে বোঝা গেছে!

চালাকের ধাড়ি তো!

খেয়াল হয়েছে ঘরে রাজু-ফাজু থাকলে অসুবিধে, ধরা পড়ে যাবে চোরা অভিসার, তাই!

হায় কপাল, সে আশা মরীচিকা মাত্র!

বসে বসে মজা দেখছে, স্বামীর ছট্‌ফটানি যন্ত্রণা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে! নরকেও ঠাঁই হবে এই পাপিষ্ঠার?

হবে না! নরকেও ঠাঁই জুটবে না ওর!

রাগ বেড়েই চলে। কারণ তদুপরি পেটের মধ্যে অগ্নিদাহ। কোন্‌কালে অফিসের ভাত খেয়ে বেরিয়েছে, কখন সে ভাত হজম হয়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, এক ফোঁটা জলও পেটে পড়ে নি!

অফিসে থাকলে এতক্ষণে চার-ছখানা হিঙের কচুরী, গোটা আষ্টেক আলুর দম, আধ-পোটাক বোঁদে সেঁটে, গেলাস দুই জল খেয়ে নেওয়া হয়ে যেত, সে জায়গায় এই! পেটের কলকব্জাগুলো পর্যন্ত বাপান্ত করছে!

আসবে না!

আসবে না পাপীয়সী!

বেরিয়েই পড়তে হবে এবার!

সত্যিই তো আর গুমখুন হতে পারে না প্রবোধ?

অবস্থা যখন এমনি চরমে, তখন হঠাৎ মৃদুমন্দ হাসির আওয়াজ যেন দরজার ওদিকে চিক্‌মিকিয়ে ওঠে!

'খি খি খি খি' কৌতুকের হাসি!

তার মানে প্রবোধের অবস্থা অনুমান করে আমুদে হাসি হাসছে।

প্রবোধ কি দরজা খুলেই ওর গলাটা টিপে ধরবে? নাকি 'নিষ্ঠুরা পাষাণী' বলে দু হাতে সাপটে ধরে—

দরজায় টোকা পড়ল।

যেটা আগে থেকে ঠিক ছিল।

প্রবোধ খিল বন্ধ করে বসে থাকবে, সুবর্ণ এসে তিনটি টোকা দেবে। কারণ দৈবাৎ যদি অন্য কেউ এসে দোর ঠেলে! তার থেকে সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা করে রাখাই ভাল!

টোকা পড়ল।

একবার, দুবার, তিনবার।

কোঁচার কাপড় তুলে মুখ মুছতে মুছতে দরজার খিলটা খুলে দিল প্রবোধ, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ঠিকরে ফের চৌকির ওপর গিয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর একটা 'আঁ আঁ' শব্দে!

শব্দটা একবার ডুকরে উঠেই একেবারে পাক খেয়ে দুদ্দাড়িয়ে নিচে নেমে গেল সিঁড়িতে 'আঁ আঁ' রেশ ছড়িয়ে!

বিরাজ!

বিরাজের ওই রোগ।

ভয় পেলেই আঁ আঁ করে চোখ কপালে তুলে কীর্তিকাণ্ড করে বসে! আর ভয় পায় ও ফি হাত! বিরাজকে ভয় দেখানো এ বাড়ির সকলের একটা পরিচিত খেলা!

প্রাণ গেলেও বিরাজ অন্ধকারে দোতলার সিঁড়িটায় ওঠানামা করে না। ফস্ করে কারুর ঘরের পিলসুজ থেকে 'পিদ্দিপ'টা তুলে নিয়ে এসে সিঁড়ি ওঠে নামে। এমন কি দিনদুপুরেও ভূতের ভয় বিরাজের!

তা বিরাজকে নিয়ে বাড়ির সেই পরিচিত খেলাটাই কি খেলতে বসেছিল সুবর্ণ? বিরাজকে ভয় দেখিয়ে কৌতুক পেতেই তাকে ভুলিয়েভালিয়ে ছাতে তুলেছিল?

নাকি রহস্য-কৌতুকের লক্ষ্যস্থল অন্য?

খেলার উল্লাস আর একজনকে নিয়ে?

তা কৌতুকপ্রিয় সুবর্ণর ভাবভঙ্গীতে কিছু বোঝা যায় নি। খুব নিরীহ গলায় চুপিচুপি বিরাজকে বলে রেখেছিল সে, 'মা বেরিয়ে গেলে চিলেকোঠায় গিয়ে বাঘবন্দী খেলবে ছোটঠাকুরঝি?'

বাঘবন্দী খেলাটা বিরাজেরই পরম প্রিয়, কারণ অক্ষর পরিচয়ের বালাই তার নেই, দুপুরের অবকাশকে সহনীয় করবার জন্য উপায় জানা নেই। উমাশশীর মত ঘুম মারতেও ওস্তাদ নয় সে।

তাই সুবর্ণ যখন দুপুরবেলা চুপিচুপি একখানি বই নিয়ে বসে, বিরাজ বাঘবন্দীর জন্যে পীড়াপীড়ি করে। 'না খেললে বই পড়ার কথা মাকে বলে দেব' বলে শাসায়। সুবর্ণকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুঁটি কড়ি নিয়ে বসতে হয়। সে অনিচ্ছা বিরাজের চোখে ধরা পড়ে বৈকি!

কাজেই প্রস্তাবটা বিরাজের কাছে প্রায় অলৌকিকই লেগেছিল।

তাছাড়া চিলেকোঠার ঘরে।

যেখানে ভরদুপুরে গেলে গা ছমছম করে।

'মা চলে গেলে আর চিলেকোঠায় কেন?' বিরাজ অবাক হয়, 'দোতলার ঘরেই তো—'

না, মুক্তকেশীর সামনে বৌ মানুষের অমন সময় 'অপচো' করা খেলা চলে

না! বৌ অবসর সময়ে সলতে পাকাবে, সুপুরি কাটবে, চালডালের কাঁকর বাছবে, নিদেনপক্ষে কাঁথা সেলাই করবে, এটাই বিধি। কচি ছেলের মা-দের যদি বা ঘুমের কিছুটা ছাড়পত্র থাকে, অন্যদের তো আদৌ না।

ওই সব কাজ না করে বৌ কাড়ি ঘুঁটি চেলে খেলতে বসবে? মা-লক্ষ্মী টিকবেন তাহলে? চার হাত তুলে ধেই ধেই করে বেরিয়ে যাবেন না?

মুক্তকেশীর অবশ্য 'গ্রাবু'র আসরে বাঁধা বরাদ্দ আছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, রোদ বৃষ্টি বজ্রপাত, সব কিছু তুচ্ছ করে দ্বিপ্রাহরিক সেই তাসের আড্ডায় গিয়ে হাজির হন মুক্তকেশী! আবার সেখানে এক স্যাকরা-গিন্নীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে যায় বলে এসে স্নানও করেন। কিন্তু মুক্তকেশীর সঙ্গে কার তুলনা?

বাঘের সঙ্গে হরিণের তুলনা সাজে?

সিংহের সঙ্গে খরগোসের?

মুক্তকেশীর সামনে তাই খেলা চলে না। মেয়ের জন্যে মনটা যদিবা একটু দোলে, তবু বৌ নষ্ট তো আর করতে পারেন না মেয়ের মায়ায় পড়ে?

মেয়েকে অনেক খোশামোদ করেন নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে কিন্তু যেতে চায় না বিরাজ। বলে, 'গিন্নীদের কাছে তো সেই মুখে তালাচাবি দিয়ে বসে থাকা! কথা কইলেই বকবে!'

'বকবো না তো কি? পরের ঘরে যেতে হবে না?' বলে চলে যান মুক্ত-কেশী পেট-কাপড়ে তাসজোড়াটি বেঁধে নিয়ে। চুপিচুপি শিখিয়ে দিয়ে যান, 'দুপুরভোর যেন গাল-গল্প করে মেজবৌমার কাজ কামাই করিয়ে দিসনে।'

খেলার আকর্ষণ তাই পুরোদমেই আছে। কিন্তু মুক্তকেশীর অসাক্ষাতে চিলেকোঠায় কেন?

সুবর্ণ বলে, 'আছে মজা! গেলেই দেখতে পাবে।'

'বলই না ছাই! কুলের আচার সরিয়ে জমা করে রেখে এসেছ বুঝি?'

'উঁহু!'

'তবে?'

'বলবো কেন? বলছি তো গেলেই দেখতে পাবে।'

'বলই না বাবা!'

'বললে মজা থাকবে না।'

'বুঝেছি ঝালমুড়ি মেখে রেখে এসেছ।'

'সুবর্ণ কৌতুকে ফেটে বলে, 'ধরে নাও তাই।'

সুবর্ণর ওই কৌতুকে ফাটা মুখ দেখে বিরাজও স্পন্দিত হয়।

না জানি কি!

অবশ্য সেই থেকে আরো অনেকবার প্রশ্ন করে করে অস্থির করেছে বিরাজ, কিন্তু একা একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসবে, সে সাহস হয় নি।

অথচ শত সাধ্যসাধনাতেও সুবর্ণ মজা ফাঁস করে নি।

নিচেয় সংসারের পাঠ যখন শেষ হল, সুবর্ণ বলে, 'চল এইবার! মল জোড়াটা খুলে পা টিপে টিপে চল।'

'ওমা কেন?'

বিরাজ ভয়ে আঁতকে ওঠে, 'মল খুলবো কেন?'

'আছে মজা! আমিও খুলছি।'

'আমার বাপু বড্ড ভয়-ভয় করছে!'

'ভয় আবার কি? বল না, ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন ভয়টা আমার কি?'

অদ্ভুত কিছু একটা কৌতুকের আশায় অগত্যাই ওই মন্ত্রটা জপ করতে করতে সুবর্ণর সঙ্গে সঙ্গে ছাতে ওঠে বিরাজ।

তারপর?

তারপর সুবর্ণ বলে, 'আস্তে দরজায় তিনটে টোকা দে!'

'ও বাবা, কেন?'

'দে না! দেখবি স্বপ্নে যা ভাবিস নি তাই দেখতে পাবি!'

'তুমি আমায় ভূতে খাওয়াতে চাও নাকি, বল তো?'

সুবর্ণ এবার উদাস হয়, 'বেশ, সে "সন্দ" যদি হয়ে থাকে তোমার তো দিও না টোকা! এতদিন আমাকে দেখেশুনে এত অবিশ্বাস আমার ওপর?'

বিরাজ লজ্জিত হয়।

স্বভাবদোষে আর শিক্ষার দোষে সব কথা মা'র কাছে লাগিয়ে দেওয়ার অভ্যাস থাকলেও মেজবৌদি তার কাছে আকর্ষণীয়। মেজবৌদির কাছে চুল বাঁধতে সুখ, মেজবৌদির কাছে সাজতে সুখ, মেজবৌদির সঙ্গে খেলতে, গল্প করতে সুখ। মেজবৌদির অভিমানে তাই নরম হয় সে।

বলে, 'বেশ বাবা বেশ, দিচ্ছি টোকা, বাঁচি বাঁচবো মরি মরবো!'

সুবর্ণ হেসে ওঠে 'খি খি' করে।

তারপর টোকা!

তারপর খিল খোলার শব্দ!

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের অতীত সেই দৃশ্য!

যে মেজদা ভাত খেয়ে অফিস চলে গেছে, সেই মেজদা খিল খুলে দিল ছাতের দরজার!

কিন্তু সত্যিই কি মেজদা?

ওই কি মেজদার মুখ?

অমন ভয়ঙ্কর?

অমন বীভৎস?

বিরাজ তবে আঁ আঁ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে না কেন?

হ্যাঁ, প্রায় অজ্ঞান হয়েই পড়েছিল বিরাজ, আর এই কৌতুকের জন্যে তাই অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছিল সুবর্ণকে।

মুক্তকেশীর মেয়েকে অজ্ঞান করার অপরাধে, মুক্তকেশীর ছেলেকে লাঞ্ছনা করার অপরাধে! আবার শুধু মৌখিক তিরস্কারই নয়, দৈহিক শাস্তিও পেতে হয়েছিল লাঞ্ছিত অপমানিত স্বামীর কাছ হতে!

সুবর্ণর কৌতুকস্পৃহার অধ্যায়ে একটা বড় ছেদ পড়েছিল সেদিন থেকে।

তবু স্বভাব যায় না ম'লে! আবার একদিন ননদাইকে নিয়ে রঙ্গ করতে গিয়ে—তা সে তো পরে।

সুবর্ণদের দর্জিপাড়ার নিজেদের বাড়িতে।

যে বাড়িতে সিঁড়ির অভাবে ছাতে ওঠা যায় না। টাকার অভাবে সারা জীবন সিঁড়ি হল না যার।

কিন্তু শুধু কি টাকার অভাবে?

প্রয়োজন বোধের অভাবেও কি নয়?

সুবর্ণ ছাড়া আর কেউ ছাতে উঠতে না পাওয়াটা মস্ত একটা লোকসান ভাবে নি সে বাড়িতে।

॥ ৫ ॥

না, সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির আর কেউ ছাতে ওঠবার সিঁড়িটার প্রয়োজন অনুভব করে নি। রান্নাঘরের নীচু ছাতটা তো রয়েছে দোতলায়, তা ছাড়া উঠোনটাও রয়েছে অত বড়, এতে আর গেরস্তর কাপড় শুকোতে দেওয়া, বিছানা রোদে দেওয়া, কি বড়ি আচার আমসত্ত্ব জারকলেবুর চাহিদা মিটবে না?

মিটছে, অনায়াসেই মিটছে। সিঁড়ি থাকলেই বা কে ওই তিনতলার মাথায় উঠতে যেতো ওই সব বোঝা বয়ে?

সুবর্ণলতার সবই ক্ষ্যাপামি।

বলে কি না—'আমি বইব। তোমরা সিঁড়ি কর, দেখো, সারা সংসারের সমস্ত ভিজে কাপড় কাঁথা বিছানার বোঝা বয়ে নিয়ে যাব আমি। আচার, আমসত্ত্ব, বড়ি? তাও তসর মটকা পরে দিয়ে আসব, নামিয়ে আনব। কাউকে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।'

কিন্তু ওর এই ক্লেশ স্বীকারের প্রতিশ্রুতিতেও উৎসাহিত হয় নি কেউ। খাওয়া নয়, পরা নয়, কিনা ছাতে ওঠা! এর জন্য মানুষের খিদেতেষ্টার মত ছটফটানি ধরেছে এটা ন্যাকামির মতই লেগেছে ওদের কাছে। ন্যাকামি ছাড়া আবার কি?

একটুকরো বারান্দা, ছাতে ওঠবার একটা সিঁড়ি, এ যে আবার মানুষের পরম চাওয়ার বস্তু হতে পারে, এ ওদের বুদ্ধির অগম্য।

বরং সুবর্ণলতার স্বামীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে আসল তথ্যটা ধরা পড়েছিল। সুবর্ণলতার এই আকুলতার পিছনে যে কোন্ মনোভাব কাজ করছে তা আর বুঝতে বাকী থাকে নি প্রবোধের।

ছাদে উঠে পাঁচবাড়ির জানালায় বারান্দায় উঁকিঝুঁকি দেওয়ার সুবিধে, নিজেকে আর দশজোড়া উঁকিঝুঁকি মারা চোখের সামনে বিকশিত করার সুবিধে, আর বিশ্বাস কি যে ঢিল বেঁধে চিঠি চালাচালির সুবিধেটাও নয়?

প্রবোধের তাই সিঁড়িতে প্রবল আপত্তি।

সুবোধ বরং কখনো কখনো বলেছে, 'বোনাসের টাকাটা বেড়েছে, লাগিয়ে দিলে হয় সিঁড়িটা!' প্রবোধের প্রতিবন্ধকতাতেই সে ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত হয়েছে সুবোধ।

বুদ্ধিমান ভাই যদি বলে, 'মাথা খারাপ? ওই টাকাটা সংসারের সত্যিকার দরকারী কাজে লাগানো যাবে।' নির্বিরোধী দাদা কি সে কথার প্রতিবাদ করে? না করতে পারে?

আর সত্যি, গেরস্তর সংসারে তো দরকারের অন্ত নেই। বিছানা বালিশ, জুতো জামা, র‍্যাপার চাদর, এ সবে তো ঘাটতি আছেই সব সময়। মুক্তকেশীর

তীর্থখরচ বাবদও কিছু রাখা যায়। পাড়ার গিন্নীরা যখন দল বেঁধে তীর্থধর্ম করতে যান, মুক্তকেশী তাঁদের সঙ্গ না নিয়ে ছাড়েন না। তখন ছুটোছুটি করে টাকাটা যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয় ছেলেদের। হাতে থাকলে—

এইসব দরকারী কাজ থাকতে, টাকা ঢালতে হবে ইঁটের পাঁজায়?

অতএব সুবর্ণলতার কম্পিত আশার কুঁড়ির উপর পাথর চাপা পড়ে।

কিন্তু সুবর্ণলতার চাওয়ার সীমানা কি ওইটুকু মাত্র? একটুকরো বারান্দা, ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি? ব্যস? আর কিছু নয়? জীবনভোর শুধু ওইটুকুই চেয়েছে সুবর্ণলতা?

না, তা নয়।

বেহায়া সুবর্ণ আরো অনেক কিছু চেয়েছে। পায় নি, তবু চেয়েছে। চাওয়ার জন্যে লাঞ্ছিত হয়েছে, উৎপীড়িত হয়েছে, হাস্যাস্পদ হয়েছে, তবু তার চাওয়ার পরিধি বেড়েই উঠেছে।

সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে, মানুষের মত হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখতে চেয়েছে, দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, দেশের পরাধীনতার অবসান চেয়েছে।

সুবর্ণলতাকে তবে পাগল বলবে না কেন তার স্বামী, শাশুড়ী, ভাসুর, দ্যাওর?

ওরা বলেছে, বাবার জন্মে শুনি নি এমন কথা! বলেছে, সেই যে বলে সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া, মেজবৌয়ের হচ্ছে তাই! রাতদিন অকারণ অসন্তোষ, রাতদিন অকারণ আক্ষেপ!

ওরা সুবর্ণলতার ওই চাহিদাটাকে 'অকারণ অসন্তোষ' ছাড়া আর কোনো আখ্যা দেয় নি। ওদের 'বোধে'র জগৎটা ওদের তৈরি বাড়ির ঘরের মত। কোথাও এমন একটা ভেন্টিলেটার নেই যেখান দিয়ে চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে।

দর্জিপাড়ার এই গলিটার বাইরে আর কোনো জগৎ আছে, এ ওরা শুধু জানে না তা নয় মানতেও রাজী নয়।

ঘর বানাবার সময় 'আওয়াজী' (ভেন্টিলেটার) না রাখার যুক্তিটাই ওদের মনোভাব।

'কোনো দরকার নেই। অনর্থক দেয়ালটায় ফুটো রাখা। পাখীতে বাসা বানাবে, আর জঞ্জাল জড়ো হবে, এই তো লাভ?'

অনর্থক পাখীর বাসায় জঞ্জাল জড়ো করতে চায় নি ওরা। তাতে শুধু লোকসানই দেখেছে।

ওদের বোধের ঘরেও ভেন্টিলেটারের অভাব।

কিন্তু সুবর্ণলতা কেন বহির্জগতে বহমান বাতাসের স্পর্শ চায়? এ বাড়ির বৌ হয়েও তার সমস্ত সত্তা কেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছট্‌ফট করে? তার পরিবেশ কেন অহরহ তাকে পীড়া দেয়, আঘাত হানে?

তা এ প্রশ্নের উত্তর একদা সুবর্ণলতার বিধাতাও চেয়ে পান নি।

যেদিন আসন্ন সন্ধ্যার মুখে সুবর্ণলতার শেষ চিহ্নটুকু পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, চিতার আগুনের লাল আভায় আকাশের লাল আভায় মিশলো, ধোঁয়া আর আগুনের লুকোচুরির মাঝখান থেকে সুবর্ণলতা পরলোকে পোঁছে গেলেন, সেদিন যখন চিত্রগুপ্তের অফিসে নতুন কেউ এসে পড়ায় ঘণ্টিটা বেজে

উঠল, বিধাতা-পুরুষ গলাঝাড়া দিয়ে বললেন, 'কে এল হে চিত্রগুপ্ত?'

চিত্রগুপ্ত গলাঝাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে হুজুর, সুবর্ণলতা।'

'সুবর্ণলতা? কোন্ সুবর্ণলতা? কাদের ঘরের?'

'আজ্ঞে হুজুর বামুনদের। যে মেয়েটা সেই পনেরো বছর বয়েস থেকে মরণকামনা করতে করতে এই পঞ্চাশ বছরে সত্যি মলো!'

বিধাতাপুরুষ বললেন, 'তাই নাকি? তা জীবনভোর মরণকামনা কেন? খুব দুঃখী ছিল বুঝি?'

চিত্রগুপ্ত এ প্রশ্নে পকেট থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বার করে চোখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ মর্ত্যধামের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্বিধাযুক্ত স্বরে উত্তর দিলেন, 'তা তো ঠিক মনে হচ্ছে না। বরং ষোলো আনা সুখের অবস্থাই তো দেখছি।'

'তবে?'

চিত্রগুপ্ত মাথা চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে সে হিসেব দেখতে হলে তো সময় লাগবে। এসব গোলমেলে লোকেদের ডিপার্টমেণ্ট আলাদা।'

বিধাতাপুরুষের কেরানী কবে আবিষ্কার করতে পেরেছিল সুবর্ণলতার উল্টোপাল্টা প্রকৃতির কারণ রহস্য, কবে সে বিবরণ পেশ করেছিল মনিবের দরবারে, কে জানে সে কথা!

হয়তো করেই নি।

হয়তো বিধাতাপুরুষও আর সে নিয়ে মাথা ঘামান নি। মুহূর্তে মুহূর্তে কত কোটি কোটি বার ঘণ্টি পড়ছে, কত হাজার কোটি লোক আসছে, বামুনদের সুবর্ণলতাকে কে মনে করে বসে থেকেছে?

প্রশ্নটা তাই নিরুত্তর থেকে গেছে।

শুধু সুবর্ণলতা যতদিন বেঁচে থেকেছে, অহরহ তাকে ঘিরে এ প্রশ্ন আছড়ে আছড়ে পড়েছে।

সংসারসুদ্ধ সবাই খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে হাসছে খেলছে ছেলে ঠেঙাচ্ছে ছেলে আদর করছে গুরুজনকে মান্য করছে গুরুজন রাগ করলে চোর হয়ে থাকছে, নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, শুধু মেজবৌই রাতদিন হয় ঠিকরে বেড়াচ্ছে, নয় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলছে। নয়তো এমন একটা কিছু কাণ্ড করে বসছে যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে লোকে। কী করবে লোকে এ বৌকে নিয়ে?

গুরুলঘু জ্ঞানের বালাই নেই, কিছুতে সন্তোষ নেই।

কেন?

কেন?

কী তুমি এমন রাজকন্যে যে কিছুতে মন ওঠে না? আর কথাই বা এত কটকটে কেন শুনি?

প্রথম ছেলেপুলে হচ্ছে, লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকবি, তা নয়, আঁতুড়ঘরে ঢোকার মুখে বলে কিনা, 'এত সব ময়লা ময়লা কাপড় বিছানা দিচ্ছেন? ও থেকে অসুখ করে না বুঝি?' উমাশশী সেই ছেঁড়া কাঁথা কাপড়-গুলো নামিয়ে এনে ধপ করে ফেলেই নাকটায় আঁচল দিয়েছিল, ওর থেকে লাফিয়ে ওঠা ধুলোর থেকে আত্মরক্ষা করতে।

জায়ের কথা শুনে চমকে আঁচল ছেড়ে শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে শাশুড়ীর দিকে তাকালো। হে ভগবান, যেন শুনতে না পেয়ে থাকেন!

কিন্তু ভগবান উমাশশীর প্রার্থনা কানে নেবার আগেই মুক্তকেশীর কানে পৌঁছে গেছে তাঁর বধূমাতার বাণী।

মুক্তকেশী তখন ছেলের নাড়ী কাটবার জন্যে চ্যাঁচাড়ি গুছিয়ে রাখছিলেন। প্রসববেদনার বাড়াবাড়িটা হবার আগেই সব কিছু গুছিয়ে রাখেন সুগৃহিণী মুক্তকেশী। অবিশ্যি ইতিপূর্বে বৌয়ের আঁতুড় তুলতে তাঁকে হয় নি। বড়-বৌমার মা গরীব দুঃখী বিধবা মানুষ হলেও প্রথম দ্বিতীয় দুবারই মেয়েকে কাছে নিয়ে গেছেন। মুক্তকেশী যা করেছেন নিজের মেয়েদের। তবে আসলে পোক্ত হয়েছেন জা ননদ ভাসুরঝি দ্যাওরঝিদের ওপর হাত পাকিয়ে। একান্ন-বর্তী সংসার ছিল তো আগে।

তা ছাড়া হাঁড়ি ভেন্ন হলেও আপদে বিপদে সবাই সবাইয়ের 'করেছে'। মুক্তকেশী বেশি করিৎকর্মা বলে বেশি করেছেন।

কিন্তু মুক্তকেশী কি এতখানি বয়সে—এমন দুঃসাহসিক স্পর্ধার কথা শুনেছেন কখনো?

না, জীবনে শোনেন নি।

প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট করতে করতে যে কোনো ঝি-বৌ এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারে, এ মুক্তকেশীর ধারণার বাইরে, জ্ঞানের বাইরে, স্বপ্নের বাইরে।

হাতের চ্যাঁচাড়ির সুঁয়ো হাতে ফুটিয়ে থ হয়ে গিয়ে বলে ওঠেন মুক্তকেশী, 'কি বললে মেজবৌমা?'

মেজবৌমা প্রায় গোল হয়ে শুয়ে উঃ আঃ করছিল, তবু ওর মধ্যেই বলে উঠল, 'শুনতে তো পেলেন। ওই ধুলো-ভর্তি ময়লা পুরনো বিছানা কাঁথায় অসুখ করবে, সেই কথা বলছি।'

মুক্তকেশী রান্নাঘরের বড় উনুনটার মত গনগনিয়ে বলে ওঠেন, 'আমার এই কপালটা দেয়ালে ঠুকে ফাটাতে ইচ্ছে করছে মেজবৌমা, নইলে কোনদিন নিজের আগুনে নিজেই ফেটে পড়বে! অ্যাঁ! বললে কী তুমি? বললে কী, পুরনো "বিছানা"য় রোগ জন্মাবে তোমার? আঁতুড়ঘরে নতুন বিছানা বালিশ দিতে হবে রাজকন্যেকে? গালে মুখে চড়াবো নাকি আমি? ভূভারতে যে কথা কেউ না শুনেছে, সেই সব কথা আমায় শুনতে হচ্ছে পদে পদে?...তবে? কী করতে হবে তাহলে? নবাব-নন্দিনীর জন্যে সাটিনের বিছানার বায়না পাঠাতে হবে? তবে একটু ধৈর্য ধরে থাকো বাছা, এক্ষুনি "ঘরের ডাক বাইরে আর বাইরের ডাক ঘরে" করে বাড়ি তোলপাড় করো না। পেটের পো পেটে রেখে বসে থাকো, আমার ভ্যাড়াকান্ত ছেলে আসুক আপিস থেকে, বলি তাকে বিছানার কাহিনী!'

সুবর্ণর তখন ছট্‌ফটানি শুরু হয়ে গেছে, তবু সুবর্ণ জবাব দিতে ছাড়ে না। মূর্খ সুবর্ণ, অবোধ সুবর্ণ, সংসার-জ্ঞানহীনা সুবর্ণ!

বলে, 'থাক গে বাবা থাক! আমার তো মরণ হলেই মঙ্গল!'

মুক্তকেশী সহসা নিজের গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে বলে ওঠেন, 'তোমার মরণ হলেই মঙ্গল? অ্যাঁ! ও রাজু, মাথায় জল দে!'

রাজু অবশ্য জল আনল না, মুক্তকেশী বিনা জলেই চাঙ্গা হয়ে আবার বলেন, 'তাহলে এও বলি মেজবৌমা, এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে তোমার মায়া হয় না? এ কী আমার করবার কথা? প্রেথম পোয়াতী শ্বশুরঘরে আঁতুড় পেতেছে শুনেছ কখনো? না দেখেছ কখনো? বলি মা-ই না হয় তোমার

"কুলের ধ্বজা" বাপ মিনসে তো আছে? বাপ আছে, ভাইভাজ আছে, কাছের গোড়ায় একটা পিসি রয়েছে, নিয়ে যেতে পারল না? নতুন সাটিন মখমলের বিছানায় শুইয়ে আঁতুড় তুলতো বাপ!'

আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্ষমতা ছিল না সুবর্ণলতার, তবু শেষ একটা কথা বলে নেয়, 'বাবা যখন নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন তো কই পাঠান নি, এখন দোষ দিচ্ছেন কেন?'

সুবর্ণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে, মুক্তকেশীও হাড়ি ধাই গঙ্গামণির আগমন আশায় ছট্‌ফট করছেন, তত্রাচ এই বাক্‌যুদ্ধ।

মুক্তকেশী অবাক গলায় যেন আর্তনাদ করে ওঠেন, 'বাবা নিয়ে যেতে চেয়েছিল? বলি কখন আবার নিয়ে যেতে চেয়েছিল মেজবৌমা? স্বপ্ন দেখছ, না স্বপ্ন দেখাচ্ছ?'

'স্বপ্ন দেখব কেন মা? ইচ্ছে করলেই মনে পড়াতে পারবেন। বিয়ের পর নিয়ে যাবার কথা বলেন নি বাবা? আপনারাই বলেছিলেন, কুসঙ্গে পাঠাব না—'

'বলেছি, বলবই তো, একশোবার বলবো।' মুক্তকেশী বলেন, 'নিত্যি যদি ওই হতচ্ছাড়া বাপের ঘরে যাওয়া-আসা করতে, তুমি কি আর এতদিন ঘরে থাকতে মা? কবে জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে! খবরের কাগজ পড়া মেয়েমানুষ তুমি, সোজা কথা?'

'বাবা রে গেলাম গো'—সুবর্ণ কাতরে উঠে বলে, 'মায়া মমতা কী আপনাদের প্রাণে একেবারে দেন নি ভগবান? মরে যাচ্ছে মানুষটা, তবু বাক্য-যন্ত্রণা—'

প্রস্তর-প্রতিমা উমাশশী হাঁ করে চেয়েছিল তার ছোটজায়ের দিকে।

কী ও?

মেয়ে না ডাকাত?

এত বড় দুঃসাহস কোথায় পেল ও? উমাশশীর যে দেখে-শুনেই বুক কাঁপে, পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়। সুবর্ণর শেষ কথায় হঠাৎ উমাশশীর সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন একযোগে ছুটি চেয়ে বসলো।

উমাশশী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে 'হু-হু' করে কেঁদে উঠল। কেন, তা সে নিজেই জানে না।

এই আদিখ্যেতায় মুক্তকেশী কি বলতেন কে জানে, কিন্তু বিপদমুক্ত করলো একটি শানানো ধারালো গলা।

এ গলা হাড়ি-বৌ গঙ্গামণির!

সুবর্ণর যন্ত্রণা শুরু হতেই খুদু গিয়েছিল তাকে ডাকতে।

বড়বৌয়ের কান্না শুনতে পেয়ে দালান থেকেই চিৎকার করে উঠেছে গঙ্গা, 'বলি হয়ে গেল নাকি? কান্নাকাটি পড়ে গেল যে?'

বেয়াড়া আস্পদ্দাবাজ বৌটাকে যতই গালমন্দ করুন, তার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন বৈকি মুক্তকেশী, বিপদকাল বলে কথা! গঙ্গামণির গলার আওয়াজে মুক্তকেশী যেন হাতে চাঁদ পান।

আর মুহূর্তে ভোল বদলে যায় তাঁর। অভিমানের গলায় বলে ওঠেন, এতক্ষণে এলি গঙ্গা? বৌ এদিকে এখন তখন!'

গঙ্গা খরখরিয়ে ওঠে, 'তা কী করবো বাবু, তোমার নাতি হচ্ছে বলে তো

আর এই গঙ্গামণি মরতে পারে না? পান সাজবো, দোক্তাপাতা গুঁড়োবো, পানদোক্তা গুলের কৌটো আঁচলে বাঁধবো, দুয়োরে তালাচাবি লাগাবো, তবে তো আসবো!'

মুক্তকেশী আরও অভিমানী গলায় বলেন, 'এখানে কী তুই পানদোক্তা পেতিস না গঙ্গা?'

হ্যাঁ, এদের কাছে মুক্তকেশী নম্র নত। কারণ এদের নইলে অচল। এ বিপদের দিন তো আসবেই সংসারে। বছর বছরই আসবে।

গঙ্গার হাতযশের নামডাক আছে, তাই গঙ্গার দস্তুরমত অহঙ্কারও আছে। রীতিমত অহঙ্কার আছে। এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই খরখর করে পাঁচকথা শুনিয়ে দেবে, তেমন রাগ হলে প্রসূতিকে ফেলে চলে যাবে। নয়তো ইচ্ছে করে অবস্থা খারাপ করে দেবে।

তাই তোয়াজ করতেই হয়।

তাই গদগদ গলায় বলতে হয়, 'ক-কুড়ি পান খাবি খা না!'

'খাব, পাঁচকুড়ি পান খাব। আগে তোমার নাতিকে পৃথিবীর মাটি দেখাই! কই গো বড়বৌমা, এক খুরি গরম জল দাও দিকি! হ্যাগা, তুমি কাঁদছ কেন? শাউড়ীর গাল খেয়েছ বুঝি? তা খেতে পারো, যা দজ্জাল শাউড়ী! নাতি হলে ঘড়া বার করতে হবে, বুঝলে গিন্নী, ওর কমে ছাড়ব না!'

গঙ্গামণির এমনি চোটপাট কথা মুক্তকেশীর গা-সহা। তাই মুক্তকেশী চটে ওঠেন না। চেষ্টা করে হেসে বলেন, 'আচ্ছা, নাতি আন্ তো আগে। হবে তো একটা মেয়ের ঢিপি, বুঝতেই পারছি।'

'মেয়ে হলেও গামলা! মেজখোকার এই প্রেথম, তা মনে রেখো।' গঙ্গামণি অতঃপর তার নিকষ-কৃষ্ণ বিপুল দেহখানি নিয়ে আসরে ওঠে।...

'গরম দুধ দাও দিকি, একটু গরম দুধ দাও, জোর আসবে দেহে। ন্যাকড়া-কানির পোঁটলা কই গো? বালিশ আছে? চ্যাঁচাড়ি? মজুত রাখো হাতের কাছে।...বলি মেজবৌমা, অমন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নীলবর্ণ হয়ে আছ যে! বুকে বল আনো, পেরাণে সাহস আনো। কষ্ট নইলে কি আর কেষ্ট মেলে?'

কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না!

অতএব কেষ্ট চাইতে হলে কষ্ট করতেই হবে।

কিন্তু শুধু যদি কষ্টই ওঠে ভাগ্যে, কেষ্টটি না মেলে?

মুখপাত প্রথম সন্তান, হলো কি না মাটির ঢিপি এক মেয়ে? ছি ছি!

মুক্তকেশী ক্রুদ্ধ গলায় বলে ওঠেন, 'জানতুম! গামলা পাবি না কচু পাবি!'

চলেছিল যমে-মানুষে টানাটানির পালা। দীর্ঘসময় এই কষ্ট হয়রানি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, তার ফলাফল কি না একটা মেয়ে! শাঁখ বাজবে না জেনেই বোধ করি চিলের মত চেঁচানির সাহায্যে পৃথিবীতে নিজের আগমনবার্তা নিজেই ঘোষণা করছে।

গঙ্গামণিও যেন অপ্রতিভ হয়।

নাতির ছলনা দেখিয়ে অনেক কথা বলে নিয়েছে! সত্যিই নাতিটি হলে মুখ থাকত!

'এই তো', মুক্তকেশী বলে উঠলেন, 'তুমি আর সঙের মতন শাঁখ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না বড়বৌমা, তুলে রেখে দাও গে! চেঁচানির শব্দ শুনেই বুঝেছি আসছেন একখানি নিধি!'

সুবর্ণ এত কথা শুনতে পায় না, সুবর্ণ যেন চৈতন্য আর অচৈতন্যের মধ্যবর্তী একটা অবস্থায় নিমজ্জিত। সুবর্ণ যেন দেখতে পাচ্ছে সুবর্ণর মা এসেছে মাথার কাছে, বলছে, 'ছেলে-মেয়ে দুই-ই সমান সুবর্ণ, হেলা করিস না।'

সুবর্ণ হাত বাড়িয়ে মাকে ধরতে যায়, পারে না। হাত তুলতে পারল না বলে, না মা হারিয়ে গেল বলে?

হারিয়ে গেল।

সুবর্ণ আর তার মায়ের সেই দীর্ঘ ছাঁদের উজ্জ্বল মূর্তিটা দেখতে পেল না। শুধু সুবর্ণর সমস্ত প্রাণটা হাহাকার করতে থাকে।

সুবর্ণ কি স্বপ্ন দেখছিল?

নাকি সুবর্ণর অসহায় বাসনাটুকু কল্পনায় মায়ের মূর্তিখানি গড়ে সুবর্ণকে ছলনা করতে এল?

কিন্তু মাকে কি সুবর্ণ এত বেশি মনে করে? মা'র উপর একটা রুদ্ধ অভিমান যেন সেই স্মৃতির দরজা বন্ধ করে রেখেছে। সুবর্ণর যে এদের সংসার ছাড়াও একটা অতীত ছিল, ভুলে থাকতে চেয়েছে সে কথা।

হঠাৎ সেই অচৈতন্যলোক থেকে যেন জেগে উঠল সুবর্ণ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ধাক্কা খেলো।

আবার?

আবার সেই কাহিনী?

সেই কথা আবার গঙ্গামণিকে বিশদ করে বলতে ইচ্ছে করছে মুক্তকেশীর—।

হ্যাঁ, মুক্তকেশীরই গলা!

শ্রোতা গঙ্গামণি।

'অ আমার পোড়াকপাল, জানিস না তুই? ওলো শোন্ তবে, মেজবৌ হচ্ছে আমার সইমার নাতনী। সেই যে সেবার জিজ্ঞেস করলি, বারুইপুরে যাচ্ছ কেন গা? বললাম, সইমার বাড়ি। তা সেই রকম গিয়েছি, দেখি এই ধিঙ্গী অবতার মেয়ে ঠাক্‌মার কাছে বসে সোহাগ খাচ্ছে। রূপখানা মন্দ নয়, বাড়ন্ত গড়ন—মিথ্যে বলব না, চোখে লাগল, মনে ধরে গেল। ভাবলাম পেবোর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তা সেই কথা বলতে সইমা কপালে হাত চাপড়ালো। বললো, বিয়ে? বিয়ে কে দিচ্ছে ওকে? ওর বিদ্যেবতী মা ওকে বিদ্যে শেখাতে ইস্কুলে পড়াচ্ছে। আরও পড়াবে, পাশের পড়া পড়বে মেয়ে।

'শুনে আমি হাঁ।

'বলি, "হ্যাঁগো তুমি শাউড়ী থাকতে—বেটার বৌয়ের কথাই জয়ী হবে?"

'সইমা বললো, "না হয়ে উপায়! দেখিস নি তো আমার বৌটিকে!" শুনে বুঝলি ঘেন্নায় যেন প্রাণ শতখান হল। খুব ধিক্কার দিলাম সইমাকে। তারপর পরামর্শ দিলাম, বৌকে না জানিয়ে নাতনীর বিয়ে দিয়ে ফেল। হয়ে গেলে তো আর ট্যাঁ-ফোঁটি করতে পারবে না!'

গঙ্গামণির কণ্ঠকাঁসর বেজে ওঠে, 'মা কোথায় ছিল?'

'ছিল? ছিল এই কলকাতায়। মেয়ে গরমের ছুটিতে আম খেতে গিয়েছিল বাপের সঙ্গে। আমি বলি, এই সুযোগ সইমা! মেয়ের মাকে খবর দাও, হঠাৎ একটা সৎপাত্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে, হাতছাড়া করতে পারছি না, চলে এসো—মেয়ের বিয়ে আরম্ভ হচ্ছে। এই তো ব্যাপার, সরল সাদা ব্যবস্থা। আচ্ছা তুই বল্ গঙ্গা, কী এমন অনেষ্য কাজটা হয়েছে?'

'কে বলছে অনেষ্য?'

'কে? তা মিথ্যে বলব না, কেউ বলে নি। দশেধর্মে সবাই বললো ভাগ্যি বটে মেয়ের। যাচা পাত্তর এসে মেয়ে নিচ্ছে! অনেষ্য বললেন আমার বেয়ান-ঠাকরুণ। তিনি কলকেতা থেকে এসেই যেন আকাশে পা তুললেন। এ বিয়ে আমি মানি না, এ বিয়ে ভেঙে দেব।'

'অ্যাঁ!' গঙ্গামণি শিউরে ওঠে, 'বে ভেঙে দেব বললে?'

'বলল তো! মেয়ে-জামাইয়ের মুখ দেখল না, একটু আশীর্বাদ করল না, ভিটেয় পা দিল না, শাউড়ীর সঙ্গে কথা কইল না, সোয়ামীকে ডেকে বলল, "ভালো চাও তো মেয়ের বিয়ে ভাঙো, নইলে এই চললাম!"

'বেয়াই আমার খুব দৈ-দস্তুর করল, শুনলাম হাতজোড় পর্যন্ত করল, মাগী একেবারে বজ্জর! শুনল না কথা, ঠকঠক করে গিয়ে গাড়িতে চড়ে বসে বলে গেল, তুমি যেমন আমায় ঠকিয়েছ, আমিও তার শোধ নিচ্ছি। তোমার সংসারে আর নয়। ব্যাস, সেই উপলক্ষ। ঘর-সংসার ত্যাগ দিয়ে তেজ করে চলে গেল কাশীতে বাপের কাছে। ব্যস, আর এল না।'

'এল না!'

গঙ্গামণি যেন শুনে পাথর।

'এল না কিগো সুবোধের মা, পাগল-ছাগল নয় তো?'

'পাগল! হুঃ, পাগল করতে পারে মানুষকে! ওই বৌ নিয়ে তো আজন্ম সইমা জ্বলে পুড়ে মরেছে। কী তেজ আস্পদ্দা! তা যেমনি মা, তেমনি ছা। আমার এই ধনীও তো তেজ-আস্পদ্দায় কম যান না!'

'হ্যাগা, তা বাপের বাড়িতে আছে কে এখন?'

'আছে সবাই। বাপ ভাই ভাজ, কাছেপিঠে পিসিও আছে একটা। কিন্তু আমার আর কী ইষ্টলাভ হল! এই তো প্রেথমবার, কোথায় মা-বাপ কাছে নিয়ে যাবে, সাধ-নেমন্তন দেবে, তা নয় আমার বুকে বাঁশ ডলছে!'

গঙ্গা বলে ওঠে, 'হ্যাগো, তা মা আর আসবে না?'

'কি জানি ভাই! তেজ কখনো করলাম না, তেজের আস্বাদ জানলামও না। এল না তো এই এত বচ্ছরে!'

গঙ্গামণি গলা নামিয়ে বলে, 'রীত-চরিত্তির ভাল তো?'

মুক্তকেশী বলেন, 'ভগবান জানে, যার ধর্ম তার কাছে। তবে মনে হয় সেদিকে কিছু নয়, শুধু তেজ-আস্পদ্দা। আমাকে না বলে আমার অনুমতি না নিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে, নেহি করেঙ্গা অমন সোয়ামীর ঘর। এই আর কি।'

'তাজ্জব! তা বাপু বৌদিদি, বেয়ান যখন তোমার সইমার পুতবৌ, তখন জানতে তো তাঁর ধাতধরন। স্বেচ্ছাসুখে তাঁর মেয়ে আনলে কি বলে?'

মুক্তকেশী কপালে হাত দিয়ে বলেন, 'অদেষ্ট!'

অদৃষ্ট!

সমস্ত নিরুপায়তার শেষ কথা!

আদি অন্তকাল সেই 'অদৃষ্ট' নামক অ-দৃষ্ট ব্যক্তিটিকেই আসামী খাড়া করছে লোকে, সমস্ত কিছুর চরমকালে।

মুক্তকেশীও করলেন।

॥ ৬ ॥

তিনটে বছর গায়েব করেও বিরাজকে আর বারোর কোঠায় রাখা যাচ্ছিল না। দেখতে ছোটখাটো, বয়সের বাড়বাড়ন্ত নেই বলেই যে পাড়াপড়শীর চোখে ধুলো দিয়ে চালানো যাবে, এ আশা একটু বেশি আশা।

সেদিন তো এক প্রিয়সঙ্গিনীর সঙ্গে বন্ধু-বিচ্ছেদই ঘটে গেল। মুক্তকেশী তাঁর কাছে আক্ষেপ জানাচ্ছিলেন, 'ছেলেরা তো আপিস আর তাসপাশা নিয়েই মগ্ন, বোনটার বিয়ের কথা মনেও আনে না, আমারই হয়েছে জ্বালা! একটা পাত্তর-টাত্তরের সন্ধান দাও না ভাই, গলা দিয়ে ভাত নামছে না যে। বারো বছর পার হয়-হয় মেয়ে—'

হয়ে গেল উল্টো উৎপত্তি। বান্ধবী বলে বসলেন, 'এখনো বারো পার হয় হয়? মেয়ে কি তোমার উল্টো দিকে হাঁটছে সুবোধের মা? পাঁচ বছর আগে তো শুনেছি রাজু দশে পা দিয়েছে—!'

মুক্তকেশী প্রথমটা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, তারপরই অবশ্য নিজমূর্তি ধরলেন। বান্ধবীকে 'বাবার-বিয়ে' 'খুড়োর-নাচন' দেখিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে চলে এলেন। কিন্তু মনের মধ্যে তো আগুনের দাহ।

আবার একদিন মুক্তকেশীর এক জ্ঞাতি ননদ বেড়াতে এসে বলে বসলেন, 'কোলের মেয়ে বলে বুঝি কাছছাড়া করবি না নবৌ, মেয়েকে "বীজ" রাখবি? বলি রাজি যে পাঁড় হয়ে উঠল!'

রসনার ধার সম্পর্কে মহিলাটির খ্যাতি আছে। মুক্তকেশীকে তিনি হেলায় জয় করতে পারবেন এ কথা মুক্তকেশীর অজানা নয়, তাই এক্ষেত্রে মুক্তকেশী অন্য পথ ধরলেন। অভিমানের গলায় বললেন, 'তা তোমরা পিসিরা থাকতে যদি মেয়ের বিয়ে না হয়, আমি আর কি করবো ঠাকুরঝি? চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হলে তোমার গিয়ে বাপ-ঠাকুর্দার বংশই হবে, আমার নয়। তোমরাই বোঝ।'

অতএব কলহ এগোল না, ননদ মুক্তকেশীর ছেলেদের নিন্দাবাদ করে বিদায় নিলেন।

কিন্তু তারপর ঝড় উঠল। অবিচ্ছিন্ন ঝড়।

মুক্তকেশীর সংসারে সেই ঝড়ের ধাক্কায় তোলপাড় হতে থাকলো। বিরাজ তো মা'র সামনে বেরোনোই ছেড়ে দিল, কারণ তাকে মাঝে রেখেই তো মা'র যত বাক্যি-বুলি!

প্রবোধ-সুবোধও মা'র সর্ববিধ কটূক্তি নীরবে গলাধঃকরণ করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে, উমাশশী সর্বদাই তটস্থ, এমন কি মুখরা সুবর্ণও মা'র মনপ্রাণ ভাল নেই ভেবে চুপচাপ আছে।

এহেন পরিস্থিতিতে সহসা আগুনে জল পড়ল। বড় মেয়ে সুশীলা এসে হাজির এক 'সম্বন্ধ' নিয়ে। বিদ্বান ছেলে, রূপে কার্তিক, অবস্থা ভাল, তারা এই সালেই বিয়ে দিতে চায়, কারণ সামনে 'অকাল' পড়ছে। তবে হ্যাঁ, একটু খাঁই আছে। ফুলশয্যার তত্ত্ব, দানসামগ্রী, বরাভরণ, নমস্কারী, ননদ-ঝাঁপি, কনের গা-সাজানো গহনা ইত্যাদি সর্ববিধ সৌষ্ঠবের ওপর আবার তিনশো টাকা নগদ।

নগদের সংখ্যাটা শুনেই আঁতকে উঠলেন মুক্তকেশী।

তিন-তিনশো টাকা নগদ বার করা কি সোজা?

ঘরখরচা, বরযাত্রী-কনেযাত্রী খাওয়ানো, এসবও তো আছে?

মেয়ের ওপর বিরূপ হলেন মুক্তকেশী। বেজার গলায় বললেন, 'খুব যা হোক সম্বন্ধ আনলি! তোর ভাইদের বুঝি রাজা-রাজড়া ভেবেছিস? এখনো বলে বাড়ির দেনাই শোধ হয় নি!'

সুশীলা এর জন্য প্রস্তুত ছিল।

সুশীলার ভাঁড়ারে তাই যুক্তি মজুত ছিল।

ধার-দেনা আবার কোন্ গেরস্তটাকে করতে না হয়? কনেদায় উদ্ধার করতে ধার-দেনা করা তো চিরাচরিত বিধি। এমন সোনার পাত্র হাতছাড়া করলে, এরপর মাটির পাত্রে মেয়ে সঁপতে হবে। আর তার মানেই চিরটাকাল মেয়েকে টানা।

এই যে তিন-তিনটে মেয়েকে পার করেছেন মুক্তকেশী, ভাল ঘরে-বরে দিয়েছেন বলেই না নিশ্চিন্দি আছেন--ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তির জালে বন্দী করতে চায় সুশীলা মাকে।

তা মুক্তকেশীরই কি আর মন ঝোঁকে না সোনার পাত্রের দিকে? তবু আরও বেজার গলায় বলেন, 'বলে দেখো তোমার ভাইদের। আমার কোঁচড়ে তো আর টাকার কাঁড়ি জমানো নেই যে বুকের পাটা করে "হ্যাঁ" করবো? মেয়ে তো তালগাছ হয়ে উঠছে, দেখি আর কাঁপি!'

তা ভাইদের বলে দেখে সুশীলা।

বুদ্ধিমতী মেয়ে বেশ মোক্ষম সময়েই কথাটা পাড়ে। চার ভাই যখন সারি দিয়ে খেতে বসেছে বড় বড় কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি পেতে, সামনে মা বসেছেন পাখা হাতে করে, বৌরা ধারে কাছে ঘুরছে নুনটুকু লেবুটুকু লাগবে কি না জানতে, তখন মায়ের হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে নাড়তে নাড়তে সুশীলা বলে ওঠে, 'হ্যাঁ রে, তা রাজুর বিয়ের কী করছিস তোরা?'

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সে প্রসঙ্গের ধুয়ো তুলে 'ঢালে খাঁড়ায় হয়ে আছেন মুক্তকেশী, দিদির মুখেও কি না সেই প্রসঙ্গ!

সন্দেহ কি যে মা'রই শিক্ষা!

কিন্তু সে সন্দেহ তো ব্যক্ত করা যায় না। সুবোধ থালায় আঁক কাটতে কাটতে বলে, 'খুঁজছি তো। তেমন মনের মতন পাচ্ছি কই! যা তা ধরে তো আর—'

'আহা-হা, তাই বা দিবি কেন? ভাল পাত্তর আমার হাতে আছে। তবে খাঁই একটু বেশি।'

হ্যাঁ, একঝোঁকে বলে ফেলাই ভাল। দ্বিরুক্তি বা বাদ-প্রতিবাদের পথ থাকে না।

খাঁই!

শব্দটা কী ভয়াবহ!

যেন হাঁ করে খেতে আসছে।

সুবোধের মুখ শুকিয়ে যায়, 'খাঁই মানে? কত খাঁই?'

কত সেকথা শুনে সুবোধের মুখ আরো শুকোয়। গলা ঝাড়া দিয়ে বলে, 'অত খাঁই হলে—মানে, আমাদের তো এখন হাতে কিছু নেই—'

'বোনের বিয়ে তাহলে শিকেয় তোলা থাক—', মুক্তকেশী ঠাণ্ডা পাথুরে গলায় বলেন, 'হাতে যখন টাকা নেই তোমাদের, বলবার কিছু নেই। তবে শাস্তরে ভগ্নীদায় আর কন্যাদায়কে সমানই বলেছে।'

কোন্ শাস্তরে বলেছে এ কথা, সে প্রশ্ন তোলে না মুক্তকেশীর ছেলেরা। এ কথাও তোলে না, না বুঝেসুঝে বুড়ো বয়স অবধি সংসার বাড়াতে তোমায় বলেছিল কে বাপু? তোমার নিবুদ্ধিতার দায় আমাদের পোহাতে হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা?

না, তোলে না এসব কথা, শুধু অস্ফুটে বলে, 'না, মানে গহনাটাও গা সাজানো চাইছে কিনা। এদিককারও সব আছে, তার ওপরে নগদ'

হঠাৎ রান্নাঘরের শেকলটা নড়ে ওঠে।

সাঙ্কেতিক ঘণ্টা!

সুশীলাই পাখাখানা নামিয়ে উঠে যায়, আর পরক্ষণেই হাস্যবদনে এসে বলে, 'ওই শোনো, হয়ে গেল সমিস্যের সমাধান! মেজ বৌ বলছে, গহনার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের!'

ভাবতে হবে না!

চার ভাই-ই একটু সচকিত হয়। যেন ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু মুক্তকেশী পারেন, সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে বলে ওঠেন, 'বুঝেছি। নিবুদ্ধির ঢেঁকি নিজের গয়নাগুলো খয়রাৎ করবে। বোকা হাবা হলে কি হয়, মনটা ওর বরাবরই উঁচু।'

এই সেদিনই ভিখিরিকে একখানা পুরনো কাপড় দিয়ে ফেলার অপরাধে যে ওই বৌয়ের 'দরাজ মেজাজে'র খোঁটা তুলে, নাকের জলে চোখের জলে করেছিলেন তাকে, তা অবশ্য মনে পড়ে না মুক্তকেশীর!

মেজ বৌয়ের উঁচু মনের পরিচয়ে ছোট দুই ভাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাতের চূড়োয় গর্ত করে ডাল ঢেলে সাপটাতে থাকে, বড় ভাই মাথাটা নিচু করে ভাতটা নাড়াচাড়া করতে থাকে এবং মেজ ভাই প্রচণ্ড রাগকে সংহত করতে বড় বড় গ্রাস তুলতে থাকে মুখের মধ্যে তার ওপর।

অসহ্য!

অসহ্য এই সর্দারী!

স্বামীর অনুমতি নেওয়া দূরে থাক, স্বামীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নেবারও দরকার বোধ করল না! ভেবেছে কি ও?

প্রশংসা কুড়োবেন?

প্রশংসা কুড়িয়ে পেট ভরবে?

এদিকে তো আচার-আচরণের দোষে নিন্দেয় গগন ফাটছে! কই তার বেলায় তো ইচ্ছে হয় না, বড় বৌয়ের মতন শান্তশিষ্ট হয়ে সুখ্যাতি কিনি!

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন!

চাঁদির ছুঁচ দিয়ে লোকের মুখ সেলাই করে দেবেন!

রাগে হাত-পা কাঁপতে থাকে প্রবোধের। সুশীলার অবশ্য এ ভাবান্তর চোখ এড়ায় না, তবে সুশীলা সে কথা তুলে আর ব্যাপারটাকে উদ্‌ঘাটন করতে চায় না। তাড়াতাড়ি ভাইদের পাতের কাছে দুধের বাটিগুলো এগিয়ে দিয়ে গুড়ের বাটিটা নিয়ে আসে।

প্রবোধ একটা সুযোগ পায়, প্রবোধ এই ছুতোয় মনের উত্তাপ প্রকাশ করে বসে। দুধের বাটিটা বাঁ হাতে ঠেলে দিয়ে বলে, 'লাগবে না, সরিয়ে নাও।'

'ওমা সে কী, কেন? পেট ভাল নেই?'

'পেট খারাপ শত্রুর হোক—', প্রবোধ থমথমে গলায় বলে, 'এসব বাবুয়ানা ছাড়তে হবে এবার!'

সুশীলা বুঝেও না বোঝার ভান করে, ফিকে গলায় বলে. 'হঠাৎ বাবুয়ানা কি দোষ করল!'

প্রবোধ গুজগুজে গলায় বলে. 'যাদের এক পয়সার সংস্থান নেই. এক কথায় মেয়েদের গায়ের গহনায় হাত পড়ে. তাদের এমন দুধ ক্ষীর খাওয়া মানায় না।'

বলে ফেলেই অবশ্য ঘাড়টা গুঁজে যায় প্রবোধের, কারণ ঠিক এমন স্পষ্টা-স্পষ্টি কিছু বলে ফেলার ইচ্ছে তার ছিল না, চোরাগোপ্তা একটু ইশারা দিতে চেয়েছিল, হল না।

মায়ের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় বুকটা হিম হয়ে গেল তার। এরপর আর কি ও গহনা ছোঁবেন মুক্তকেশী?

কিন্তু মুক্তকেশী কি সুবর্ণলতা?

তাই অভিমানভরে সুবিধে-সুযোগ পণ্ড করবেন? না, সুবর্ণলতার মত বোকা নয় মুক্তকেশী। মুক্তকেশী তাই তেতো গলায় বলে ওঠেন, 'তা ওই দুধটুকু সরালেই সব সমিস্যের মীমাংসা হবে? না ওই বাঁচানো দুধটুকু পুনরায় গরুর বাঁটে উঠে গিয়ে আবার পয়সা ফিরিয়ে আনবে? বাড়িতে কন্যেদায় উপস্থিত হলে, ঝি-বৌয়ের গহনায় হাত পড়ে না এমন রাজার সংসার ক'টা দেখেছিস তুই? মেজ বৌমা নিজে মুখ ফুটে বলেছে, সেইটুকুই আহ্লাদের, নইলে দরকারের সময় ছলে বলে কৌশলে নিতেই তো হতো! দিতে চেয়ে খুব একটা মহত্তর কিছু করে নি মেজ বৌমা। বড় বৌমারও থাকলে দিত।'

অর্থাৎ প্রবোধের ঠেস দেওয়া কথার ফল হলো এই। সুবর্ণলতার মহত্ত্ব, উদারতা সব কিছুই এখন তৃতীয় বিভাগে পড়ে গেল, সুবর্ণলতার উঁচু মনের পরিচয়টা ধামাচাপা পড়ে গেল, সুবর্ণলতার সুখ্যাতিটা মাঠে মারা গেল।

মুক্তকেশী অতঃপর বসে বসে ফিরিস্তি দিতে লাগলেন এহেন ঘটনা আর কবে কোথায় দেখেছেন এবং কী রকম সোনাহেন মুখ করে সেই সব বৌরা গা থেকে গহনা খুলে দিয়েছে ননদের বিয়েতে, ভাশুরঝির বিয়েতে।

তবে?

সুবর্ণলতা এত কিছু বাহাদুরি দেখায় নি। সুবর্ণলতা নতুন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি। সুবর্ণলতার মনটাকে যে 'উঁচু মন' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুক্তকেশী, সে কেবল মুক্তকেশীর নিজের মন উঁচু বলে।

কিন্তু সুবর্ণলতার সেই মনের স্বীকৃতি কি রইল? বিরাজের গায়ে-

হলুদের দিন যখন মুক্তকেশী মেজ বৌমার গহনার বাক্সটি তোরঙ্গ থেকে বার করলেন মেয়েকে 'সালঙ্কারা' করবার জন্যে, তখন কি দর্জিপাড়ার ওই বাড়িটায় একটা বজ্রপাত ঘটে গেল না?

দোয়াত আছে, কালি নেই।

বাক্স আছে, গহনা নেই।

মুক্তকেশীর ঘরে তোরঙ্গ, মুক্তকেশীর কোমরের ঘুনসীতে চাবি, অথচ মুক্তকেশীর অজান্তে সে গহনা হাওয়া!

এ হেন ঘটনায় বিয়েবাড়িতে যতদূর হুলস্থূল হবার তা হয়েছিল বৈকি। বেশি বৈ কম হয় নি, কারণ বিয়েতে মুক্তকেশীর তিন বিবাহিতা মেয়ে এসেছে সপরিবারে, এসেছেন মুক্তকেশীর ভাজ, বোন, মাসতুতো বোন হেমাঙ্গিনী।

সকলে গালে হাত দিয়ে থ!

ভূত না চোর!

চোর যদি তো বাক্সটাসুদ্ধই নেবে, বাক্স খুলে আংটি মাকড়ি মল ইত্যাদি কুঁচোকাচা গহনা রেখে দিয়ে, বালা বাজুবন্ধ, চিক, সীতাহার, শাঁখা অনন্ত, পালিশ পাতের চুড়ি ইত্যাদি করে বড় বড় গহনাগুলি বেছে নিয়ে যাবে? এত সময় হবে চোরের?

তা হলে! হুঁ!

রাত-বিরেতে সিঁড়ির ছায়ায় কি উঠোনের ছাঁচতলায় ভূতের দেখা মেলে বলেই যে লোকে গহনা-চোর ভূতে বিশ্বাসী হবে এমন হয় না।

শেষ অবধি তবে ঘরের মানুষ!

কে সেই মানুষটি?

কোন্ ঘরের?

মুখে মুখে কথা ফেরে, কথা কানে হাঁটে। অনেক কান ঘুরে সুবর্ণলতার কানে এসে পেঁছিয় উত্তরটা।

আর কে?

যার জিনিস সে।

হ্যাঁ, সে নিজেই। তা ছাড়া আর কি! সুখ্যাতি কিনতে লোক দেখিয়ে দানপত্তরে সই করে বসে হাত-পা কামড়ে মরছিল, অতএব তলে তলে পাচার। বাপের বাড়ি যাওয়া-আসা নেই! তাতে কি, এ বাড়িরই আনাচেকানাচে কোথাও সরিয়ে রেখেছে, পরে তাক বুঝে ব্যবস্থা করবে। দিয়ে ফেললে তো হাতছাড়া গোত্তরছাড়া!

সরিয়েছে কখন?

ওমা তার আবার ভাবনা কি, গঙ্গাস্নান যান না মুক্তকেশী? তাসের আড্ডায়?

চাবি?

সে অমন পাঁচটা চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেলা যায়। ভাঁড়ারের বাসনের সিন্দুকের মরচেধরা তালাটা খুলে দেয় নি সেদিন সুবর্ণলতা?

খুলে দিয়ে বাহাদুরি নেয় নি?

পান সাজছিল সুবর্ণলতা, কাছে এসে কানে ঢেলে দিল একজন কথাটা।

সুবর্ণলতা দাঁড়িয়ে উঠল।

বলল, 'কি বললে?'

'ও বাবা, এ যে নাগিনীর মত ফোঁস করে ওঠে গো! আমি বলি নি বাবা, বলেছে তোমারই শাশুড়ী।'

'কোথায় তিনি?'

আরক্ত মুখ আগুনের মত গন্‌গনিয়ে ওঠে, 'সামনে এসে মুখোমুখি বলবার সাহস হল না বুঝি?'

'জানি না বাবা, তোমাদের কথা তোমরা জানো' বলে জ্ঞাতি ননদ পালায়। ভেবেছিল কথাটা নিয়ে জ্ঞাতি জেঠির একটু নিন্দেবাদ করবে, ব্যাপার দেখে থেমে গেল, সরে পড়ল।

কিন্তু সুবর্ণলতা কি থেমে থাকবে?

সুবর্ণলতা কি তার মা সত্যবতীর রক্তে-মাংসে তৈরি নয়? যে সত্যবতী কখনো মিথ্যার সঙ্গে আপোস করে চলতে পারে নি, কখনো অন্যায় দেখে চুপ করে থাকে নি?

সুবর্ণলতা সেই একবাড়ি লোকের সামনে মুক্তকেশীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, 'গহনা হারানোর কথায় কী বলেছেন?'

মুক্তকেশী তাঁর মেজবৌমার অনেক মূর্তি দেখেছেন, কিন্তু ঠিক এ মূর্তিটি বোধ হয় দেখেন নি, তাই ভয়কে গলায় বলেন, 'কী আবার বলবো?'

'বলেন নি, আমি সরিয়ে ফেলেছি?'

মুক্তকেশী গালে হাত দেন, 'ওমা শোনো কথা! তোমার জিনিস, তুমি বলে কত আহ্লাদ করে ছোট ননদকে দেবে বললে, তোমায় ও-কথা বলতে যাব কেন? ছি ছি, আমি পাগল না ভূত!'

নিজের অভিনয়-ক্ষমতায় নিজেই প্রীত হন মুক্তকেশী।

সুবর্ণলতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'তবে যে রঙ্গা ঠাকুরঝি বলল?'

মুক্তকেশী কথাটা লুফে নেন

উদাস গলায় বলেন, 'তা তো বলবেই, জ্ঞাতি শত্তুর যে! জ্ঞাতির মুখেই এমন কথা শোভা পায়!'

'তবে আপনি কাকে সন্দেহ কচ্ছেন?'

'সন্দেহ আর কাকে করবো বাছা, করি আমার অদেষ্টকে! গহনার জন্যে এখন শ্বশুরবাড়িতে কত খোয়ার হয় দেখ মেয়েটার!'

'হবে বললেই তো হয় না—', সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে, 'বার করতে হবে গহনা!'

'ওমা, বার করবো কোথা থেকে? হদিস জানি?'

মুক্তকেশী হদিস জানেন না, কিন্তু মুক্তকেশীর বৌ সে হদিস বার করে ছাড়বে! মুক্তকেশীর ঘোমটা দেওয়া বৌ ঘোমটা মুখে সকলের সামনে মুখ তুলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনার ছেলে কই, মেজ ছেলে?'

'ওমা কী সর্বনেশে কথা, তাকে কী দরকার?'

'আছে দরকার।'

'তা এই একবাড়ি লোকের সামনে ডেকে কথা কইবে নাকি তুমি তার সঙ্গে?'

'কইব। কইতেই হবে। খুদু ডেকে আনো তো তোমাদের মেজদাদা-বাবুকে।'

চটি জুতোর শব্দ করতে করতে বাইরের ঘর থেকে ভিতরে এল প্রবোধ। অলস আদুরে গলায় শুধোলো, 'মা, ডেকেছ কেন গো?'

'মা নয়, আমি!'

দর্জিপাড়ার গলির ওই বাড়িটায় আর একটা বাজ পড়ল।

বুঝিবা এ কাজটা আরো ভয়ঙ্কর, আরো সাংঘাতিক।

মুক্তকেশীর পাশ কাটিয়ে, মুক্তকেশীর সামনে, একবাড়ি লোকের সামনে, মুখের ঘোমটা কমিয়ে বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৌ তীব্র গলায় উচ্চারণ করল, 'মা নয়, আমি!'

প্রবোধের মুখটা হঠাৎ অমন পাংশু হয়ে গেল কেন? প্রবোধ হুঙ্কার দিয়ে বৌকে থামিয়ে দিতে পারল না কেন? অমন বোকার মত শিথিল গলায় প্রশ্ন করল কেন, 'তার মানে?'

সুবর্ণলতা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে? সুবর্ণলতা কি ভুলে গেছে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কাদের সামনে? তা নইলে কি করে সুবর্ণলতা তেমনি স্বরেই বলতে পারে, 'মানে বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে? গহনাগুলো কোথায় সরিয়েছ?'

'গহনা? আমি? কিসের গহনা? মানে—ইয়ে সেই গহনা? আমি কি জানি? বাঃ!'

প্রবোধের জিভ তোৎলার অভিনয় শুরু করে।

কিন্তু মুক্তকেশী কি দাঁড়িয়ে ছেলের এই অপমান সহ্য করবেন?

তা তো আর হয় না।

মুক্তকেশী কনুইয়ের ধাক্কায় বৌকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'বাড়তে বাড়তে একেবারে যে আকাশে পা তুলছো মেজবৌমা। কাকে কি বলছো জ্ঞান নেই?'

'আছে। জ্ঞান ঠিকই আছে।'—ধাক্কা খেয়েও নিবৃত্ত হয় না সুবর্ণলতা। বলে, 'খুব তো মাতৃভক্ত ছেলে আপনার, মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি গালুক না, ও জানে কি না গহনা কোথায় আছে!'

'বেশ তাই করছি—', প্রবোধ মায়ের পা থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছোঁড়ে, 'পা ছুঁয়েই দিব্যি গালছি। ডরাই নাকি? এ্যা, এত বড় আস্পর্ধার কথা! আমি চোর, আমি গহনা চুরি করেছি!'

'চুরি করবে কেন, সাবধান করেছ—', সুবর্ণলতা আরো তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'পাছে পরের ঘরে দামী জিনিসগুলো চলে যায় তাই বাঁধ দিয়েছ। তোমায় চিনি না আমি? "দেব" বলেছি বলে যাচ্ছেতাই কর নি তুমি আমায়? ধরে ঠেঙাও নি?'

হ্যাঁ, এই চরমতম অপমানের কথা ব্যক্ত করে বসলো সুবর্ণলতা। পাছে লোক-জানাজানি হয়ে যায় বলে মার খেয়ে যে টুঁ শব্দটি করে না, তার এই বলে বসাটা আশ্চর্য বৈকি!

এমনই ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো সুবর্ণলতার যে, তার জীবনের এই লজ্জাকর গোপনীয় খবরটা এমন করে উদ্‌ঘাটিত করে বসলো!

তা সুবর্ণলতার চরিত্রে হয়তো ওইটাই ছিল পরমতম ত্রুটি। সুবর্ণলতা যখন-তখনই ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে বসতো। সেই অতিক্রম করে বসায় যে

নিজেই সে হাস্যাস্পদ হতো, হেয় হোত, সমালোচনার বিষয়বস্তু হতো, তা মনে রাখতে পারত না! সুবর্ণলতা যে তার ননদের গায়ে-হলুদের দিন গলায় আঁচল পাকিয়ে মরতে গিয়ে একটা কীর্তি করে বসেছিল, এতে কেউ সুবর্ণলতাকে মমতা করেছিল? না কি প্রবোধকে নিন্দে দিয়ে সত্যপথে-স্থির তার বৌকে বাহবা দিয়েছিল?

মোটেই না। সুবর্ণলতাকে শুধু ছি-ছিক্কার করেছে সবাই। কারণ সুবর্ণলতার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল সেদিন।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

মুক্তকেশীই কেন গলায় দড়ি দেন নি সেদিন, এই আশ্চর্য!

আচ্ছা বিরাজের বিয়েটা কি তবে বন্ধ হয়ে গেল?

ইস! পাগল নাকি?

মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়?

মা মরলে তাকে ঘরে শেকল তুলে রেখে দিয়ে লোকে কন্যাসম্প্রদানটা করে নেয়! এ তো তুচ্ছ একটা বৌ বাড়ির!

তা ছাড়া মরেও নি তো!

শুধু কেলেঙ্কারি করেছিল।

একবেলা শুয়ে পড়ে থেকেই তো সেরে গেল তার দুর্বলতা। আবার তো পরদিন উঠে কাজ-কর্ম করতে লাগলো বিয়েবাড়িতে। সবাইয়ের সঙ্গে খেতে বসতেও দেখা গেল মাছ লুচি নিয়ে। শুধু একটু বেশি শান্ত, একটু বেশি স্তব্ধ।

কিন্তু লজ্জিত কি?

আশ্চর্য, লজ্জিত হতে দেখা যায় নি কখনো সুবর্ণলতাকে! অথচ জীবনে কম কেলেঙ্কারি তো করে নি সে! বারে বারে করেছে, যখন-তখন।

বিরাজের বিয়ে হয়ে গেল তা হলে? তবে বুঝি নিরলঙ্কার দেহে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে অনেক গঞ্জনা খেতে হয়েছিল বেচারাকে?

না না, গহনাগুলো যে পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত!

অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পাওয়া গেল। মুক্তকেশীর সেই তোরঙ্গের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিল কাপড়চোপড়ের খাঁজে।

হয়তো গহনার বাক্সটায় চাবি দেওয়া হয় নি! হয়তো অসাবধানে কোনো সময় উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল বাক্সটা।

ঠিক ঠিক সবই পাওয়া গেল'

স্বাস্থ্যবতী সুবর্ণলতার দরুণ গায়ে বড় জরির কল্‌কা বসানো মখমলের জামা আর বেগুনী ডুরে ভারী জরিদার বেনারসী পরে, সর্বাঙ্গে ঢলঢলে গহনা ঝলমলিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল বিরাজ, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে।

যাবার আগে গোপনে সুবর্ণলতার হাত ধরে কেঁদে বলেছিল, 'এতদিন তোমায় চিনতে পারি নি মেজবৌ, কত লাঞ্ছনার কারণ হয়েছি! তুমি দেবী।'

সুবর্ণর চোখেও জল ছিল বৈকি। চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে বলেছিল, 'যাক, একজন তবু চিনলে আমায়! তবু মনে জানবো ভূ-ভারতে এসে একটু সার্থক হলাম। তা মনে কি আর রাখবে মেজবৌকে? যা সোন্দর বর হল! পৃথিবীই ভুলে যাবে!'

॥ ৭ ॥

মুক্তকেশীর ছোট দুই ছেলে যে রোজগারী হয়ে উঠেছে তা নয়, প্রভাস তো এখনো পড়ুয়া ছেলে, 'ল' পড়ছে, আর প্রকাশ পাড়ার সখের থিয়েটারের হিরোইনের পাকা পোস্টটা পেয়ে সুখে 'মহলা' দিচ্ছে।

তবু মেয়ের বিয়ের পর ছেলেদের বিয়ের চিন্তায় আর বিলম্ব করলেন না মুক্তকেশী। মেয়ের বিয়ের জন্যই আটকে ছিলেন এযাবৎ। আর থাকেন? দুই ছেলের বিয়ের জন্যেই তোড়জোড় লাগান।

খবরটা শুনে উমাশশীর কাছে সেই কথাটা বলে বসলো সুবর্ণলতা। যে কথার জন্যে খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেল।

তা সুবর্ণলতার জীবনটা নিরীক্ষণ করে দেখলে আগাগোড়াই তো শুধু ওই খণ্ডপ্রলয়। সুবর্ণলতা একটা কিছু বেফাঁস কথা বলে বসে, আর সংসারে তুমুল কাণ্ড ঘটে।

মনে হয় এবার বুঝি একটা কিছু করে বসবে সুবর্ণলতা!

কিন্তু নাঃ, আবার দেখা যায় সুবর্ণলতা তার দীর্ঘ সুন্দর দেহটা নিয়ে সংসারে চরে বেড়াচ্ছে, কাজ করছে, কর্তব্য করছে।

বোঝা যায় না সুবর্ণলতা এই সেদিন গভীর রাতে বিনিদ্র চোখে মৃত্যুর যত রকম উপায় আছে তা নিয়ে ভেবেছে। বোঝা যায় না সব সময় মরতে ইচ্ছে হয় ওর। কিন্তু কেন?

চিত্রগুপ্ত বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারে নি সুবর্ণলতার বিধাতা পুরুষ। হয়তো বা সুবর্ণলতা নিজেও পারে না।

বুঝতে পারে না নিজেই সে সেধে দুঃখু ডেকে আনে। নইলে কী দরকার ছিল সুবর্ণর বড় জায়ের কাছে শাশুড়ীর বুদ্ধির ব্যাখ্যা করবার? বলে বসবার দরকারটা কী ছিল, 'মা'র যেমন বুদ্ধি! ছোট ঠাকুরপোর আবার বিয়ে! গোঁপ কামিয়ে কামিয়ে মেয়ে সেজে সেজেই যার জীবন যাচ্ছে! দিতে হয় তো একটা বেটাছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত ওর!'

বলা বাহুল্য, কথাটা চাউর হতে দেরি হল না। তিন বছরের টেঁপু মহোৎসাহে বলে বেড়াতে লাগল, 'মেজ খুড়িমা বলেছে, ছোট কাকা তো মেয়েমানুষ, বেটাছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে ছোট কাকার!'

বলা বাহুল্য, প্রলয় ঘটতেও দেরি হয় নি।

'গোঁফ-কামানো' মেয়েলী-গলা প্রকাশচন্দ্র বীর-বিক্রমে লাফাইঝাঁপাই করতে থাকে মেয়েমানুষের আস্পর্ধার বিরুদ্ধে। বিদ্বান বিচক্ষণ প্রভাস চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, 'উদ্দেশ্য আলাদা। আরও বৌ আসে বাড়িতে এটা ইচ্ছে নয়। নিজের যথেচ্ছাচারটা চলবে না ভেবে বাঁধ দিচ্ছেন। মনে হয় মেজদার উচিত ওঁকে নিয়ে আলাদা বাস করা। নচেৎ ওঁর দৃষ্টান্তে নতুন যে বৌরা আসবে, তাদেরও মাথা বেঠিক হয়ে যাবে।'

শুধু সুবোধই কথাটা শুনে হা-হা করে হেসে উঠেছিল, 'বাড়ির মধ্যে মেজবৌমারই দেখছি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। মা যে পেকার জন্যেও এক্ষুনি কনে

খুঁজছেন, আমি তো ভাবতেই পারি নি!'

তা সুবোধের অবশ্য সাতখুন মাপ। কারণ প্রবোধ আজকাল প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার করলেও, এখনো গৃহকর্তা হিসেবে সমগ্র সংসারের ভাত-কাপড়ের দায়টা সুবোধই টেনে চলেছে। নিজের সারি সারি ছেলেমেয়েতে ঘর ভরে উঠলেও এদিকে কার্পণ্য করে না সে।

ভগবানও মুখ তুলেছেন, বড়বাবু হয়েছে সে।

তবে বাড়িতে মুক্তকেশীই বড়বাবু বড়সাহেব সব। সুবোধের কথা ধর্তব্য করলেন না, ছেলেদের বিয়ে তিনি দিলেন। নগদ নিলেন, তত্ত্ব ঘরে তুলছেন এক কুটুমের নিন্দেয় শতমুখ এবং আর এক কুটুমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন।

ওটাই মুক্তকেশীর রাজনীতি।

প্রথম থেকেই বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা ভাল। নইলে জায়ে জায়ে একদল হলে পৃষ্ঠবল বাড়বে না! শাশুড়ীকে কি তাহলে গ্রাহ্য করবে?

তা মুক্তকেশীর নীতি কার্যকরী হয় বৈকি। নতুন বৌয়েরা আসার পর থেকেই সংসারের বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের সঞ্চার হতে দেখা যায়। মুক্তকেশী সেই উত্তাপের সুযোগে একজনকে সুয়ো করে নেবার চেষ্টা করেন।

উকিল ছেলের বৌ-ই ইদানীং সুয়ো হয়েছে। তাকে তোয়াজ করে চলেছেন মুক্তকেশী প্রায় নির্লজ্জের মত।

কারণ?

কারণ পায়ের তলায় একটু শক্ত মাটির আশ্রয় খুঁজছেন মুক্তকেশী, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে পারেন।

প্রতিপক্ষ?

আর কে?

দুর্দান্ত দুর্বিনীত মেজবৌ।

তার চোখের কোণে যেন চাপা আগুনের গনগনানি, তার ঠোঁটের কোণায় যেন ঔদ্ধত্যের ঝিলিক।

মুক্তকেশীর কাজে প্রতিবাদ করে বসে সে যখন-তখন।

তার উপর আবার বরটা তার 'উপায়ী' হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর।

ওকে দাবাতে হলে শক্ত মাটিতে পা রাখতে হয়। অলিখিত আইনে সব ভাইরাই উকিলভাইকে নিজেদের থেকে উচ্চাসনে বসিয়ে সমীহর চোখে দেখে আসছে, কাজেই সেই খুঁটিটাই ধরা ভাল।

মুক্তকেশী তাই রাতদিন সেজবৌ গিরিবালার 'শরীর কাহিল' দেখেন, আর 'খেটে খেটে আধমরা' হতে দেখেন তাকে। আর তার গুণের তুলনা দেখতে পান না। সে যে বড়মানুষের মেয়ে হয়েও দেমাকী নয়, এটাই কি সোজা পাওয়া নাকি?

প্রকাশের বৌ বিন্দু বড়মানুষের মেয়ে নয়, নিতান্তই নিরুপায়ের ঘরের মেয়ে। মুক্তকেশী রাতদিন তাকে তার সেজ জা'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেন।

মুক্তকেশীর এই রাজনীতির লীলার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে দিন, বয়ে চলেছে প্রকৃতির লীলা। মেয়েতে বৌতে মিলে কোন্ না বছরে বারতিনেক আঁতুড়ের ঘটনা ঘটাচ্ছে!

সুবর্ণলতা?

তা সুবর্ণলতাও সে দলে আছে বৈকি। প্রকৃতি তো ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়। আর প্রবোধচন্দ্রও কিছু আর ছেড়ে কথা কইবার ছেলে নয়।

যে স্ত্রীলোক আঁতুড়ে যেতে ভয় পায়, সে স্ত্রীলোককে অসতী ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নয় প্রবোধ। 'মা হতে অরাজী? তার মানে রূপ-যৌবন ঝরে যাবার ভয়? তার মানে পরপুরুষ আর ফিরে চাইবে না এই আশঙ্কা, এই তো? বুঝি সব। ওসব বিবিয়ানা রাখ!'

বিবিয়ানা রাখতে হয় অতএব।

কত আর যুঝবে সুবর্ণলতা?

কত খণ্ডপ্রলয় ঘটাবে?

কত কেলেঙ্কারি করবে?

বাড়িতে তো আর এখন শুধু গুরুজনই নেই, লঘুজনও রয়েছে যে। লজ্জা তো তাদের সামনেই। তা ছাড়া সমপর্যায়রা?

তারা যদি টের পায় সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আঁতুড়ে ঢুকতে হচ্ছে সুবর্ণলতাকে, আর কি মানবে তাকে? হয়তো 'আহা'ই করে বসবে।

ওই 'আহা'র চাইতে অনেক ভাল ঈর্ষা।

তা ঈর্ষা তারা করে বৈকি।

এতকাল বিয়ে হয়েছে সুবর্ণলতার, তবু তার বর তাকে 'চক্ষে হারা' হয়, তবু একদণ্ড ঘরে না দেখলেই রসাতল করে, রান্নাঘরে গেলেই বার বার ছেলেপুলেকে জিজ্ঞেস করে, 'এই, তোদের মা কই?'

এর চাইতে ঈর্ষার বস্তু আর কি আছে?

আজীবন সবাই সুবর্ণকে ঈর্ষাই করেছে।

আর বাইরের লোক বলেছে, 'এমন মানুষ হয় না।'

এ কথা মুক্তকেশীর সংসারের বাইরের সবাই চিরকাল বলেছে।

আর মুক্তকেশীর সংসার বলেছে, 'এমনটি আর দেখলাম না! কোটি কোটি নমস্কার!'

সেই দূর অতীতে সুবর্ণলতা যেদিন গলায় আঁচল পাকিয়ে মরতে বসে হারানো গহনার হদিস করে দিয়েছিল, সেইদিনই বোধ করি গলা খুলে বলার শুরু।

মুক্তকেশী মেয়ের গায়ে গহনা পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন বৈকি? তবু বলেছিলেন, 'কোটি কোটি নমস্কার মা, কোটি কোটি নমস্কার!'

উমাশশীও বলেছিল, 'নমস্কার করছি বাবা!'

সুবর্ণলতার দেওররা বলেছিল, 'নমস্কার! কোটি কোটি নমস্কার!'

শুধু সুশীলা বলেছিল, 'কেলেঙ্কারিটা তোরাই করলি! যতদূর নয় ততদূর লোক হাসালো তো পেবোটা, অথচ কেলেঙ্কারি ছড়ালো বৌয়ের!'

আর সুশীলার বর কেদারনাথ বলেছিলেন—। তা তাদের কথার মূল্য কি? তারা তো মুক্তকেশীর সংসারের বাইরের লোকই। যাদের শুনিয়ে শুনিয়ে মুক্তকেশী বলতেন।—

'যার সঙ্গে ঘর করি নি,
সে-ই বড় ঘরণী,
যার হাতে খাইনি,

সে-ই বড় রাঁধুনী।'

তা সেই কেদারনাথ শুধু সেদিনই নয়, অনেক সময় অনেক দিনই বলতেন, 'মানুষটাকে তোমরা চিনলে না!' বলতেন, 'এমন মেয়ে সচরাচর হয় না গো! তবে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শিব গড়ার মাটিতে বাঁদর গড়বার পণ করে বসেছেন এই দুঃখ!'

কেদারনাথের সঙ্গে কথা কইবার অনুমতি ছিল সুবর্ণলতার। অর্থাৎ সুবর্ণলতাই ওটা চালু করে নিয়েছিল। উমাশশী কখনো ননদাইয়ের সঙ্গে কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করে নি। ঘোমটা দিয়ে ভাত জল এগিয়ে দিয়েছে এই পর্যন্ত।

সুবর্ণলতাই প্রথম বলেছিল, 'বড় ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে কথা কইলে দোষ কি মা? আমি তো ও'র মেয়ের বয়সী!'

কথাটা মিথ্যা নয়।

কেদারনাথের বয়েস হয়েছে।

সুশীলা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ।

আগের পক্ষের যে মেয়েটি আছে, বয়সে সে সুবর্ণলতার চাইতে বড় বৈ ছোট হবে না। সুশীলা যখন বেশি দিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসতো, সতীন-ঝিকে নিয়ে আসতো।

এখন আর আসে না। শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে মেয়ে।

সে যাক, সুবর্ণলতা যে কেদারনাথের মেয়ের বয়সী তাতে ভুল নেই।

তাই এত সাহস সুবর্ণলতার।

তবু মুক্তকেশী প্রস্তাবটা প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করবেন এমন আশা করা যায় না। বললেন, 'হঠাৎ কথা কইবার দরকারই বা কী এত পড়লো?'

'উনি সর্বদা ডাক দেন, "কই গো বড় গিন্নী, কই গো মেজ গিন্নী" বলে, পান-তামাক চান, বোবার মত শুধু এগিয়ে দিই, লজ্জা করে!'

মুক্তকেশী বেজার মুখে বলেন, 'কি জানি মা, তোমাদের যুগের লজ্জার রীত-নীত কি! যাতে লজ্জা, তাতে তোমাদের লজ্জা নেই, যেটা সভ্যতা-ভব্যতা তাতেই হল লজ্জা! গুরুজনের সঙ্গে কথা কি কইলেই হয়? মান রাখতে না পারলে?'

সুবর্ণ হেসে ফেলে বলে, 'মানই বা রাখতে না পারবো কেন মা? মান্যের মানুষ—'

মুক্তকেশী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'সে শাস্তর যে তোমার পাঠশালায় আছে, তা তো জানি না মা! গুরুজনকে হেঁট করাই তো তোমার প্রকিতি!'

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'বড় ঠাকুরজামাইকে হেঁট করতে চাইবে, এমন খারাপ কেউ আছে নাকি জগতে?'

সেই 'বড় ঠাকুরজামাইটি' মুক্তকেশীর নিজের জামাই, তাকে প্রাধান্য না দিলে চলে না। তাই অনেক তর্কাতর্কির পর নিমরাজী হয়েছিলেন মুক্তকেশী।

নিজেও তো তিনি কতকাল জামাইয়ের সঙ্গে কথা কইতেন না, ঘোমটা দিতেন। কিন্তু জামাইয়ের প্রাণ-জুড়ানো ব্যবহারে ধীরে ধীরে সেটা ত্যাগ করেছেন।

তাই বলে বৌ?

আর ওই দজ্জাল বৌ?

এমনিতেই যে স্বামীর মাথায় পা দিয়ে হাঁটে! এর ওপর আবার পর-পুরুষের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

সেই কথাই বলেছিলেন, 'ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে কথা কয়ে কি চতুর্বর্গ লাভ হবে তুমি জানো মা। তবে এও বলি, জানো তো "পেবো" এসব পছন্দ করে না!'

সুবর্ণ আরক্ত মুখে বলে, 'কেউ যদি পাগল হয়, তার তালেই চলতে হবে?'

'পাগল যে কে, সে হিসেবই বা করছে কে বাছা!' মুক্তকেশী বেজার গলায় বলেন, 'কথা কইবে কও, "হ্যা হ্যা" করো না গুচ্ছির। তোমার তো মাত্রাজ্ঞান নেই! এই যে "পেকা"র সঙ্গে হট হট করে কথা কইচ, মান কি রাখছো তার?'

মান!

প্রকাশের!

শখের থিয়েটারে মেয়ে সাজা সেই ছেলেটারও মানহানির প্রশ্ন! সুবর্ণলতার মুখে চোখে একটা হাসির আভাস খেলে গিয়েছিল। তবু কৌতুকের গলা সম্বরণ করে বলেছিল, 'মানের হানি কি করেছি মা, বিয়ের কথায় একটু হন্তারক হয়েছিলাম, তা সে আক্ষেপ তো তার মিটেছে বাপু!'

মুক্তকেশী সগর্বে বলেন, 'মিটবে না তো কি তোমাদের হাততোলায় রেখে দেব ওকে?'

তা সেই গর্বের মুহূর্তে সুবর্ণলতা বলে উঠেছিল, 'সে যাক, তাহলে বাপু কথা কইব বড় ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে—'

'তাতে যদি তোমার চারখানা হাত-পা বেরোয় তো কোরো!'

এই অসতর্ক উক্তিটুকুই অনুমতি বলে ধরে নিয়েছিল সুবর্ণলতা।

কিন্তু সত্যিই তো, কী চারখানা হাত বেরুবে সুবর্ণের বুড়ো ভদ্রলোকটার সঙ্গে কথা কয়ে?

কে জানে সে কথা!

তবে এইটি হলো, বাড়ির পরবর্তী আরও দুটো বৌ এ সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলো। মুক্তকেশী বললেন, 'হবেই তো! কথাতেই আছে, "আগ ন্যাংলা যেদিকে যায়, পাছ ন্যাংলা সেদিকে ধায়!" মেজবৌ একেলে হাওয়া ঢোকালো বাড়িতে!'

মেজবৌয়ের এ বদনাম উঠতে বসতে। মেজবৌ বাড়িতে খবরের কাগজ আসার পত্তন করেছে, মেজবৌ বাড়িতেও গায়ে সেমিজ দেওয়ার পত্তন করেছে, মেজবৌ আঁতুড়ঘরে ফর্সা বিছানা-কাপড়ের প্রথা প্রবর্তন করেছে। মেজবৌ মেয়েগুলোকে সন্ধ্যে ধরে ধরে 'পড়তে বসা'র শাসননীতি প্রয়োগ করেছে। এমন আরো অনেক কিছুই করেছে মেজবৌ।

ধিক্কৃত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত হয়েছে, তবু জেদ ছাড়ে নি। শেষ পর্যন্ত করে ছেড়েছে।

কিন্তু জেদী মেয়ে সুবর্ণলতা সব কিছুই কি করে উঠতে পেরেছে?

সমুদ্র দেখবার যে বড় বাসনা ছিল তার, দেখেছিল কি সারা জীবনে? অথচ ইচ্ছেটা তাকে কম্পিত করেছিল সেই কোন্ অতীতকালে!

কত বয়েস তখন সুবর্ণলতার যখন মুক্তকেশী পাড়ার দলের সঙ্গে 'শ্রীক্ষেত্র' গিয়েছিলেন?

আকস্মিক কথাটা উঠেছে, চট্‌পট সব যোগাড় করে করে ফেলতে হবে। মুক্তকেশী দুজোড়া থানধুতি 'সাজো' কাচিয়ে নেন ধোবার বাড়ি থেকে। গায়ের চাদর খুদুকে দিয়ে কাচিয়ে নেন সাজিমাটি দিয়ে। এ ছাড়া যোগাড় কি কম? কম্বল, বালিশ, মধু, আখের গুড়, ইসবগুল, আতপচাল, সাবু, মিশ্রী, খুঁটিনাটির কি অন্ত আছে? একেই তো বিদেশে বেঘোরে প্রাণটা হাতে করে যাওয়া!

মা তীর্থ করতে যাবেন শুনে মেয়েরা দেখা করতে আসে এক-একদিন। সুশীলা তো থেকেই গেল কদিন। মেজ সুবালাও এল, পরদিন চলে গেল। বড় ননদকে সুবর্ণ বড় প্রীতির চোখে দেখে। মানুষটার মহৎ গুণ, বড় নির্বিরোধী আর শান্তিপ্রিয়। যেটা নাকি মুক্তকেশীর গর্ভজাতদের মধ্যে দুর্লভ।

এরা সকলেই অশান্তিপ্রিয়।

অকারণ একটা কথা কাটাকাটি, অকারণ একটা চেঁচামেচি, অকারণ একটা জটিলতার সৃষ্টি করা—এটাই যেন এদের ব্যসন! বিশেষ করে সুবর্ণলতার উকিল সেজ দেওরের আর সুবর্ণলতার পতি পরম গুরুর। এরা দুজন যেন এদের উপস্থিতিতে সমস্ত পরিবেশটাকে সচকিত করে রাখতে চায়, অহরহ সরবে ঘোষণা করতে চায় 'আমি আছি'। এই ওদের বিলাস, ওই ওদের বিকাশ।

হয়তো এমনিই হয়।

যাদের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করবার উপযুক্ত কোনো বিশেষ গুণ নেই, অথচ নিজেকে 'বিশিষ্ট' দেখার ইচ্ছেটা থাকে ষোল আনা, তাদের মধ্যেই জন্ম নেয় এই বিকৃতি। তারাই নিজের চারিদিকে একটা সোরগোলের আবর্ত তুলে 'বিশিষ্ট হলাম' ভেবে আত্মতৃপ্তি পায়।

প্রবোধ একটা মুটের সঙ্গে অথবা একটা পালকি-বেহারার সঙ্গে একটা দেড়টা পয়সা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন শব্দময় দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে যে, পাড়াসুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে ছুটে আসে, জানলায় জানলায় খড়খড়ির ফাঁকে কৌতূহলী চোখের ভিড় বসে যায়।

প্রভাসের মহিমাটা আবার বাড়িতেই বেশি প্রকট।

প্রভাস প্রতি কথায় পা ঠুকে বলে, 'আমি শুনতে চাই কে এ কথা বলেছে! শুনতে চাই কে এ কাজ করেছে!'

তারপর?

তারপর অপরাধীর জন্য তো আছেই হাতে মাথা কাটার ব্যবস্থা!

ঘোরতর মাতৃভক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রতি পদে সংসারে তার মাতৃসম্মান ক্ষুণ্ন হতে দেখে, এবং সেই কল্পিত অসম্মানকে উপলক্ষ করে ঘূর্ণি-ঝড় তোলে। প্রধান লক্ষ্যবিন্দু অবশ্য সুবর্ণলতা!

কারণ সুবর্ণলতাই গুরুজনের মান-সম্মান রক্ষার নীতি, নিয়ম, ধারা, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি মেনে চলতে তেমন উৎসাহী নয়। সুবর্ণলতা জানে না অকারণ গাল খেয়ে চুপ করে থাকতে হয়, সুবর্ণলতা জানে না অহেতুক খোশামোদ আর তোয়াজ করতে হয়।

তাই সুবর্ণলতার নাম না করেও শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে, 'মাকে মান্য করে চলতে যে না পারবে, সে যেন পথ দেখে। এ ভিটেয় মাকে অপমান করে বাস করা চলবে না।'

হ্যাঁ, বহু সহস্রবার 'পথ দেখা'র হুকুম পেয়ে পেয়ে তবে 'পথ দেখেছিল' সুবর্ণলতা। তবু নিন্দেয় 'ঢি ঢি' পড়েছিল সুবর্ণলতার—আলাদা হয়ে গিয়েছিল বলে।

'হাঁড়ি ভেন্ন' কর সে কথা স্বতন্ত্র, যেমন করেছে ছোটবৌ বিন্দু, তা বলে বাড়ি ভেন্ন!

কিন্তু এসব তো অনেক পরের কথা।

সুবর্ণলতা যখন সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতো, তখন 'আলাদা' হওয়ার স্বপ্ন দেখে নি।

মুক্তকেশী শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছেন।

যেখানে নাকি সমুদ্র আছে।

মুক্তকেশীর সাজিমাটিতে কাচা চাদর বালিশের ওয়াড় তুলে আনতে রান্নাঘরের ছাদে এল সুবর্ণ। এটাই মুক্তকেশীর বিশুদ্ধ এলাকা। এখানে তাঁর কাচা কাপড় শুকোয়, শুকোয় বড়ি আচার।

রোদ পড়লে এগুলি ঘরে তোলার ভার সুবর্ণর। স্বেচ্ছায় সে এ ভার নিয়েছে। কাপড়ে সন্ধ্যা পাবার আগেই তসর শাড়ি একখানা জড়িয়ে পাশের দিকের এই নিচু ছাদটায় নেমে আসে সুবর্ণ। গলির মধ্যে বাড়ি, ছাদে তার বুকচাপা হাওয়া। তাছাড়া হবেই বা কি? যে ছাদে উঠতে হয় না, নামতে হয়, সে ছাদে কোথা থেকে আসবে উত্তাল হাওয়ার স্বাদ?

তবু ভাল লাগে।

তবুও সামান্যতম মুক্তি।

উপরে বাতাস না থাক, পায়ের তলায় ঘুঁটে আর কয়লার গুঁড়োয় তৈরি গুলের ছড়াছড়ি থাক, তবু তো মাথার ওপর আকাশ আছে।

কাপড় শুকোতে দেওয়া দড়িতে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুবর্ণ এই একটুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে।

সমুদ্র কী ওই আকাশের মত?

না, তাতে নাকি ঢেউ আছে, তরঙ্গ আছে, গর্জন আছে। কী অপূর্ব সেই মহিমা!

সুবর্ণলতার শাশুড়ী মুক্তকেশী সেই মহিমার দৃশ্য দেখবেন গিয়ে। কিন্তু মুক্তকেশীর মনের কাছে কি সেই সমুদ্রের মূল্য ধরা পড়বে? মুক্তকেশী তো কই একবারও বলছেন না সমুদ্র-দর্শনে যাচ্ছি। বলছেন 'জগন্নাথ-দর্শনে যাচ্ছি'! বলছেন 'জগন্নাথ টেনেছেন'!

সুবর্ণলতাকে তো কই সমুদ্র টান দিচ্ছে না?

সুবর্ণলতার আকুলতার চাইতে কি মুক্তকেশীর চিত্তের আকুলতা বেশি? নইলে 'চারধাম' করে নিতে পেরেছেন তিনি! আবার দ্বিতীয়বার পুরী

যাচ্ছেন রথযাত্রাকে উপলক্ষ করে! কেদারবদরী, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন কত কত জায়গায় গিয়েছেন মুক্তকেশী সুবর্ণর বিয়ের আগে, পরে।

পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে এসে ছেলেদের একত্রে ডেকে বলেন, 'তোমরা চার ভাই কে কি দেবে বল?'

ছেলেদের মুখ শুকোলেও মুখে হারে না। বলে, 'তোমার যা লাগে বল মা!'

এবারেও বলেছে।

তা এবারে টাকা একটু বেশি লাগবে।

রথে যাওয়া 'আটকে' বাঁধতে হবে, 'পান্ডাপুজো' করতে হবে, 'গুণ্ডিচা-বাড়ি' ভোগ দিতে হবে।

মুক্তকেশী জানতেন, 'টাকা' দিলে প্রবোধই দেবে। সুবোধের 'নেই' বলে দিতে পারবে না, আর সেজ ছোট কিপটেমির জন্যে দিতে পারবে না।

তা প্রবোধও কিছু কম কিপটে ছিল না, শুধু সুবর্ণর দাপটেই মুক্তহস্ত হতে হয়েছে তাকে।

প্রবোধের আজকাল উপার্জন বেশি, জাহাজঘাটায় মাল লেন-দেনের কাজ, কাঁচা পয়সা, তাই দায়ে-দৈবে, জামাইবাড়ির তত্ত্ব-তল্লাসের ব্যাপারে প্রবোধই মা'র ভরসা এখন।

এই একটি কারণেই হয়তো এখনো পর্যন্ত সুবর্ণলতাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বাড়ির বাইরে দূর করে দেন নি মুক্তকেশী! টাকাকড়ির ব্যাপারে বৌটা একেবারে উদোমাদা। 'আমার স্বামীর বেশি গেলো' বলে হাপসানো তো দূরের কথা, 'তোমার বেশি আছে তুমিই দাও' বলে স্বামীকে উৎপীড়ন করে মারে।

আর বৌ তিনটে এক পয়সায় মরে বাঁচে!

উমাশশী যে অত ভালো, পয়সার ব্যাপারে কঞ্জুষের রাজা!

এই যে নিত্য গঙ্গাস্নান করেন মুক্তকেশী, খরচ কি নেই তাতে? গাড়ি-পালকি না চড়ুন, ঠাকুরদোরে তো দু-চারটে পয়সা দিতে হয়! ভিখিরি ফকির-কেও এক-আধটা না দিলে চলে না। তাছাড়া গঙ্গার ঘাটের বাজার থেকে হলো বা দুটো ফলপাকড়, হলো বা দুটো মাটির পুতুল কেনা, এ তো আছেই। এ খরচ সুবর্ণলতাই হাতে গুঁজে দেয়। নিজে থেকেই দেয়।

এবারেও যে প্রবোধ উদার গলায় বলেছিল• 'সবাইকে আর এই সামান্যর জন্যে বলার কি আছে মা? তোমার আশীর্বাদে শ' দুই টাকা আমিই তোমাকে দিতে পারবো'—সে ওই বৌয়ের অন্তরটিপুনিতে ছাড়া আর কিছু নয়। তবে মুক্তকেশী মর্যাদা খোয়ান নি।

মুক্তকেশী উদাসভাবে বলেছিলেন, 'সে তোমাদের যার যেমন ক্ষ্যামতা, ভাইয়ে ভাইয়ে মোকাবিলা কর! আমি সবাইয়ের কাছে বলে খালাস!'

বৌয়ের বদান্যতায় বিচলিত হবেন মুক্তকেশী এমন নয়।

সুবর্ণলতা কাচা কাপড় তুলে নেমে আসছিল, সহসা বড় বৌয়ের সেজ ছেলে গাবু এসে হাঁক পাড়ে, 'মেজ খুড়ী, দিব্বি যে ছাদে এসে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে! ওদিকে দেখ গে যাও, ঠাকুমা তোমার পিণ্ডি চটকাচ্ছে!'

হ্যাঁ, এই ভাষাতেই কথা বলতে অভ্যস্ত ওরা।

এই ভাষাই তো শুনছে অহরহ।

সুবর্ণ ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন হলোটা কি?'

'হলো? হুঁ! সাতশোবার ডাকছেন, শোনো গে কেন?'

ওঃ!

সাতশোবার ডেকে সাড়া না পাওয়াটাই তা হলে অপরাধ! অতএব মারাত্মক কিছু না। সুবর্ণ তাড়াতাড়ি কাচা কাপড় যথাস্থানে রেখে এসে বলে, 'মা ডাকছিলেন?'

মুক্তকেশী গম্ভীর আর কঠোর কণ্ঠে বলেন, 'বোসো।'

ঈষৎ ভয় পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সুবর্ণ।

পরিস্থিতিটা কেমন যেন ঘোরালো।

আশেপাশে ভিড়।

খুনের আসামীর চারিদিকে যেমন ভিড় বসে বিচারফল শোনবার আশায়, তেমনি দালানের দরজায়, রান্নাঘরের রোয়াকে, ভাঁড়ারের সামনে দাঁড়িয়ে তার তিন জা, তাদের ছেলেমেয়েরা।

সুশীলা কোথায়?

তিনি কি চলে গেছেন?

কার সঙ্গে?

মুক্তকেশী আগের সুরেই বলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্তর দরকার মেজবৌমা। শোনো, কী বলেছ তুমি কেদারকে?'

সুবর্ণ শঙ্কিত হয়ে তাকায়।

কেদারকে আবার কী বলবে সে?

কেদারকে সে বলে পিতৃতুল্য ভালবাসে।

অবাক হয়ে বলে, 'কী বলেছি?'

'কী বলেছ? আকাশ থেকে পড়ছ? বলি ক্ষেত্তরে যাবার কথা বল নি?'

ক্ষেত্তরে যাবার কথা!

সুবর্ণর চোখের সামনের পর্দাটা সরে যায়। কেদারের কাছে বলেছিল বটে সে এ কথা!

কিন্তু সেটা কি এতই দোষাবহ?

তাই ঈষৎ সাহসের সঙ্গে বলে ফেলে সে, 'বলেছিলাম। সে কি আর সত্যি? কথার কথা!'

হ্যাঁ, তাই বলে সুবর্ণ।

'সে কি সত্যি? কথার কথা!'

কিন্তু সুবর্ণর কাছে সে যে কত বড় সত্য ছিল, সে কথা সুবর্ণ জানতো বৈকি।

সুবর্ণ সেই বলার পিছনে সমস্ত চিত্তকে উন্মুখ করে রেখেছিল, সুবর্ণ সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই সেদিন কেদার—

হ্যাঁ, যেদিন কেদার এসেছিলেন শাশুড়ীর তীর্থযাত্রার সংবাদে দেখা করতে। সুশীলা আগেই এসেছিল দ্যাওরপোর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে। কেদার সেদিন এসেছেন অফিস ফেরত।

'কই গো বাড়ির গিন্নীরা কোথায় গো? দুয়োরে অতিথি এসেছে যে—'

এই পরিচিত কৌতুকবাক্যটি উচ্চারণ করে ঢুকেছিলেন কেদারনাথ। কাল? না পরশু? কালই তো!

ছোটবৌ বিন্দু আগেভাগে এসে মাথায় কাপড় টেনে রসিকতা করেছিল, 'কানকে আটকে রাখা হয়েছে বলেই বুঝি মাথাটি এসেছেন?'

'বটে নাকি!' কেদারনাথ দালানে পাতা চৌকিটার উপর বসে পড়ে বলেন, 'ছোট গিন্নী যে আজকাল খুব ফাজিল হয়েছো দেখছি! ওহে মশাই, এ হত-ভাগ্যের প্রাণটাই যে এ বাড়িতে আটকে পড়ে থাকে, জানো না?'

বিন্দু ঘোমটার মধ্যে থেকে টিপে টিপে হেসে বলে, 'জানি।'

'জানো তো এক ছিলিম তামাক খাওয়াও দিকি!'

ছোট এই শালাজকে নাতবৌয়ের শামিল মনে হয় কেদারনাথের।

'আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার প্রাণের মহাজনের হাত দিয়েই পাঠাচ্ছি—' বলে চলে যায় বিন্দু।

কেদারনাথ চেঁচিয়ে বলেন, 'কথাটা যে ছুঁড়ে মেরে গেলে ছোট গিন্নী, বলি মানেটা কি?'

'মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি'—বলে বিন্দু দোতলায় সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে ভাল-মানুষের মত বলে, 'মেজদি, বট-ঠাকুরজামাই তোমায় ডাকছেন!'

'বট-ঠাকুরজামাই?'

সুবর্ণর মুখটা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 'এসেছেন বুঝি? কতক্ষণ?'

বিন্দু আরো নিরীহ গলায় বলে, 'এই তো এইমাত্তর! এসেই তোমার খোঁজ করলেন। যাচ্ছ তো—এক ছিলিম তামাক বরং সেজে নিয়ে যাও।'

সুবর্ণর অত দেরি সয় না।

সুবর্ণ আগেই ছুটে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বলে, 'এতদিন আসেন নি যে, ঠাকুরজামাই?'

কেদারনাথ নকল গাম্ভীর্যে বলেন, 'এসে লাভ? বাড়ির গিন্নীরা অতিথিকে একটা পান দেবে না, এক ছিলিম তামাক দেবে না, শুধু শুধু মুখচন্দ্র দেখতে দু কোশ রাস্তা ভেঙে ছুটে আসা—এ বয়সে আর পোষায়?'

'পোষায় বৈকি!' সুবর্ণ একগাল হেসে বলে, 'দুটি দিন বট-ঠাকুরঝির মুখ দেখতে পান নি বলে এলেন তো ছুটে!'

'নাঃ, এ যে দেখছি সব শালীই ফাজিল হয়ে উঠেছে!' কেদারনাথ বলেন, 'ওহে মশাই, সে মুখচন্দ্র দেখতে দেখতে চোখে ঘাঁটা পড়ে গেছে। সেই নথ ঘুরানো মুখ মনে করলেই প্রাণে ভয় আসে। এখানে আসা নাকছাবি পরা শৌখিন মুখের আশায়!'

'যত সব বাজে কথা আপনার! বসুন, তামাক নিয়ে আসি।'—বলে উঠে যায় সুবর্ণ।

খোঁজও রাখে না, বিন্দুতে আর গিরিবালাতে তখন সুবর্ণর বটঠাকুর-জামাইয়ের নামে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসার ভঙ্গী নিয়ে হাসাহাসি করছে!

হলোই বা বুড়ো, বেটাছেলে তো বটেই।

তাছাড়া যার বর 'পরপুরুষে'র ছায়াদর্শনে খাপ্পা হয়ে ওঠে! 'যাই বল বাপু, দেখলে হাসি পায়! মাথার কাপড় তো কপালের ওপর উঠে যায় ওঁকে দেখলে!'

সুবর্ণ অত জানে না।

সুবর্ণ পান-তামাক নিয়ে গুছিয়ে এসে বসে।

তারপর বলে, 'আচ্ছা ঠাকুরজামাই, আপনি সমুদ্র দেখেছেন?'

কেদারনাথ বলেন, 'তা দেখেছি। অনেকদিন আগে অবিশ্যি। আমার মা-পিসীকে নিয়ে জগন্নাথ-দর্শন করিয়ে আনা গিয়েছিল।'

'অনেকদিন আগে! রেল হয়েছিল তখন?'

'পাগল! পুরীর রেল তখন কোথায়?'

'ওমা, তাহলে তো খুব কণ্ট হয়েছিল!'

'দেখ মেজ গিন্নী, কষ্ট মনে করলেই কণ্ট, নচেৎ নয়। তা ছাড়া কণ্ট না করলে কি কেণ্ট মেলে!'

'আমি খুব কণ্ট করতে পারি।'

সুবর্ণ বলে আস্তে।

কেদারনাথ হেসে ওঠেন, গলা নামিয়ে বলেন, 'না পারলে আর আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে ঘর করছো!'

এই!

এই জন্যেই কেদারনাথকে এত ভালবাসে সুবর্ণ। কেদারনাথ সুবর্ণকে বোঝেন। কেদারনাথ এ সংসারকে বোঝেন।

সুবর্ণ একটু বিহ্বল হয়।

তারপর বলে, 'শ্রীক্ষেত্র গিয়ে সমুদ্র দেখেছিলেন?'

কেদারনাথ সস্নেহে বলেন, 'সাধে আর তোমার ঠাকুরঝি তোমায় "পাগল" বলে গো! সমুন্দুর না দেখে কেউ জগন্নাথ থেকে ফেরে? দেখেছি, চান করেছি—'

সুবর্ণ আরো কাছে এসে বসে, 'খুব ভাল লেগেছিল আপনার?'

'সে আর বলতে! দু বেলা চান করেছি!'

সুবর্ণ বিবশ বলায় বলে, 'খুব বিরাট? খুব সুন্দর? খুব ঢেউ?'

'খুব বলে খুব!' কেদারনাথ তামাকে টান দিতে দিতে বলেন, 'এক-একদিন সন্ধ্যেবেলায় বালির গাদায় বসে থাকতাম, মনে হতো না যে আর ফিরি!'

'আপনি ঠিক আমার মতন।' সুবর্ণ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে, 'ওই জন্যেই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে।'

কেদারনাথ সহাস্যে বলেন, 'সর্বনাশ করেছে। নির্জনে যা বললে তা বললে মেজ গিন্নী, আর মুখে এনো না। আমার গিন্নী আর তোমার কর্তা এই দু-জনের একজনও যদি শুনেছে—কি হয় বলা যায় না!'

সুবর্ণ এসব বাজার-চলতি ঠাট্টার ধার ধড় ধারে না। সুবর্ণ সতেজে বলে, 'ইস! কী হয়? আমি তো ঠাকুরঝিকে ডেকে ডেকে বলি, আপনার বরের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে খুব মিলতো!'

'নাঃ, এ একেবারে বদ্ধ পাগল! ও মেজকর্তা, ওহে ও মেজকর্তা, গিন্নীর মর্মবার্তাটা শুনে যাও একবার হে—'

সুবর্ণ বলে, 'থাক, তাঁকে আর ডাকতে হবে না। তাঁর সঙ্গে আমার জন্মেও মেলে না।'

কেদারনাথ ঈষৎ গাম্ভীর্যে বলেন, 'তা বললে কি চলে মেজ গিন্নী? মিলিয়ে নিতে হয়!'

'যা হয় না তা কিভাবে হবে বলুন!' সুবর্ণ একেবারে সম্ভাবনার মুলেই কোপ দিয়ে বলে, 'ও কথা ছেড়ে দিন। আপনি আমার একটা উপকার করুন ঠাকুরজামাই, কেনা হয়ে থাকবো আপনার। মাকে বলুন আমাকে নিয়ে যেতে!'

কৌতুকপ্রিয় কেদারনাথ ওই 'কেনা হয়ে থাকা'র প্রসঙ্গে কিছু কৌতুক কথা আমদানি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুবর্ণর আবেগে থরথর মুখ দেখে সামলে নিলেন।

অবাক হয়ে বললেন, 'নিয়ে যেতে! কোথায় নিয়ে যেতে!'

'পুরীতে।'

'পুরীতে? তোমায় পুরী নিয়ে যাবেন আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকরুণ? তা হলেই হয়েছে!'

শাশুড়ীর সম্বন্ধে সমবয়সী জামাই কেদারনাথ এ ধরনের হাস্য-পরিহাস করেই থাকেন।

সুবর্ণ বলে, 'সে আমি জানি। তাই তো আপনাকে ধরছি। আপনার দুটি পায়ে পড়ি ঠাকুরজামাই, বলুন একবার। আপনার কথায় "না" করতে পারবেন না।'

'আহা, বুঝছো না ভাই! বলাটাই যে নিন্দের হবে! সব বৌয়ের কথা বলতাম সে আলাদা কথা!'

'সব বৌ?' সুবর্ণ তীব্র গলায় বলে, 'ওরা কি সমুদ্র দেখতে চায়? ওদের খালি গাদা গাদা রান্না আর গাদা গাদা খাওয়ায় আহ্লাদ। আপনি একবারটি আমার কথা বলুন ঠাকুরজামাই! বলবেন, "পাগল-ছাগল, বড্ড ইচ্ছে হয়েছে—"'

কেদারনাথ হয়তো বুঝতে পারেন পাগল-ছাগলের মতই কথা বলছে মানুষটা। তবু মুখের উপর তার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিতে পারেন না। স্নেহের গলায় বলেন, 'আচ্ছা বলে দেখবো।'

সুবর্ণলতার চোখের সামনে আশার দীপ জ্বলে ওঠে।

সুবর্ণলতা আনন্দে ছল ছল করতে করতে বলে, 'বলে দেখবো নয়, এ আপনাকে করে দিতেই হবে ঠাকুরজামাই। সমুদ্র দেখতে বড় ইচ্ছে আমার। মনে হয় একবার সমুদ্র দেখতে পেলে বুঝি মরতেও দুঃখ নেই।'

'এই দেখ পাগল! আচ্ছা, আচ্ছা, বলে দেখবো।'

অবোধ সুবর্ণলতা এই আশ্বাসের তেলটুকু দিয়ে আশার দীপ জেলে রাখে। সুবর্ণ মনে করে পুরীর টিকিট বুঝি কেনা হয়ে গেছে তার!

সেই থেকে এই চব্বিশ ঘণ্টা সময় সমুদ্রের স্বপ্নে ডুবে আছে সুবর্ণ।

হঠাৎ যেন কে ওকে সেখান থেকে টেনে তুলে এনে পাথরে আছাড় মারলো।

মুক্তকেশীর দরবারে বিচার বসলো। জেরা শুরু হলো, 'কী বলেছো তুমি কেদারকে?'

সুবর্ণ শঙ্কিত গলায় বলে, 'বলেছিলাম যেতে ইচ্ছে করে—'

'শুধু ওই কথা বলছে? বলনি বড়বৌ, সেজবৌ, ছোটবৌ গাদা গাদা খায়!'

সুবর্ণ অবাক হয়ে বলে, 'ও কথা আবার কখন বললাম?'

'কেন, যখন ঠাকুরজামাইয়ের কোলের কাছে বসে আদর কাড়ানো হচ্ছিল! সাধে কি আর মেয়েমানুষকে ঘোমটা দিয়ে অন্দরে রাখার রেওয়াজ মেজ বৌমা? এই তোমার মতন লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষদের জন্যই। আরো দুটো বৌও তো কথা কয়, কই তোমার মতন কোলের কাছে বসতে চায় না তো তারা? "পেবো" যাই দেখে নি তাই রক্ষে, দেখলে গুরুলঘু মানতো? ঠাকুরজামাইয়ের কাছে

বসে আদর কাড়ানো হচ্ছিল! জগন্নাথে নিয়ে যাবার বাসনা জানানো হচ্ছিল! ওরা গাদা গাদা খায়, ওদের যাবার দরকার নেই, আমি সোহাগী, আমায় নিয়ে যেতে বল! বলি কেন? কেন? এত "আস্পদ্দা" তোমার কিসের? ওরা তোমার বাবার খায়?'

সুবর্ণর এবার প্রসঙ্গটা মনে পড়ে। অতএব বিস্ময়টা কাটে।

প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে, 'ও ভেবে ও কথা বলি নি আমি—'

হঠাৎ বড়বৌয়ের বড় মেয়ে মল্লিকা খরখর করে বলে ওঠে, 'না বল নি বৈকি! আমি যেন শুনি নি! টেঁপিও শুনেছে। বল নি তুমি বড় পিসে-মশাইকে, "ওরা গাদা গাদা রাঁধে, গাদা গাদা খায়"—এখন আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে!'

না, মল্লিকার দোষ নেই।

এ বাড়ির শিশুরা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখে আসছে সবাই সুবর্ণলতার বিপক্ষ। সুবর্ণলতা সকলের সমালোচনার পাত্রী। সুবর্ণলতাকে 'এক হাত' নিতে পারবার চেষ্টায় সবাই তৎপর। তবে আর তাদেরও তেমন মনোভাব গড়ে উঠবে না কেন! সুবর্ণলতার নিজের মেয়ে পারুলও কি ওদের দলে নয়!

ছেলে দুটো অবিশ্যি মা'র নেওটা, কিন্তু মেয়েটা মল্লিকারই জুড়ি।

কিন্তু আজ মল্লিকার কপালে দুঃখ ছিল।

অভ্যস্ত পাকা কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বড়-সড় একটা চড় খেল সে।

হঠাৎ যেন সুবর্ণর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল ওর কথায়। তাই 'বলেছি বেশ করেছি, এক ফোঁটা মেয়ে তোর এত সর্দারী কিসের রে?' বলে ঠাস করে একটা চড় তার গালে বসিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। খেয়াল করল না, তার বিচারসভা অসমাপ্ত কার্যভার নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই গমনঃ পথের দিকে।

কিন্তু বিচারসভা কি তার কার্যভার শেষ না করে নিশ্চিন্ত হয়? মুলতুবী সভা আবার বসে না নতুন উদ্যমে?

বিচার হয় সুবর্ণর।

সেই বিচারের সূত্রে সমুদ্রের আভাস কিছু মেলে বৈকি।

ঢেউ, তরঙ্গ, গর্জন।

লবণাক্ত স্বাদ?

তারই বা অভাব কি?

সেও তো মজুত আছে অগাধ অফুরন্ত। শুধু একবার বালুবেলায় আছড়ে পড়ার অপেক্ষা।

আচ্ছা কেদারনাথ আর সুশীলা?

তারা?

তারা তো আগেই চলে গিয়েছিল। কেদারনাথ 'চেষ্টা' দেখবার চেষ্টায় আজও এসেছিলেন। কথা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লো গত কালকের ইতিহাস। তারপরই উঠলো ঝড়। পরিস্থিতির আভাস দেখেই সুশীলা বলে-ছিল, 'আমি তোমার সঙ্গে পালাই চল। চোখের ওপর বৌটার খোয়ার দেখতে পারব না।'

খোয়ার থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলে বিপদ আরো বাড়ানোই হবে বৌটার

সে কথাও তো অবিদিত নেই। তবু রক্ষা হলো না।

দু-তিন ছেলের মা হবার পর মারটা ছেড়েছিল প্রবোধ, কিন্তু পরপুরুষের গা ঘেঁষে বসে আদর কাড়ানোর খবরে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। হিংস্র জানোয়ারের মত প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতে দিতে উচ্চারণ করলো, 'বল্ আর বুড়োর সঙ্গে কথা কইবি না! প্রতিজ্ঞা কর!'

সুবর্ণ আঁচড়ে-কামড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'করব না প্রতিজ্ঞা।'

'তাহলে তোর ওই পেয়ারের বুড়োকেই খুন করে ফেলবো দেখিস!'

'কোরো। সংসারে দুটো বিধবা সৃষ্টি হবে এই যা। খুন করে তো রেহাই পাবে না, ফাঁসি যেতে হবে।'

প্রবোধ এই দুঃসহ স্পর্ধার সামনে সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই স্বভাব প্রবোধের। হয়তো দুর্বলচরিত্র মাত্রেরই এমনি স্বভাব হয়। কেঁচোকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখলেও তারা হঠাৎ ভয় খায়, নিজেকে সম্বরণ করে নেয়।

সুবর্ণলতা যদি উমাশশীর মত হতো, কবেই হয়তো প্রবোধ তাকে অবহেলায় ঘরে ফেলে রেখে 'কাঁচা পয়সা'র সদ্ব্যবহার করবার পথ খুঁজতে যেত। কিন্তু সুবর্ণলতার এই দুঃসহ স্পর্ধাই একটা তীব্র আকর্ষণ!

তাই প্রবোধ একবার জ্ঞানশূন্য হয়ে মারে, পরক্ষণেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পায়ে ধরতে যায়।

সেদিনও প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েই সহসা সুর বদলায় প্রবোধ। সুবর্ণ-লতার নখের আঁচড়ে বিক্ষত হাতটায় ফুঁ দিতে দিতে বলে, 'উঃ, নখে দাঁতে বাঘের বিষ! ফাঁসিতে লটকাতে প্রধান সাক্ষী বোধ হয় তুমিই হবে?'

'একশোবার!'

প্রবোধের গলায় অভিমানের সুর বাজে, 'তা জানি। এ আপদ মরলেই যে তুমি বাঁচো তা আর আমার জানতে বাকি নেই। নিজের মাছ খাওয়াটাও যে ঘুচবে সেই সঙ্গে, সে খেয়াল আছে?'

সুবর্ণলতা বিধ্বস্ত খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে নিজের বালিশটা মাটিতে ফেলে শুয়ে পড়ে বলে, 'তোমাদের মতন খাওয়াটাই আমার কাছে চতুর্বর্গ নয়!'

'তার মানে বিধবা হতেই চাও?'

'চাই, তাই চাই। শুনলে তো? এখন কি করবে? আমার প্রার্থনা পূরণ করতে বিষ খাবে? না গলায় দাড়ি দেবে?'

এই বৌকে কোন্ উপায়ে জব্দ করবে প্রবোধ?

মেরে ফেলা ছাড়া করা যাবে আর কিছু?

অথচ আবার নিজে সে প্রকৃতির একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের প্যাঁচে নিতান্তই জব্দ!

এত কাণ্ডের পরও ওই মাটিতে পড়ে থাকা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যে ভরপুর দেহটা যেন তাকে লক্ষ বাহু দিয়ে আকর্ষণ করতে থাকে!

তিন ছেলের মা হয়েও তো স্বাস্থ্যে এতটুকু শিথিলতা এল না!

অতএব এবার খোশামোদের পথ ধরতে হয়।

তবে সেটা কিছু বিচিত্র।

লুব্ধ পুরুষের গভীর রাত্রির সেই বিচিত্র তোয়াজের ইতিহাস অনুদ্-

ঘাটিতই থাক।

সুবর্ণরই বা কী উপায় আছে এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার, মরে হাড় জুড়নো ছাড়া?

রাত্রে দরজা খুলে বেরিয়ে আসার ছেলেমানুষি আর করা চলে না এখন। চারিদিকে চল্লিশটা চোখ! ছোটগুলোর কথা মনে করলেই সেই তীব্র বাসনাও স্তিমিত হয়ে আসে।

অথচ মরবার উপকরণও তো দুর্লভ!

শাশুড়ীর একটা বাতের মালিশের ওষুধ চুরি করে লুকনো আছে বটে, কিন্তু খুব একটা আস্থা আসে না তার উপর।

আবার একবার কি লোক হাসাবে সুবর্ণ?

মরতে গিয়ে না মরে কেলেঙ্কারি করবে?

তার থেকে এই কথা বিশ্বাস করাই ভাল, সুবর্ণ আর কারো দিকে তাকালেই মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে প্রবোধের, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই এমন কাণ্ড করে বসে।

কারণ?

কারণ তো পড়েই আছে।

ভালবাসার আধিক্য! পায়ে মাথা খুঁড়ে সেই কথাই বোঝাতে চায় প্রবোধ।

মেয়েটা ঠাকুমার কাছে শোয়, কিন্তু ছেলে দুটোও তো ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, তাদের ঘুমের গভীরতায় বিশ্বাস নেই, শেষ পর্যন্ত ওই আধিক্যটা বোঝা ছাড়া উপায়ই বা কি?

॥ ৯ ॥

তীর্থ থেকে ফিরলেন মুক্তকেশী, সঙ্গে নিয়ে এলেন সেজমেয়ে সুরাজকে।

না, তীর্থপথে কুড়িয়ে পান নি তাকে. সম্প্রতি তার বর কটকে বদলি হয়েছে, তাই সেখানেই দু-একদিন থেকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বললেন, 'এত বড় খবরটা চেপে বসে আছিস সুরি? ধনি বটে! এই সময় কখনো একা থাকে?'

সুরাজের বরের বদলির কাজ, সুরাজ মেমসাহেবের মত স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। চাকর, ঠাকুর, আর্দালী, বেহারা সকলের সঙ্গে কথা বলে, বর এতটুকু এদিক-ওদিক করলে পলকে প্রলয় করে।

অবশ্যই সে প্রলয় মুক্তকেশীর মত নয়, প্রণয়েরই পরিচয় ঘোষণা মাত্র। ভঙ্গীটা অতএব সভ্য মার্জিত।

সুরাজকে দেখলে বোঝবার জো নেই একদা সে এ সংসারের মেয়ে ছিল!

সুরাজ সর্বদা টাইট জ্যাকেটবডি পরে থাকে। সুরাজ এক-গা গহনা পরাকে 'সেকেলে' বলে হাসে. সুরাজ মাথায় সোনার চিরুনি বসিয়ে খোঁপা বাঁধতে নারাজ, সুরাজ নাকি স্বামীর কর্মস্থলে জুতো পায়ে দেয়!

সুরাজ কদাচই আসে।

শেষ এসেছিল বিরাজের বিয়ের সময়, গোলমাল দেখে বরকে চিঠি লিখে মেয়াদের আগেই সরে পড়েছিল!

এবার যে এল সেটা ইচ্ছেয় নয়, নিতান্তই মায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে! বরও বলল, 'সত্যিই বটে, এতদিন পরে যখন আবার হচ্ছে, মা'র কাছে থাকলেই হয়তো ভাল। কলকাতা শহর—'

একটি ছেলে সুরাজের, দশ বছর পরে আবার এই ঘটনা।

মুক্তকেশীর কি শুধুই মাতৃস্নেহ?

তার উপর বাড়তি আরও কিছু ছিল না?

তাঁর এই ষোল আনা স্বাধীন মেমসাহেব মেয়েটিকে আত্মজনের সামনে দেখাবার বাসনাও ছিল না কি?

এর আগে যখন এসেছে, তখন এত সুখ-স্বাধীনতা ছিল না, শাশুড়ীমাগী ছিল বেঁচে, এখন সে বালাইও গেছে। মেয়েকে তাই 'বুকে করে' নিয়ে এলেন মুক্তকেশী। আর জনে জনে ধরে ধরে শোনাতে লাগলেন, 'এত বড় ঘটনা, আমি "মা", আমাকে জানায় নি!'

সুরাজ লজ্জা পেয়ে বলে, 'কী একেবারে ঘটনা! মা যেন কী! আর দেখছ না বুঝি এ ঘটনা?'

মুক্তকেশী বলে ওঠেন, 'দেখব না কেন? নিয়তই দেখছি। হাঁস-মুরগীর মত রাতদিন প্যাঁক প্যাঁক করে বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে, দেখছি না? তার সঙ্গে আর তোর তুলনা করিস না মা!'

সুরাজ লজ্জা পেয়ে চুপ করে।

কিন্তু সুরাজ এ সংসারে হাঁপিয়ে ওঠে। একদা যে এইখানেই থেকেছে সে, সে কথা যেন তার নিজেরও বিশ্বাস হয় না।

সুরাজের দাদারা কী স্থূল, কী অমার্জিত, কী সেকেলে! সুরাজের বৌদিরা যেন ঝি-চাকরানীর পর্যায়ের! সুরাজের ভাইপো-ভাইঝিগুলো যেন গোয়ালের গরু-ছাগল!

আশ্চর্য!

ভালভাবে থাকতে ইচ্ছে হয় না এদের?

সেই কথাই জিজ্ঞেস করে সে।

বলে, 'সংসারে খরচ তো কম হতে দেখি না, অথচ সৌষ্ঠবের বালাই নেই কেন বল তো তোমাদের?'

খরচটা অবশ্য বড়লোক সুরাজের খাতিরে একটু অতিরিক্তই করা হচ্ছিল। বিরাজ এক ধরনের বড়লোক, এ আর এক ধরনের। বিরাজের কাছে চক্ষুলজ্জা নেই, এর কাছে সেটা আছে।

তবু লজ্জা কি বাঁচানো যাচ্ছে?

লজ্জা যে চতুর্দিকে ছড়ানো!

সুরাজ বলে, 'স্বামী ধমক দেবে আর তাই সইতে হবে? কেন দাঁড় কি নেই জগতে?'

সুরাজ বলে, 'পড়ে মার খাও বলেই এত অত্যাচার তোমাদের ওপর। নিজের মানটি নিজে রাখতে হবে বাবা! সেজদাই বা হঠাৎ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হল কেন তাও বুঝি না! আর মেজদার ওই সন্দেহবাতিক সহ্য কর কি করে মেজ বৌদি ভেবে পাই না। ধোবার সামনে বেরিয়েছিলে বলে তোমার

যাচ্ছেতাই করলো মেজদা। আমি তো দেখে "হাঁ"। আমি হলে কি করতাম জানো? ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে গল্প করতাম।'

সুবর্ণ এ ধরনের কথায় চুপ করেই থাকে। সুবর্ণ এই সহানুভূতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা অপমানের জ্বালা অনুভব করে। তা গিরিবালাও 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা' প্রসঙ্গে জ্বালা অনুভব করছিল। তাই বলে ওঠে, 'হুঁ, তা তো করতে! তার পর ঠেঙানিটা খেলে?'

সুরাজ ভুরু কুঁচকে বলে, 'ঠেঙানি!'

'তবে না তো কি! হুঁ, মেজ বড়ঠাকুরের তো সে গুণে ঘাট নেই! নিজে পড়েছ শিবতুল্য মানুষের হাতে—'

সুরাজ সুবর্ণর মুখের দিকে তাকায়।

সুরাজ ভয় পায়।

তাই তাড়াতাড়ি বলে, 'আসল কথা কি জানো সেজবৌ, মাতৃনিন্দা মহাপাপ হলেও না বলে পারছি না, মা'র পৃষ্ঠবলেই এতটা হতে পেরেছে। "মা"-টি তো আমার সোজা নয়! পুরুষ একলা পড়লেই পরিবারের কাছে জব্দ। মা দাদা বোন ভাজ চারিদিকের পৃষ্ঠবলে এত বাড় বাড়ে তাদের। তোমাদের নন্দাইটি যে একলা পড়েছে কিনা তাই শিবতুল্য।'

তখনকার মত রক্ষা হয়।

কিন্তু মুক্তকেশীই আবার আগুন জ্বালেন।

হেমাঙ্গিনী এসেছেন সুরাজকে দেখতে, মুক্তকেশী হেসে হেসে গলা খুলে মেয়ের বাসার সুখ-সমৃদ্ধির গল্প করেন, গল্প করেন বশংবদ জামাইয়ের আনুগত্যের কাহিনী।

'সে কী বাড়ি! একেবারে সাহেব বাড়ি বুঝলি হেমা? কোচ কেদারা, টেবিল আর্শি কত কেতা! সুরিও আমার বেড়ায় যেন মেম! পায়ে জুতো-মোজা, বিলিতি ঢং করে কাপড় পরা। আর জামাইয়ের আমার...হি হি হি কী বলবো—অবস্থা যা! অত বড় একটা হোমরাচোমরা চাকুরে, সুরির কাছে যেন চোরটি! সুরির কথায় উঠছে বসছে, সুরি চোখ রাঙালে চোখে অন্ধকার দেখছে। দূরে থেকে শুনি, চোখে তো দেখা হয় নি, দেখে বলবো কি চোখ যেন জুড়োলো!'

হঠাৎ এই জমাটি সভায় ছন্দপতন ঘটে।

হঠাৎ সুবর্ণলতা কোন্ দিক থেকে যেন এসে প্রশ্ন করে, 'এসব দেখলে আপনার চোখ জুড়োয় মা?'

মুক্তকেশী প্রথমটায় থতমত খান। তার পর কপাল কুঁচকে বলেন, 'কোন্ সব?'

'এই যে—পুরুষমানুষ স্ত্রীর কথায় উঠছে বসছে, স্ত্রী চোখ রাঙালে চোখে অন্ধকার দেখছে! তাছাড়া কোচ কেদারা টেবিল আর্শি—'

মুক্তকেশী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'কেন, শুনে বুঝি তোমার গা-জ্বালা করে উঠল মেজবৌমা? তা করবেই তো, হিংসের রীষে ভরা যে! বলি তোমরাই বা সোয়ামীকে কী ভ্যাড়াকান্ত করতে বাকী রেখেছ? সাধ যায় তো পরো জুতো-মোজা, খানা খাওগে টেবিলে বসে! ধন্যি বটে! আহ্লাদ করে দুটো গপ্পো করতে এলাম, গায়ে যেন ছুঁচ ফুটলো মানুষের!'

'ছুঁচ কেন ফুটবে মা!' সুবর্ণ উঠে পড়ে বলে, 'আহ্লাদের কথায় আহ্লাদই

হয়। মনে হয় তবু বাংলা দেশের একটা মেয়েমানুষও মানুষের মত বাঁচছে। তবে আপনাদের চোখে এসব মেমসাহেবী ভাল ঠেকে, এটা দেখেই আশ্চর্যি হচ্ছি!'

মুক্তকেশী আর উচিত উত্তর খুঁজে পান না। সুবর্ণ চলে গেলে বলে ওঠেন, 'দেখলি তো হেমা, এই আগুনের খাপরা নিয়ে ঘর করছি আমি।'

সর্বদা এই কথাই বলেন মুক্তকেশী।

সবাই তাই বলে।

আগুনের খাপ্‌রা!

কিন্তু সেই আগুন কানে জ্বালাতে পারলো সুবর্ণ? কী বা জ্বালালো? শুধু তো নিজেই জ্বলে জ্বলে ভস্ম হলো!

সুরাজের বরের চিঠি এল।

রঙিন খাম, আতরের গন্ধ, খামের কোণে বেগুনীরঙা একটি ছোট গোলাপ ফুল!

কত বছর বিয়ে হয়েছে সুরাজের?

সুবর্ণর থেকে বড় না সুরাজ?

সুরাজের নামের মানে নিয়ে যখন কৌতুকের হাসি হেসেছিল সুবর্ণ, তখন তো সুরাজের বিয়ে হয়ে গেছে।

সুরাজ লজ্জায় আনন্দে গৌরবে হেসে ফাটে। বলে, 'বুড়ো বয়সে ঢং দেখেছ? আসল কথা বিয়ে হয়ে ইস্তক তো ইস্তিরী গলায় ঝুলছে, এদিকে সখের প্রাণ গড়ের মাঠ! তাই নতুন বরের মত—'

চিঠিখানা নিয়ে সরে পড়ে সুরাজ আতর আর আদরের সৌরভ ছড়িয়ে!

গিরিবালা বলে, 'পয়সা থাকলেই আদিখ্যেতা শোভা পায়।'

বিন্দু বলে, 'শোভা পায় আর বোলো না সেজদি, হাসি পায় তাই বল!'

উমাশশী বলে, 'সেজ ঠাকুরজামাই তোমাদের ভাসুরের চাইতে মাত্তর দু বছরের ছোট!'

হয়তো ওইতেই অনেক কিছু বলা হয়।

শুধু সুবর্ণ কিছু বলে না।

সুবর্ণকে কে যেন আচম্‌কা এক ঘা চাবুক মেরে গেছে।

সত্যিই কি তবে হিংসুটে হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ?

সৌভাগ্যের অনেক লীলা দেখিয়ে বিদায় নিল সুরাজ। শেষের দুদিন যে আবার বরও এসেছিল নিয়ে যেতে।

বড়লোক বোনাইকে তোয়াজ করতে অনেক ব্যয় করে ফেললে মুক্তকেশীর ছেলেরা। কারণ সুরাজের বর ভবেন সাহেবের আগমন উপলক্ষে আরও তিন মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করে আনলেন মুক্তকেশী। সুবালা তো পড়ে থাকে চাঁপতায়, সাতজন্মে আনবার কথা মুখেও আনেন না, কারণ তার একপাল 'এণ্ডি গেণ্ডি'। আবার আনলেন।

মুক্তকেশী সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন, 'লক্ষ্মীর ঘরে ষষ্ঠীর কৃপা কম, এ হচ্ছে ডাকের বচন। দেখ তার সাক্ষী সুরাজকে। বললাম এ দুটো মাস থাক্‌ আমার কাছে, একেবারে 'খালাস' হয়ে তবে যাস! জামাইও রাজী হয়েছিলেন, বরসোহাগী মেয়েই আমার থাকতে পারলেন না—বর ছেড়ে!'

সুরাজ চুপিচুপি সুবর্ণকে বলে, 'মোটেই তা নয় বাবা, মায়ের এই দাপটের বহরে থাকবার বাসনা মিটে গেছে আমার। অন্যকে নিচু করে আমায় বড় করা, এ বাপু অসহ্য!'

তা সেই অসহ্যটুকু শেষ পর্যন্তই করতে হল সুরাজকে। ভবেনকে নিয়ে আদিখ্যেতার বাড়াবাড়ি করলেন মুক্তকেশী। যাত্রাকালে শুধু মেয়েকেই ভাল ফরাসডাঙার শাড়ি দিলেন তা নয়, জামাইকে কাঁচির ধুতি-চাদর দিলেন।

দিলেন সুবালা আর সুবালার বরকেও, দিলেন মিলের ধুতি-শাড়ি।

তবু খরচপত্র হয়ে গেল বিস্তর।

হাওড়া ইস্টিশান যেতে ফিটন ভাড়াটা পর্যন্ত জোর করে দিয়ে দিলেন সুরাজকে, মিষ্টির হাঁড়ি দিলেন সঙ্গে।

আর শেষ অবধি হয়তো হাঁফ ছেড়েই বাঁচলেন।

সুবালার ইচ্ছে ছিল কটা দিন থাকে।

কিন্তু পাজি-পুঁথি না দেখে অদিনে এসেছে এই ছুতোয় তাকে ভাগালেন মুক্তকেশী।

তার পর—

হ্যাঁ, তার পরদিনই সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের ডেকে সংকল্পটা ঘোষণা করলেন মুক্তকেশী।

বললেন, 'আমার তীর্থখরচ তো ডবল লাগল—শশধরের মা'র কাছে একশোখানি টাকা হাওলাৎ নিয়ে তবে পাণ্ডার কাছে মুখরক্ষে। সে কর্জ শোধ করতে হবে। তারপর তোমাদের এই বোন-ভগ্নীপোত আনাআনি। খরচের খরচান্ত! বৌ-ছেলেদের মাস দুচ্চারের মতন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে দিকি। দেনাপত্তর শোধ করে, একটু গুছিয়ে নিয়ে তা'পর আনিস!'

শুনে ভাইয়েরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল।

সুবোধের তো শ্বশুরবাড়ি বলতে অষ্টরম্ভা। শাশুড়ীই কখনো ভাইয়ের বাড়ি. কখনো দ্যাওরের বাড়ি, কখনো বোনঝির বাড়ি!

আর প্রবোধ?

তার যে একটা শ্বশুরবাড়ি আছে. সে কথা কে কবে মনে রেখেছে?

প্রভাসের অবশ্য ভাল শ্বশুরবাড়িই আছে. প্রকাশেরও আছে একটা যেমন তেমন। কিন্তু প্রস্তাবটা কারো কাছেই প্রীতিকর ঠেকে না। তবু মায়ের কথার প্রতিবাদ চলে এ তারা ভাবতেই পারে না।

স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে কথা!

ন্যায় বলুন, অন্যায় বলুন, মাথা পেতে নিতে হবে আদেশ।

কে জানে বৌয়েরা এ প্রস্তাব কোন্ আলোয় নেবে! ইদানীং তো বৌগুলো যখন-তখনই বলতে শুরু করেছে. 'এতই যদি মাতৃভক্তি. মায়ের আঁচলতলায় খোকা হয়ে থাকলেই পারতে! বিয়ে করে সংসার পাতবার সাধ হয়েছিল কেন?'

যখন-তখনই বলে।

ধমকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

এ এক বিড়ম্বনা।

মাতৃভক্তি আর বিয়ে. এই দুটোর মধ্যে যে কখনো বিরোধ ঘটতে পারে. এটা কে কবে ভেবেছিল?

সে যাক, নেপথ্যের চিন্তা পরে. আপাতত সামনে মা। ছেলেরা তাই নিতান্ত

বাধ্য ভাবে বলে, 'তুমি যা ভাল বুঝবে।'

'আমি তো ভাল বুঝেই বলছি। তবে তোমরা এখন সব বিজ্ঞ হয়েছ—'

হঠাৎ প্রবোধচন্দ্র ইতস্ততঃ করে বলে ওঠে, 'আমার আর শ্বশুরবাড়ি!'

মুক্তকেশী বলেন, 'তা জানি। থেকেও নেই। অথচ শ্বশুর মিনসে নাকি এখনও চাকরি করছে, দুই শালা মান্যিমান হয়েছে। ছোটটা তো আবার বিয়েও করে নি, বিদেশে থাকে, টাকা পাঠায়। সেই যে বলে না, "আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখু চিরকাল" এ হয়েছে তাই।'

প্রবোধ এসব তথ্যে অবাক হয়।

শ্বশুরবাড়ি নামক একটা জায়গা যে তার আছে, এ প্রমাণ পাবার সুযোগ পায় নি সে। শাশুড়ীর কলঙ্ক-কথা সহজ ধারার মুখে পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে সেই একবার শ্বশুর নিতে এসেছিল, মুক্তকেশী যাচ্ছেতাই করে বিদায় করেছিলেন। তার পর আরও কি উপলক্ষে যেন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। পাঠানো হয় নি। আগে আসতো এক-আধ দিন, আর আসে না।

তদবধি সব সম্পর্ক শেষ।

জীবনে কোনোদিন উচ্চারণ করে নি সুবর্ণ—'বাবার জন্যে মন কেমন করছে' অথবা 'একবার তাদের না দেখে থাকতে পারছি না।'

এখন হঠাৎ মুক্তকেশীর মুখে তাদের তত্ত্ব-বার্তা!

প্রবোধ বোধ করি ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলে, 'কে বললো তোমায়?'

মুক্তকেশী গম্ভীরভাবে বলেন, 'তোদের মাকে কারুর কিছু বলে যেতে হয় না, হাওয়ায় খবর পায়। মেজ বৌমার সেই পিসি বুড়ীর একটা সতীন-ঝি যে আমাদের হেমার ছেলের শালীর শাশুড়ী। সেই সূত্রেই খবর!'

পিসি, সতীন-ঝি, শালী, শাশুড়ী! এই সম্পর্কের জটিলতার জাল-মুক্ত হবার চেষ্টা করে না প্রবোধ। শুধু সাহসে ভর করে বলে ফেলে, 'তা ওরা তো সাতজন্মে নিয়ে যাবার কথা বলে না—'

'বলবে কে? মা আছে? তোমার গরুড়ধ্বজা শাশুড়ীর গুণে উভয় কুল মজলো! যাক গে, নিয়ে যাবার কথা বলার অভ্যেস ওদের নেই, তাই বলে না। তুই যাবি, বৌকে রেখে আসবি!'

এবার প্রবোধের হয়ে সুবোধ হাল ধরে, 'কিন্তু মা, ওরা যখন বলে নি, তখন—'

কথা শেষ করতে দেন না মুক্তকেশী। বলে ওঠেন, 'তা ওরা কেমন করে জানবে যে তোমাদের দেনা-কর্জ হয়ে গেছে, বেপোটে পড়েছ? তোমাদের শালা-শ্বশুররা খড়ি পাততে পারে, এ খবর পেয়েছ কোনোদিন?'

'তা নয়, মানে—', প্রবোধ প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেলে, 'সাতজন্মে বলে না, হঠাৎ এরকম উপযাচক হয়ে—'

মুক্তকেশী ছেলের বক্তব্যকে সম্পূর্ণতার রূপ দিতে দিলেন না, বলে উঠলেন, উপযাচক হয়ে পাঠিয়ে দিলে তাড়িয়ে দেবে, এ ভয় যদি থাকে তোমার তা হলে অবিশ্যি পাঠাবার কথা ওঠে না। তবে চিরকাল জানি বিয়েওলা মেয়ে আরাধনার সামগ্রী, বাপের বাড়ি গেলে বাপ-ভাই মাথায় করে রাখে।'

'তবে তাই হবে—'

বলে ছেলেরা তখনকার মত রণে ভঙ্গ দেয়। কারণ অনুভব তো করছে, নেপথ্যে জোড়া তিনেক কান উৎকর্ণ হয়ে আছে। তাদের মুখ বন্ধ করে রাখবার

কার্যকরী পদ্ধতিটা যেন আজকাল আর তেমন কাজে লাগছে না।

এই বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের আমদানিকারিণী যে সুবর্ণলতা, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। সেজ ছোট ভাই তাই প্রতিনিয়ত সুবর্ণলতাকে শাপশাপান্ত করছে মনে মনে।

কিন্তু তাতে তো শুধু গায়ের ঝাল মেটানো। সংক্রামক ব্যাধি আপন কাজ করেই যাবে।

কর্তারা অদৃশ্য হতেই নেপথ্যচারিণীরা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন।

বৌরা যে কাছে-পিঠে কোথাও আছে, এটা মুক্তকেশী আন্দাজ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভালই, জানা হয়ে থাক। সামনে এসে তো আর প্রতিবাদ করতে পারবে না!

আর প্রতিবাদই বা করবে কি!

বাপের বাড়ি যাবার সুযোগ পেলে তো বর্তেই যাবে। অবশ্য বড়বৌকে তিনি সবাইয়ের সঙ্গে ধরে সমদৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখালেও, মনে মনে তাকে ধর্তব্য করেন নি। তাকে পাঠাবেন না। কার্যকালে কোনো ছুতো করবেন।

একযোগে সবাই চলে গেলে চলবে কেন?

মুক্তকেশী কি 'গুরুগঙ্গা' ছেড়ে এখন ছেলেদের অফিসের ভাত রাঁধতে বসবেন? বড়বৌ গেলে অচল। যেদিকে জল পড়ে সেদিকে ছাতি ধরে সে। অথচ আত্মভোলা উদোমাদা। বাড়ির পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত ভয় করে চলে। ও থাকবে।

মেজ সেজ ছোটকেই পাঠাতে হবে।

আহ্লাদে নাচবে। সেজ ছোট নাচবেই। তবে—

ওই মেজটার ব্যাপার সন্দেহজনক।

ওর মতিবুদ্ধি কোনোদিনই স্বাভাবিক খাতে বয় না। হয়তো বা দুম করে বলে বসবে—'আমি যাব না'।

বৌদের এদিকে আসতে দেখেই মুক্তকেশী গম্ভীর চালে সলতে পাকাতে বসলেন। সলতে তো সংসারে কম লাগে না! ঘরে ঘরে হিসেব করলে, কোন্ না দশ-বারোটা পিদ্দিম জ্বলে! কেরোসিনের চলন অন্য কোথাও যদি হয়েও থাকে, মুক্তকেশীর অন্দরে তার প্রবেশ নিষেধ। নতুন আলোর পক্ষপাতী নন মুক্তকেশী।

গিরিবালা এসেই সুয়োর গলায় বলে, 'ওসব রাখুন না মা। আপনি কেন কষ্ট করছেন? সলতে পাকাতে কেউ না সময় পায়, আমি পাকিয়ে রাখবো।'

মুক্তকেশী একটু উদাস হাসি হেসে বলেন, 'তোমরা কাচিকাচার মা, বললে "করবো", হয়তো সময় পেলে না! অসময়ে অসুবিধেয় পড়া তো।'

ফস করে গিরিবালার হয়ে কথার উত্তর দেয় সুবর্ণলতা, 'কেন, আমরা কি কিছু করি না?'

মুক্তকেশী বহুবার ওর দুঃসাহস দেখেছেন, তবুও কেন যে চমকান? চমকে উঠেই পরক্ষণে ঠোঁটের আগায় একচিলতে ধানিলঙ্কার ঝালমাখানো হাসি এনে বলেন, 'করো না কে বলছে গো! তোমরাই তো সংসার মাথায় করে রেখেছ। তবে আমিই বা বসে থাকি কেন? দুটো সলতে পাকিয়েও যদি উপকার না করবো তো ছেলেদের ভাতগুলো খাবো কোন্ লজ্জায়?'

সুবর্ণলতা এতখানি রাগ প্রকাশের পরও বলে, 'এ আপনার রাগের কথা।

সে যাক, আমাদের বাপের বাড়ি পাঠাবার কি যেন কথা হচ্ছিল!'

মুক্তকেশীর হাতের পীড়নে ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরোগুলো কাঠির মত কঠিন হয়ে উঠেছে, আরো কঠিন হয়ে উঠছে তাঁর চোয়ালের মাংসপেশী। সেই মুখের উপযুক্ত নীরস স্বরেই বলেন তিনি, 'যাদের কাছে বলবার বলা হয়ে গেছে বাছা, এক কথা "পাঁচবার" বলার সামর্থ্য আমার নেই।'

এতো কঠিন হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবুও প্রয়োজন আছে। ওটাই তো আশ্রয়। ওটাই পা রাখবার জায়গা। নইলে কি আর সংসার-পর্বতের চূড়োর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়? ভয় দেখিয়েই সবাইকে পদানত করে রাখা। ভয় ভাঙা হলে চূড়ো থেকে গড়িয়ে পড়ে যেতে হবে কি না কে জানে!

ভক্তির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান না মুক্তকেশী, ভালবাসার তো নয়ই। তাঁর মতে এই-ই ভাল। শনি দেবতার পুজোয় উপচারের ত্রুটি করবার সাহস কারো হবে না।

কঠিন মুখে সলতেই পাকাতে থাকেন মুক্তকেশী। জলজ্যান্ত মানুষগুলো যে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে যেন চেতনাই নেই।

জানেন এ মুখের সামনে সুবর্ণলতারও কথা বলবার সাহস হবে না। সাহস হবে না অবশ্য বকুনির ভয়ে নয়, মানহানির ভয়ে। কথা বললে যদি সে কথার উত্তর না দেন মুক্তকেশী?

সে অপমান যে সুবর্ণলতার মরণতুল্য, সে কথা জানেন মুক্তকেশী। সে মরণ দিতে চানও মাঝে মাঝে। কিন্তু তাঁর নিজের বাক্‌যন্ত্রই বিশ্বাসঘাতকতা করে। কথা না বলে থাকতে পারেন না তিনি।

বিন্দু আর গিরিবালা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল বাপের বাড়ি যাবার প্রস্তাবটা পাকা করার জন্যে। কে বলতে পারে আবার মেজাজ ঘুরে যায় কিনা গিন্নীর!

নিজেই তো মুক্তকেশী সব সময় বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করেন।

এবারই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। এবারই মুক্তকেশী সুর বদলেছেন।

এমন সুযোগ আবার না ফসকে যায়!

ওরা তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল কথা পাকা করতে। কিন্তু আপাতত সুবিধে হল না। চলে গেল আস্তে আস্তে।

চলে গেল সুবর্ণলতাও।

কিন্তু সে কি আস্তে আস্তে?

সে কি আশায় আশায়?

কিন্তু উল্টোপাল্টা সুবর্ণলতা সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন মুক্তকেশী, তাই-ই হল। সুবর্ণ ঠিকরে এসে বলল, 'আমি যাব না।'

প্রবোধও অবশ্য এ আশঙ্কা করেছিল, এবং মনে মনে কণ্টকিতও হচ্ছিল, তবু মুখে অবহেলা দেখিয়ে বললো, 'কেন? যাবে না কেন?'

'যাবো কেন, সেটাই শুনতে চাই!'

প্রবোধ কড়া হবার চেষ্টা করে বলে, 'ঘটা করে শোনবার কী আছে? একদা

একটা কিছু ঘটেছে বলে চিরদিনের জন্যে কুটুম্বর সঙ্গে বিরোধ রাখাই বুঝি মহত্ত্ব?'

'মহত্ত্ব করতে তো চাইছে না কেউ!'

প্রবোধ তীব্রস্বরে বলে, 'মা চাইছেন। মা মহত্ত্বের বশে সেটা মিটোতে চাইছেন।'

'আমি চাই না।'

'তোমার বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগা চাইছ না তুমি?'

'না।'

'নমস্কার! ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার তোমার!'

সুবর্ণ অন্যদিকে চেয়ে বলে, 'সে তো করছোই। রাতদিনই করছো। নতুন নয়।'

প্রবোধ গলাটা নরম করে কার্যোদ্ধার করবার চেষ্টা করে। মা'র কানে এই কথা কাটাকাটির আভাস গেলে তো আর রক্ষা নেই।

অবশ্য মায়ের এই আকস্মিক খেয়ালটার কারণ সে বুঝতে পারছে না, এবং এ খেয়ালে বিপন্ন হচ্ছে। ধারণা করতে পারছে না—এ হচ্ছে নির্বুদ্ধির ঢেঁকি নামধারিণী হেমাঙ্গিনীর।

হ্যাঁ, হেমাঙ্গিনীই বলেছে, 'ওই দজ্জাল পরিবারকে তো তোর পেবো মাথায় করে নাচে, বলি সদা-সর্বদা অত দাপট সয়ে থাকিস কী করে? বৌ তো একদোরী!'

মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'কী করবো বল? অসহ্য হলে বেটার বৌকে লোকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আমার তো ওর বেলায় সে সুখ হবার জো নেই! সদা-সর্বদাই তাই বুকের ওপর আগুনের মালসা নিয়ে বসে আছি।'

হেমাঙ্গিনীই তখন এই পরামর্শ দিয়েছিলো, 'বিরোধ মিটিয়ে ফেল্! জিদ্ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবি? আর সত্যি তো তোর বেয়ানমাগী কুচরিত্তির নয়! কাশীতে আছে, শুনি নাকি ডাঁটের ওপর আছে। বাপের পয়সা খায় না, খোট্টাদের ছেলেমেয়েকে বাংলা, ইংরিজি পড়িয়ে মাইনে নেয়, সেই পয়সায় চালায়। তুই বাপু তোর মেজবৌয়ের বাপের বাড়িটাকে এবার জাতে তোল্। তুইও দুদিন হাঁফ ফেলে বাঁচ, মহারাণীও দুদিন বাপ-ভাইয়ের ওপর দাপট করে আসুক!'

অতএব এই জাতে তোলার প্রয়াস!

কিন্তু সে প্রয়াসে যার বর্তে যাবার কথা, সে-ই বাদী হচ্ছে! বলছে, 'আমি চাই না।' তার মানে মেয়েমানুষ নয়, পাষাণী!

প্রবোধকে অতএব অবাক হয়ে বলতে হয়, 'আশ্চর্য!'

সুবর্ণ তীক্ষ্ম গলায় বলে, 'ওঃ, এইটুকুতেই আশ্চর্য হচ্ছো তুমি? তা হতে পার, তোমাদের অসাধ্য কাজ নেই। তবে ভাবছি—এত বছর বিয়ে হয়েছে, বাপ-ভাইয়ের চেহারা কেমন তা ভুলে গেছি, এখন উপযাচক হয়ে বৌ পৌঁছে দিয়ে আসতে মাথা কাটা যাবে না তোমাদের?'

মাথা যে একেবারেই কাটা যাচ্ছিল না তা নয়। তবু আর একজন যে প্রত্যক্ষ হাতে মাথা কাটবার জন্যে খাঁড়া শানিয়ে বসে! সে ভয়ের তুল্য ভয় আছে?

তাই প্রবোধকে উদার সাজতে হয়। বলতে হয়, 'মায়ের মতিবুদ্ধিতে এতদিন তো কষ্ট পেলে, এখন বাপ বুড়ো হয়েছেন, কবে আছেন কবে নেই, যাওয়া-

আসাটা বজায় করাই তো ভাল।'

'তোমাদের ভালর সঙ্গে আমার ভাল মেলে না—', সুবর্ণ উদ্ধতভাবে বলে, 'মোট কথা আমি যাব না।'

প্রবোধ হাসির চেষ্টা করে বলে, 'যাবো না বললে আর চলছে কোথা? হাইকোর্টের হুকুম যে বেরিয়ে গেছে!'

সুবর্ণলতা এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলে, 'আমি যদি সে হুকুম না মানি?'

'যদি না মানি! মা'র হুকুম তুমি মানবে না!'

'ন্যায্য হুকুম বলে অবশ্যই মানবো, অন্যায্য হুকুম হলে নয়।'

প্রবোধ রূঢ় গলায় বলে, 'মা'র ন্যায্য-অন্যায্যর বিচার করবে তুমি?'

'করবো না কেন? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, ভগবান যখন চোখ কান, মন বুদ্ধি দিয়েছে--'

এ কথায় প্রবোধ রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়। বলে, 'মানুষ হয়ে জন্মেছ, তাই প্রতি পদে গুরুজনের ব্যাখ্যানা করবে, কেমন? "পায়ে মাথায় এক" হয় না, বুঝলে?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করবার বাসনা আমার নেই। তবে তোমার মাকে বলে দাও গে, এতকাল পরে হঠাৎ বাপের বাড়ি আমি যাব না।'

প্রবোধ আরো ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল গে, আমি বলতে পারবো না। আশ্চর্য, এমন বেহায়া মেয়েমানুষ কখনো দেখি নি! কত ভাগ্যে যদি মা'র মত হল—'

'দোহাই তোমার, ভাগ্যের কথাটা থামাও। বেশ, অত ভাগ্যের ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই, তাই ধরে নাও! মনে পড়ে পিসি একবার চিঠি লিখেছিল, বাবার শক্ত অসুখ, সে চিঠি তোমরা ছিঁড়ে ফেলেছিলে? মনে পড়ে ছোড়দা একবার দাদার মেয়ের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, তোমরা তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাও নি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে?'

প্রবোধ সদর্পে বলে, 'তা রাগের ক্ষেত্রে মানুষ অমন করেই থাকে!'

'রাগের ক্ষেত্রটা হঠাৎ শ্রীক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে কি জন্যে সেটাই জানতে চাইছি।'

প্রবোধ হঠাৎ একটা অসতর্ক উক্তি করে বসে। বলে ফেলে, 'আমি বলি নি বাবা, আমার ইচ্ছেও ছিল না। মা'র হুকুম, কী করবো!'

সুবর্ণলতা একবার স্বামীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। আমিই হুকুম রদ করিয়ে আনছি।'

'খবরদার মেজবৌ—', প্রবোধ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'ইচ্ছে করে আগুন খেতে যেও না। জেনে-শুনে সাপের গর্তে হাত দিও না।'

'সাপের বিষেই তো জরজর হয়ে আছি, এর থেকে আর বেশি কি হবে!' বলে সুবর্ণলতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিরুপায় প্রবোধচন্দ্র ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। সাহস হয় না দালানে বার হতে। কি জানি কী সর্বনাশ ঘটাতে গেল সুবর্ণলতা!

হ্যাঁ, তখনো এ ভয় ছিল।

তখনো বহুবিধ সর্বনাশ ঘটিয়ে ঘটিয়ে ঘাটা পড়ায় নি সুবর্ণ। তাই তখনও প্রবোধ ভাবতে পারতো, 'মেয়েমানুষ হয়ে কী ভয়ানক বুকের পাটা মেজবৌয়ের!'

মুক্তকেশীও যে মেয়েমানুষই, এ তথ্যটা আবিষ্কার করে ফেলার মতো দুঃসাহস ওদের নেই।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!

জন্মভূমির বার্তা প্রবোধচন্দ্রদের সংস্কৃতিতে কখনো প্রবেশ করে নি, ওরা শুধু একজনকেই জানে। জানে তাঁর ইচ্ছে আইন, তাঁর আদেশই অলঙ্ঘ্য। হবে না!

লঙ্ঘন করার চিন্তার ধারে-কাছে কারো ছায়া দেখলেই যে মুক্তকেশী বসে বসেন, 'থাকবো না, চলে যাবো! "বার্ধক্যে বারাণসী" এ কথা ভুলে বসে আছি বলেই এত হেনস্থা আমার!'

ওদিকে স্ত্রীও ছেড়ে কথা কয় না।

উঃ, পুরুষমানুষ হয়ে জন্মানোর কত জ্বালা!

কতক্ষণ পরে যেন চমক ভাঙলো ভাইঝি মল্লিকার ডাকে।

মল্লিকা উচ্চ চিৎকারে হাঁক দিয়েছে, 'মেজকাকা, জল্দি! ঠাকুমা ডাকে—'

'আমাকে? আমাকে কেন?'

মল্লিকা খরখর করে বলে, 'তা জানি না! মেজকাকী গিয়ে ঠাকুমাকে সাত-কথা শুনিয়ে দিয়েছে, তাই বোধ হয়!'

প্রবোধ কাতর গলায় বলে, 'মল্লিকা, লক্ষ্মী মা আমার, বল গে মেজকাকা বাড়ি নেই।'

'বাঃ, বললেই অমনি হলো? এইমাত্তর আরু তোমায় দেখে গেল না?'

'তবে যা, বল গে এইমাত্তর—ইয়ে কলঘরে ঢুকেছে।'

'আমি বাবা মিথ্যে-টিথ্যে বলতে পারবো না, ইচ্ছে হয় যাবে, না ইচ্ছে হয় না যাবে!' বলে ধর্মপুত্রের মহিলাসংস্করণ মল্লিকা ধর্মের মহিমা বিকীর্ণ করে চলে যায়। মনে হয় একটা গিন্নী!

অগত্যাই যেতে হয় প্রবোধকে বলির পাঁঠার গতিভঙ্গী নিয়ে।

মুক্তকেশী ছেলেকে দেখে জলদগম্ভীরে বলেন, 'বাবা প্রবোধ! মুখ্যু মেয়েমানুষ, একটা অসঙ্গত কথা না হয় বলেই ফেলেছি, ঘাট মানছি তার জন্যে। কিন্তু অপরাধের শাস্তি দিতে নিজে তুমি ধরে সাত ঘা জুতো মারলে না কেন আমায়? বৌকে দিয়ে এই অপমানটা করানোর চাইতে সে অনেক ভাল ছিল!'

'মা!' প্রবোধচন্দ্র প্রায় আছড়ে মায়ের পায়ের কাছে পড়ে বলে, 'মা, তোমাকে অপমান করার সাহস যার হয়েছে জুতো তারই খাওয়া উচিত! কোথায় সে! এখনি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।'

মুক্তকেশী অবশ্যই একটু প্রীত হন।

নচেৎ 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' ধরতেন না।

বলেন, 'থাম্ পেবো! বীরত্বের বড়াই আর করিস নে। এদিকে তো বৌয়ের ভয়ে কেঁচো হয়ে গুটিয়ে যাস! পুরুষের হিম্মত যদি থাকতো তোর, তোর বৌ এমন দুঃশাসন হয়ে উঠত না!'

প্রবোধচন্দ্র জননীর এই ধিক্কারবাক্যে সহসা দুঃশাসন-শাসক ভীমমূর্তি ধারণ করে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'মল্লিকা, ডেকে আন্ তোর মেজকাকীকে! সোজায় না আসে চুল ধরে নিয়ে আয়!'

মুক্তকেশীর কুলিশকঠোর ওষ্ঠাধরের ফাঁকে বোধ হয় ক্ষীণ একটু হাসির আভাস দেখা যায়। কিন্তু সেটুকু দমন করে ফেলে বলেন, 'থাক্ বাছা,

কেলেঙ্কারিতে আর কাজ নেই। যে যেমন আছে থাক্। আমাকে তোমরা আজই কাশী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। বেটার বোয়ের লাথি খেয়ে সংসার কামড়ে পড়ে থাকবার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

কিন্তু মুক্তকেশীর কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের মধ্যে কি কেউ বোমা দাগলো? না হলে সবাই অমন চমকে উঠল কেন?

বোমা না হলেও বোমার মতই শক্তিশালী! মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ একটি প্রতিবাদ!

'অপমান আমি কাউকে করি নি। কথার জোরে "নয়কে হয়" করলে কী করবো!'

বললো।

বললো এই কথা সুবর্ণলতা।

বরের সামনে, বড় বড় দ্যাওরদের সামনে, স্পষ্ট গলায় শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করলো।

বজ্রাহত ভাবটা কাটলে মুক্তকেশী একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেন, 'এর পরও আর তোমরা আমায় এ সংসারে থাকতে বল বাবা? না হয় আমি তোমাদের শাঁখা-চুড়ি পরা মা নয়, তবু মা তো—'

'বড়বৌ!'

হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ গর্জন করে উঠল, 'বড়বৌ! বড়বৌ!' চিৎকারে বাড়ি থরথরিয়ে ওঠে।

দোষ করেছে মেজবৌ, ডাক কেন বড়বৌকে?

কেউ বুঝতে পারে না।

সবাই থরথর করে।

বড়বৌ তো মেজ দ্যাওরের সঙ্গে কথাও কয় না। তথাপি এই ডাকের পর বসেও থাকতে পারে না। রণস্থলে হাজির হয় ঘোমটা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে।

প্রবোধচন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলে, 'বড়বৌ, তোমাদের মেজবৌকে বল মা'র পায়ে ধরে ক্ষমা চাক্!'

ওঃ, তাই!

তাই বড়বৌ!

মায়ের সামনে সরাসরি স্ত্রীকে সম্বোধন করা চলে না, তাই বড়বৌকে মাধ্যম করা!

'অবশ্য আশা ছিল বড়বৌকে আর কষ্টস্বীকার করতে হবে না, এই হুমকিই যথেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! এত বড় তর্জনের পরও কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সুবর্ণলতা।

'বড়বৌ, ওকে ঘাড় ধরে ক্ষমা চাওয়াও।'

উমাশশী কাছে এসে মৃদুস্বরে বলে, 'সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন মেজবৌ? যা, মাপ চা!'

সুবর্ণলতা মুখ তুলে উমাশশীর দিকে তাকালো। আর সে দৃষ্টিতে উমাশশী যেন হিম হয়ে গেল। শাশুড়ীর চোখের অনেক ভয়াবহ দৃষ্টি দেখার অভ্যাস আছে তার, এমন চাউনি কখনো দেখে নি।

এ কী!

সুবর্ণলতা কি পাগল হয়ে গেল?

এ যে স্পষ্ট পাগলের চোখ!

সেই চোখ তুলে সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে, 'কেন? মাপ চাইব কেন?'

উমাশশী বলে, 'চাইলেই তো সব গোল মিটে যায় ভাই'। বল্—বল্ লক্ষ্মীটি, "মা, যা বলেছি, না বুঝে বলেছি"।'

কিন্তু উমাশশীদের হিসেবমত 'গোল মিটোতে' পারলে তো পৃথিবীটাই সমতল হয়ে যেত। তা হয় না।

সুবর্ণলতার মুখ দিয়ে সে কথা বার করানো যায় না। সুবর্ণলতা বলে, 'না বুঝে তো বলি নি, বুঝেই বলেছি।'

হ্যাঁ, বুঝেই বলেছে সুবর্ণ শাশুড়ীকে, 'বাবার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে রাখা হয়েছে, বাবা যখন উদ্দিশ করেছেন, তখন দূর-দূর করে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এখন নিজের সংসারে ভাতের আকাল হয়েছে বলে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে! খুব তো মানের বড়াই, কাকে মান বলে, কাকে অপমান বলে, সে জ্ঞান নেই!'

বলেছিল।

আবার এখন বলছে, 'না বুঝে বলি নি!'

অবাক হয়ে গিয়েছিল বাড়ির প্রতিটি সদস্য। এমন কি সুবোধও। বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'পেবোটা শিক্ষা-সহবৎ দিতে জানে না।'

আর মুক্তকেশী?

মুক্তকেশী শুধু স্তম্ভিতই হন নি, যেন একটু ভয়ও পেয়েছিলেন। একটা ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যেন দাঁত খিঁচিয়ে উঁকি মারছে তাঁর জীবনের সীমানা-প্রাচীরের ওধার থেকে। পড়বে বুঝি লাফিয়ে!

যাক তবু এখুনি সে ভয়কে আমল দেবার দরকার নেই। ঘরের খিল-হুড়কো আছে মজবুৎ। ছেলেরা আজও মায়ের পদানত। আজও একটা বৌকে দূর করে দিয়ে ছেলের আর একটা বিয়ে দিতে পারেন মুক্তকেশী!

প্রভাস বলেছে, ওকালতি করছি, কোর্ট-কাছারি দেখছি, ভদ্রঘরের মেয়ে যে এমন বে-সহবৎ হয়, এ ধারণা ছিল না। এ সমস্তই মেজদার বুদ্ধিহীনতার ফল! মেয়েমানুষকে কখনো আস্কারা দিতে আছে? সর্বদা চোখরাঙানির নিচে রাখলে তবে শায়েস্তা থাকে।'

প্রকাশ বলেছে, 'পয়সা দিয়ে আর "এস্টারে" গিয়ে থিয়েটার দেখতে হবে না আমাদের, বাড়ি বসেই অনেক থিয়েটার দেখতে পাওয়া যাবে। বিয়েটা জব্বর করেছিল মেজদা!'

ক্ষিপ্ত মেজদা অতএব বৌ শায়েস্তা করবার ভার নেয়। থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি একখানা ডেকে আনে।

যে গাড়িতে চাপিয়ে এ বাড়ির মেজবৌকে নির্বাসন দেওয়া হবে। মেজবৌ যাবে একা, একবস্ত্রে। মেয়েটা আর ছেলে দুটো থাকবে এ বাড়িতে। তারা এ বংশের। সুবর্ণলতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না।

যদি কোনোদিন পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখে, তবেই হয়তো আবার ওদের মুখ দেখাতে পারবে সুবর্ণ। নচেৎ এ বাড়ির অন্নজলের বরাত উঠল ওর। বরাত উঠল স্বামী-সন্তানের 'সঙ্গ'র।

আড়ালে-আবডালে সবাই প্রবোধকে স্ত্রৈণ বলে। দেখুক আজ তারা।

নিজেই বনবাস দিয়ে আসবে সীতাকে।

মুক্তকেশী কিন্তু এ ভূমিকায় নেই।

মুক্তকেশী সেই যে জপের মালা নিয়ে বসেছেন, নড়ন-চড়ন নেই তার থেকে।

সুবর্ণর বড় মেয়ে চাঁপা মায়ের এই দুর্গতিতে কাঠ হয়ে বসে থেকে এক-সময় ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসেছে, ভানু কানু দুই ছেলে 'মা'র সঙ্গে যাবো, মা'র সঙ্গে যাবো—' করে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে অবশেষে জেঠির কাছ থেকে খেলনা পুতুল খাবার পেয়ে চুপ করেছে, কর্তারা কে কোন্ দিকে গেছেন, গিন্নীরা আরব্ধ কাজের ভার আবার হাতে তুলে নিয়েছে, মুক্তকেশী নির্বিকার।

প্রবোধের কাজটা তাঁর সমর্থন পেলো কি পেলো না, তাও বুঝতে পারে না প্রবোধ।

এর চাইতে যদি মুক্তকেশী গলা খুলে বলতেন, 'বেশ করেছে প্রবোধ. এত বড় জাঁহাবাজ মেয়ে তিনি ভূভারতে দেখেন নি', অনেক আহ্লাদের ব্যাপার হতো!

এটা কী হলো ?

লাঠিটা ভাঙলো, সাপটা মরলো না!

বৌ বিতাড়িত হল, মা প্রসন্ন হলেন না!

।। ১০ ।।

কিন্তু মুক্তকেশীর সংসারের অন্নজল কতদিনের জন্যে উঠেছিল সুবর্ণলতার? সে ইতিহাস জানতে হলে অন্য অধ্যায় খুঁজতে হবে। অথচ সুবর্ণলতার জীবনের খাতাটা টাইট-বাঁধুনি তো দূরের কথা, একেবারে অবাঁধা। ঝুরো ঝুরো পাতা-গুলো তার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে. উড়ে বেড়িয়েছে।

তবু সেই 'বিদেয় করে দেওয়া'র অধ্যায়টা খুঁজে-পেতে দেখে এইটুকু দেখা যায়, বাড়ির দরজায় ঘোড়ার গাড়ির শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সুবর্ণলতার বাবা নবকুমার বাঁড়ুয্যে। ফর্সা ধবধবে রঙ, নিটোল গড়ন, চুল কাঁচা-পাকা। হয়তো বা কাঁচার থেকে পাকার সংখ্যাই বেশি।

পরনে ফতুয়া, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। একদা সরকারী কোনো এক অফিসের বড়বাবু ছিলেন, রিটায়ার্ড। ঘরকুনো মানুষ. বাইরে বেরোন কমই। সারাদিন বাড়ি বসে ছেলের বৌকে টিকটিক করেন আর নাতি নিয়ে সোহাগ করেন।

বেরোনোর মধ্যে সৌদামিনী দেবীর বাড়িতে একটু বেড়াতে যাওয়া। বৃদ্ধা বিধবা. নবকুমারের দূর-সম্পর্কের দিদি। বহু দুঃখ-কষ্ট পার হয়ে আর বহু কর্মক্ষয় করে শেষ জীবনে পেয়েছিলেন কিঞ্চিৎ সুখের স্বাদ, কিন্তু সইল না।

বুড়োটি গত হলেন।

অবিশ্যি সৌদামিনীর যা বয়েস তাতে বৈধব্যটাই স্বাভাবিক, তবে বহু কষ্ট

পেয়ে সবেই তো স্বামী পেয়েছিলেন। তাঁর সতীনই সর্বস্ব দখল করে রেখেছিল।

স্বামী গেছেন, সতীন গেছে, এখন একা সতীনের ছেলেপুলে বৌ জামাই সব নিয়ে সংসার করছেন।

এই সংসারটাই দেখে পরিতৃপ্ত হন নবকুমার। তাই ছুটে ছুটে আসেন। এ সংসারে পুরনোর ছাপ বিদ্যমান, কারণ সৌদামিনীর হাতেই তো গড়া। যে সৌদামিনী নবকুমারের দিদি।

নবকুমারের সংসারে নবকুমারের ছেলের বৌয়ের রুচি-পছন্দের বিজয়-নিশান।

নবকুমারের মনের সঙ্গে খাপ খায় না সে পছন্দ, সে রুচি!

কিন্তু বৌয়ের বা দোষ কি? শ্বশুরের মনের মত রুচি-পছন্দ সে পাবে কোথায়? শাশুড়ীকে কি চক্ষে দেখেছে?

বিয়ের কনের থেকেই গিন্নী হতে হয়েছে তাকে। সংসারত্যাগিনী শাশুড়ীর পরিত্যক্ত সংসারটাকে কুড়িয়ে তুলে নিতে হয়েছে ছোট দুটি হাতে।

সংসারও অবিশ্যি ছোট, শ্বশুর-দ্যাওর-স্বামী। কিন্তু ছোট বলেই যে হাল্কা তা তো নয়। পাষাণভার। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে উত্তরাধিকার সেটা সহজ, সেটা কোমল, কিন্তু এ তো তা নয়।

স্বেচ্ছায় সংসারটাকে ত্যাগ করে চলে গেছে সংসারের গিন্নীটা! ছেলের বিয়ের সব ঠিকঠাক, তখনই অকস্মাৎ মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে এই কাণ্ড!

যথানির্দিষ্ট দিনে ছেলেটার বিয়ে হয় নি বটে, তবু বিয়েটা হলো। কারণ শাশুড়ী সত্যবতী নাকি এ সম্বন্ধ স্থির করে গিয়েছিলেন।

শ্বশুর সেই ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

বৌ সুধীরবালা।

মানুষ খারাপ নয়, তবু নবকুমার যেন তাকে তেমন স্নেহের চোখে দেখেন না, পয়-অপয় কথাটা বিশ্বাস করেন তিনি।

হাঁচি টিকটিকি মঙ্গলবার সব কিছুতেই পরম বিশ্বাস নবকুমারের। আজও পঞ্জিকাখানা হাতে নিয়ে উল্টে দেখছিলেন, ক'টা থেকে বেলা ক'টা পর্যন্ত মুলো খেতে নেই।

হঠাৎ ওই ঘোড়ার গাড়ির শব্দ! এই বাড়ির দরজাতেই থামলো!

নবকুমার পঞ্জিকাখানা তাকের উপর রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন, আর হাঁ করে দেখেন ভয়ঙ্কর অপরিচিত আর বেশি পরিচিত এক নারীমূর্তি নেমে আসছে গাড়ি থেকে।

কে!

কে ও!

নবকুমার যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। এত বার্ধক্য এসেছে তাঁর, তাই এত দৃষ্টিবিভ্রম! না, না?

নবকুমার তাই আর্তনাদ করে ওঠেন।

কিন্তু এই বিচলিত ভাবটা মুহূর্তমাত্র স্থায়ী হলো, পরক্ষণেই সে ভাব বদলে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন নবকুমার, ভাড়াটে এই গাড়িটা, যাকে নাকি ছ্যাকরা গাড়ি বলা হয়, সেটা ওই নারী আরোহিণীকে নামিয়ে দিয়েই উল্টো মোচড় দিয়ে গড়গড় করে চলে গেল।

তার মানে যে পৌঁছতে এসেছিল, সে নামল না। সে পত্রপাঠ বিদায় নিল।

অর্থাৎ মানুষটাকে নির্বাসন দিয়ে গেল।

এর মানে কি?

পরমাকাঙ্ক্ষিত মূর্তির এ কী অনাকাঙ্ক্ষিত রূপে প্রকাশ!

ও এসে পায়ের ধুলো নিচ্ছে!

নবকুমার কি সেই নতমুখ নতদৃষ্টি কন্যাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরবেন? হাহাকার করে বলে উঠবেন, 'সুবর্ণ রে—এতদিন পরে এলি তুই? যখন তোর বাপের সব গেল!'

না, পারলেন না।

সেই সহজ স্নেহ-উচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে সুবর্ণর পারের কাণ্ডারী।

এই চলে যাওয়ার চেহারার মধ্যেই বুঝি সুবর্ণলতার দুর্ভাগ্যের ছায়া।

তাই নবকুমার কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আগে প্রশ্ন করেন, 'কে? সুবর্ণ? কী ব্যাপার? মানে—'

'এখানে থাকতে চাই!'

প্রণাম-নিবেদনকারিণী এবারে নবকুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্থির স্বরে বলে, 'আর কিছু চাই না বাবা, শুধু এইখানে থাকতে চাই!'

এইখানে থাকতে চাই!

এ আবার কী গোলমেলে প্রার্থনা! বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এই এতগুলো বছর যার দর্শনমাত্র মেলে নি, যার জন্যে কত দিন কত রাত শুধু প্রাণের মধ্যে হাহাকার করেছে, এবং ইদানীং যার দর্শন পাওয়া সম্পর্কে একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছেন, বলতে গেলে যাকে প্রায় ভুলেই বসে আছেন, সেই মেয়ে কিনা অকস্মাৎ এসে পায়ে আছড়ে পড়ে বলে, 'আমায় আশ্রয় দাও!'

বলে, 'আমি থাকতে চাই!'

অথচ শাঁখা-সিঁদুর-সোনায় জ্বলজ্বলাট মূর্তি! এমন নয় যে ভাগ্যান্তর ঘটেছে!

বিহ্বল নবকুমার স্খলিত স্বরে বলেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সুবর্ণ!'

'বুঝতে পারবে না বাবা!' সুবর্ণ তেমনি স্থির স্বরে বলে, 'পরে সব বুঝতে পারবে বাবা! এখুনি সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করো না। পরে সব বলছি।'

বলেছিল সুবর্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে।

কিন্তু নবকুমার তো বলতে পারতেন, 'থাক মা, বলতে তোকে হবে না কিছু। তুই যে এসেছিস এই আমাদের ঢের। কতকাল তোর চাঁদমুখটি দেখি নি, হয়তো কোনদিন মরেই যেতাম, ভগবান বোধ করি দয়া করেই তোকে এনে দিলেন।'

বলতে পারতেন।

মেয়েকে সুস্থির হবার সময় দিতে পারতেন। কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তৃষিত পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু নবকুমার তা করলেন না। নবকুমার কেমন যেন ভয় পেলেন।

আর সেই ভয়ের তাড়নাতেই চির অভ্যাসমত ছুটলেন 'দিদি'কে ডেকে আনতে।

দিদি সৌদামিনী দেবী নবকুমারের নিজের দিদি অবশ্য নয়, পিসতুতো বোন. কিন্তু স্বামী থাকতেও 'বেধবা' হয়ে দীর্ঘকাল তিনি মাতুলালয়ে বাস করেছেন, সেই সূত্রে নবকুমারের দিদি-অন্ত প্রাণ!

যখন নবকুমারের বয়েস কম ছিল, এবং তাঁরও প্রায় জামাইয়ের মতই স্ত্রী নিয়ে সমস্যার অন্ত ছিল না, ওই দিদিই বল-বুদ্ধি-ভরসা হয়ে রক্ষা করেছেন।

তবে শেষরক্ষা করতে পারেন নি সৌদামিনী। সুবর্ণর বিয়ে উপলক্ষ করে সত্যবতী যখন এক অপরিসীম ধিক্কারে সংসার ত্যাগ করলেন, তখন তো শেষ পর্যন্ত সৌদামিনীই সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তথাপি ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

কিন্তু ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাই কি করেছিলেন?

সে প্রশ্ন করেছিলেন নবকুমার দিদির কাছে হাহাকার করে, 'পারলে না সদুদি? তুমি পারলে না? তোমার চেষ্টাও বিফল হল?'

সৌদামিনী ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'ও কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হয় নবু। সত্যি বললে বলতে হয় চেষ্টা আমি করি নি।'

'চেষ্টা কর নি!'

'নাঃ! তার মুখ দেখে বুঝেছিলাম যে, কোনো চেষ্টাই সফল হবে না। বিশ্বাসঘাতক স্বামীর ঘর আর করবে না সে। বললে তুই দুঃখু পাবি, তুই ওর যুগ্যি ছিলি না কোনদিনই। তবু স্বামী বলে ভালবাসতো, ভক্তিছেদ্দা করতে চেষ্টা করতো, সে ছেদ্দা তুই খোয়ালি। বৌ তোকে অসার অমনিষ্যি যাই ভেবে আসুক, একথা কোনোদিন ভাবে নি তুই ওকে ঠকাবি! সেই কাজ করলি তুই, আমি আবার কোন্ দুঃখে চেষ্টা করতে যাব বল্!'

বলেছিলেন সৌদামিনী এসব কথা। তত্রাচ নবকুমার দিদির 'শরণ' ত্যাগ করেন নি। সদুদিকে আঁকড়েই আবার হালভাঙা নৌকোটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসেছিলেন তীরে। এখন আর ভাইয়ের সংসারটা দেখতে হয় না সৌদামিনীকে, ছেলের বৌ দেখে, তবে কারুর একটু 'মাথা ধরলে' ছুটে আসতে হয়।

তাছাড়া এদের লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাকাল, ইতু, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি করে গেরস্তঘরের যা কিছু নিয়ম-লক্ষণ, পাল-পার্বণ, তার দায় এখনো পোহান সৌদামিনী।

বলতে গেলে এখনো এ সংসারে অভিভাবিকার পোস্টটা সৌদামিনীরই।

অতএব আকস্মিক কন্যার এই আবির্ভাবে ভীত-ত্রস্ত-আতঙ্কিত নবকুমার সদুদিকেই ডাকতে ছুটলেন, মেয়েকে ভাল করে বসতে পর্যন্ত না বলে।

বসতে বললো সাধনের বৌ সুধীরবালা। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, 'এসো ঠাকুরঝি, হাত-মুখ ধোও।'

বৌ সপ্রতিভ আত্মস্থ। শ্বশুরের মত ভয় পেল না সে।

বুঝলো একটা ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত ননদকে চক্ষে না দেখলেও ননদের কথা শুনেছে বৈকি অনেকই শুনেছে। ননদের ভাইদের কাছে, পিসশাশুড়ীর কাছে, কদাচিৎ শ্বশুরের কাছে। শ্বশুরের কাছে—বেশির ভাগই তার মেয়ে অম্বর সঙ্গে তুলনার ব্যাপারে।

উঠতে বসতে অম্বর দোষ দেখতে পান নবকুমার আর বলেন, 'তোর পিসি তো এমন ছিল না রে!'

নাতিটি নবকুমারের নয়নমণি, নাতনীটি নয়। নাতনীটার মধ্যে থেকে বুঝি কেবলই অনেক দিন আগের একটা বালিকাকে খুঁজে পেতে চান নবকুমার, একদা এই বাড়িরই সর্বত্র যে ছড়িয়ে ছিল আলোর কণিকার মত। গোলগাল বেঁটে-খাটো শ্যামলা রঙ অন্নর মধ্যে তার আভাস কোথায়? তাই বিরক্ত হন।

আগে এই বাসাটার ভাড়াটে ছিলেন নবকুমার, তার পর বাড়িওয়ালাকে বলে-কয়ে বাড়িটা কিনে নিয়েছেন।

কেন?

কে জানে কী রহস্য!

সাধনের আদৌ ইচ্ছে ছিল না পয়সা খরচ করে এই পচা বাড়িটাই কেনা হয়। বাড়ির অভাব আছে নাকি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব থাকে?

চলছিল বাপের সঙ্গে সামান্য কথান্তর, সদুই রক্ষা করলেন। আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললেন, বুঝতে পারছিস না বাবা, এই বাড়িখানাতেই তো তোর মা থেকেছে, সংসার করেছে, বলতে গেলে এর সর্বত্রই তোর মা বিদ্যমান। এ বাড়ি ছাড়লে সে একেবারে মুছে যাবে! তাই বোধ করি নবু প্রাণ ধরে—'

সাধন চিরদিনই শান্ত গম্ভীর, গম্ভীর হয়েই বলেছিল সে, 'মা'র প্রতি খুব একটা ইয়েও তো দেখি না। মা'র নাম উঠলেই তো বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন আর রাতদিন গাল পাড়েন!'

সৌদামিনী হেসেছিলেন।

বলেছিলেন, 'ছেলেমানুষ তুই, তোকে আর কি বোঝাব! তবে বিয়ে তো করেছিস, আপনিই বুঝতে পারবি পরোক্ষে। বেশিদূর যেতে হবে না, আমার জীবনটাই দেখ না কেন!'

তা সৌদামিনীর জীবনটা এ হিসেবে দ্রষ্টব্য বৈকি। দীর্ঘকাল পতি-পরিত্যক্তা হয়ে মামা-মামীর সংসারে হাড়ে দুর্বো গজিয়েছে, স্বামী দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে সুখে সংসার করেছেন। হঠাৎ একদিন চাকা ঘুরলো, স্বামীর সংসারে আবার প্রতিষ্ঠিত হলেন সৌদামিনী রুগ্ন সতীনের কন্না কবতে আর তার 'ষষ্ঠীর সংসারের' খবরদারি করতে। তার পর স্বামী বড়গিন্নীতেই তদ্গত হয়েছেন, বড়গিন্নীতেই চক্ষে-হারা হয়েছেন। বলেছেন, প্রথম বলেছেন, 'ভাল-বাসা জিনিসটাই আলাদা বড়গিন্নী!'

সমস্ত তো সাধনের চোখের সামনে।

তাই নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখান সৌদামিনী। বলেন, 'তোর বাপের মর্মকথা আমি বুঝি।'

নবকুমারও তা জানেন, তাই মর্মকথার ভার নিয়ে ছোটেন দিদির কাছে। আজও ছুটলেন। অতএব সুধীরবালা এসে হাত ধরতে এল সুবর্ণর।

সুবর্ণ অবশ্য সে হাতে হাত রাখল না, এমনিই ঝেড়ে-পুড়ে উঠল। বলল, 'তুমিই বুঝি বৌ?'

সুধীরবালা ঘাড় কাত করলো।

বিহ্বল সুবর্ণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সেই তার বাল্যের লীলাভূমিকে। হাত বদল হয়ে জিনিসপত্রগুলো জায়গা বদল করেছে, কিন্তু ইট-কাটগুলো তো অচল আছে। ওই জানলাটার নিচে বসে বই পড়তো সুবর্ণর মা, ওই কোণটায় বসে কুটনো কুটতো।

আর দোতলার সেই ছোট্ট ঘরখানা?

যেখানায় সুবর্ণ আর তার মা শোবে বলে চৌকি পাতা হয়েছিল?

সাধনের বিয়ে হলে বৌ নিয়ে সাধন ভাল ঘরটায় শোবে, পাশের সরু ঘরটায় সুবর্ণকে নিয়ে তার মা সত্যবতী, আর হতভাগ্য নবকুমার অতএব ছোট ছেলেকে নিয়ে নিচেরতলায়।

এই ব্যবস্থার মাঝখানে হঠাৎ এল ঝড়, তছনছ হয়ে গেল সংসার, ছেলের বৌকে নিয়ে সংসার করা আর হলো না সত্যবতীর।

সেই ঝড়ের পরের সংসারটাকে তো আর দেখে নি সুবর্ণ! .

সুবর্ণ তাই বিহ্বল দৃষ্টি মেলে হারানো দিনকে খুঁজছিল ..ওই—ওই সেই কুলুঙ্গীটা যার মধ্যে সুবর্ণর বই-শেলেট থাকতো। এখনো তাই রয়েছে! ধ্বক করে উঠেছিল বুকটা, তার পর বুঝলো ওসব নতুন অধিকারীর ব্যাপার!

সুবর্ণ কি আবার এ বাড়ির একটা কুলুঙ্গী খুঁজে নেবে তার বই-খাতা রাখতে? বহুদিনের ধুলো ঝেড়ে হাতে তুলে নেবে সেগুলো? আর সেই পরম বস্তুটি হাতে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? বলবে, 'মা, তুমি যা চেয়েছিলে তোমার সুবর্ণ তাই হয়েছে। তবে প্রায় তোমার মতই জীবন তার, শুধু তফাৎ এই তুমি সংসারকে ত্যাগ করেছ, আর সংসার সুবর্ণকে ত্যাগ করেছে।'

চকিত দৃষ্টিপাতের মধ্যে এতগুলো কথা ভাবা হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণর। শুধু যখন সহসা চাঁপা আর ভানু কানুর কাছে এসে ঠেক্ খেয়েছে, তখন সুধীরবালা বললো, 'এসো ঠাকুরঝি!'

সুবর্ণ ঝেড়ে উঠলো, বললো—'তুমিই বুঝি বৌ?'

তারপর বললো, 'বাবা তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গেলেন?'

সুধীরবালার বুঝতে আটকায় নি কোথায় গেছেন শ্বশুর। তবু ঘাড় নেড়ে বললো, 'জানি না।'

সুবর্ণ অবাক হয়ে ভাবলো, বাবা কি মেয়ে এসেছে বলে তাড়াতাড়ি বাজারে ছুটলেন মিষ্টি আনতে?

অদ্ভুত তো! ভাল করে তো দেখলেনও না সুবর্ণকে!

এখন এই পরের মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনের অবস্থা তার অনুকূল নয়। এই অপরিচিত দুটো চোখের সামনে আপন দৈন্য নিয়ে—

বৌ আবার মিনতি করলো, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও ঠাকুরঝি।'

সুবর্ণ সে কথায় কান দিল না।

বলল, 'দাদা কোথায়?'

বৌ একটু হাসলো।

বললো, 'কোথায় আর? কাছারিতে!'

'দাদা উকিল হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ছোড়দা?'

'ঠাকুরপো?' বৌ হেসে হেসে থেমে থেমে বলে, 'তিনি তো সাহেব। রেল-আপিসে মেজসাহেব। বাঙালী নামে চলে না, নাম নিয়েছেন এস কে ব্যানার্জি।'

সুবর্ণর বুকটা হঠাৎ যেন হাহাকার করে ওঠে।

কেন কে জানে?

সুবর্ণ কি এ বাড়ির ওই ছেলেটাকে হিংসে করছে? নাকি ওর সঙ্গে সুবর্ণর ব্যবধানের দূরত্ব মনে পড়ে বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল?

একটু থেমে বললো, 'তা সাহেব আসেন কখন?'

'ও মা! তিনি এখানে থাকেন নাকি? তাঁর তো মোগলসরাইয়ে কাজ। আগে ছিল বক্সার—'

শেষ কথাটায় কান দেয় না সুবর্ণ।

ওর মাথার মধ্যে ধাক্কা দিতে থাকে মোগলসরাই! মোগলসরাই! যেটা নাকি কাশীর নিতান্ত নিকট। তার মানে ছোড়দা মা'র নিতান্ত নিকটজন হয়ে আছে এখন। নিশ্চয়। ছোড়দাকে মা ফেলতে পারবে না।

এই মেয়েটার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। বলল, আমি ছাতে যাচ্ছি।'

ছাতে!

বৌ অবশ্যই অবাক হল। বললো, 'ছাতে কেন?'

'এমনি।'

'তা হলে চলো—এই যে এদিকে সিঁড়ি—'

'জানি।' সুবর্ণ তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'জানি।' চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

সুধীরবালা অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো. আর গেল না সঙ্গে। রাগও হলো। দিব্যি চলছিলো, হঠাৎ আবার এ কী বিপদ? এ বিপদকে ঠিক সাময়িকও মনে হচ্ছে না যেন। কে জানে কী ঘাড়ে পড়তে চলেছে!

মুখটা বেজার করে দাঁড়িয়ে থাকে সে বরের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়। সময় হয়ে এসেছে।

গায়ে লম্বা কালো চাপকান, গলায় পাকানো চাদর, পরনে ধুতি, পায়ে জুতো মোজা, যথারীতি উকিলবাবুর সাজে বাড়ি ফিরলো সাধন শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি করে। মোড়ের মাথায় নামে. গাড়ি অন্যদিকে ঘুরে চলে যায়।

নিত্য অভ্যাসমতই নেমে পড়েই বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিল একবার, আর তাকিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভুরুটা কুঁচকে এল তার।

ছাতে দাঁড়িয়ে কে?

আলসে থেকে অনেকটা উঁচুতে মুখ, ঘোমটা খোলা মাথা মনে হচ্ছে, এলো চুল!

সুধীরবালা?

সুধীরবালা কি অতটা লম্বা, অতটা ফর্সা?

তা ছাড়া সুধীরবালা এ সময় হাওয়া খেতে যাবে?

কেউ বেড়াতে এসেছে তা হলে!

কিন্তু কে?

যাক্ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার দরকার কি! হনহন করে এসে বাড়ি ঢুকেই দেখলো সামনে স্ত্রী বেজার মুখে বসে আছে।

অবাক হল সুবর্ণর দাদা সাধন।

কেউ যদি বেড়াতে আসবে, সুধীরবালা কেন এখানে এমন প্যাঁচামুখে?

বললো, 'ছাতে কে? আলসে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হলো, মাথার ঘোমটা খোলা চুল খোলা—'

ঘোমটা খোলা!

চুল খোলা!

সুধীরবালার বুকটা কেঁপে ওঠে।

এ কী কথা!

পাগল নয় তো? নাকি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে? তাই! তাই হয়তো শ্বশুরবাড়ির লোক ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। কী হবে!

সাধন আর একবার প্রশ্ন করলো, 'বল, কি? কে এসেছে?'

সুধীরবালা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু গলায় বলে, 'কে এসেছে পরে শুনো।'

'পরে শুনবো? তার মানে?'

'পরে শুনোটা' তো ছল! খবরটা স্বামীর কর্ণগোচর করবার জন্যে তো মরছিল! তবে লজ্জা?

তাই যেন না বললে নয়, এইভাবে বলে সুধীরবালা, 'এসেছে তোমাদের বোন।'

'বোন! বোন মানে? কোন্ বোন?'

সাধন গলা থেকে চাদরটা নামিয়ে আল্‌নায় রাখতে ভুলে গিয়ে হাতে করে ধরেই বলে, 'কোন্ বোন?'

সাধনের কণ্ঠস্বর থেকে বিস্ময় যেন ঝরে ঝরে পড়ে—

সুধীরবালাও চালাক মেয়ে, রয়ে-বসে পরিবেশন করে। বলে, 'বোন আর তোমাদের ক'টা আছে? একটাই তো বোন! সেই বোন।'

'সেন বোন! মানে সুবর্ণ?'

'হুঁ।'

সাধনও বহুদিন অদেখা সেই বোনের আগমন-সংবাদে আনন্দিত না হয়ে ভীতই হয়। শঙ্কিত গলায় বলে, 'হঠাৎ এভাবে আসার কারণ?'

'কারণ!' সুধীরবালা গলা খাটো করে বলে, 'কারণ কী করে জানবো? এসেই তো ঠরঠরিয়ে ছাতে উঠেছে!'

'বাবা নেই?'

'আছেন। মানে মেয়েকে দেখে তবে গেছেন!'

'দেখে তবে গেছেন? কোথায় গেছেন?'

'জানি না। বোধ হয় পিসিমার বাড়ি। দেখামাত্রই তো ছুটলেন।'

সাধন বিরক্ত হলো।

বললো, 'বাবার তো কেবল ওই!'

সাধন চিন্তিত হলো।

বললো, 'এলো কার সঙ্গে?'

'জানি না। চক্ষে দেখলাম না তাকে। দরড়া থেকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'হুঁ, গণ্ডগোল একটি বাধিয়েছেন আর কি! তা এসেই ছাতে উঠল যে?'

'ভগবান জানেন। সাতবার বলছি হাত-মুখ ধোও, তা নয়, ছাতে যাব!'

'অন্ন কোথায়? ডেকে আনতে বল—'

'অন্নও তো পিছু পিছু ছাতে উঠেছে। বললাম কিনা, পিসি হয়।'

'ডাকো ডাকো! কি জানি মাথার দোষ হয়েছে কিনা!'

'কে ডাকবে?'

'অন্নকেই ডাকো!'

'তুমি চেঁচাও, আমি আর সিঁড়ি ভাঙতে পারব না।'

'পিসি! পিসির সঙ্গে কী এত কথা!'

অপছন্দ ভাব দেখায় সাধন।

কিন্তু সাধনের মেয়ে হঠাৎ ভারি পছন্দ করে ফেললো পিসিকে।

আস্তে আস্তে গায়ে হাত দিয়ে বলেছে, 'তুমি পিসি?'

তারপর কেমন করে না-জানি ভাব উঠেছে জমে। সুবর্ণকে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে আর সুবর্ণ উত্তর দিচ্ছে।

হয়তো এমনিই একটা কিছু চাইছিল সুবর্ণ। বলতে চাইছিল নিজের কথাগুলো।

এই শিশুচিত্তের কৌতূহলের সামনে সেই বক্তব্য সহজ হলো।

অম্র বলছে, 'এই বাড়িতে যদি জন্মেছ তুমি তো এখানে থাক না কেন?'

'এরা তাড়িয়ে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'আবার তবে এলে কেন?'

'আবার শ্বশুরবাড়িরাও তাড়িয়ে দিল।'

'তোমায় কেবল সবাই তাড়িয়ে দেয়?'

'তাই তো দিচ্ছে।'

'কেন? তুমি তো খুব সুন্দর!'

'তাতে কি! সুন্দরের ওপরই তো পৃথিবীর রাগ!'

'য্যাঃ!'

'দেখিস বড় হয়ে!'

অম্র নিজের হাতটা পিসির হাতের উপর রেখে বলে, 'আমি কালো!'

'না না, তুমি ভালো।'

'ঠাকুরদা বলে, তুই বিচ্ছিরি, বোকা। তোর পিসি ছিল বুদ্ধির রাজা!'

'কে বলে এ কথা? কে বলে?'

অম্র পিসির এই আকস্মিক উত্তেজনায় থতমত খেয়ে বলে, 'ঠাকুরদা! তোমার বাবা!'

'তোর ঠাকুরদা আমার বাবা হয়, জানিস এ কথা?'

'ওমা—' অম্র গিন্নীর মত বলে, 'তা জানবো না! ও বাড়ির ঠাকুমা বলে দেয় নি বুঝি! আচ্ছা, তোমার বর নেই?'

'বর! আছে বৈকি—'

নীচের তলায় তখন পিতাপুত্রে গুপ্ত পরামর্শ চলছে।

না, সৌদামিনী তৎক্ষণাৎ আসতে পারেন নি, তাঁর হঠাৎ বাত চেগেছে। কোমর নিয়ে উঠতে দেরি। বলেছেন, 'তুই যা আমি যাচ্ছি।'

সাধন অবশ্য পিসির জন্যে অপেক্ষা করছিল না, অপেক্ষা করছিল বাপের জন্যে। বলল, 'তুমি কিছু জিজ্ঞেস না করেই চলে গেলে ওবাড়ি!'

নবকুমার নিজেকে সমর্থন করেন, 'জিজ্ঞেস করবার আর কী আছে? বুঝতেই তো পারলাম ঘটিয়ে এসেছেন একটা কিছু। ঝাড়ের বাঁশের গুণ যাবে কোথায়? হয়ে উঠেছেন একখানি অনুমান করছি!'

সুবর্ণ এ বাড়িতে দুর্লভ ছিল, সুবর্ণ যেন একটু বিষণ্ণতার আধারে ভরা একখণ্ড পরম মূল্যবান রত্ন ছিল, কিন্তু সহসা সুবর্ণর দাম কমে গেল।

বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিতে এসে সুবর্ণ সব মূল্য হারালো।

সুবর্ণ বিপদের মূর্তি হলো।

সুবর্ণকে ছাত থেকে ডেকে পাঠিয়ে নবকুমার প্রশ্ন করলেন, 'হঠাৎ এরকম লে এলি যে?'

সুবর্ণ মুখ তুলে বাপের দিকে একবার তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললো, 'চলে তা আসি নি, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে!'

সাধন বিরক্তকণ্ঠে বলে, 'তাড়িয়ে অমনি দিলেই হলো?'

সুবর্ণলতা স্থিরভাবে বলে, 'হলো তো দেখলাম। সহজেই হলো। ললো—ছেলেরা আমাদের বংশধর, ওরা আমাদের কাছে থাক, তুমি তোমার মেয়ে নয়ে বাপের বাড়ি থাকো গে। আমি বললাম, সবাই থাক। মেয়েও তামাদেরই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! গাড়ি ডাকলো, তোরঙ্গটা নিয়ে গাড়ির মাথায় তুলে দলো, গাড়িতে উঠলো, দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল, আমি ঢুকে এলাম।'

নবকুমার ধৈর্য ধরে সবটা শোনার শেষে ক্ষোভ আর ক্রোধের সংমিশ্রণে গড়া একটি প্রশ্ন করেন, 'ব্যস! ঢুকে এলাম! বুঝতে পারলি না এটা ত্যাগ করা?'

'বুঝতে পারব না কেন? ওরা তো বলে-কয়ে—'

'তবে? কেঁদে পড়ে বলতে পারলি না, ছেলেদের ছেড়ে আমি থাকবো কী করে?'

সুবর্ণও ব্যঙ্গ আর ক্ষোভে গড়া একটি প্রশ্ন করে, 'ছেড়ে থাকতে পারবো না, এ কথার কোনো মানে হয়? ওটা তো একটা হাসির কথা!'

নবকুমার মুহূর্তের জন্য মাথাটা হেঁট করেন। তারপর বলেন, 'তা ভবিষ্যৎটা তো ভাবতে হবে?'

'ভেবে কি সত্যিই কেউ কিছু করতে পারে—?' 'বাবা' শব্দটা মুখে এসেও আসে না, অনভ্যাসে মুখের মধ্যেই যেন আটকে যায়, 'কত মেয়ে তো হঠাৎ বিধবাও হয়!'

'হরি হরি!' নবকুমার রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'যা মুখে এলো বললেই হলো! আশ্চর্য! কোথায় রইল মা, কোথায় রইল মেয়ে, প্রকৃতিটি হয়েছে দেখছি এক ছাঁচে ঢালা। মুখ দিয়ে বার করলি কি করে এ কথা!'

'সত্যি কথা বলতে বাধবে কেন?'

এবার বোধ করি জোর করেই 'বাবা' শব্দটা উচ্চারণ করে সুবর্ণ। বলে, তুমি কি আমায় থাকতে দিতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছ, বাবা?'

নবকুমার হঠাৎ বিচলিত হন।

নবকুমারের চোখ দিয়ে একঝলক জল এসে পড়ে। সেই অবসরে সাধন লে ওঠে, 'ভয় পাওয়ার কথা হচ্ছে না। তবে আশ্চর্য হচ্ছি বৈকি! যারা এই ত বছরের মধ্যে কক্ষনো পাঠাল না, তারা হঠাৎ ইচ্ছে করে—'

এই সময়ে অন্ন কথা বলে ওঠে বাবার হাঁটুর নীচে থেকে, 'পিসির শাশুড়ীর াকা কমে গিয়েছিল বলে শাশুড়ীটা বলেছিল, "বৌরা কিছুদিন বাপের বাড়ি াক্। আমার বেশি খরচ হবে না—", তা পিসি বলেছিল, "কেন যাব? যাব া"—তাই ওরা রেগেটেগে বলেছে, "তবে চলে যাও। থাকতে হবে না আমাদের াড়িতে"।'

'তা সে প্রস্তাবে রাজী হলে ক্ষতিটা কি ছিল?' সাধন বলে, 'সেটা তো ারাপ কিছু ছিল না। কিছুদিন বেড়িয়ে যেতে!'

নবকুমার বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, সেটা তো ভালোই হতো। আহ্লাদ করে চলে এলেই পারতে। ফাঁকতালে দুদিন থাকা হয়ে যেত!'

'ফাঁকতালে পেয়ে যাওয়া কোনো জিনিসে আমার লোভ নেই বাবা!'

নবকুমার যেন একটু চমকে ওঠেন। কথাটা কেমন নতুন লাগে তাঁর কাছে।

কিংবা নতুনও নয়, শুধু ভুলে যাওয়াটা একটা সুরের মত। সুবর্ণর মা সত্যবতীও যেন এইরকম সুরেই কথা বলতো না?

কিন্তু এখন সময়টা সঙ্গীন।

হারানো সুর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। যে মেয়ে তাঁর কাছে প্রায় মৃত, অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিত, হঠাৎ সেই মেয়েকে 'ঠিক আছে, তুই চিরকাল আমার ঘর ভরে আমার বুক ভরে থাক্' বলা শক্ত বৈকি।

কে জানে মেয়ের কী প্রকৃতি, কী রীতি, কেন তারা এমন করে বিদায় করে দিয়েছে, কিছুই তো জানা নেই! তা ছাড়া তিনি বাপ, মেয়ের হিতাহিত দেখতে হবে! মেয়ে যদি তেজ করে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে—

নবকুমার বিচলিত গলায় বললেন, 'আর সব বৌরা কী বলেছিল?'

'আর সব বৌরা!' সুবর্ণ বিদ্রূপের গলায় বলে, 'আর সব বৌরা তো বাপের বাড়ি যেতে পেলেই নাচে! মানমর্যাদা বোধ থাকলে তো!'

'হু! যত মান-মর্যাদা তোমার, কেমন? হবেই তো। মানী মায়ের মানী মেয়ে! মা একটা সংসার ধ্বংস করে বসে আছেন, মেয়েও—'

নবকুমার হঠাৎ চুপ করে যান।

হঠাৎ পিছন ফেরেন। হয়তো চোখ দুটো আড়াল করতেই।

সাধন এই সব ভাবপ্রবণতা পছন্দ করে না। সাধন বলে ওঠে, 'ওসব কথা থাক্ বাবা। কথা হচ্ছে এ ব্যাপারের একটা বিহিত দরকার কিনা—'

'কিনা মানে?' নবকুমার উদ্দীপ্ত গলায় বলেন, 'করতেই হবে। তারা বললো ত্যাগ করলাম, অমনি ত্যাগ হয়ে গেল, এ একটা কথা নাকি? তাদের কাছে গিয়ে নাকে খৎ দিয়ে মাপ চাইতে হবে!'

'নাকে খৎ দিয়ে মাপ চাইতে হবে!'

একটা ধাতুপাত্র যেন কথা কয়ে ওঠে।

এ কী স্বর! কী ভয়ানক!

এ স্বর যে বড্ড পরিচিত নবকুমারের।

আশ্চর্য!

মায়ের মতনই হয়ে বসে আছে মেয়েটা? কেন, ভাইদের মত হতে পারত না? কিন্তু এর ভার বইবার শক্তি নেই নবকুমারের। তাই নবকুমার তরল হবার চেষ্টা করেন, 'তা হবেই তো। শ্বশুরবাড়ি বলে কথা! মায়ের মত খুব নাটক নভেল পড়বার অভ্যেস হয়েছে বুঝি? তাই এত মান-মর্যাদার জ্ঞান! ওসব বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। দু-চারটে দিন যাক, আমি নিজে সঙ্গে করে গিয়ে শাশুড়ীমাগীকে তোয়াজ করে আসবো—'

'আমি তো আর কখনো ওখানে যাব না বাবা—'

শান্ত স্বর সুবর্ণর।

মেয়ের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ অনুভব করেন নবকুমার, যা হোক করে বুঝিয়ে বাগে আনা যাবে বলে মনে হয় না। দেখা যাক্, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনা যায় কিনা!

বলেন, 'শোনো ক্ষ্যাপা মেয়ের কথা! একেবারে কাটান-ছেঁড়ান করলে চলে? যাবো, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঁজি দেখিয়ে বরং আনবো একবার দু মাসের জন্যে। এ একটা ভাল হলো, শাপে বর হলো। আসা-যাওয়া ছিল না, আসা-যাওয়ার পথ খুললো—'

সুবর্ণ ছাত থেকে নেমে এসে বসেছিল সিঁড়ির ধাপে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমিও তাহলে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ বাবা?'

'তাড়িয়ে! ছি ছি, এ কী কথা!'

নবকুমার বলেন, 'সাধন, শুনছিস তো বোনের কথা?'

'শুনছি বৈকি।' সাধন বলে, 'তবে মনে হচ্ছে মায়া-মমতার প্রশ্ন এখন নয়। মেয়েদের যেটা আসল আশ্রয়—'

আসল আশ্রয়!

সুবর্ণ হেসে উঠে বলে, 'আসল আশ্রয়ের দাম তো ধরা পড়ে গেল দাদা! এক নিমেষের এদিক-ওদিক, বলে দিল বিদেয় হও। তবু সেই আশ্রয়কেই আসল আশ্রয় বলে আঁকড়ে থাকতে হবে?'

সাধনের বৌ সুধীরবালা এই সব কথাবার্তার মধ্যেই তাড়াতাড়ি জলখাবারের আয়োজন করে ফেলেছিল। গৃহ-প্রত্যাগত স্বামীর জন্যও বটে, আগন্তুক ননদের জন্যেও বটে।

দুখানি ধবধবে কাঁসার রেকাবি করে ধরে এনে দেয় সে দুটো মানুষের সামনে। আগে আসন আনে। আনে জলের গ্লাস।

শ্বশুর এ সময় খান না, অতএব তাঁর জন্যে প্রয়োজন নেই।

সুবর্ণ সেই রেকাবির দিকে তাকায়।

বড় বড় দুটি রসগোল্লা, দুখানা করে অমৃতি, আর দুখানা করে নিমকি।

সহসা হেসে ওঠে সুবর্ণ।

জোরে জোরে হেসে বলে, 'কী বৌ? বিদেয়ের ইশারা নাকি? বাঃ! তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী!'

নবকুমার বৌয়ের মুখের দিকে তাকান।

গৃহিণীহীন গৃহের গৃহিণী।

ভয় একটু করতেই হয়।

তাই তাড়াতাড়ি বলেন, 'ও কি কথা সুবর্ণ? কতদিন পরে এসেছিস তুই, একটু মিষ্টিমুখ করবি না?'

সুবর্ণ তিক্ত হাসি হেসে বলে, 'করলাম তো অনেক, রসগোল্লাটা আর সইবে না বাবা। তার চেয়ে তুমি বরং একটা গাড়ি ডাকো।'

'গাড়ি ডাকো!'

নবকুমার ব্যস্ত গলায় বলেন, 'এখুনি গাড়ি ডাকবো মানে? আজই আমি ছাড়ছি কিনা! এক্ষুনি সদুদি এসে যাবেন, তোর সেই পিসি রে! মনে আছে তো? নাকি ভুলে গেছিস? বেতো মানুষ, মালিশ করাচ্ছে, বললো, "যাচ্ছি এখুনি।" আজ আর নয়, বললাম তো দুটো দিন যাক, তারপর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সাত হাত নাকেখৎ দিয়ে দু মাস নিয়ে আসবার জন্যে অনুমতি চেয়ে আনবো।'

কিন্তু সুবর্ণ কি হঠাৎ কালা হয়ে গেল? সুবর্ণ শুনতে পেল না এসব কথা? তাই সেই আগের মত ধাতব কণ্ঠে উচ্চারণ করে উঠল, 'দাদা' একটা গাড়ি

ডাকো—'

সাধন এবার বোধ করি ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়। বলে, 'আজই এই দণ্ডে যাবার কী দরকার? বরং আজ একবার আমি ওদের ওখানে গিয়ে—'

সাধনের কথা শেষ হয় না, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অম্ব বলে ওঠে, 'কেন খালি খালি বলছো বাবা? পিসি মরে গেলেও আর শ্বশুরবাড়ি যাবে না—'

'বটে? বটে?' রাগে আগুন সাধন মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, 'যাবে না! বলেছে তোমার কানে ধরে! পাজী ডেঁপো মেয়ে! হচ্ছেন তৈরি আর একখানি!'

'আহা থাক থাক, কচি মেয়েটাকে কেন শুধু শুধু—', নবকুমার বলেন, 'কুটকচালে কথা রাখ দিকি, নে খা' দাদার সঙ্গে বসে খেয়ে নে। সেই তোর ননীর দোকানের রসগোল্লা। ছোটবেলায় যার জন্যে জিভে জল পড়তো তোর। ননী বুড়ো এখনো—'

ননীর নামে নরম হতে পারতো সুবর্ণ। ছেলেবেলার উল্লেখে কোমল।

কিন্তু কিসে থেকে যে কি হয়! হঠাৎ সুবর্ণলতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে।

আচমকা বসে পড়ে নিজের কপালটা ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন? কেন?'

ভিতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার আর কোনো ভাষা খুঁজে পায় না বলেই সুবর্ণলতা ওর এই এতদিনকার বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নকে এই একটিমাত্র শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে চায়।

হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত অবরুদ্ধ নারীসমাজের নিরুদ্ধ প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা এটা, যা সত্যকার কোনো পথ না পেয়ে এমন উন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে!

হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখ-ঝলসানো আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল মেয়েদের পিছনের অন্ধকারে আজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে—কেন? কেন?

সুবর্ণলতার যুগ কি শেষ হয়ে গেছে?

কোনো যুগই কি কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে শেষ হয়ে যায়?

হয়তো যায় না!

হয়তো বৃদ্ধা পৃথিবীর শীর্ণ পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কোথাও কোনোখানে আটকে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া যুগের অবশিষ্টাংশ, এখানে ওখানে উঁকি দিলে তার সন্ধান মেলে।

যেখানে মাথাকোটার প্রতিকার নেই। যেখানে লক্ষ লক্ষ 'কেন' ছুটোছুটি করে মরছে।

তবে দৃশ্যমান মাথাকোটার প্রতিকার হয়। 'ও কি ও কি' বলে ধরে ফেলেন নবকুমার। সাধন জল এনে কপালে ছিটোয়। সুধীরবালা ঘোমটা দিয়ে বাতাস করে।

আর ঠিক এই সময় সৌদামিনী এসে দাঁড়ান ভাঙা কোমর নিয়ে।

তাসের আড্ডা রোজই বসে, সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত চলে। বাড়ির মেয়েরা হাঁড়ি আগলে বসে থাকতে থাকতে হয় ঝিমোয়, নয় ঘুমিয়ে নেয় এক পালা।

তবে নিশ্চিন্তের ঘুম তো নয়, কখন যে বৈঠকখানা থেকে হুকুম আসে চারটি পান সেজে পাঠিয়ে দিতে, তার তো ঠিক নেই!

বৌরা ঘুমিয়ে পড়েছে খবর পেলে তো গর্দান যাবে।

তাছাড়া ভাত গরম রাখার উদ্বেগও তো আছে। উনুনের উপর হাঁড়ি 'দমে' বসিয়ে রেখে রেখেও তো বেদম ঠাণ্ডা মেরে যাবে। আর অতক্ষণ তাস পিটিয়ে এসে ক্ষুধার্ত পুরুষ যদি দেখে ঠাণ্ডা ভাত, তা হলে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা তাদের পক্ষে শক্ত বৈকি।

তবু ছুটির দিনের সঙ্গে অন্য সব দিনের তুলনাই চলে না। ছুটির দিনে আড্ডাটা বসে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরমুহূর্ত থেকেই, চলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

পান সাজতে সাজতে বৌদের এবং তামাক সাজতে সাজতে ছোট ছেলে-গুলোর প্রাণ বেরিয়ে যায়।

মুহুর্মুহু হুকুম আসে, আর তামিল করতে তিলার্ধ দেরি হলেই আসে হুঙ্কার।

সুবোধ বাদে বাকী তিন ভাই তাসের পোকা। সুবোধ একটু ঘুম-কাতুরে, সকাল সকাল খেয়ে ঘুমোয়. আর ঘুমোতে যাবার আগে বলে যায়, 'তাস দাবা পাশা, তিন কর্মনাশা! তোদের এই এক কর্মনাশা নেশায় ধরেছে!'

প্রভাস তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'তা বটে। এর থেকে ঘুমটা অনেক মূল্যবান বস্তু, কি বল দাদা?'

সুবোধ লজ্জিত হয় না. বলে, 'একশোবার! ঘুম হচ্ছে মগজের আহার। দেহের যেমন অন্ন, মগজের তেমনি ঘুম!'

প্রভাস অবশ্য এই নতুন জ্ঞানলাভে ধন্য হয় না। বলে. 'অতিভোজনটাও ভাল নয়।'

সুবোধ হাসে, 'অতি মানে? ভগবান ক'ঘণ্টা দিবালোক দিয়েছে, আর ক'ঘণ্টা অন্ধকার সে হিসেব কর?'

'তুমি কর!' বলে প্রভাস।

প্রভাসের কথাবার্তার ধরনই ওই।

গুরুজনের সঙ্গে বাক্যালাপে যে নম্রতার নীতি বলবৎ আছে, প্রভাস সেটা কদাচিৎ মানে। প্রভাসকেই সকলে সমীহ করবে এই নীতিই চালু হয়ে গেছে সংসারে।

এমন কি মুক্তকেশীও তাঁর উকিল-ছেলেকে রীতিমত সমীহ করছেন. ওর বৌয়ের দোষের দিকে দৃষ্টিক্ষেপটা কম করছেন, এবং ছেলেকে প্রায়শই 'তুমি' করে কথা বলছেন।

প্রভাস যদি তাস খেলার বিরোধী হতো, নির্ঘাত বাড়িতে তাসের আড্ডা বসবার স্বপ্ন কেউ দেখত না। কিন্তু প্রভাসই এ যজ্ঞের হোতা! অতএব আড্ডা ক্রমশই আয়তনে বাড়ছে, দর্শক-বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে।

ছুটির দিনে পূর্ণিমার জোয়ার।

তবে অন্য দিনেও কম নয়।

প্রবোধ যখন ঘোড়ার গাড়ি করে মেজবৌকে নির্বাসন দিতে গেল, তখন প্রভাস বন্ধুদের মধ্যে থেকে খেলোয়াড় নির্বাচন করে বাজার বজায় রেখেছিল। তার মধ্যে যথারীতি পান দু ডাবর শেষ হয়েছে। রাতও প্রহর হয়-হয়।

প্রবোধ বৌকে পেঁৗছে দিয়ে এসে মা'র কাছ থেকে ঘুরে সবে জুৎ করে বসেছে।

এমন সময় দরজায় গাড়ি থামার শব্দ। বিতাড়িত হয়ে তাড়িত আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু দর্জিপাড়ার গলির মধ্যেকার এই রুদ্ধ কপাটের ভিতরপিঠে প্রবেশ-অধিকার কি সহজে মিলেছিল সুবর্ণর?

মেলে নি।

মাতৃভক্ত ছেলে প্রবোধ সদ্য জমে-ওঠা খেলায় 'জল' ঢেলে শ্বশুরের সামনে এসে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে ঘাড় গুঁজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেছিল, 'না, এমনি ঢুকে পড়া চলবে না, আমার সাফ কথা, আমার মায়ের পায়ে ধরে মাপ চাইতে হবে।'

খেলা ফেলে প্রভাসও উঠে এসে বলেছিল, 'তালুইমশাই কি মেয়েকে এক সন্ধ্যেও দুটি খেতে দিতে পারলেন না?'

'পারলাম নাই বলতে হবে—.' বলে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন নবকুমার।

ক্ষুব্ধ ক্রন্দন-বিজড়িত সেই কণ্ঠস্বর ভিতরের ইতিহাসের আভাস প্রকাশ করল।

সুবর্ণ খায় নি। জলটুকু পর্যন্ত না।

গাড়িতে ওঠার সময়ে বলেছিল, 'কী দরকার বাবা? দর্জিপাড়ার সেই গলিটাতে যদি আবার গিয়ে ঢুকতেই হয়, তাদের হাঁড়ির অন্ন খেতেই হয়, তবে আর একবেলার জন্যে জাত নষ্ট করি কেন?'

সৌদামিনী গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'তুই যে দেখি তোর মায়ের ওপর গেছিস সুবর্ণ, বাপের ঘরে খেলে তোর জাত যাবে?'

'সময় বিশেষে তাও যায় বৈকি পিসিমা!...যাক গে বাবা, গাড়ি একখানা ডাকো, বেশি রাত হবার আগেই পেঁৗছে দিয়ে এসো। অনেক কষ্ট তোমাকে পেতে হল এই যা!'

তা দরজা আটকানোর নাটকটা পাড়ার লোকে দেখেছিল বৈকি।

যারা তাস খেলছিল তারা, যারা আশেপাশের জানলায় মুখ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। আর নিজ নিজ বাড়ির সামনের রোয়াকে যারা বসে ছিল গা খুলে, বাড়ির বাচ্চা মেয়েদের একটা 'পাঁচ-ছ' হাতি শাড়ি পরে, তারা তো বটেই।

শেষ পর্যন্ত সে নাটকে যবনিকাপাত করলেন স্বয়ং মুক্তকেশীই। মুক্ত-কেশীর তো আর এখন আব্রুর বালাই নেই, তাই দরজার কাছে এসে বলেছিলেন, 'দোর ছাড় পেবো, লোক হাসাস নে। মেজবৌমা, যাও বাছা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না।'

না, সেদিন আর মুখে মুখে চোপা করে নি সুবর্ণ। বলে নি, 'কেলেঙ্কারিটি তো ঘটালেন আপনিই!'

সুবর্ণ শুধু ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল।

বাবার দিকে আর তাকায় নি।

মুক্তকেশী উদাত্ত গলায় বলেছিলেন, 'কত ভাগ্যে বেয়াইয়ের পায়ের ধুলো পড়ল, দোর থেকে ফিরে যাবেন বেয়াইমশাই? একটু জল খেয়ে যেতে হবে—।'

'আজ থাক্, আজ থাক্।' বলে বোধ করি চোখের জল চাপতে চাপতেই গাড়িকে চালাতে বলেছিলেন নবকুমার।

'খেলাটাই মাটি হল আজ, যত সব ঝামেলা—, বলে প্রভাস ফের গিয়ে তাস ভাঁজতে বসলো, চক্ষুলজ্জার দায়ে অগত্যা প্রবোধও।

মনের মধ্যে একটা আহ্লাদের ঢেউ বইছিল বৈকি।

ঝোঁকের মাথায়, আর 'স্ত্রৈণ' অপবাদ ঘোচাতে, করে বসেছিল কাজটা, মনের মধ্যে তো বিছে কামড়াচ্ছিল!

যে সাংঘাতিক সিংহরাশি মেয়েমানুষ, কে বলতে পারে এ বিচ্ছেদ সত্যিই চিরবিচ্ছেদ হল কিনা! তেমন কান্ড ঘটলে কতদূর জল গড়াতো কে জানে? 'দ্বিতীয় পক্ষ' এসে কি আর ভানু-কানুকে দেখতো? না চাঁপার সঙ্গে বনিয়ে থাকতো?

সে দুর্ভাবনা গেল।

এখন মান-ভাঙানোর খাটুনি।

রাতটা ওতেই যাবে আর কি!

কিন্তু সে রাতটা কি ওতেই গিয়েছিল প্রবোধের?

সেই রাত্রের মধ্যভাগে ভয়ানক একটা শোরগোল ওঠে নি বাড়িতে?

হ্যাঁ, ভয়ানক শোরগোলই উঠেছিল সুবর্ণর শাশুড়ীর আফিমের কৌটো চুরি করে মুক্তি পাবার হাস্যকর প্রচেষ্টায়।

হলো না কিছুই, হলো শুধু ধাষ্টামো। তবুও কেলেঙ্কারিটা তো হলো। ডাক্তার আনতে হলো সেই মাঝরাত্তিরে, আর থানা-পুলিসের ভয়ে ডাক্তারকে দর্শনীর ওপর আবার ঘুষ দিতে হলো। যদিও গেলাস গেলাস নুনজল খাওয়ানো ছাড়া আর কিছুই করলো না ডাক্তার।

সে নির্লজ্জ ধৃষ্টতার প্রসঙ্গে জীবনভোর অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খেতে হয়েছে সুবর্ণকে।

এমন কি যে ভাসুর কখনো কিছু বলে না, সে পর্যন্ত বলেছে, 'বস্তা বস্তা নাটক নভেল পড়ে এইটি হয়েছে আর কি!'

তা সত্যিই হয়তো পড়েছে সুবর্ণ, বস্তা বস্তাই পড়েছে। সেই বস্তা বস্তার কল্যাণে বস্তা বস্তা কথাও হয়তো শিখেছে, কিন্তু আফিমের মাত্রাটা কতখানি হলে সেটা ধাষ্টামো না হয়ে মুক্তিফলপ্রসূ হয়, সে কথা শেখে নি!

তা যদি শিখতে পারতো, তা হলে সুবর্ণলতার জীবন-নাট্যে সেখানেই যবনিকা পড়ে যেত।

বিষের মাত্রা সম্পর্কে কোনো দিন কোনো জ্ঞানই যদি থাকতো সুবর্ণলতার! কিন্তু ওকথা থাক্। এখন প্রবোধচন্দ্র আর সুবর্ণলতার যে বৃহৎ ফটোগ্রাফ দুখানা মুখোমুখি টাঙানো রয়েছে ওদের বড় ছেলের ঘরে, তাদের বেষ্টন করে ফুলের মালা দুলছে।

প্রতি বছর শ্রাদ্ধবার্ষিকীতে শুকনো মালা বদলে নতুন মালা দেওয়া হয়।

সার্থক জীবনের প্রতিমূর্তি ওই ছবিটা দেখে কে বলতে পারবে গায়ে

কেরোসিন ঢালা বাদে আত্মঘাতী হবার যত রকম পদ্ধতি আছে, সবই একবার করে দেখে নিয়েছে মানুষটা!

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য!

শেষ পর্যন্ত ত্রুটি থেকে গিয়েছে সমস্ত পদ্ধতিতেই। হয়তো ওটাই বিধি-লিপি সুবর্ণর। নইলে কে কবে শুনেছে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়েও বাঁচে মানুষ!

অবিশ্যি রান্নাঘরের ছাত, একতলা, নিচু—তবু ছাত তো!

পড়েছিল সেই ছাত থেকে!

তদবধি ছাতের সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করা থাকতো। চাবি থাকতো মুক্ত-কেশীর হাতে।

মা গঙ্গাই কি দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন কিছু?

কিছু না।

যোগে গঙ্গাস্নানের বায়না নিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে চুপি চুপি গঙ্গাস্নানে গিয়ে দেখেছে—হয় নি।

লাভ হয় নি!

কেউ কোনোদিন এ সন্দেহ করে নি, সুবর্ণ স্রেফ তলিয়ে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

তাই চেষ্টা সফল হতো না।

সঙ্গে যারা যেত তারাই সহসা ওর হাত ধরে টান দিত, 'যাচ্ছ কোথায়? এই ঘাটের কাছে কাছে থাক না? অত এগোবার দরকার কি?'

কিন্তু এতই বা অতিষ্ঠ কেন সুবর্ণলতা?

উমাশশী, গিরিবালা, বিন্দু, এরাও তো থেকেছে ওই একই পরিবেশে? কই, ওরা তো রাতদিন মরণের বাসনায় উদ্বেল হয় নি?

হয়তো সত্যিই মূল কারণ ওই বস্তা বস্তা নাটক-নভেল! আর তো কারণ দেখা যায় না!

কিন্তু সেই 'বস্তা বস্তা'র আমদানিকারক ছিল কে? ওই যুগের থেকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে থাকা বাড়িটার অন্ধকার অন্তঃপুরে এসে ঢুকতো তারা কোন্ পথে? নতুন নতুন বই আর পত্র-পত্রিকা এসে এসে ঢুকতোও তো!

চলতি সাহিত্যের ওই খবরটা কি সে রাখতো? ওই যোগানদার? নাকি সুবর্ণলতার নির্দেশে খুঁজে আনতো?

সুবর্ণলতার নির্দেশ!

সুবর্ণলতা আবার নির্দেশ দিতে যাবে কাকে?

তা ছিল একজন।

যে নাকি সুবর্ণলতার নির্দেশ মানতে পেলে কৃতার্থ হতো।

ক্ষ্যাপাটে ক্ষ্যাপাটে ছেলেটা, ভালো নামের ধার কেউ ধারতো না, 'দুলো' নামেই বিখ্যাত। স্কুলে ক্লাসে প্রমোশন পাওয়া ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে হারতে দেখা যেত না তাকে। অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা ধরতো দুলো।

সুশীলার কেমন এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, সেই সূত্র ধরে এদের বাড়িটাকে বলতো 'মামার বাড়ি', সুবর্ণকে বলতো 'মামী'।

সুবর্ণকে বই যোগাবার ভার নিয়েছিল সে।

কেন নিয়েছিল কে জানে!

হয়তো তার ক্ষ্যাপাটে বুদ্ধিতে অপরকে খুশি করবার প্রেরণাটাই এর কারণ। সবাইকে খুশি করতে সাধ হতো তার। তা ছাড়া 'মেজমামী'র উপর অহেতুক একটা টান ছিল দুলোর।

বোধ করি হৃদয়ের ক্ষেত্রে কোথায় কোনোখানে তারা ছিল সমগোত্র। এ বাড়ির মেজবৌও যে একটু ক্ষ্যাপাটে, এ তো সর্বজনবিদিত।

কোথা থেকে যে 'দুলো' নানাবিধ বই কাগজ সংগ্রহ করে আনতো দুলোই জানে। সুবর্ণলতা প্রশ্ন করলে, বলতো, 'মল্লিকবাবুর বাড়ি থেকে আনি। মল্লিকবাবু যে সকল বই কেনে গো! টাকার তো অধিবধি নেই ওনার! আর বলে, "দুলো রে, লক্ষ্মী সার্থক হয় সরস্বতীকে কিনে"।'

কী সূত্রে যে দুলো সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র ও সরস্বতীর প্রিয় পুত্র মল্লিকবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়বার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল, সে কথা বোধ হয় দুলো নিজেই ভুলে গেছে। তবে দেখা যায় দুলোর সেখানে অবাধ গতিবিধি। দুলো যথেচ্ছ বই আনে।

ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

সুবর্ণরও হয়েছিল সন্দেহ। চুরি নয় তো?

সে সন্দেহ ব্যক্ত করেছিল সুবর্ণ অন্য প্রশ্নে। বলেছিল, 'তুই তো নিজে পড়তে লিখতে জানিস না, বই চাইলে রাগ করে না?'

দুলোকে কেউ কখনো 'তুমি' করে না।

সুবর্ণও করলো না।

বলল, 'তুই তো পড়িস না? ওরা রাগ করে না?'

দুলো মেয়েদের মত গালে হাত দিত, 'রাগ করবে, কী বল? যারা বই পড়তে ভালবাসে, মল্লিকবাবু তাদের খুব ভালবাসে। মেয়েছেলেরা পড়লে তো আরোই। বলে, "মেয়েছেলেরা যতদিন না মানুষ হচ্ছে, ততদিন আর আমাদের দেশের দুঃখু ঘুচবে না।" ওনার বাড়ির সবাই তো 'ক' অক্ষর গো-মাংস! বলে, "তুই একটা আমার ভক্ত জুটেছিস, তাও মুখ্যু! আমার কপালই এই।" আমি যদি পড়তে ভালবাসতাম, মল্লিকবাবু বোধ হয় আলমারি সুদ্ধু সব বই দিয়েই দিত আমায়!...আচ্ছা মেজমামী, রাতদিন যে "দেশের দুঃখু দেশের দুঃখুটা" করে মল্লিকবাবু, দেশের দুঃখুটা কী?'

'আছে দুঃখু, তুই বুঝবি না—', সুবর্ণ উত্তেজিত হত, 'দেশের কথা আর কি বলেন তোর মল্লিকবাবু?'

'কত বলে! একগাদা লোক আসে, আর ওই গপপোই তো হয় বৈঠকখানায়!'

'তুই শুনিস না সেসব কথা?'

সুবর্ণলতার স্বর চাপা, উত্তেজিত।

দুলো মেজমামীর এই ভাবের কারণটা বুঝতে পারে না। হেসে ফেলে বলে, 'শুনবো না কেন? এক কান দিয়ে শুনি, এক কান দিয়ে বার করি।'

'কেন তা করিস? মনে রাখতে পারিস না?'

দুলো অবাক হয়ে বলে, 'শোনো কথা, আমার কিসের দুঃখু যে ওই শখ করে টেনে আনা দুঃখুকে বরণ করতে বসবো? এ তো বেশ আছি!'

'না, বেশ নেই!' সুবর্ণ উত্তেজিত গলায় বলে, 'আছে দুঃখু। বুঝতে হবে সেটা।'

দুলো মনে মনে বলতো, মল্লিকবাবু আর আমাদের মেজমামীটি দেখছি একই জাতের পাগল। তারপর বলে বসতো, 'মল্লিকবাবু ঠিক তোমার মতন কথা বলে। তোমাকে, যদি দেখতে পেতো, নির্ঘাত খুব ভালবাসতো। দেখার ইচ্ছেও রয়েছে—'

সুবর্ণর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'দূর বোকা ছেলে। বলতে নেই ও-কথা। খবরদার আর ও-কথা কখনো মুখে আনিস নি।'

দুলো ভয়ে ভয়ে বলে, 'বাবু বলছিলো কিনা সেদিনকে—'

'কি বলছিল ?'

'বলছিল, "মেয়েমানুষ হয়ে এত শক্ত শক্ত বই এত তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে, দেখলে আহ্লাদ হয়। তোর মেজমামীকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে দুলো" !'

'চুপ চুপ, একদম চুপ !'

ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে থামিয়ে দিত সুবর্ণ। কিন্তু থামাতে পারতো না নিজের ভিতরের দুরন্ত বাসনার ঢেউকে।

সুবর্ণরই কি ইচ্ছে করে না বই-ভর্তি আলমারি সাজানো সেই স্বর্গীয় ঘরটাকে, আর সে ঘরের মালিককে দেখতে ? যাকে সুবর্ণ দেবতারূপে কল্পনা করে রেখেছে ?

তা দেবতা ছাড়া আর কি ?

যে ব্যক্তি বোঝে লক্ষ্মীর সার্থকতা সরস্বতীকে আহরণ করায়, আর 'দেশের দুঃখ' যার মনকে স্পর্শ করে, দেবতাই সে !

সংসারে এইসব মানুষও আছে।

তিনি নাকি এই 'দুঃখ' নিয়ে আলোচনা করেন, বক্তৃতা দেন, সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল এঁদের সঙ্গে নাকি চেনা-জানা আছে তাঁর, রবি ঠাকুরকে নাকি অনেকবার দেখেছেন তিনি। কী অলৌকিক কথা !

অথচ ওঁর বৌ নাকি ওসব দু'চক্ষের বিষ দেখে। নাকি রাতদিন বাড়িতে গোবরজলের ছড়া দিয়ে বেড়ায় সে, ভিজে কাপড় পরে।

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! পৃথিবীটাই কি তাহলে এই রকম ?

একখানা পত্রিকায় প্রবন্ধ পড়ছিল সুবর্ণ, 'ময়াল সাপের কথা' নিয়ে।

ময়াল সাপ নাকি হিমশীতল আলিঙ্গনে গায়ের উপর পাকে পাকে এঁটে বসে, চোখে ধরা পড়ে না এমন আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে, সে চাপ ক্রমশ বজ্রকঠিন হয়ে বসে।...সেই অদৃশ্য নিষ্ঠুর পেষণে বাইরের চেহারাটা অবিকল রেখেও—চূর্ণ করে ফেলে অধিকৃত শিকারের হাড়গোড়।

পড়তে পড়তে উত্তেজিত হচ্ছিল সুবর্ণ, অন্য আর একটা কিসের সঙ্গে যেন ওই সাপটার প্রকৃতির মিল খুঁজে পাচ্ছিল।...

ঠুক ঠুক করে জানলায় টোকা পড়লো।

উৎফুল্ল মুখে উঠে বসলো সুবর্ণ।

আবার বই !

দুলোর ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। সুবর্ণর এতটা বয়সে একমাত্র ক্ষ্যাপাটে ছেলেটার মধ্যে অকারণ ভালবাসার প্রকাশ দেখেছে।

জানলায় টোকা, এটা বই আনার সঙ্কেত। একতলার একটা গলির পাশের

ঘর বেছে নিয়েছে সুবর্ণ দুপুরবেলার বিশ্রামালয় হিসেবে।

এখান থেকে এই পদ্ধতিটায় কাজ সহজে হয়। দুলো জানলায় টোকা দেয়, সুবর্ণ জানলা খুলে দেয়, সেই পথে বই প্রেরণ করে দুলো।

এ ছাড়া উপায় কি?

নিত্য এত নাটক-নভেল সরবরাহ করছে দেখলে দুলোকে 'পাঁশপেড়ে কাটবে' না এ বাড়ির গিন্নী আর তার ছেলেরা?

এ ঘরটা প্রকৃতপক্ষে বাড়ির যত আপদ-বালাইয়ের ঘর! সিঁড়ির ওপর চিলেকোঠা তো নেই, তাই এই প্রায়-পাতাল ঘর!

ভিতরের অন্ধকার-অন্ধকার দালানের দিকে একটামাত্র দরজা, আর পিছনের অন্ধকার-অন্ধকার গলির দিকে দুটো জানলা। আয়তনের অনুপাতে যাদের 'গবাক্ষ' বলাই সঙ্গত।

এই জানলা দিয়ে সরু যে দুটি আলোকরেখা ঘরে প্রবেশ করে, সেই হচ্ছে সুবর্ণর আলোকবর্তিকা।

ওইটুকুকে সম্বল করে যে পড়তে পারে, সে বোধ করি সুবর্ণ বলেই।

একদা ভাঁড়ারঘর থেকে একটা নড়বড়ে চৌকি বাতিল করে এ ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেটাই সুবর্ণর রাজশয্যা।

'এ ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, গোলমাল নেই' এই ছুতো দেখিয়ে দুপুরে এই ঘরেই পড়ে থাকে সুবর্ণ।

না, এখন আর দুপুরের অবসরে সুপুরি কাটা কি চাল-ডাল বাছার কাজ করতে হয় না বৌদের, তাদের মেয়েগুলো তো ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, তারাই করে।

তা ছাড়া আর যে করে সে করে, সুবর্ণ কিছুতেই না। সুবর্ণর এই মৌতাতটি চাই।

চৌকির মাথার কাছের জানলা খুলে বই পড়ছিল সুবর্ণ, বাকি জানলাটা বন্ধ ছিল। টোকা পড়েছে সেটাতে।

সহাস্য মুখে চৌকি থেকে নেমে এসে জানলাটা খুলে দিয়ে চুপি চুপি বলে, 'আবার পেয়েছিস আজ?'

'চারটে—', দুলো বিগলিত আনন্দে বইগুলো বাড়িয়ে ধরে।

দুলোর মুখে যেন একটা চাপা আনন্দোচ্ছ্বাস!

এ কী শুধুই বইয়ের আহ্লাদ।

সরু জানলা, ঘেঁষাঘেঁষি গরাদে, একটি একটি করে বই টেনে নিতে হয়।

বইগুলো শেষ করেই বলে ওঠে দুলো, 'কপাটটা হাট করে খুলে এখানটায় দাঁড়াও তো মেজমামী!'

'কেন রে?'

বিস্মিত প্রশ্ন করে সুবর্ণ।

দুলো ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে নিশ্চুপের ইশারা করে। নিচু গলায় বলে, 'আছে মজা, দাঁড়াও!'

কাঠের গরাদেতে মুখটা চেপে ধরে সুবর্ণ বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করে, কোথায় দুলোর 'মজা' অবস্থান করছে।

ইতস্তত চাইতেই চমকে উঠলো। সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠলো মুখটা। পরক্ষণেই মাথাটা সরিয়ে নিয়ে চৌকির উপর এসে বসে পড়ল!

এই মজা!
বোকা ছেলেটার এ কী কাণ্ড!
কাকে ডেকে এনেছে ও জানলার নিচেয়?
সন্দেহ নেই ওই মল্লিকবাবু!
না বলে দিলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না।
ছি ছি! এ কী করে বসলো দুলো!

অথচ অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে বসেছে দুলো।

এই দুটো মানুষই যে পরস্পরকে দেখতে পেলে খুশি হবে, এমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল তার, অতএব ভেবে নিয়েছিল সেই খুশিটা করতে হবে।

চালাকি একটু করতে হয়েছে।

মল্লিকবাবুকে বলতে হয়েছে, মেজমামীর "একান্তো" ইচ্ছে তোমায় একবার দেখে। বলে, "এত বই কেনে, আবার অপরকে পড়তে দেয়, কেমন সেই মানুষটি একবার দেখতে সাধ হয় রে দুলো"!'

প্রায়ই বলেছে।

রোজই বলেছে।

এ কথাও বলেছে, 'মেজমামী যদি মেয়েমানুষ না হোত নিজেই আসতো। ওরও তো আবার আপনার মতন "দেশের দুঃখুর" বাই!'

অবশেষে এই ঘটনা।

ভদ্রলোক হয়তো ভদ্রতার বশেই এমন অভদ্র কাজটা করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

কিন্তু সুবর্ণর সে-সব জানবার কথা নয়, তাই সুবর্ণ ভাবে, ছি ছি, উনিই বা কেমন!

তবে কি সুবর্ণ যা ভাবে তা নয়?

বোকা ছেলেটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বই ঘুষ দেওয়াটাও কি তাহলে এই উদ্দেশ্যে?

কিন্তু তাই কি?

সেই মুহূর্তের দেখাতেও উজ্জ্বলকান্তি সেই মানুষটার দুই চোখে যে দৃষ্টি দেখেছে সুবর্ণ, সে কি অসৎচরিত্র পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি?

তা তো নয়।

সে দৃষ্টিতে যেন সসম্ভ্রম পুজো!

সে দৃষ্টি আর কবে কোথায় দেখেছে সুবর্ণ?

দুলো ভেবেছিল ঘটনান্তে ঘুরে সদর দরজা দিয়ে বাড়ি এসে ঢুকবে সে, এবং মহোৎসাহে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করবে কেমন করে এমন কৌশলটি করেছে দুলো!

কিন্তু মেজমামীর সেই মুহূর্তের ভঙ্গিতেই সব সাহস উবে গেল তার।

সর্বনাশ করেছে!

মেজমামী রাগ করেছে!

অথচ বেচারা কত আশায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে আসছে। পলায়ন করা যাক বাবা!

কিন্তু দুলোর সেদিন পলায়ন করা হয় নি।

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটি চোখে পড়েছিল আর কারো নয়, প্রভাসচন্দ্রের চোখে।

শরীরটায় তেমন জুৎ ছিল না বলে, অসময়ে কোর্ট থেকে ফিরে আসছিলো, দূরে থেকে দেখলো দুটো লোক যেন গলিতে ঢুকলো।

একটা তো দুলো, আর একটা?

ধীরে ধীরে ওদের পিছু নিয়েছিলো প্রভাস।

তার পরই চোখে পড়ল এই দুর্নীতিপূর্ণ দৃশ্য!

একটি সুকান্তি ভদ্রলোক ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, মিহি ধুতির লম্বা কোঁচা, মেজবৌয়ের 'বিশ্রামঘরে'র জানলার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো—যেন জুলিয়েটের রোমিও! যেন যমুনাতীরের কেষ্ট!

দুলো হারামজাদা কী যেন একটা জিনিস পাচারও করলো জানলা দিয়ে!

এতেও পুরুষের রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠবে না? বংশমর্যাদার চেতনা নেই মুক্তকেশীর ছেলেদের?

এ যদি প্রবোধ হত, খুন একটা হয়েই যেত আজ মুক্তকেশীর গলিতে! হয় দুলো, নয় ওই প্রেমিকটি!

প্রভাস বলেই প্রাণে বাঁচলো!

লোকটার গায়ে হাত দিতে বেধেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বড়লোকের ছেলে। পরে মোচড় দিয়ে উকিলের ঘরে কিছু এনে ফেলতে হবে।

তাই শুধু রূঢ় কথা, নাম-ঠিকানা জেনে নেওয়ার উপর দিয়েই গেল।

কিন্তু দুলো?

কুটুমের ছেলে বলে কি রেয়াৎ করা হোল তাকে?

না, তা হয়নি।

দুলোর বুদ্ধিটা কম, গতরটা কম নয়। পাড়ার লোক তাকে 'গুণ্ডা' নামে ডাকতো। সেই দুলো সেদিন মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

চাঁদা করে মেরেছিল পাড়ার লোকেরাও।

জবরো কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ পর্যন্ত লটকে পড়েছিল ছেলেটা।

কিন্তু ওইটুকুই কি ঝড়?

মরে তো আর যায় নি যে ঝড়কে 'ঝড়' বলা হবে?

গায়ের ব্যথা মরতে কদিন লাগবে?

ঝড়টা অন্য মূর্তিতে বাড়ির ওপর আছড়ে পড়েছিল।

এ বাড়ির মেজবৌ রাস্তায় বেরিয়ে এসে আধমরা ছেলেটাকে ওই হিংস্রতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। মাথার ঘোমটা খুলে আর গলা তুলে বলেছিল, 'তোমরা মানুষ না কসাই?'

বলেছিলো, 'ওকে কেন? মারো আমাকে মারো! এ মার তো দুলোর প্রাপ্য নয়, আমার প্রাপ্য!'

'বলেছিল, 'আমায় যদি মেরে শেষ করতে, তোমরাও রেহাই পেতে, আমিও রেহাই পেতাম।'

শুধু যে গলাই খুলেছিল তাই নয়, ছেলেটাকে হিঁচড়ে টেনে নিতে নাকি পাড়ার পুরুষদের হাতে হাত ঠেকেছিল তার।

এর পর যে একটা ভয়ানক ঝড় উঠবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

সে ঝড়ের তুলনা মেলে চৈত্র-বৈশাখের সন্ধ্যায়। কালবৈশাখীতে।

সে ঝড়ে গাছ পড়ে, চাল ওড়ে, পাকাবাড়ির দেওয়াল সুদ্ধ দোলে।

যেমন ঝড়ে দর্জিপাড়ার এই গলিটা উদ্দাম হয়ে ওঠে, বীভৎস হয়ে ওঠে। দশ-বারোটা বাড়ির বাসি উনুনের ছাই উচ্ছিষ্ট ভাত আর এ'টো শালপাতায় উপচে ওঠা ডাস্টবিনটা উল্টে গড়াগড়ি খেতে থাকে, পাতা আর নোংরা কাগজের টুকরো ঝাপটে এসে গৃহস্থের ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে, সমস্ত গলিটা আবর্জনার কুণ্ডে পরিণত হয়।

সেই কালবৈশাখীর ঝড় উঠল সেদিন মুক্তকেশীর বাড়িতে।

এতদিনে টের পেয়ে গেছে সবাই, নির্জনে নিচের তলার ঘরে বিশ্রাম করার বাসনা কেন 'সতীলক্ষ্মী' মেজবৌয়ের!

'তেজী পাজী হারামজাদী' এটাই জানতো সবাই, এখন তো দেখা গেল কতখানি নষ্ট, কত বড় জাঁহাবাজ ও!

মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'মানুষের রক্ত যদি তোর গায়ে থাকে তো ও বৌকে লাথি মেরে মেরে ফেল পেবো। আর যদি জন্তু-জানোয়ার হোস তো পরিবারকে মাথায় করে ভেন্ন হয়ে যা। নষ্ট মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করতে মুক্ত-বামনী পারবে না।'

॥ ১২ ॥

ডান হাতে টুকটুকে করে মাজা তামার ঘটি, বাঁ কাঁধের উপর গামছায় মোড়া ভিজে কাপড়ের পুঁটলি। পিছনে বছর ছয়েকের একটা মেয়ে।

কাশী মিত্রের ঘাটের কাছাকাছি একটা পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন মুক্তকেশী। মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দোরটা ঠেল দেখি, আমি আর ছোঁব না।'

কারো বাড়ির বাইরের কপাটে হাত দেন না মুক্তকেশী। কারণ রাস্তার ধাঙড়দের ঝাঁটার ধুলো যে উড়ে উড়ে এই সব কপাটে এসে পড়ে, এ কথা আর কারো হুঁশের মধ্যে না থাকুক, মুক্তকেশীর অবশ্যই আছে।

মেয়েটা দরজাটায় সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে রয়ে যায়, দরজাটা আলগা ভেজানো ছিল মাত্র।

মুক্তকেশী ভিতরে ঢুকে এসে হাঁক পাড়েন, 'জগু, ও জগু, আছিস নাকি?'

জগু মুক্তকেশীর ভাইপো, এবং এই পুরনো দোতলাটি মুক্তকেশীর ভাইয়ের বাড়ি। ভাই অবশ্য গত হয়েছেন অনেককাল, আছেন বিধবা ভাজ শ্যামাসুন্দরী। তা জগুর বদলে তাঁর গলাই পাওয়া গেল। ননদিনীর সাড়া পেয়ে অন্যান্য দিনের মত ছুটে এলেন না তিনি, কোথা থেকে যেন সাড়া দিলেন, 'থাকবে না তো আর যাবে কোন্ চুলোয়? পেঁড়োর মন্দিরে বসে ফোঁটা-চন্দন কাটছে বোধ হয়।'

গঙ্গাস্নান-ফেরত প্রায়ই একবার ভাইপোর বাড়ি ঘুরে যান মুক্তকেশী, ভাজের সহাস্য অভ্যর্থনা জোটেই, আজ এ রকম দূরাগত বংশীধ্বনির হেতু?

যেন বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে সাড়া আসছে। মুক্তকেশী অবাক হয়ে বলেন, 'তুমি কমনে থেকে কথা কইছো বৌ?'

'এই যে যমের দক্ষিণ দোর থেকে। লক্ষ্মীছাড়া হাড়হাবাতে ছেলে ছেকল তুলে রেখে দিয়ে গেছে।'

'ওমা সি কি কথা!'

মুক্তকেশী এগিয়ে আসেন।

পিছনের মেয়েটা হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে, 'মামী-ঠাকুমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে—'

মুক্তকেশীর মুখেও একটু হাসি ফুটে ওঠে। তবে সেটা গোপন করে তাড়া দিয়ে ওঠেন, 'মরণ আর কি! হেসে মরছিস যে—' তারপর কপাটের শিকলটা খুলে দেন ছড়াৎ করে।

রান্নাঘরের মধ্যে বসে কুটনো কুটছিলেন শ্যামাসুন্দরী, মুক্তকেশী ঢুকতেই বঁটিটা ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

মেয়েটা আর একবার হেসে ফেলে পরনের বোঁপাগলা শাড়িখানার আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে বলে, 'মামী-ঠাক্‌মা বুঝি দুষ্টুমি করেছিলে? তবে জ্যাঠা-মশাই শাস্তি দিয়ে গেছে?'

শ্যামাসুন্দরী এ হাসির উত্তরে হাসেন না—বিরক্তিকুঞ্চিত স্বরে বলেন, 'দুষ্টুমি কেন, জন্ম জন্ম মহাপাতক করেছিলাম, তাই এত শাস্তি ভোগ করছি।'

মুক্তকেশী মেঝেয় বসে পড়ে বলেন, 'হলো কি?'

'কী হলো তা জানে যম! আদালতে আজ নাকি মামলার দিন আছে, তাই আমার মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের পাদোদক খেয়ে যাত্রা করবেন!'

মুক্তকেশী মামলা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত আছেন। দেশের জমিজমা নিয়ে মায়ের নামে মামলা ঠুকে বসে আছে জগু।

জমিজমা বাগান পুকুর আছে বেশ কিছু। সব জ্ঞাতিরা খাচ্ছে। তাই শ্যামাসুন্দরী সেই জ্ঞাতি দ্যাওর ও ভাসুরপোদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, 'এই জবরদখলটি ত্যাগ করে তোমরা মানে মানে আমার প্রাপ্য অংশের টাকাটি ফেলে দাও।'

জগু মাকে চোখ রাঙিয়েছে।

বলে, 'বলি প্রাপ্য কার? তোমার না আমার? ওসব আমার ঠাকুর্দার বৈ তোমার ঠাকুর্দার নয়! তুমি পরের বাড়ির মেয়ে, উড়ে এসে জুড়ে বসে 'রমানাথ মুখুয্যের ভিটে থেকে তার বংশধরদের তাড়াবার কে হে?'

অতঃপর মায়ে বেটায় লেগে গেছে লাগ্ ঝমাঝম, ফলশ্রুতি নালিশ! শ্যামা-সুন্দরী দেবী জগন্নাথ মুখুয্যের ন্যায্য সম্পত্তির উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করছেন।

মুক্তকেশী জানেন এ কথা, কিন্তু দরজা বন্ধর ব্যাপারটা রহস্যজনক। তাই হেসে ফেলে বলেন, 'মায়ের সঙ্গে মামলা লড়ে মায়ের পাদোদক জল খেয়ে জিততে যাবে? তা বেশ। কিন্তু ছেকল কেন?'

শ্যামাসুন্দরী উত্তর দেবার আগেই পিছন থেকে উত্তর দিয়ে ওঠে শ্রীমান জগু। বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, 'ছেকল কেন? বলুক—বলুক, ওই নিকষা বুড়ী নিজেই বলুক ছেকল কেন? একদণ্ড পুজোয় বসেছি, অমনি ননদের

কাছে ছেলের নামে লাগানো-ভাঙানো হচ্ছে, কেমন?'

জগু একটা তাচ্ছিল্যের হুঙ্কার ছাড়ে।

পরনে ফরসা হলদেটে রং একখানা খাটো বহরের 'কেটে' ধুতি, লোমশ বুকের উপর একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। পিসির গলার সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে এসেছে দোতলা থেকে।

শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'ওই শোনো ঠাকুরঝি, নন্দেরচাঁদ ভাই-পোর বাক্যি শোনো। তোর নামে লোকের কাছে লাগাতে বসবো, এত সস্তা জিভ আমার নয় রে লক্ষ্মীছাড়া!'

'শুনে যাও পিসি শুনে যাও—,' জগু দরাজ গলায় বলে, 'দেখো পেটে পেটে কী শয়তানির প্যাঁচ! হবে না? দাদামশাইটি আমার কেমন ঘুঘু ছিলেন! নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। তাঁরই কন্যে তো! যেই শুনেছে আজ মামলার দিন, অমনি পা নুকিয়ে বসে আছে! হেতু? না পাছে জবরদস্তি করে পাদোদক জলটুকু নিই।...আমিও বাবা তেমনি বজ্জাত, দিয়েছি দরজায় ছেকল তুলে। বেরোতে তো হবে একসময়। দেখি তখন কেমন করে পা আটকায়? পুজো সেরে এসে ওই চৌকাঠে জল ঢেলে ওৎ পেতে বসে থাকতাম। ছেকল খোলা পেয়ে যেমনি না বেরোবে, পড়বে তো পা জলের ওপর? সেই জল চেটে মেরে দেব—'

নিজের বুদ্ধি-গরিমায় হা হা করে হেসে ওঠে জগু।

শ্যামাসুন্দরী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, 'ওরে আমার মাতৃভক্ত পুত্তুর রে! চব্বিশ ঘণ্টা মাকে পাঁশ পেড়ে কাটছেন, মায়ের নামে মামলা ঠুকে রেখে-ছেন আবার ঢং করে আসেন চন্নামেত্তর খেতে! জুতো মেরে গরু দান!'

সমর্থনের আশায় ননদের দিকে তাকান শ্যামা।

মুক্তকেশী কিন্তু ভ্রাতৃবধূর কথায় সমর্থন করেন না। অসন্তুষ্টভাবে বলেন, 'তা বললে কী হবে বৌ, এ তোমার অন্যেয্য কথা! তুমি যদি সোয়ামীর মরণ-কালে তার কানে বিষমন্তর ঝেড়ে পেটের ব্যাটাকে বঞ্চিত করে যথাসর্বস্ব নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে থাকো, ও কেন হকের ধন ছাড়বে? এ হলো নেয্য দাবির কথা। তা বলে ছেলের তুমি মাতৃভক্তির কসুর পাবে না।'

শ্যামাসুন্দরী যদিও বড় ননদকে যথেষ্ট খাতির করে চলেন, তবু এতটা অসহ্য সব সময় সইতে পারেন না! গর্জন করে বলেন, 'অমন মাতৃভক্তির ক্যাঁথায় আগুন! ও ছেলের মুখদর্শন করলে নরক দর্শনের কাজ মেটে। বলি ঠাকুরঝি, সব্বস্ব নিজের নামে লিখিয়ে নেবো না তো কি সব্বস্ব ওই বাউণ্ডুলে উড়নচণ্ডে অকাল কুষ্মাণ্ড গেঁজেলটার হাতে তুলে দিয়ে ঘুচিয়ে পুচিয়ে দেব? ওর হাতে পড়লে এ ভিটেয় এসে দাঁড়াতে পেতে? একখানা একখানা করে ইঁট বেচে গাঁজা খেত না? আর ওর সেই গেঁজেল গুরুর সেবায় লাগাত না? আবার উদারতা কত! জ্ঞাতিরা লুটেপুটে খাচ্ছে খাক! তাদের ঠাকুর্দার সম্পত্তি! নিজের যে তাহলে এরপর মালা হাতে করে ভিক্ষেয় বেরুতে হবে!'

শ্যামাসুন্দরী একটু দম নেন।

মুক্তকেশী কিন্তু এহেন বিভীষিকার আশঙ্কাতেও দমেন না। জোর গলায় বলেন, 'তা হত হতই! ওর বাপের সম্পত্তি ও ওড়াতো! আর কারুর বাপের বিষয়ে তো নোখ্ ডোবাতে যেতো না! নেশা-ভাঙ আবার কোন্ বেটা-ছেলেটা না করে? তাই বলে হকের দাবি পাবে না?'

'বল তো পিসি বল তো!'

জগু বুকে থাবড়া মেরে মিটমিটি হাসে।

শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত গলায় বলেন, 'ভাইপোর সুয়ো হয়ে খুব তো বলছো ঠাকুরঝি, বলি আজ যদি আমি ওর হাতে পড়ি, কাল আমায় আঁচল পেতে ভিক্ষে করতে হবে না? আমার কি পেটের আর পাঁচটা আছে যে, ও না খাওয়াক আর একজন খাওয়াবে? আমি যাই মা বসুন্ধরার মতন সহ্যশীলা, তাই ওকে সহ্য করছি। অন্য মা হলে ওই ছেলের মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে চলে যেত।'

ভাজকে যে ভালবাসেন না মুক্তকেশী তা নয়। সময়-অসময়ে অনেক করে ভাজ। তবু ঝোল তাঁর কোলে টানেন না। বলেন, 'নুড়ো তোমার বুদ্ধির মুখেই জ্বালতে হয় বৌ! মামলা-মকদ্দমা হল বাইরের কাজ, বাপে-বেটায় হচ্ছে, ভাই-ভাইয়ে হচ্ছে, এই তোমার মতন গুণবতী মায়ের সঙ্গে হচ্ছে, তাই বলে মানুষ ধর্মাধর্ম ছাড়বে? মায়ে-বেটায় লাঠা-লাঠি বলে কি তুমি মরলে ও হবিষ্যি গিলবে না? না মাথা মুড়োবে না?'

জগু এতক্ষণ দুই কোমরে হাত দিয়ে বীরের ভঙ্গীতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, এবার পরম সন্তোষের সুরে বলে, 'এই দেখো জ্ঞানবানের কথা! বুঝলে পিসিমা, এই সহজ কথাটুকু আর ওই নিকষা বুড়ীকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না! কথায় বলে "স্বর্গাদপি গরীয়সী!" বলে কিনা? তুমি জ্ঞানবান, বুঝমান, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে!'

শ্যামাসুন্দরী টিটকিরি দিয়ে ওঠেন, 'তা সুখ থাকবে না কেন? কোলে ঝোল টানলে সবাই জ্ঞানবান! বলি, তোমার ছেলেরা এ রকম হলে কী বলতে ঠাকুরঝি! ভাগ্যিগুণে তারা সবাই ভাল, তাই। আমার হচ্ছে এক ব্যান্নন নুনে বিষ!'

'ভাগ্যিগুণে নয় হে—বুদ্ধির গুণে!' জগু রায় দেয়, 'পিসির ছেলেরা কি অমনি ভাল হয়েছে? কথাতেই আছে "যেমন মা, তার তেমন ছা!" তা যেমন তুমি তেমনি তোমার পুত!'

'জ্ঞানপাপী!'

বলে শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে আবার কুটনো কুটতে বসেন।

মুক্তকেশীও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বলেন, 'তাও বলি বৌ, ছেলে কেন বাউণ্ডুলে হবে না? বয়েস পার হয়ে গেল ছেলের, তুমি বিয়ে দিলে না—'

কথাটা সত্যি।

বিয়ের বয়েস কোন্ কালে পার হয়ে গেছে জগুর। মুক্তকেশীর বড় ছেলে সুবোধের থেকেও বড় সে। কিন্তু পাত্র হিসেবে যে সুপাত্র নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেবেলা থেকে কেমন করে যেন গাঁজার আড্ডায় ভিড়ে পড়েছিল, আবার এখন এক অবধূত বাবার শিষ্য হয়েছে।

মুক্তকেশী আগে বহু চেষ্টা করেছেন হাল ধরতে, কিন্তু নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে সক্ষম হন নি। হন নি অবশ্য জগুরই প্রবল প্রতিবন্ধকতায়, তবু তিনি যখন তখন ভাজকেই দোষী করেন। এখনো করলেন, 'বয়সের ছেলে, সময়ে বে-থা না হলে—'

'থামো ঠাকুরঝি, ওকথা মুখে এনো না আর—,' শ্যামাসুন্দরী গুরুজনের সম্মান ভুলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'নিজে তো ওই এক ভূত বিইয়ে জ্বলে পুড়ে

মরছি। আবার কি পরের মেয়ের কপালে তেঁতুল গুলতে সেই ভূতের বিয়ে দেব? পাগল তো হই নি এখনো!'

প্রশ্নটা তামাদি হয়ে গেছে, তবু মুক্তকেশী অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'তার মানে তুমি চাও আমার বাপের বংশটা লোপ পাক?'

'পেলে আর করছি কি!' শ্যামাসুন্দরী বলেন 'কত কত রাজা-বাদশার বংশ লোপ পাচ্ছে!'

'তবে আর কি! লোকের গলা কাটা যাচ্ছে তো আমার গলাটাও কাটি! তুমি না দাও, আমি এবার জগুর বিয়ে দেব। বলতে কি, সেই উদ্দিশ্যেই আসা আজ। গঙ্গার ঘাটে এক মাগী কেঁদে পড়লো। বলে, "গলায় গলায় আইবুড়ো মেয়ে, ইচ্ছে হয় যে গলায় দড়ি দিই! দিদি যদি একটা পাত্তরটাত্তর দেখে দেন!" আমার মনে এল জগুর কথা। এখনো যদি ধরে করে একটা বিয়ে দিতে পারা যায়—'

জগু বলে ওঠে, 'এই দেখো পিসির দুর্মতি! বলি নিজেই তো বলে মর, ছেলেগুলো তোমার সব বৌয়ের গোলাম হয়ে আছে, বৌরা কান ধরে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে, আবার এ হতভাগার কানের মালিক আনার চেষ্টা কেন?'

মুক্তকেশী সহাস্যে বলেন, 'শোনো কথা ছেলের! আগে থেকেই বুঝি গোলাম হয়ে বসছিস? বলি, সবাই তা হবে কেন? বৌকে পায়ের পাপোষ করে রেখে দিষ্টান্ত দেখা তুই!'

'হুঁ, দেখাবো বললেই দেখানো হয়!' জগু বিচক্ষণের ভঙ্গীতে বলে, 'এই বেড়ালই বনে গেলে বন-বেড়াল হয়, বুঝলে পিসি? তার ওপর আবার আমার রক্তে আমার বাপের গুণ!'

'বটে, বটে রে হতভাগা পাজী বাঁদর—', শ্যামাসুন্দরী ছিটাফটিয়ে ওঠেন, 'দূর হ, দূর হ আমার সুমুখ থেকে। মরা বাপকে গাল দিচ্ছিস লক্ষ্মীছাড়া? নরকেও ঠাঁই হবে তোর?'

'নরকে ঠাঁই চাইতে যাচ্ছে কে?' জগু বুকে আর একটা থাবড়া মেরে বলে, 'সগ্‌গো থাকতে নরকে যেতে যাব কী দুঃখে? মরণকালে "মা মা" করে মরব, মাতৃনামে তরে যাব। তবে ওই বিয়ে-টিয়ের কথা কইতে এসো না পিসি। বিয়ে করেছি কি গোল্লায় গেছি!'

'তা যা বলেছিস—'

মুক্তকেশী সহসা নিজ যুক্তি বিস্মৃত হয়ে একগাল হেসে বলেন, 'তা যা বলেছিস। এ ছোঁড়া দেখছি না পড়েই পণ্ডিত! বলেছিস ঠিক। আমার ছেলেগুলো কি আর মনিষ্যি আছে? বিশেষ করে পেবোটা! যেটা নাকি সব চেয়ে ডাকাবুকো ছিল! সেরেফ ভেড়া হয়ে বসে আছে। বৌ দজ্জালি করলে তেড়ে একবার করে মারতে আসে, আবার কেঁচো হয়ে গুটিয়ে পালায়। লাখোবার বলেছি, ও বৌ ত্যাগ দিয়ে আর একটা বিয়ে কর। সে সাহসও নেই। দিলে একবার বাহাদুরি দেখিয়ে বিদেয় করে, ওমা বৌ কিনা তৎক্ষণাৎ বাপের সঙ্গে ফিরে এল!'

এবার জগু একটু গম্ভীর হয়।

বলে, 'এটা পিসি তোমার অন্যায্য কথা হচ্ছে। তোমার মেজবৌকে তুমি অন্যায় নিন্দে কর। সুবো আমায় বলেছে, "আমার মায়ের হাতে না পড়ে অন্যত্র পড়লে, ওই বৌয়ের ধন্যি ধন্যি হত"।'

মুক্তকেশী সহসা যেন আকাশ থেকে হাত-পা ভেঙে ধপাস করে পড়েন।
সুবোধ!
সুবোধ বলেছে এই কথা!
কেন?
রীত-চরিত্তির মন্দ হয়ে যাচ্ছে না তো হতভাগার! ওই জাঁহাবাজ ভাদ্দর-বৌয়ের গুণ দেখেছেন তিনি! ভাদ্দরবৌ তাহলে গুণ-তুক করছে!
বড় দুঃখে আর রাগ আসে না—রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'বটে! এই কথা বলেছে সুবো?'
'বলে তো! যখন তখন বলে! তা যাই বল পিসি, তুমিও তো সোজা মায়ের সোজা মেয়ে নও! জানি তো আমার ঠাক্‌মাকে! কী নিধিটি ছিলেন!'
মুক্তকেশী এবার ভয় খান।
কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেটা কী বলতে কী বলে ঠিক কি?
উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, গঙ্গাচ্ছান করে এসে মাতৃনিন্দে শুনছি বসে বসে। চললাম বৌ। ..এই ছুঁড়ি, চল। ওমা, কোথায় আবার গেল মুখপুড়ী?'
'গেছে ওইদিকে বোধ হয় পেয়ারা পাড়তে!'
'রাক্ষুসী যেন পেয়ারার যম। আবার এখন—'
শ্যামাসুন্দরী আবহাওয়া হাল্‌কা করতে বলেন, 'তা সে আর কোন্‌ মেয়ে-ছেলেটা নয়?'
'তা তো নয়—', মুক্তকেশী আর একবার তোলা প্রসঙ্গ পেড়ে নামান, 'এই তো বললে তো? আমার মেজ বৌমার কাছে বল গিয়ে? শুনবে পেয়ারা খেলে নাকি পেট কামড়ায় ওঁর ছেলেমেয়েদের? চাঁপিটাকে সঙ্গে আনা বন্ধ করেছি কি সাধে? মা দজ্জাল, মেয়েটা তো আমার পায়ের কাদা! "ঠাক্‌মা তোমার সঙ্গে যাব" বলে রসাতল! মেম মা বলেন কিনা, গঙ্গার ঘাটে বুড়ীদের দলে বসে রাজ্যের পাকা পাকা কথা শিখবে আর রাজ্যের ফল-পাকড় গিলে অসুখ করাবে—'
আমি বলি, 'ও বটে! আচ্ছা! রইল তোমার মেয়ে। মাথা খুঁড়ে মরলেও আনি না আর। বড়বৌমার এইটেকে নিয়ে আসি।'
জগু বলে, 'এটা কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতা পিসি।'
'তা নিষ্ঠুর বলিস নির্মায়িক বলিস, সবই শুনতে হবে!' মুক্তকেশী উদাস গলায় বলেন, 'সেদিন সেই কথার পর প্রবোধ কি এসে পরিবারের হয়ে হাতজোড় করে মাপ চেয়েছে? বলেছে কি "মা, তুমি থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ড্যাংডেঙিয়ে নাতনীদের নিয়ে গঙ্গাচ্ছানে যাবে, যা ইচ্ছা কিনে খাওয়াবে!" বলে নি তো? তবে? তবে আর কিসের মায়া-মমতা আমার?"
জগু সহসা উদ্দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, 'তবে যদি বললে পিসি, এ তোমার শিক্ষার দোষ। এ যদি তোমার গোঁয়ার-গোবিন্দ জগু হত, বৌকে মেপে সাত হাত নাকে খৎ দেওয়াতো। মায়ের ওপর ট্যাঁফোঁ! স্বর্গাদপি গরীয়সী না? আমার মা, আমি পাঁশ পেড়ে কাটতে পারি, তা বলে পরের মেয়ে উঁচু কথা বলবে? শাস্তরে বলেছে—'
শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'থাম্‌ খুব ধাষ্টামো হয়েছে! তোর মুখে শাস্ত্রবাক্য শুনলে স্বর্গে বসে মুনি ঋষিরা গালে মুখে চড়াবে!'

'ওই শোনো! দেখছো পিসি, কেন দু-চক্ষের বিষ দেখি বুড়ীকে? দশে ধর্মে বলেছে কুপুত্র যদ্যাপি হয় কুমাতা কদাপি নয়! অথচ আমার ভাগ্যে হলো উল্টো! ভগবানের রাজ্যে একটা বেতিক্রম পটলের মা পলতাপাতা, আর এই সংসারে এক বেতিক্রম জগার মা শ্যামাসুন্দরী! মাতৃনাম উচ্চারণে পাপ নিও না ঠাকুর। মাগো মা শ্যামা মা! যাক্ পিসি, বড়মানুষের মেয়েকে তুমি হুকুম করে যাও দিকি, ওই ওখানে শ্বেতপাথরের বাটিতে জল আছে, কৃপা করে একটু চরণ ডুবিয়ে রাখতে!'

'ফের জগা?'

শ্যামাসুন্দরী ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'ফের ধাষ্টামো?'

'চোখ রাঙিও না বলছি মা জননী—', জগুও সমান গলায় বলে, 'বেশি বাড়াবাড়ি করবে তা ওই ঠ্যাঙ দুখানি ভেঙে এইখানে শুইয়ে রেখে দেব।'

মুক্তকেশী আপসের সুরে বলেন, 'তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমিই বা কেলেঙ্কার করছ কেন বৌ, দিয়ে দাও না!'

শ্যামাসুন্দরী সহসা দুমদুম করে গিয়ে সেই পাথরবাটি-রক্ষিত জলে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা ডুবিয়ে আবার এসে বসে পড়েন।

জগু সাবধানে বাটিটা উঠিয়ে নিয়ে সোল্লাসে বলে, 'ব্যাস, কেল্লা ফতে! দেখি এখন রাবণ জেতে কি নিকষা জেতে!'

ঝগড়ার শেষ শোনার সময় নেই, বেলা হয়ে যাচ্ছে। মুক্তকেশী ডাকেন, 'টেঁপি, এই হারামজাদী আয় না?'

টেঁপি এগিয়ে আসে।

জগু তার হাতে চারটে পয়সা দিয়ে বলে, 'পুতুল কিনিস।'

'আবার পয়সা কেন?' মুক্তকেশী অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'নিত্যি তোর পয়সা দেওয়া! ছুঁড়িও হয়েছে তেমনি লুভিষ্টে! হাত পেতেই আছে। নে চল চল, রোদ উঠে গেল। চলি বৌ। বলি হ্যাঁ গো, থরে থরে কত কুটনো কুটেছো! মা ব্যাটা দুটো মনিষ্যিতে তো খাবে!'

শ্যামাসুন্দরী চরম বিরক্তির স্বরে বলে, 'ব্যাটা যে একাই একশো! বাহান্ন ভোগ না হলে গলা দিয়ে ভাত নামবে? মাছ খাবি, চারখানা মাছ-সর্ষে রেঁধে দেব চুকে যাবে, তা নয়, মার হেঁসেলে নিরিমিষ্যি গিলবো! হাড়মাস পুড়িয়ে খেলো। আজ আবার আদালতের সমন, এক্ষুনি বলবে "ভাত দাও"! তখন জলে পড়ি কি আগুনে পড়ি!'

মুক্তকেশী আর দাঁড়ান না।

বাইরে আগুনের মত রোদ উঠে গেছে। বেলা দশটাতেই এত রোদ। মুক্তকেশীর মনে হয়, পৃথিবীর আবহাওয়াও বুঝি বদলে গেছে। তাঁদের বয়েসকালে আষাঢ় মাসে এত রোদ কখনো ছিল না।

পথে বেরিয়ে টেঁপি আবদারের সুরে বলে, 'একটা পাল্কি ডাকো না ঠাক্মা, হাঁটতে ভালো লাগছে না।'

মুক্তকেশী চড়া গলায় বলেন, 'ভাল লাগে না তো আসিস কেন লক্ষ্মীছাড়ি! গঙ্গাচ্ছান করে মানুষের কাঁধে চড়বো!'

'আহা, গঙ্গার ঘাটের সেই মুটকি বুড়ীটা রোজ পাল্কি চড়ে না?'

মুক্তকেশী বুড়ীর উল্লেখে হেসে ফেলে বলেন, 'সে বুড়ীর ক্ষ্যামতা নেই তাই চড়ে। পাল্কি আর আছেই বা কই? দেখতেই তো পাই না? যাবে,

আস্তে আস্তে সবই উঠে যাবে। পালকি যাবে, আব্রু যাবে, গুরুজনে ভক্তি-ছেদ্দা যাবে, ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যি সবই যাবে। স্বদেশীর হুজুগে দেশ ছারেখারে যাবে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।...সাহেবের রাজ্যিপাট, তোরা যাচ্ছিস তাদের উৎখাত করতে! বলি ওদের উচ্ছেদ করে করবি কি! রাজ্যি চালাবি? হুঁ! সুখের পৃথিবীতে ইচ্ছে করে আগুন জ্বালা!'

এসব কথা নাতনীর জন্যে নয়, মুক্তকেশীর এ স্বগতোক্তি পালকির সূত্রে বেরিয়ে পড়া ভিতরের উষ্মা। পথেঘাটে কেবলই শোনেন, কিনা স্বদেশীওলারা সাহেবদের উচ্ছেদ করবার তালে আছে। বোমা করছে, গুলি বন্দুক গোছাচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে ওই আলোচনা শুনে শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। ওদের রাজ্যপাট, তোরা কেড়ে নিবি? ওদের সঙ্গে পারবি? বামন হয়ে চাঁদে হাত?

হঠাৎ স্বদেশীদের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠেন কেন মুক্তকেশী কে জানে!

মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন নিজের জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁক ধরা পড়ে গেছে তাঁর চোখে।

কিসের এই শূন্যতা?

তাঁর রাজ্যপাট তো পুরোদস্তুর বজায় আছে। তবে হঠাৎ সাহেবের রাজ্যপাট বেদখল হবার চিন্তায় মেজাজ ক্ষিপ্ত হয় কেন?

গোঁয়ার-গোবিন্দ জগুর মা'র ওপর কি সূক্ষ্ম একটা ঈর্ষাবোধ আসছে? কেন? মুক্তকেশীর ছেলেরা কি মাতৃভক্তিতে কম? তাই জগুর অভিনব মাতৃভক্তি তাঁকে ঈর্ষায় পীড়িত করেছে?

মাতৃভক্তিতে কসুর কোথায় মুক্তকেশীর ছেলেদের? তবু গভীর এই শূন্যতার বোধটা ভরাট করে তুলতে পারছেন না বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে। মুক্তকেশীর নিজের হৃদয়ে ছেলেদের ঠাঁই নেই, না ছেলেদের হৃদয়ে মুক্তকেশীর ঠাঁই নেই? ঠাঁই থাকলে ভরাটত্ব থাকবে না কেন? শ্যামাসুন্দরীর মধ্যে যে ভরাটত্বটা দেখে এলেন এইমাত্র?

ছেলের বিয়ে দেওয়াটাই কি তাহলে বোকামি? হাতের কড়ি পরকে বিলিয়ে দেওয়ার মত?

'অ ঠাক্‌মা, অত জোরে হাঁটছো কেন? আমি বুঝি পারি?'

'পারিস না তো আসিস কি করতে?' মুক্তকেশী গতিবেগ একটু কমিয়ে বলেন, 'আমি বুড়ী পারছি, তুমি জোয়ান ছুঁড়ি পারছ না? তোদের বয়সে লোহা ভাঙতে পারতাম, তা জানিস?'

কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়।

অসামান্য গতর ছিল, এখনো আছে। কথায় বলে মরা হাতী লাখ টাকা! আখ কখনো দাঁতে ছাড়িয়ে ভিন্ন বঁটিতে ছাড়িয়ে খান না, নিত্য ডালবাটা পোস্তবাটা খেয়ে অবলীলায় হজম করেন। জলের কলের মধ্যে চামড়া আছে, এই বিচারে বিধবা হয়ে পর্যন্ত কখনো কলের জল খান নি। দৈনিক দু ঘড়া করে 'ভারি'র গঙ্গাজল তাঁর বরাদ্দ।

নিষ্ঠাবতী বলে বিশেষ একটা নামডাক আছে মুক্তকেশীর। পাড়ার লোক সমীহর দৃষ্টিতে দেখে। মুক্তকেশীকে পথে বেরোতে দেখলেই রাস্তার ছেলেরা ডাংগুলি খেলা স্থগিত রাখে, মারবেল খেলতে খেলতে চকিত হয়ে দাঁড়ায়।

দোবরা চিনিতে হাড়ের গুঁড়ো আছে বলে কখনো সন্দেশ রসগোল্লাটি পর্যন্ত খান না মুক্তকেশী, রাতে আচমনী খান না। অম্বুবাচীর কদিন অশুদ্ধ

বসুমতীর সংস্পর্শ ত্যাগ করে দৈনিক একবার মাত্র গঙ্গাগর্ভে দাঁড়িয়ে মধু আর ডাব পান করেন। এমন আরো অনেক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের তালিকা আছে মুক্তকেশীর, তাই তাঁর চেহারাতেও রুক্ষ-কাঠিন্য।

মুক্তকেশীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে আজকের শূন্যতার মিল নেই। তিনি তো বরাবর ভালোবাসার চেয়ে ভয়কেই মূল্য দিয়েছেন বেশি। ভেবেছেন, ওটাই সংসারের পায়ের তলার মাটি। তবে আজ কেন গোঁয়ার জগুর মাতৃপাদোদক পান করার মত হাস্যকর ব্যাপারটা বার বার মনে পড়ছে? কেন মনে হচ্ছে শ্যামাসুন্দরী একটা উঁচু পাথরের বেদীতে বসে আছেন, মুক্তকেশী নীচে থেকে মুখ তুলে দেখছেন?

'ও ঠাক্‌মা, পাল্কি নেবে না?'

টেঁপির আবদারের সুর ধ্বনিত হয়।

মুক্তকেশী হঠাৎ যেন নরম হন। বলেন, 'পয়সা খরচা না করিয়ে ছাড়বি না, কেমন? কই দেখি কোথায় পাল্কি?'

'ওই তো ওখানে বসে রয়েছে—'

মুক্তকেশী দেখেন একটা গাছতলায় বসে রয়েছে বটে পাল্কি নামিয়ে দুটো বেহারা।

হাতছানি দিয়ে ডাকেন।

তারপর তাতে উঠে বলেন, 'তোর মা যা কঞ্জুষী, আক্কেল করে দেবে ভাড়াটা! দেবে না। চাঁপির মা'র আর কোন গুণ না থাক এটা আছে।'

টেঁপি মুখখানা বেজার করে বলে, 'চাঁপির মা'র হাতে তো রাতদিন পয়সা, আমার মা'র আছে বুঝি? বলে মা'র একটা চাবির রিং কেনবার ইচ্ছে কবে থেকে, তাই হয় না!'

মুক্তকেশী তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'না হলে আর কার কী দোষ? লাখ টাকায় বামুন ভিখিরি! কেন, তোর বাবা কি "উপায়" কম করে?'

হ্যাঁ, এ ধরনের কথা ক্ষুদে ক্ষুদে নাতি-নাতনীদের কাছে হামেশাই বলে থাকেন মুক্তকেশী। যা কিছু বলার ইচ্ছে, যা কিছু বক্তব্য, বেশীর ভাগই তো ওই ছোটগুলোকে মাধ্যম করেই উচ্চারণ করেন। ঠিক জানেন, সরাসরি বলার হাঙ্গামাটা না পুইয়েও সরাসরি বলার কাজটা এতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তো গিয়ে মায়েদের কর্ণগোচর করবে ওরা।

ওরা পাকা পাকা কথা শিখবে?

ওমা, তাতে কী এল গেল!

মুক্তকেশীর 'মেম' মেজবৌমার মত আর কে বলতে যাবে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পাকা কথা শিখবে!

কিন্তু মুক্তকেশীর সেই মেজবৌ কি এখনো টিকে আছে তাঁর বাড়িতে? সেদিনকার ঝড়ে উড়ে পড়ে যায় নি সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়?

তাই তো যাবার কথা।

রাগে দুঃখে অপমানে ধিক্কারে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে যাবার কথা তো প্রবোধের: অথবা নষ্টচরিত্র স্ত্রীকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার কথা!

কিন্তু তার কিছুই হয় নি।

আবার সুবর্ণ রান্নাঘরে এসে হেঁসেলের 'পালা' ধরেছে, আবার খেয়েছে ঘুমিয়েছে, কথা বলেছে।

তারপর ?

তারপর তো আরো দুই মেয়ে আর দুই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সুবর্ণর এ বাড়ির নীচের তলার সেই ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে আঁতুড়ঘরটায়। যে ঘরে বছরে অন্তত পাঁচ-সাতবার সদ্যোজাতের কান্না ওঠে।

অদৃশ্য অন্ধকার জগতে অবস্থিত যে সব বিদেহী আত্মারা পৃথিবীর আলো-বাতাসের আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হয়ে ঘোরে, তাদের মুক্তির মাধ্যম তো এই সুবর্ণলতার দল! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যারা মা হতে বাধ্য হয়! তাদের নিষ্ফল প্রতিবাদ নিঃশব্দে মাথা কুটে মরে, অথবা যারা এই ঘটনাটাকেই 'স্বামীসুখ' বলে মনে করে!

কিন্তু সে যাক, কথা হচ্ছিল সেদিনের ঝড়ের। যে ঝড়ের দিন সুবর্ণ-লতার উদারচিত্ত ভাসুর পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'ওই নাটক নভেল পড়াটা বন্ধ করা দরকার। ও থেকেই যত অনিষ্ট এসে ঢোকে সংসারে!'

অতএব কালীর দিব্যি দিয়েছে প্রবোধ স্ত্রীকে, দিয়েছে নিজের দিব্যি। রাত্রিকালে নিশ্চিন্ত অবকাশে বুঝিয়েছিল, নভেল পড়ার কি কি দোষ।

কিন্তু বেহায়া সুবর্ণ সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও এক অদ্ভুত কথা বলে বসেছিল। বলেছিল, 'বেশ, তুমিও একটা দিব্যি গালো!'

'আমি? আমি কি জন্যে? আমি কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি?'

'না, তুমি কেন পড়বে, সব চোরদায়ে ধরা পড়েছে মেয়েমানুষ! কেন বলতে পারো? কেন?'

'কেন? শোনো কথা!'

এর বেশি আর উত্তর যোগায় নি প্রবোধের।

সুবর্ণ হঠাৎ প্রবোধের একটা হাত ঘুমন্ত ভানুর মাথার ওপর ঠেকিয়ে বলে উঠেছিল, 'তুমিও দিব্যি কর তবে, আর কখনোও তাস খেলবে না?'

'তাস খেলবো না! তার মানে?'

'মানে কিছু নেই। আমার নেশা বই পড়া, তোমার নেশা তাস খেলা। আমাকে যদি ছাড়তে হয় তো তুমিও দেখো, নেশা ছাড়া কী বস্তু। বল আর কখনো তাস খেলবে না!'

প্রবোধের সামনে আসন্ন রাত্রি।

আর বহু লাঞ্ছনায় জর্জরিত স্ত্রী সম্পর্কে বুক-দুরু-দুরু আতঙ্ক।

আবার কী না কি কেলেঙ্কারি করে বসে কে বলতে পারে! তবু সাহসে ভর করে একবার বলে ফেলে, 'চমৎকার! মুড়ি-মিছরির সমান দর!'

সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে উঠেছিল, 'কে মুড়ি কে মিছরি, তার হিসেবই বা করেছিল কে, আর তাদের দর বেঁধে দিয়েছিলই বা কোন্ বিধাতা, বলতে পারো?'

আশ্চর্য, এত লাঞ্ছনাতেও দমে না মেয়েমানুষ। উল্টে বলে, 'লজ্জা আমার করার কথা, না তোমাদের করার কথা সেটাই বরং ভাবো!'

প্রবোধ অতএব বলে বসেছিল, 'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, করছি দিব্যি!'

'খেলবে না আর কখনো তাস?'

'খেলবো না। হল তো! তা আমার বেলায় তো বেশ হলো, নিজের প্রতিজ্ঞা?'

'বলেছি তো, তুমি যদি আর তাস না খেলো, আমিও বই পড়বো না।'

'আমার সঙ্গে কি তা তো বুঝলাম না! হলো পরপুরুষের সঙ্গে মাখামাখি—'

'খবরদার! আর একবারও যেন ওকথা উচ্চারণ করতে শুনি না, ইতর ছোটলোক!'

'বাঃ বাঃ, একেই তো বলে পতিব্রতা সতী! সতী স্ত্রীলোকেরা—'

'তোমাদের হিসেবমতন সতী আমি নই, নই, নই। হলো!'

'সুবর্ণ রুদ্ধগলায় বলে, 'ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছো মনে রেখো। পয়সা বাজি ধরে তাস খেলা! ও তো জুয়া খেলা! জুয়া খেললে পাপ হয় না তোমাদের? নাকি পুরুষের পাপ বলে কিছু নেই?'

'পুরুষের আবার পাপ নেই!' প্রবোধ বলে, 'মহাপাপ হচ্ছে বিয়ে করা।' বলেই সবলে আকর্ষণ করে সুবর্ণলতার পাথর-কঠিন দেহটাকে।

তারপর?

গড়িয়ে চলে দিনরাত্রি।

যথানিয়মে সকালে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায়, মুক্তকেশী গঙ্গাস্নানে যান, মুক্তকেশীর ছেলেরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় আর ছুটির দিন সারাদিন তাসের আড্ডা বসায়, বড়বৌ রাশি রাশি পান সেজে বৈঠকখানায় পাঠায়, বাড়ির ছেলেরা ঘন ঘন তামাক সাজে।...

আজকাল আবার আর এক নতুন ফ্যাসান উঠেছে চা খাওয়া। চায়ের সাজসরঞ্জাম কেনা হয়েছে, মহোৎসাহে চা বানিয়ে তাসের আড্ডায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

চলছে যথারীতি।

কিন্তু মুক্তকেশীর মেজছেলে!

সে কি যোগ দিচ্ছে তাসের আড্ডায়?

তার চরিত্র কোন্ কথা বলে?

॥ ১৩ ॥

বাসনমাজা ঝি হরিদাসী পুজোয় পাওয়া কাপড়খানা বাসায় নিয়ে গিয়ে আবার ফেরত দিতে এল। বলল, 'নাট্টুমার্কা কাপড় চলবে নি ঠাকুমা, ও বিলিতি কাপড় আমাদের বস্তিতে বারণ হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যের দিকে ইদানীং যেন মুক্তকেশী চোখে একটু কম দেখছেন, তাই সহসা ঠাহর করতে পারলেন না ব্যাপারটা কি। চোখ কুঁচকে ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বললেন, 'কি বললি! কিসের কি হয়েছে?'

'বারণ হয়ে গেছে গো ঠাকুমা, বিলিতি কাপড় পরা বারণ হয়ে গেছে! ও পরলে নাকি দেশের শত্তুরতা করা হবে!'

মুক্তকেশী চোখে-কানে যদিই বা কিঞ্চিৎ খাটো হয়ে থাকেন, গলায় খাটো

হন নি। রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'কাপড় ফেরত দিতে এসেছিস! এত বড় আস্পদ্দা! বাজারের সেরা কাপড় এনে দিয়েছে মেজবাবু, আর তুই...কই পেবো কোথা গেল? দেখে যাক ছোটনোককে 'নাই' দেওয়ার ফল! কাঁচা পয়সা হয়েছে তাই দু হাতে পয়সা ছড়াচ্ছে বাবু। ঝিয়ের কাপড় চোদ্দ আনা! ওই যে—পরিবার রাতদিন বলেন, "ঝি বলে কি মানুষ নয়? গরীব বলে কি মানুষ নয়?" তারই ফল! তখনই বলেছিলাম, এত বাড়াবাড়ি ভাল নয় পেবো, যা রয়-সয় তাই কর। ও-কাপড় বদলে আট-ন আনার একখানা কাপড় এনে দে। সে কথা শোনা হল না, এখন দেখে যাক আস্পদ্দা! সেই কাপড় অপছন্দ করে ফেরত দেওয়া—'

হরিদাসী বেজার মুখে বলে, 'অপছন্দ আমি করি নি ঠাকুমা, বলেছি পরা চলবে নি।'

'ওলো থাম্ থাম্, তুই আর কথার কায়দা শেখাতে আসিস নি! যার নাম ভাজাচাল তার নামই মুড়ি, বুঝলি? ছোটমুখে লম্বা লম্বা কথা!'

হরিদাসী আরো বেজার গলায় বলে, 'ছোটনোকে কথা কইলেই তোমাদের কানে "লম্বা" ঠেকে ঠাকুমা! বদ্‌লে না দাও কাপড় চাই না, গালাগাল কোর না।'

'গালাগাল! গালাগাল করি আমি?' মুক্তকেশী ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, বলেন, 'বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?'

তা কালটা তখনো তাই ছিল।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব ঘটত না। তবু কে জানে কোন্ দুঃসাহসে হরিদাসী চাকরি যাওয়ার ভয়ে কেঁদে পড়ে বলে উঠল না, 'কাল মা দুগ্‌গার পুজো, এই বছরকার দিনে তুমি আমার অন্নটা খেলে ঠাকুমা!'

না, বলে উঠল না।

কে জানে কোন্ শক্তিতে শক্তিলাভ করে অপ্রসন্ন গলায় বলে উঠল, 'অন্যায় রাগ করলে নাচার ঠাকুমা! তোমার একখানা কাপড় পরে তো বাসায় আমি জাতে ঠেকা হয়ে থাকতে পারি না। দেখ গে যাও না, রাস্তায় কী কাণ্ডটাই হচ্ছে! পুলিসের হাতে মার খেয়ে মরছে, তবু মানুষ "বন্দে মাতাং!" বলছে! এতটুকুন-টুকুন ছেলেগুলো পর্যন্ত মার খাচ্ছে, গান গাইছে। দোকান থেকে কাপড় লুঠ করে বাবুরা সব বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তর-যজ্ঞি করছে, এরপর সব নাকি স্বদেশী হবে, নেকচারবাবুরা সেই সেই নেকচারই দিয়ে বেড়াচ্ছে।...আমাদের বস্তিতে পর্যন্ত তোলপাড় কাণ্ড চলছে। খালি এ বাড়ির বাবুদেরই চোখে কানে ঠুলি আঁটা!'

ছেলের বার্লির বাটি হাতে করে রান্নাঘর থেকে আসছিল সুবর্ণলতা, দাঁড়িয়ে পড়েছে কাঠ হয়ে। বাটিটা কাত হয়ে গিয়ে বার্লি পড়ে গড়াতে শুরু করেছে সে খেয়াল নেই।

এ বাড়ির বাবুদের চোখে-কানে ঠুলি আঁটা!

এ বাড়ির বাবুদের চোখে-কানে ঠুলি আঁটা!

এ বাড়ির বাবুদের!

চোখে-কানে ঠুলি!

সুবর্ণলতার মাথার মধ্যে লক্ষ করতাল বাজতে থাকে, 'এ বাড়ির বাবুদের—।'

বাঁসনমাজা ঝিয়ের মুখে শুনতে হলো, এ বাড়ির বাবুদের চোখে কানে ঠুলি! যে কথা সুবর্ণলতা ভাবছে, সে কথা ওর চোখেও ধরা পড়ে গেছে তাহলে!

সুবর্ণলতা তো জানতো, শুধু এ বাড়ির বাবুদের চোখেই নয়, ঠুলি আঁটা এ বাড়িটারও। আষ্টেপৃষ্ঠে ঠুলি আঁটা। রাজরাস্তার মুখর হাওয়া এ গলির মধ্যে ঢুকে আসে না। বস্তিতে যায়, যায় গাছতলায়, শুধু এ গলির মধ্যে ঢুকতে চাইলে, গলির বাঁকে বাঁকে ভাঙা দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে বোবা হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য, সুবর্ণলতার চোখ-কান এত খোলা থাকে কি করে! সুবর্ণলতা কেন বাইরের জগতের বাতাসে স্পন্দিত হয়, বাইরের ঝড়ে বিক্ষুব্ধ হয়, বাইরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাকে ঘৃণার চোখে দেখে!

সুবর্ণলতাকে এই চারখানা দেয়ালের ভিতরে বাইরের জগতের বার্তা এনে দেয় কে?

আর যে বার্তা অন্য সকলের কানের পাশ দিয়ে ভেসে যায়, গায়ের চামড়ার উপর দিয়ে ঝরে পড়ে, সে বার্তা সুবর্ণলতার গায়ের চামড়াকে জ্বালিয়ে ফোস্কা পড়িয়ে দেয় কেন? কেন কানের মধ্যে গরম সীসে ঢেলে মনের মধ্যে তীব্র ক্ষতের সৃষ্টি করে?

হরিদাসীর চোখে যদি ধরাই পড়ে থাকে এ বাড়ির বাবুদের চোখে-কানে ঠুলি আঁটা, তাতে সুবর্ণলতার চোখ দিয়ে আগুন ঝরাটা বাড়াবাড়ি নয় কি? আর সুবর্ণলতা যদি সেই ঠুলি উন্মোচন করতে চায়, ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি?

সারাজীবন কি শুধু ধৃষ্টতাই করবে সুবর্ণলতা?

সংসারের সমস্ত সদস্যের পুজোর কাপড় কেনা প্রবোধচন্দ্রের ডিউটি, কারণ তার পয়সা কাঁচা পয়সা! আর তার পরিবারের বুদ্ধিটা কাঁচা বুদ্ধি!

সুবর্ণ বলেছিল, 'এবারে বিলিতি কাপড় আনা চলবে না। জোলা তাঁতির জেলে গামছা কাপড়ও তার চেয়ে ভাল।'

প্রবোধ নাক তুলে বলেছিল, 'তোমার ভাল তো পাগলের ভাল! সে কাপড় কে ছোঁবে?'

'সে চৈতন্য এনে দিলে সবাই ছোঁবে, মাথায় করে নেবে!'

'চৈতন্যদায়িনী দিক তবে চৈতন্য, আসছে বছর কাজে লাগবে।' বলে সুবর্ণর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে একবোঝা যথারীতি বিলিতি কাপড়ই এনে ফেলেছিল প্রবোধ। এনেছিল আলতা, চীনেসিঁদুর, মাথা ঘষার মশলা।

যার যার কাপড় তার তার ঘরে উঠে গেছে, ছোট ছোট ছেলেগুলো দিন গুনছে কখন পরবে সেই পুজোর কাপড়, আর ছোট ছোট মেয়েগুলো হিসেব করছে কার কাপড়ের পাড়টা ভাল!

সুবর্ণ ভেবে রেখেছিল যে যা করে করুক, সে পরবে না ও শাড়ি। সে আপনার সংকল্পে অটুট থাকবে।

ষষ্ঠীর দিনে যখন নতুন কাপড়ের কথা উঠবে, সুবর্ণ বলবে পুজোর পুণ্যদিনে অশুচি বস্ত্র পরবার প্রবৃত্তি নেই তার। কোনো দিনই নেই। সে ত্যাগ করবে এবারের পুজোর কাপড়।

কিন্তু হরিদাসীর ধিক্কারে সে সঙ্কল্পের পরিবর্তন হল।

দাউ দাউ আগুন জেবলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খসিয়ে দাও ওই ঠুলি। নয়তো মুক্তি দিক সুবর্ণলতাকে এই নাগপাশ থেকে। তাড়িয়ে দিক ওরা সুবর্ণ-লতাকে, দূর করে দিক তাকে তার ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের জন্যে।

মীরাবাঈয়ের মত পথে বেরিয়ে পড়ে দেখবে সুবর্ণ পৃথিবীর পরিধিটা কোথায়?

কতদিন কল্পনা করেছে সুবর্ণলতা এরা সুবর্ণকে তাড়িয়ে দিল, সুবর্ণ সাহস করে চলে গেল।

বাইরের লোকের কৌতূহলী চোখকে এড়াবার জন্য ঢুকে পড়ল না তাড়া-তাড়ি মুক্তকেশীর শক্ত বেড়ার মধ্যে।

তারপর সুবর্ণলতা পথে পথে ঘুরছে, ঘুরছে তীর্থে তীর্থে, ঘুরছে ওই সব মহাপুরুষদের দরজায় দরজায়, যাঁরা 'স্বদেশী' করেন।

চোখ জ্বালো করানো ধূম্রকুণ্ডলী পাক খেতে খেতে নিচে নামছে...তার সঙ্গে নেমে আসছে তীব্র আর পরিচিত একটা গন্ধ।

এ বাড়ির ছাদের আকুলতা আকাশে ওঠবার পথ পায় না, তাই নিরুপায় ধোঁয়াগুলো ছাদের আলসে টপকে পাতালের দিকে নামতে চায়।

প্রথমটা কারো খেয়াল হয় নি, খেয়াল হল চোখ জ্বলায়। তারপর পোড়া গন্ধ। ন্যাকড়া পোড়ার গন্ধ তো আর চাপা থাকে না!

ছোটদের চেঁচামেচিটা নতুন নয় এ বাড়িতে, কাজেই সবশেষে অনুভবে এল সেটা।

কোথায় কি সর্বনাশ ঘটাচ্ছে পাজীগুলো!

সর্বনাশে উমাশশীর বড় ভয়, উমাশশী এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করল ঘটনাটা।

রান্নাঘরের ছাদে ধূম্রালোক, জড়ো-করা চারটি কাপড় পুড়ছে, তার ধারে কাছে কটা ছেলেমেয়ে চোখের জ্বালা নিবারণ করছে চোখ রগড়ে রগড়ে, আর তার সঙ্গে করছে হৈ চৈ।

কিন্তু শুধুই কি ছোটরা?

তার সঙ্গে নেই পালের গোদা মেজগিন্নী?

উমাশশী 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উমাশশীর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ইচ্ছে করে এ কী পোড়াতে বসেছে মেজবৌ? কাপড় না ভবিষ্যৎ? তা সে তো পোড়াচ্ছেই জীবনভোর! আ-জীবনই তো ধ্বংসকার্য চালাচ্ছে! তবু সে আগুনটা ছিল অদৃশ্য, এবার কি বাড়িটাতেই আগুন ধরাবে মেজবৌ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল উমাশশী। তারপর আঁচল দিয়ে চোখটা মুছল। জল পড়ছে চোখ দিয়ে, জ্বালা করছে।

ধোঁয়ায়?

না সুবর্ণলতার অসমসাহসিক দুঃসাহসের স্পর্ধায়?

অবিরত এইরকম করে চলেছে সুবর্ণলতা, তবু তার ভাগ্য উথলে উঠছে দিন দিন। দু হাতে খরচ করছে, চাঁদির জুতোয় সবাইকে কিনছে, সোনার ঠুলি দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখছে লোকের।

মেজকর্তা করেন?

সেটা তো বাইরের হাত!

ভিতরের ঘরের অধিকারটা কার?

মেজঠাকুরপো যখন সকলের পুজোর কাপড় কিনে এনে মায়ের কাছে ধরে দেন, তখন কি মনে হয় না মেজবৌই দিল?

অনেক দুঃখে আর অনেক ধোঁয়ায় বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটো মুছে নিয়ে উমাশশী রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'এ কী হচ্ছে মেজবৌ।'

মেজবৌ কিছু উত্তর দেবার আগেই একটা ছেলে বলে উঠল, 'বস্তর-যজ্ঞি হচ্ছে জেঠিমা। সাহেবদের তৈরি কাপড় আর পরা হবে না, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে সেই ছাইয়ের টিপ পরবো আমরা।'

ছাইয়ের টিপ!

এসব কী কথা!

কোন্ ভাষা!

উমাশশী দিশেহারা হয়ে তাকিয়ে দেখে মেজবৌয়ের দিকে। ধোঁয়া উঠছে বিলক্ষণ, তবুও আগুন জ্বলছে দপ্ দপ্ করে, আর সেই আগুনের আভায় আনন্দের আভার মত জ্বলজ্বল করছে সুবর্ণলতার মুখ। মাথার কাপড় খোলা, গায়ের কাপড়ও অবিন্যস্ত, এ বাড়ির ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করে সেমিজ পরে এই যা!

ওকে যেন তাদের পরিচিত মেজবৌ মনে হচ্ছে না। ওকে ধিক্কার দেবে উমাশশী?

কম্পিতকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'এ কী কথা মেজবৌ?'

মেজবৌ সেই আহ্লাদে জ্বল্‌জ্বল্ মুখে বলে, 'হোম হচ্ছে!'

উমাশশীর আর কথা যোগাতো কি না কে জানে, তবে কথা থামাতে হল। মাথার ঘোমটাটা দীর্ঘতর করতে হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সুবর্ণলতাও মাথায় আঁচলটা তুলে দিল!

ভাসুর নয়, দ্যাওর। তবু বয়সে বড় বিজ্ঞ পুরুষ দ্যাওর। ভাসুরের মতই সমীহ করা দরকার বৈকি। সেটাই বিধি।

প্রভাস চলে এসেছে ছাতে, তার হাতে হাত জড়িয়ে চাঁপা। চাঁপার চোখ ক্রন্দনারক্ত। কাঁদতে কাঁদতে কাকাকে ডেকে এনেছে সে, মা তাদের পুজোর কাপড় আগুন জেবলে পুড়িয়ে দিচ্ছে বলে।

বাড়ির বিচারকের পোস্টটা সেজকাকার, সেই জানা আছে বলেই পাকা মেয়ে চাঁপা তার কানেই তুলেছে খবরটা।

'কি কচ্ছে মা?'

ধমকে উঠেছিল সেজকাকা।

'পুজোর কাপড় পুড়িয়ে দিচ্ছে! সব কাপড়!'

হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল চাঁপা। 'কই কোথায়—' বলে বীরদর্পে এগিয়ে এসেছে প্রভাস, তবু এ ধারণা করে নি।

এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে-ও।

পরক্ষণেই ব্যাপারটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না তার। কারণ পথে-ঘাটে এ ব্যাপার ঘটতে দেখছে যে!

কিন্তু বাড়িতে?

বাড়িতে সেই থিয়েটার?

আর সেই থিয়েটারের অভিনেত্রী বাড়ির বৌ?

বড় ভাজ। কানে হাত দেওয়া চলবে না, অতএব তার ছেলেটাকেই কান ধরে টান মারে প্রভাস, যতটা জোরে টানলে শুধু ছিঁড়ে পড়তে বাকি থাকে।

'পলিটিক্সের চাষ হচ্ছে বাড়িতে? পলিটিক্সের চাষ? লীডার কে? মা জননী? তা বাড়িতে শাড়ি পরে বসে ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচ নেচে ছেলেগুলোর পরকাল ঝরঝরে করবার দরকার কি? কোঁচা কাছা এ'টে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই হয়! ইংরেজরাজকে খবর পাঠাই, তোমাদের অন্ন এবার উঠলো!'

ব্যঙ্গ মুখটা বিকৃত করে প্রভাস।

সুবর্ণলতা যে স্রেফ পাগল হয়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ কি! নচেৎ অত বড় দ্যাওরের সামনে গলা খুলে কথা বলে? আর তাকেই বলে?

বলে কিনা, 'যার যেমন বুদ্ধি, তার তেমন কথা! এ বাড়ির পুরুষদের চেয়ে হরিদাসীর ভাইও অনেক উঁচুদরের মানুষ!'

হঠাৎ উমাশশী দ্রুতপায়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুড়-দুড় করে চলে যায়।

দ্যাওরের হাতে বড় ভাজের মার খাওয়া দেখতে পারবে না সে।

আর ততক্ষণে তো আরো সবাই গিয়ে জুটেছে ছাতে! তার মানে সভাস্থলে লাঞ্ছনা!

কিন্তু আশ্চর্য! আশ্চর্য!

লাঞ্ছনা হলো না সেদিন সুবর্ণলতার।

বোধ করি মূক হয়ে গেল সবাই সুবর্ণলতার বুকের পাটায়। কিংবা ভাবল পাগল হয়ে গেছে! সুবর্ণর ব্যবহারে এরা যখন বাক্যাহত হয়ে যায় তখন এরা বলে, 'পাগল হয়ে গেছে! মাথার চিকিৎসা করা দরকার!'

আজও বলল।

প্রভাসই বলল।

হয়তো মান বাঁচাতেই বলল।

মারতে গেলে ফিরে উল্টে মার খাওয়া অসম্ভব নয়। আর সত্যিই কিছু আর একটা শিক্ষিত ভদ্রলোক বড় ভাইয়ের স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারে না।

এক মারানো যেত মেজদাকে দিয়ে!

কিন্তু তাই বা হচ্ছে কই?

মেজদাকেও যে গুণতুক করেছে!

সংসারে যখন ভয়ঙ্কর কোনো ঢেউ তোলে সুবর্ণলতা, মনে হয় এবারে আর রক্ষা নেই তার। এবারে সত্যি সত্যিই মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গলির বার করে দেওয়া হবে তাকে।

কিন্তু নাঃ, সে আশঙ্কা গর্জন করতে করতে তেড়ে এসে হঠাৎ ভেঙে গিয়েই কেমন ছড়িয়ে পড়ে। যেন ফেনার রাশির মত স্তিমিত হয়ে মিলিয়ে যায় বালির স্তরে।

প্রবোধচন্দ্র এসে সব শুনলো।

মুক্তকেশী কথাটা আর এক সুরে বললেন। বললেন, 'বছরকার দিনে লক্ষণ করে কেনা পুজোর কাপড়চোপড়ে আগুন, সেই অবধি ভয়ে আমার বুকের কাঁপুনি থামছে না বাবা! না জানি কী দুর্ঘটনা আসছে, কী অলক্ষণ ঘটবে সংসারে! কাপড়ের একটা সুতো উড়ে আগুনে পড়লে "স্বস্তেন" করতে হয়,

আর এ কী! তোমার পরিবার যখন এমন দুর্দান্ত তখন তোমার উচিত হয় নি ওর অমতে কাজ করা!'

প্রবোধ মরমে মরে যায়।

প্রবোধ ঘটা করে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করতে যায় বহরমপুরের পাগলাগারদে পাঠাতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার।

তারপর প্রবোধ মা'র হাতে একশোখানি টাকা তুলে দেয়। বলে, 'মা, কাপড় কেনায় ঘেন্না ধরে গেছে আমার, এ টাকা থেকে প্রকাশকে দিয়ে যা হয় করে কিছু কিনিয়ে নিও।'

কিন্তু বহরমপুরের টিকিট কি কেনা হয়েছিল সুবর্ণর?

কোথায়?

টিকিট যা কেনা হল সে তো স্বদেশী মেলার!

বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়েকে আর ননদ বিরাজকে নিয়ে মহোৎসাহে দুখানা গাড়ি ভাড়া করে স্বদেশী মেলা দেখতে গেল সুবর্ণ।

কিনে আনলো স্বদেশী দেশলাই, স্বদেশী চিরুনি, স্বদেশী সাবান। সবাইকে বিলালো। বললো, 'পুজোয় এবার ঢাকাই কাপড় কেনা হবে। ঢাকাই আমাদের নিজস্ব বাংলাদেশের জিনিস।'

হেরেও কোন্ উপায়ে জিতে যায় সুবর্ণ, মার খেতে গিয়েও মাথায় চড়ে বসে, এ এক অদ্ভুত রহস্য।

যে যতই তড়পাক, শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন ভয় খায়।

আর বিজয়িনী সুবর্ণলতা খানিকটা করে এগিয়ে যায়। এ বাড়ির বৌরা মেলায় যাবে, এ কথা কেউ দশ দিন আগেও কল্পনা করতে পারতো?

অথচ সেই অকল্পিত ব্যাপার ঘটাল সুবর্ণ। আর আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বলল, 'আসছে বারে আমিও মেলায় দোকান দেব!'

'আসছেবার আমিও মেলায় দোকান দেব!' বলেছিল সুবর্ণলতা আহ্লাদে ছলছল করে। ভেবেছিল এইবার বুঝি বন্ধনমুক্তির মন্ত্র পেল সে। ভেবেছিল আলোর রাস্তায় হাঁটবার অধিকার অর্জন করবে সে এইবার। কানু ভানু বড় হয়ে উঠেছে, তাদের অবলম্বন করে বহির্জগতের স্বাদ নিতে বেরিয়ে আসবে রাজপথে।

চাঁপাকে সুবর্ণ ঘৃণা করে, চাঁপা যেন তার মেয়ে নয়। সেজমেয়ে চন্দনটা বোকাটে নিরীহ। ছেলেদের ওপর অনেক আশা। এ আশা ও পোষণ করছে এখন থেকেই, আর একটু বড় হোক ভানু, ওকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে যাবে সে একদিন। গিয়ে দেখবে তার সেই কুল ভেঙে অকূলে ভাসা মাকে।

আজ পর্যন্ত নিয়ে গেল না প্রবোধ! খুব ভাল মানসিক অবস্থায় কখনো কি ইচ্ছে প্রকাশ করে নি সুবর্ণ? বলে নি কি, 'ন বছর বয়সে সেই শেষ মাকে দেখলাম! আর কি বাঁচবেন মা? জীবনে আর দেখা হবে না!'

বলেছে।

প্রবোধও প্রবোধ দিয়েছে, 'কেন বাঁচবেন না? ধ্যুৎ! কত বয়েস তোমার মা'র! আমার মায়ের থেকে তো আর বড় নয়? তোমার এই এণ্ডি-গেণ্ডি নিয়ে তো আর কাশী যাওয়া চলে না! ওগুলো একটু বড় হোক!'

সুবর্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলতো, 'ওগুলো বড় হলেই শখ মিটবে তোমার? রেহাই দেবে?'

প্রবোধ অভিমানাহত গলায় বলতো, 'এই নিয়ে চিরদিন ঘেন্না দিলে। তবু ভেবে দেখলে না কোনোদিন আমার সেজভাই ছোটভাইয়ের মতন স্বভাব খারাপ করতে যাই নি!'

আশ্চর্য, ওই মোক্ষম কথাটা ভেবে দেখতে ন্য সুবর্ণ!

বরং বলতো, 'ওরাই জগতের আদর্শ পুরুষ নয়!'

তারপর একদিন কোথা থেকে একটা 'কবিরাজী পান' এনে হাজির করল প্রবোধ। চুপি চুপি বললো, 'ভোরবেলা খালি পেটে খেয়ে নেবে, ব্যস! তুমি যা চাও তাই হবে, আর "ন্যান্‌জারি" হতে হবে না!'

সুবর্ণ হেসে বলেছিল, 'বিষ দিচ্ছ না তো আপদের শান্তি করতে?'

প্রবোধ সর্পাহতের মত মুখে বলেছিল, 'এই কথা বললে তুমি আমায়? এই সন্দেহ করলে? ভুলিয়ে তোমায় বিষ খাওয়াচ্ছি আমি? বেশ তা যদি ভেবে থাকো, খেও না!'

সুবর্ণলতা আরো হেসে উঠেছিল, 'নাঃ, ঠাট্টাও বোঝো না! মাথা না ঝুনো নারকেল! আর বিষ বলে ভয় পাবো কেন গো? বিষের জন্যেই তো হাহাকার করে বেড়াই।' তারপর ঈষৎ আড়ষ্ট গলায় বলেছিল, 'খেলে পাপ হবে না?'

তা বিষের কথাটায় কান দেয় নি প্রবোধ, শেষের কথাটায় দিল, পরম আনন্দে মশগুল হয়ে বলল, 'পাপ কিসের?' এগিয়ে দিয়েছিল সেই কবিরাজী পান।

সুবর্ণও বোধ করি আশায় কম্পিত হয়েছিল। রেহাই যদি নেই তো 'উপায়' একটা ধরা হোক। সেজভাই ছোটভাইয়ের মত প্রবোধেরও যদি স্বভাব খারাপ হত, সুবর্ণ কি বাঁচত না? বলেছেও তো কতবার বরকে! 'তাই হও তুমি। আমি বাঁচি।'

কিন্তু খারাপ হতে যাবার জন্যে যে সাহসের দরকার তাই বা কোথায় প্রবোধের?

নেই।

তাই প্রবোধ সুবর্ণলতার কাছে 'পান' নিয়ে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'মহৌষধ।'

মহৌষধ!

সুবর্ণ তাই তারপর থেকে নিশ্চিন্ত আছে। সুবর্ণ বিশ্বাস করেছে আর ন্যান্‌জারি হবার ভয় নেই তার। তাই আহ্লাদে ছলছলিয়ে বলে উঠেছে, 'আসছেবারে আমিও স্বদেশী মেলায় দোকান দেব! মেয়েরা দিচ্ছে!'

ভেবে দেখে নি, যে মেয়েরা স্বদেশী মেলা খুলে দোকান দিচ্ছে তারা কাদের ঘরের মেয়ে!

তারা কি সুবর্ণর ডাস্টবিন ওলটানো সরু সরু গলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে?

নাঃ, তারা রাজরাস্তার, তারা প্রাসাদের।

তাদের জন্যে তাদের অকৃপণ বিধাতা রেখেছেন অনেক আলোর প্রসাদ। ভাগ্যের টীকা ললাটে পরেই পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছে তারা।

সুবর্ণ যদি নিজের ওজন বুঝতে না শিখে তাদের রাস্তায় হাঁটতে চায়, তাদের আকাশে চোখ তুলতে চায়, সুবর্ণর কৃপণ বিধাতা ঘা মেরে সচেতন করিয়ে দেবেন বৈকি।

সুবর্ণর মাকেও তো দিয়েছিলেন।

সুবর্ণর মা যখন ভেবেছিল, 'আমি পাই নি, কিন্তু আমার মেয়ের জন্যে মুঠোয় ভরে আহরণ করে নেব সেই আলো, আর সেই আলোর সাজে সাজিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব ওই রাজপথে, যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর এক পৃথিবীর মেয়েরা!'

তখনও কি সুবর্ণর মায়ের বিধাতা বড় একটা হাতুড়ি বসিয়ে দেন নি তার ধৃষ্টতার উপর?

সুবর্ণর মা যদি বাকী জীবনটা শুধু এই কথাই ভেবে ভেবে দেহপাত করে—'ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রতারকের প্রতারণায়, অহঙ্কারীর নির্লজ্জ শক্তির মত্ততায়, যে কোনও ঘটনায় ঘটিত বিয়েও "চিরস্থায়িত্ব" পাবে কেন, মানুষকে নিয়ে মানুষ পুতুল খেলা করবে কেন?'—তবু সুবর্ণর তাতে কোন্ লাভটা হবে?

সুবর্ণর পরবর্তীকাল লাভবান হবে? সুবর্ণ দেখতে পাবে সে লাভ?

সুবর্ণ যদি ওর সরু গলির শিকলটা ভাঙবার দুরন্ত চেষ্টায় নিজেকে ভেঙে ভেঙে ক্ষয় করে, কোনো একদিন শিকল খসে পড়বে?

কে জানে সে কথা!

সুবর্ণ অন্তত জানে না।

সুবর্ণ পরবর্তী কালকে জানে না।

সুবর্ণ নিজে চায় শিকল ভেঙে বেরিয়ে পড়তে। চায় আলোর মন্দিরের টিকিট কিনতে।

কেনা হবে না!

তার বিধাতা তাকে আঘাত করবে, ব্যঙ্গ করবে!

সেই ব্যঙ্গ ধরা পড়ল সুবর্ণর কাছে।

ধরা পড়েছিল, তবু চোখ বুজে ছিল। খারাপ মনটাকে নিয়ে জোর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ সেই অনেক দিন আগে পড়া ময়াল সাপের প্রবন্ধটা মনে পড়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার, বিস্ফারিত হয়ে এল চোখ দুটো, আড়ষ্ট কঠিন হয়ে উঠল শরীর। হাত দুটো আপনি মুঠো হয়ে গেল।

ঘরে কেউ থাকলে দেখে চমকে যেত, চেঁচিয়ে উঠত।

এর পর আর কি করতো সুবর্ণ কে জানে!

কে জানে চীৎকার করে কেঁদে উঠতো, না দেয়ালে মাথা ঠুকতো?

মোক্ষম সময়ে প্রবোধচন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো।

দেরাজ থেকে তোলা তাসজোড়াটা বার করে নিতে এসেছিল প্রবোধ।

আড্ডায় লোকসংখ্যা বেশি হয়ে গেছে, কাজেই একদল বেকার ব্যক্তি খেলোয়াড়দের পিছনে বসে উসখুস করছে আর 'চাল' বলে দিয়ে খেলার পিপাসা মেটাচ্ছে।

অবস্থাটা অস্বস্তিকর!

প্রভাস বলেছে, 'দূরছাই, আর একটা "বাসর" বসুক! মেজদা, তোমার ঘরে আরও তাস আছে না?'

প্রভাস ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, প্রভাস বলেছে! হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিল প্রবোধ তোলা তাসটা নিতে! কিন্তু সুবর্ণর মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালো।

মুঠোপাকানো হাত, আর সে হাতের স্ফীত শিরাগুলো দেখে ভয়ই হলো তার। সত্যি বলতে, এমনিতেই সুবর্ণকে ভয়-ভয় করে প্রবোধের। নিয়ে ঘর করে বটে, কিন্তু কোথায় যেন অনন্ত ব্যবধান!

সত্যি, বাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোকগুলিকে বুঝতে পারা যায়, পারা যায় না শুধু নিজের স্ত্রীকে! এ কি কম যন্ত্রণা!

অথচ ওই বুঝতে না পারাটা স্বীকার করতে রাজী নয় বলে না-বোঝার জায়গাগুলো চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে চায়, ভয় করে বলেই শাসনের মাত্রায় সহসা মাত্রা ছাড়ায়।

আশ্চর্য!

মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে, আর হাঁটু মুড়ে বসে এককাঁসি চচ্চড়ি দিয়ে একগামলা ভাত খাবে, এই তো জানা কথা। তাও বাড়া দেখে ঘরের পুরুষেরা পাছে মুচকে হেসে প্রশ্ন করে, 'বেড়াল ডিঙোতে পারবে কিনা' তাই পুরুষের চোখের সামনে কখনো ভাত বাড়বে না নিজেদের। এই সবই তো চিরাচরিত।

প্রবোধের ভাগ্যে সবই উল্টো।

সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম!

ইচ্ছে হচ্ছিল, না দেখার ভান করে কেটে পড়ে, কিন্তু হলো না। চোখো-চোখি হয়ে গেল। অগত্যাই একটু এগিয়ে এসে বলতে হলো, 'কী ব্যাপার? শরীর খারাপ হচ্ছে নাকি?'

সুবর্ণ শুধু চোখ তুলে তাকালো, সুবর্ণর নিঃশ্বাসটা আরো দ্রুত হলো।

'হলো কি? কামারের হাপরের মত অমন বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে? বড়বৌকে ডেকে দেব?'

এবারে আর নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে উঠল না, ফোঁস করে উঠল সুবর্ণ নিজেই, 'কেন, বড়বৌকে ডেকে দেবে কেন?'

'বাঃ, ডেকে দেব কেন! কী হলো না হলো বড়বৌ বুঝবেন।'

সুবর্ণ শুধু ফোঁসই করে না, এবার তীব্র একটা ছোবল দেয়, 'বড়বৌ বুঝবেন! আর তুমি বুঝবে না? কবিরাজী পান এনে ভোলানো হয়েছিল, কেমন? মিথ্যুক, জোচ্চোর!'

প্রবোধ ওই আরক্ত মুখের দিকে তাকায়।

প্রবোধের ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না।

আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়টাও কাটে। ওঃ, শরীর খারাপ নয়, রাগ! বাবাঃ, স্বস্তি নেই!

ক্যাবলা-ক্যাবলা হাসি হেসে বলে, 'ও, ফেঁসে গেছে বুঝি তুক্? বাবা, কী ইয়ে—'

বোধ করি বলতে যাচ্ছিল কোনো বেফাঁস কথা, সামলে নিল। ওই সামলে নিতে নিতে কথার ধরনই সভ্য হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র এই তাসের আড্ডাতেই যা ইচ্ছেমত মুখ খুলতে পাওয়া যায়। স্ত্রী তো নয়, যেন গুরুমশাই!

বলে মিথ্যেও নয়!

গুরুমশাইয়ের ভঙ্গীতেই ধমকে ওঠে তার স্ত্রী, 'খবরদার বলছি, দিদিকে ডাকবে না!'

'ডাকবো না? বাঃ! শেষে একলা ঘরে দাঁতকপাটি লাগিয়ে বসে থাকবে?

ওসব মেয়েলী কাণ্ড বড়বৌই ভাল বুঝবে!'

'মেয়েলী কাণ্ড!'

মেয়েলী কাণ্ড!

আর সর্পিণী নয়, যেন বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সুবর্ণ স্বামীর উপর। যেন নখে করে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ওর ওই খোকামির মুখোশ।

আর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা সেই কুৎসিত জীবটাকে কটূক্তির চাবুকে জর্জরিত করে ফেলতে পারলেই বুঝি সুবর্ণলতার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

কিন্তু সত্যিকার নখ দিয়ে তো আর সে মুখোশ ছেঁড়বার নয়, তাই কিছুই হয়ে ওঠে না। শুধু একটা আগুনঝরা প্রশ্ন ঠিকরে ওঠে, 'মেয়েলী কাণ্ড কচি খোকা তুমি!'

প্রবোধ এই আগুনের খাপরার কাছ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে, তাই একটা সাজানো হাসি হেসে বলে, 'হল কি রে বাবা! থেকে থেকে যেন ভূতে পায়। তাসজোড়াটা কোথায়? দেরাজে আছে?'

প্রশ্নটা বাহুল্য।

ঘরে ওই দেরাজটা ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই।

না, আর একটা জিনিস আছে।

ইঁট দিয়ে উঁচু করা একটা চৌকিও আছে। যার নীচে বাক্স-প্যাঁটরা চালান করবার জন্যে ওই উঁচু করা। যে চৌকিটার উপর অনেকদিন পর্যন্ত দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়েও আড়াআড়ি শুয়ে এসেছে সুবর্ণ আর প্রবোধ। তিনটে হবার পর থেকেই সেটাকে ছেড়ে মাটিতে শয্যা বিছিয়েছে সুবর্ণ।

চৌকিটায় এখন সারাদিন গাদা করে বিছানা তোলা থাকে, আর রাত্রে প্রবোধ একা হাত পা ছড়িয়ে শোয়। কচি-কাচা নিয়ে শুতে পারে না আর সে· বয়েস হয়েছে, শরীর ভারী হয়েছে, তাছাড়া—কাঁচা পয়সার গুমোরও হয়েছে কিছু।

মনে জানে, আরাম চাইবার দাবি জন্মেছে তার।

সুবর্ণ মাটিতে বিছানা বিছিয়ে শোয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে, দিনেরবেলা মাদুরে। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি বিছানা কাঁথার সমাবেশ, কে জানে অদূর ভবিষ্যতে আরও একটা জায়গা সঙ্কুলান হবে কোথায়?

কিন্তু সে যাক।

তাসজোড়াটা থাকলে দেরাজেই থাকবে। কিন্তু সেই সহজ নির্দেশটা দিল না সুবর্ণ, উঠে দাঁড়িয়ে কটুকণ্ঠে বলল, 'আবার তাস?'

'আস্তে!' প্রবোধ বলে, 'গলা যে ভাসুরের কান ফাটিয়ে দিচ্ছে!'

কিন্তু ভাসুরের নামোল্লেখেও দমে না সুবর্ণ, সমান তেজে বলে, 'ওঃ, ভারি একেবারে সাতমহলা অট্টালিকা, তাই ভাদ্দরবৌয়ের গলা ভাসুরের কানে পৌঁছবে না! সারা বাংলায় বোবা মেয়ে ছিল না? বোবা মেয়ে! তাই একটা খুঁজে নিয়ে বিয়ে করতে পারো নি?'

'ঘাট হয়েছিল। তাই উচিত ছিল।' প্রবোধ বলে ওঠে, 'জিভ তো নয়, ছুরি!'

প্রবোধ ঝনাৎ করে দেরাজ টেনে তাসটা বার করে।

'তাস নেবে না বলছি, ভাল হবে না! সেদিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই?

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছিলে না? বেহায়া নির্লজ্জ! জোচ্চোর!'

একখানা ঘরের ব্যবধানে ভাইরা আর খেলার বন্ধুরা, এ সময়ে আর গোলমাল বাড়তে দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করা চলে না। নইলে প্রবোধের কি ইচ্ছে হচ্ছিল না, ফুটবলের মত লাথিয়ে লাথিয়ে ঘরের বাইরে বার করে দেয় ওই অবিশ্বাস্য ঔদ্ধত্যকে!

তাই কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, 'ফুঃ, সংকটকালে অমন কত প্রতিজ্ঞা করতে হয়। তাই বলে যদি রাতের প্রতিজ্ঞা দিয়েও মানতে হয়, তাহলে তো বাঁচাই চলে না।'

'কী? কী বললে?'

সুবর্ণ আবার বসে পড়ে।

প্রতি মুহূর্তে স্বামীর অপদার্থতার পরিচয় পায় সুবর্ণ তবু চমকে চমকে ওঠে।

অথচ অপদার্থতাটা সুবর্ণর মাপকাঠিতেই। অন্য অনেক মেয়েমানুষই এমন বর পেলে ধন্য হয়ে যেত।

প্রবোধ পালায়।

স্রেফ পালায়। তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের ভঙ্গীতে।

শুধু বলে যায়, 'ওঃ, কাকে কি বলছ হুঁশ নেই, কেমন? নিজে নিত্যি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবেন, আর মেজাজ হবে যেন আগুন!'

কাকে কি বলাই বটে!

কিন্তু হুঁশ কি সত্যিই নেই সুবর্ণর?

নাকি ও চায় অপমানের অঙ্কুশে আহত হয়ে একবার অন্তত জ্বলে উঠুক প্রবোধ? পুরুষের মত জ্বলে উঠুক, বজ্রের তেজ নিয়ে জ্বলে উঠুক? মা ভাইয়ের কাছে মুখ রাখতে শাসনের প্রহসন নয়, সত্যিকার শাসন করুক। সুবর্ণকে তাড়িয়ে দিক, মেরে ফেলুক। সেই মরণের সময়ও যেন জেনে মরে সুবর্ণ, যে প্রাণীটার সঙ্গে ঘর করছিল সেটা মানুষ!

কিন্তু ফলটা ফলে বিপরীত।

সুবর্ণলতা যত উগ্র হয়ে ওঠে, প্রবোধচন্দ্র ততো নিস্তেজ হয়ে যায়। পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কিন্তু সুবর্ণই বা কী!

তার মধ্যেই কি পদার্থ থাকছে আর? যেটুকু ছিল, এই আত্মঘাতী সংগ্রামে ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে না? তার নিজের ভিতরকার যে সুরুচি, যে সৌন্দর্যবোধ এই কুশ্রী পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সর্বদা ছটফট করে মরতো, সে যে প্রতিনিয়ত এই নিষ্ফল চেষ্টায় বিকৃত হয়ে উঠছে, সে বোধ কি আর আছে সুবর্ণলতার?

এই বাড়ি আর এই বাড়ির মানুষগুলোর অসৌন্দর্য ঘুচিয়ে ছাড়াবার জন্যে নিজে সে কত অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, এ কথা তাকে কে বুঝিয়ে দেবে!

'কী হে প্রবোধবাবু, তাস আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলে!'

অভ্যস্ত কথা, অভ্যস্ত ঠাট্টা

'বলি গিন্নীর আঁচল ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছে না বুঝি!'

'হুঁ, গিন্নী!'

প্রবোধ গুছিয়ে বসে বলে, 'প্রবোধচন্দ্র অমন গিন্নী-ফিন্নীর ধার ধারে না। দেরি হল তাসটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে।'

বাড়ির অখ্যাতি বন্ধুমহলেও প্রচার হয়ে গেছে, তাই প্রবোধের সগর্ব উক্তিতে একজন হেসে ফেলে বলে, 'আরে রেখে দাও তোমার গুমোর! গিন্নী তো শুনি তোমার কান ধরে ওঠায়, কান ধরে বসায়!'

হাসি।

হাসিই একমাত্র মুখরক্ষার ঘোমটা।

তাই হাসতে থাকে প্রবোধ তাস ভাঁজতে ভাঁজতে, 'নাঃ, তোমরা আর মান মর্যাদা রাখলে না!'

এই সময় সুবোধের ছেলে 'বুদো' এক ডাবর সাজা পান এনে আড্ডার মাঝখানে বসিয়ে দেয়, প্রবোধের লজ্জায় ছেদ পড়ে। পর পর তিন মেয়ের পর ছেলে, তবু বেচারা যেন নিতান্তই বেচারী।

রবিবারটা বুদোর দুঃখের দিন।

খেলতে যেতে পায় না, সারাক্ষণ আসরের খিদ্‌মদগারী খাটতে হয়।

বিশেষ এক-একটা ভার যে কেমন করে বিশেষ এক-একজনের ঘাড়ে এসে চাপে, সেটাই বোঝা শক্ত। বাড়িতে আরো ছেলে আছে, কিন্তু বুদোরই সব রবিবার দুঃখের দিন।

অবশ্য ভানু কানুর এ আসরের মুখো হবার জো নেই। তাদের মা তাহলে তাদের ধরে ধোবার পাটে আছাড় দেবে। এবং যে তাদের ফরমাস করবে, তাকেও রেহাই দেবে না এটাও জানা। তাই বাড়িতে ভানু কানু নামের দু-দুটো ছেলে থাকতে বুদোর ঘাড়েই সব বোঝা।

প্রবোধ বলেছিল, 'ওরা কিছু করে না, একা দাদার ছেলেটাই খেটে মরে—এটা স্বার্থপরের মত দেখায় না!'

'দেখায়!' সুবর্ণ বলেছিল, 'কি করা যাবে, দেখাবে!'

'তোমারই যত ইয়ে, কই ওর মা তো এত রাগ করে না?'

'ওর মা মহৎ।'

তা মহৎই!

নইলে ওই ডাবর ডাবর পানই বা সে একা সেজে মরে কেন?

জনৈক আড্ডাধারী পকেট থেকে জর্দার কৌটো বার করে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'পান কে সেজেছে রে বুদো? তোর মা বুঝি?'

মেয়েদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার সুর মেশাতে হয়, এটাই রীতি। ভদ্রলোক সে রীতিতে বিশ্বাসীও।

নির্বোধ বুদো এ প্রশ্নে কৃতার্থমন্য হয়ে একগাল হেসে বলে, 'হ্যাঁ।'

'তোর মাকে শিখিয়ে দিগে যা বাপ, পান দিলে তার সঙ্গে একটু চুন দিতে হয়।'

যেন একটি ক্ষুদে লাটের ভঙ্গীতে একটা পান তুলে নেন ভদ্রলোক।

এই এঁদের অভ্যস্ত ভঙ্গী।

পৃথিবীটা এঁদের কাছে করতলগত 'আমলকীবৎ'। সর্ববিধ ব্যাপারকে নস্যাৎ করে দেবার কৌশলটি এঁদের জানা। দেশ যখন স্বদেশী আন্দোলনের

উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেল. এ'রা তখন ঘরে বসে রাজা-উজির মারছেন. সেই আন্দোলনকে তুড়িতে ওড়াচ্ছেন।

পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ির বৌদের খবর এ'রা রাখেন এবং সমালোচনায় তৎপর হন। এ বাড়ির বড়বৌটিকে ওঁরা অগ্রাহ্য করেন. মেজটিকে ব্যঙ্গ করেন. সেজটিকে স্বার্থপর বলে ছিছিক্কার করেন এবং ছোটটিকে অবজ্ঞা করেন।

গুণানুসারেই করেন অবশ্য. এবং মনোভাব চাপতেও চান না।

শুধু পাড়াপড়শীই নয়. ও'দের আড্ডায় কাটা পড়ে না এমন মাথা নেই। এ'রা ব্রাহ্মকে বলেন 'বেম্ম', ব্রাহ্মণপুরুতকে বলেন 'বামনা'. বিদুষী মেয়ের নাম শুনলে বলেন 'লীলাবতী'!

এ'রা দেশনেতাদের 'পাগলা' আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন না. 'পরমহংসে'র বুজরুকীর ব্যাখ্যায় আমোদ পান. বিবেকানন্দের আমেরিকায় গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের বার্তা নিয়ে হাসাহাসি করেন এবং মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতি লক্ষ্য করে সকৌতুক ব্যঙ্গ যখন তখন ঈশ্বর গুপ্ত থেকে উদ্ধার করে বলেন. 'আরো কত দেখবে হে! দেখবার এখুনি হয়েছে কি? এরপর সব—

এ. বি. সি. শিখে বিবি সেজে
বিলিতি বোল ক'বেই ক'বে।
আর হুট বলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।'

বাড়ি বাজার আর অফিস. এই ত্রিভুজ তাঁতে আনাগোনা করতে করতে মরচে পড়ে গেছে ওঁদের জীবনের মাকুটা।

এ'রাই সুবর্ণলতার স্বামীর বন্ধু।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই 'অফিসবাবু'র দল কি এ যুগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

আজকের পৃথিবীর এই দুরন্ত কর্মচক্রের দুর্বার গতির তাড়নের মাঝখানেও, অলস গতি আর অসাড় আড্ডা নিয়ে আজও কি টিঁকে নেই তাঁরা? আজও কি তাঁদের জানার জগতে শুধু এই কথাই নেই, 'মেয়েমানুষ' জাতটাকে ব্যঙ্গের আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে হয়, তারা পানের পাশে চুন রাখতে ভুলে গেলে তাদের সমঝে দিতে হয়? আছে। ও'রা যে 'আধুনিক' নন. এই ও'দের অহমিকা. এই ও'দের গৌরব।

নাঃ. একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

আজও আছে বৈকি কিছু কিছু।

আছে দর্জিপাড়া আর কিনুগোয়ালার গলি, ছিদাম মিস্ত্রী আর রাণী মুদিনীর লেনের অন্তরালে।

এখনো এ'রা জানেন পুরুষ জাতটা বিধাতার স্বজাতি বলেই শ্রেষ্ঠ।

এ'রা আছেন।

হয়তো চিরকাল থাকবেন।

পৃথিবীর দুরন্ত অগ্রগতির পথে 'বাঁধ' দেবার প্রয়োজনে বিধাতাই এ'দের সৃষ্টি করে চলেছেন, কম-বেশি হারে।

অথচ আবার হয়তো ও'দের অন্তঃপুরের রঙও বদলাচ্ছে. ও'রাই আব্রুর কড়া শিকল শিথিল করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন. ও'রাই ও'দের মেয়েদের নিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসছেন বিয়ের বাজারে দাম বাড়াবার আশায় আর

মেয়েদের বিয়ের বয়েসটা বারো থেকে ষোলোয় তুলছেন পারিপার্শ্বিকের চাপে।

এ'দের নাম মধ্যবিত্ত।

এ'রাই নাকি সমাজের কাঠামো।

এ'রা এ'দের মধ্যবিত্ততা এবং মধ্যচিত্ততা নিয়ে রক্ষা করে চলেছেন সেই কাঠামো। তার সঙ্গে চলেছে সময়ের স্রোত।

॥ ১৪ ॥

মুটের মাথায় ফলের ঝোড়া, আঙুলের ফাঁকে ঝোলানো বড় দুটো কলার ছড়া—জগু এসে পিসিমার দরজায় হাঁক পাড়লো, 'পিসি গো পিসি!'

'কে র‍্যা, জগু নাকি?'

মুক্তকেশী জপের মালা হাতেই বেরিয়ে আসেন।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তা নইলে এ বাজখাই গলা আর কার হবে?' জগু চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই কথা সারে, 'ও সর্বনাশ, এতখানি বেলা হয়ে গেল এখনো তুমি মালা ঠকঠকাচ্ছো! পুণ্যির ছালা রাখবে কোথায়?'

মুক্তকেশী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন, 'কি ব্যাপার? এত কলা কিসের?'

'কলা তোমার ভাইবৌয়ের ছেরাদ্দর!' বলে ছড়া দুটো একবার দুলিয়ে নিয়ে জগু মহোৎসাহে বলে, 'কী আক্রাগণ্ডার বাজারই পড়লো! মাত্তর দুছড়া কলা তিন-তিন গণ্ডা পয়সা!'

মুক্তকেশী মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'ঠকিয়েছে তোকে। আমি আনাচ্ছি ছড়া আনছি নিত্য! বলি এত ফল কী হবে রে?'

'বললাম তো, তোমার আদরের ভাজ শ্যামাসুন্দরীর ছেরাদ্দ!...মাগো মা, শ্যামা মা, মাতৃনাম উচ্চারণে অপরাধ নিও না। সিন্নি হবে গো সিন্নি। শ্যামাসুন্দরী দেবী যে মামলা জিতেছেন! কাল "রায়" বেরিয়েছে। সত্যনারায়ণের সিন্নি মানা ছিল, তাই শোধ হচ্ছে আজ। যেও সন্ধ্যেবেলা, সেই কথাই বলতে এলাম। মা ঠাকরুণ পইপই করে বলে দিয়েছেন।'

মুক্তকেশী যাকে বলে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে বলেন, 'মা জিতেছে! তার মানে তুই হেরেছিস?'

'তা শ্যামাসুন্দরী দেবী জিতলেই আমাকে হারতে হবে, এ তো পড়েই আছে কথা! "বাদী-প্রতিবাদী"র সম্পর্ক যে দিন-রাত্তিরের মত! এ আছে তো ও নেই, ও আছে তো এ নেই।'

মুক্তকেশী বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, 'থামা ব্যাখ্যানা! বলি হেরে মরে আবার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে মায়ের মানুতি পুজোর নৈবিদ্যির যোগাড় দিচ্ছিস?'

'জগু অসন্তুষ্ট স্বরে বলে, 'ওই, ওই জন্যেই তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধ হয় আমার পিসি! বলি আমি যোগাড় করে দেব না তো কোন্ যম এসে দেবে? আর ক'কুড়ি ব্যাটা আছে তোমার ভাজের? আবার তো কাল ভোরবেলা তাঁকে নিয়ে ছুটতে হবে কালীঘাটে। পূর্বজন্মে কত মহাপাতক

ছিল তাই এক পুত্তুর হয়ে জন্মেছি! যেও তাহলে।'

জগু চলে যাচ্ছিল, মুক্তকেশী হাতের ইশারায় দাঁড় করিয়ে হাতের মালা কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'দেখ্, সত্যনারায়ণ কাঁচাখেকো দেবতা, তার নাম করে অন্যায্য উপরোধ করিস নে। আমার বাপের বংশধরকে বঞ্চিত করে বৌ ড্যাং ড্যাং করে মামলা জিতে "সিন্নি" দেবে, আর আমি সেখানে পেন্নাম ঠুকতে যাবো? আমার বাড়ির এক প্রাণীও যাবে না।'

জগু আরো অসন্তোষের গলায় বলে, 'এই দেখ, আমি পারবো ড্যাবড়েবিয়ে দেখতে, আর তুমি পারবে না? বলি ঠাকুরটা তো আর ওনার খানাবাড়ির খানসামা নয় যে ওঁকেই পুণ্যফলটুকু ধরে দেবে?...ওগো বৌমারা, একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ঝি সঙ্গে করে শাশুড়ীকে নিয়ে যেও সন্ধ্যেবেলা। মামীশাশুড়ী বলে দিয়েছে, ভারি ঘটার সিন্নি!...ভাইরাও যদি পারে তো যায় যেন।...চললাম, অনেক কাজ। বড়লোকের কন্যের আহ্লাদ মেটাতে মটাতেই--'

চলে যেতেই সেজবৌ মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'ভাসুর গুরুজন, বললে অপরাধ, তবে ওবাড়ির বট্‌ঠাকুরের বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে।.. হাসবো, না কাঁদবো?'

কোথায় ছিল সুবর্ণলতা, কট্ করে বলে ওঠে, 'এ বাড়ির কর্তারা যদি ওবাড়ির বট্‌ঠাকুরের পায়ের নখের যুগ্যিও হতেন, তাহলে দুবেলা তাঁদের পা-ধোওয়া জল খেতাম।'

সেজবৌ অনেকদিন 'মেজদি'র সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছিল, আজ মেজদিই যখন ভাঙলো সেটা, তখন আর উত্তর দিতে বাধা রইল না।

বলে উঠল, 'কি বললে মেজদি?'

'যা বলেছি ঠিকই বলেছি।'

'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? ও বট্‌ঠাকুর তো মানুষের আকৃতিতে একটি—থাক গুরুজন, বলব না কিছু। সেই যে কথায় বলে না "কিসের আর কিসেয়, সোনায় আর সীসেয়,' তোমার তুলনাটা তেমনি।'

'ঠিকই বলেছো সেজবৌ! সোনা আর সীসেয় তুলনাটাই ঠিক। তবে কে সোনা কে সীসে সেটাই প্রশ্ন। তোমাদের হিসেবের সঙ্গে আমার হিসেব মেলে না এই যা।'

তা কারো হিসেবের সঙ্গেই কি মেলে সুবর্ণর?

মিললে কি সে ছোট তিনটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভরসন্ধ্যেবেলা একা একটা ঝিয়ের সঙ্গে একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠত?

চাঁপা ফরকেছে, চাঁপা যায় নি। যায় নি ভানু-কানু। শুধু চন্নন পারুল খোকা। এদের এখনো মা ছাড়া চলে না।

ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, আর সদ্য-কাটা তাজা ফলের গন্ধ বাড়িটাতে যেন দেবমন্দিরের বাতাস পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর দরজা থেকে সুনিপুণ আল্‌পনার রেখা যেন তার সুষমাময় স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে দেবতার আবির্ভাবের।

কী অপূর্ব!

কী সুন্দর!

কী অনাস্বাদিত এই স্বাদ!

সুবর্ণর মনে হলো কোন এক স্বর্গলোকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণ।

মুক্তকেশী তীর্থ করেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে, মুক্তকেশী মানতও পুজো দেন দেবমন্দিরে গিয়ে গিয়ে। মুক্তকেশীর ঘরে এমনভাবে দেবতার আহ্বান নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু বছরে বারকয়েক সুতিকাষষ্ঠীর পুজো।

কিন্তু তাতে কি এমন মোহময়, সৌন্দর্যময় আর সৌরভময় পরিবেশের স...

সুবর্ণ এই সুরভিত বাতাসের সুযোগে আচ্ছন্ন হয়ে আসে। ভিতরে ...

শ্যামাসুন্দরী সস্নেহে বলেন, 'এসো মা এসো! দাদা দিদিরা এসো ভাই'

... ...দূরে থেকে প্রণাম করো বৌমা! ঠাকুরঝি কই

...মৃদুস্বরে বলে, 'আসতে পারলেন না।'

'আসতে পারলেন না? শ্যামাসুন্দরী বিস্ময় আর ... বলেন ... আসতে পারলেন না ... সব ...?

'... ও বোধ হয় আসতে পারবে না।'

বোধ হয়টা বাহুল্য।

পুরো একখানা গাড়িতে সুবর্ণ তিনটে মাত্র কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসে গিয়েছে আর কারো আসার প্রশ্ন নেই।

শ্যামাসুন্দরী বলে ওঠেন 'পারবে না, না আসবে না? বুঝেছি, এসব ঠাকুরঝির নিষেধ। আসবে না আমার বাড়ি।'

সুবর্ণ ভদ্র গলায় বলে 'তা কেন, আমি তো এলাম!'

বুদ্ধিমতী শ্যামাসুন্দরী বোঝেন এখানে বিরুদ্ধ মন্তব্য চলবে না। বুঝে অবশ্য প্রীতই হন বৌয়ের পক্ষে এটা সদ্গুণ! ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে 'তুমি তো আমার ... মেয়ে' বলে কর্মান্তরে প্রস্থান করেন।

কথা এমন মিষ্ট করে বলা যায়!

সুবর্ণ একটুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে তারপর ছেলেমেয়েদের নিচের তলায় বসিয়ে রেখে উঠে যায় দোতলায়। এ বাড়িতে আগে এসেছে কয়েকবার। শ্যামাসুন্দরী তখন মাঝে মাঝে ননদ ও ভাগ্নে-বৌদের নেমন্তন্ন করতেন।

এখন গুষ্টি বড় হয়ে গেছে, হয়ে ওঠে না। নেমন্তন্ন করলে অন্তত এক কুড়ি পাত সাজাতে হবে।

দোতলার বড় ঘরটাই শ্যামাসুন্দরীর, দক্ষিণ খোলা রাস্তার ওপর। এর জানলায় দাঁড়ালে বড় রাস্তা দেখা যায়।

বাড়িটা বড় নয়, তবু যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা। দোতলায় ওই রাস্তার দিকটা বাদে আরো দুখানা ঘর, সামনে টানা দালান। কিন্তু জগুর আবাব ভূতের ভয়, একা ঘরে শুতে পারে না, তাই এই বড় ঘরটায় মা ছেলে দুজনের বিছানা পাতা হয় দুটো সরু সরু চৌকিতে।

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'তোর যা নাক ডাকে, ভয় পাবার কথা আমারই। তুই নিজের ঘরে শুগে না বাবা, আমি শেষরাত্তিরে উঠে একটু ঠাকুরদেবতার নাম

করে বাঁচি!'

জগু বলে, 'কেন, আমি ঘরে থাকলে তোমার ইষ্টদেবতাও ভয় খাবে? হুঁ!'

অতএব এদিকের ঘর দুটো শেকল তোলা থাকে। মামলায় কে জিতবে এ নিয়ে দুই মায়ে-বেটায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। তর্কের শেষে অবশ্য জগুরই জয় হয়, কারণ সে শেষ রায় দেন, 'ভগবান যদি থাকে তো তিনি আমারই। বুঝলে? বিষয়টা আমার বাপের, তোমার ঠাকুর্দার নয়।'

শ্যামাসুন্দরী সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না। আবার 'ভগবান নেই' এ কথাও বলা চলে না।

সুবর্ণ অবশ্য মা-ছেলের সেই অপূর্ব বাক্‌বিনিময়ের কথা জানে না, শুধু দুটি সদ্য চৌকি দেখে মুগ্ধ হলো।

পূর্ণিমা তিথি।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে, ঘরের মেঝেয় কালো কালো গরাদের ছায়া। দোতলায় এখন কেউ নেই, কাজেই হ্যারিকেন লণ্ঠন দুটো নিচেয় নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আধো অন্ধকার আধো আলো, শূন্য ঘরখানায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হলো সুবর্ণর সে যেন অন্য কোনো জগতে এসে পড়েছে।

নির্জনতার বুঝি নিজস্ব একটা সত্তা আছে। আর সে সত্তা অলৌকিক সুন্দর। অনেকগুলো লোকের উপস্থিতি কী ক্লেদাক্ত বিশ্রী!

কত বড় দুঃসাহস দেখিয়ে সে একা এভাবে চলে এসেছে, সে চিন্তা মনে আসে না, ফিরে গেলে কপালে কী লাঞ্ছনা জুটবে সে চিন্তা করতে ভুলে যায়, শুধু লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে সুবর্ণ, অনন্তকাল ধরে যদি এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে পেতাম!

এমনি চলমান পথিকের স্রোতের দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা!

সুবর্ণ কেন ওই রাস্তার হেঁটে-যাওয়া লোকেদের একজন হলো না? সুবর্ণ কেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালো?

'ও আমার কপাল, তুমি এখেনে—', পিছনে হরিদাসীর কণ্ঠে ভাঙা কাঁসি ঝনঝনিয়ে ওঠে, 'হ্যাগো মেজবৌদিদি, তোমার আক্কেলটা কী? নিচেয় ভট্‌চাষ এসেছে, পুজো বসে গেছে, পাড়াপড়শীতে ঘর বোঝাই, ছেলেপেলেগুলোকে ফেলে রেখে এসে তুমি এখেনে ভূতের মত দাঁইড়ে আছো? আঁদারের ভয় লাগে না গো?'

'ভয় আবার কি—,' পৃথিবীর মাটিতে নেমে-আসা সুবর্ণ অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'বেশ তো তুই, আমায় ডাকিস নি যে?'

'ডাকি নি আবার? কত ডাকছি! শেষে—'

তাড়াতাড়ি নেমে আসে সুবর্ণ, আর এসেও চোখ জুড়িয়েই যায়। সত্য-নারায়ণ ব্রতের আয়োজন কি সত্যিই এর আগে দেখে নি সুবর্ণ? দেখেছে পাড়াপড়শীর বাড়ি কদাচ, বাড়িসুদ্ধ সকলে ভিড় করে গিয়ে। নিজেদের 'চ্যাঁ-ভ্যাঁ'তেই ত্রাহি ত্রাহি লেগেছে।

এখানে সকলেই বেশ গিন্নীবান্নী, শ্যামাসুন্দরীর বান্ধবীকুলই সম্ভবত, শান্তভাবে বসে আছেন যুক্তকরে।

ধূপ ধুনো চন্দন ফুল চৌকি মালা ঘট পট সব মিলিয়ে দেবতা যেন সত্যই

একটি সত্তা নিয়ে বিরাজ করছেন।

আশ্চর্য, সুবর্ণর ছেলেমেয়েরাও তো এখানে দিব্যি চুপ করে জোড়হাতে বসে আছে! অথচ ওরাই দলে মিশে যেন অন্য অবতার। ঠেলাঠেলি, হাসা-হাসি, অসভ্যতা, লোলুপতা, এই তো মূর্তি ওদের।

পরিবেশ।

পরিবেশই মানুষকে ভাঙে গড়ে।

পুরোহিত পুঁথি খুলে গলা ঝেড়ে 'কথা' শুরু করেন।

কলাবতীর গল্প!

কলাবতীর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সত্যনারায়ণ, সুবর্ণলতার জীবনযাত্রার গতিটা ফিরিয়ে দিতে পারেন না?

কলাবতীর সত্যকার ভক্তি ছিল!

সত্যকার ভক্তিটা কেমন বস্তু? আর তার আকুলতাটাই বা কেমন?

গাড়ি অনেকক্ষণ আগে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। 'কথা'র শেষে পড়-শীরা বিদায় নেয়, শ্যামাসুন্দরী এদের ছাড়েন না। রাতের খাওয়াটা খাইয়ে দেবেন বলে লুচি ভাজতে বসেন। অভিভূত সুবর্ণ আপত্তি করে না, সুবর্ণ যেন ভুলে গেছে সে কাদের বাড়ির। ভুলে গেছে আবার সে-বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

কিন্তু মনে থাকলেই কি মনে করতে পারতো, সেই দাঁড়ানোর চেহারাটা এমন হবে? ভয় ছিল একা আসার জন্যে, ভয় ছিল রাত হওয়ার জন্যে, তবু এ ভয় ছিল না, সেই দরজা তার সমস্ত কদর্যতাকে উদ্‌ঘাটিত করে বন্ধ হয়ে থাকবে।

ছেলেমেয়ে ক'টা বাবা কাকা জেঠা প্রভৃতি অনেককে ডেকে ডেকে শেষ অবধি বাইরের দরজার ধুলো-জঞ্জালের ওপরই বসে পড়েছে।

একেই গুরুভোজনে ক্লান্ত, তাছাড়া রাতও হয়েছে।

ঝি হরিদাসী কড়া নেড়ে নেড়ে হতাশ আর অবাক। মন্তব্য প্রকাশের ভাষা যোগাচ্ছে না আর তার।

গলির মধ্যের এপাশের ওপাশের সমস্ত বাড়ি এই দোর-ঠ্যাঙানোর সমারোহে সচকিত, জানলায় কৌতূহলী দৃষ্টির উঁকিঝুঁকি।

শেষবারের মত দরজায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে হরিদাসী পরাজিতের সুরে বলে, 'আমার দ্বারা আর হবে নি মেজবৌদি, আর দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা নেই। বেশি আত্তির হলে বাড়িউলি আবার সদর কপাট বন্ধ করে দেয়। তোমার সঙ্গে গিয়ে ভ্যালা বিপদ হল দেখছি। তোমার মামীশাউড়ীর যে আবার আদর উথলে উঠল, নুচি ভেজে খাওয়াতে বসলো!'

রাত দশটা না বাজতেই এদের ঘুমের বহর দেখে সুবর্ণও প্রথমটা সত্যিই যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন অবাক হওয়াটা পার হয়ে গিয়েছে।...তারপর মনে পড়ল ভাসুর এখন উপস্থিত নেই। মেজ বোন সুবালার বরের অসুখ শুনে খবর নিতে গেছেন তার গ্রামে।

এসব কর্তব্য সুবোধই করে থাকে। তাছাড়া সুবোধ বাড়িতে থাকলে যে বাড়িসুদ্ধ সবাই এমন করে ঘুমে 'পাথর' হয়ে যেতে পারত না, সেটা নিশ্চিত।

সুবর্ণ আরক্ত চক্ষু মেলে বলে, 'তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে হরিদাসী, বাসায় যাও।'

হরিদাসী দোদুল্যমান মনকে 'রাশে' এনে বলে, 'শোনো কথা! আতদুপুরে এই কুচোকাচা সমেত তোমাকে আস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে বাসায় যেতে পারি? হলো কি এদের? কেউ 'নিদুলী' মন্তর দিল নাকি?'

সামনের বাড়ির বসাক-কর্তা অনেকক্ষণ সহ্য করে এবার রণাঙ্গনে নামেন। ভারী গলায় হাঁক পাড়েন, 'ও প্রবোধবাবু, বলি কী রকম ঘুম মশাই আপনাদের! বাড়ির মেয়েছেলে দু ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে!'

এবার বুঝি মুক্তকেশী-নন্দনদের ঘুম ভাঙে, প্রভাসচন্দ্রের ভারী গলার উত্তর পাওয়া যায়, 'আমাদের বাড়ির মেয়েবৌরা কেউ রাতদুপুরে একা বাইরে থাকে না মশাই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গে!...'

খোলা জানলাটা সজোরে বন্ধ হয়ে যায়।

'এ হচ্ছে তেজ-দম্ভর কথা!' হরিদাসী অকুতজ্ঞের গলায় বলে ওঠে, 'এ হচ্ছে তেজের কথা, দ্বেষের কথা। আগে কি জানি ছাই—তোমাদের ভেতরে এত মনকষাকষি। এমন যখন অবস্থা, যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। পুরুষের রাগ হচ্ছে চণ্ডাল! সেই চণ্ডালকে—'

'তুই যাবি? যা, যা বলছি—'

হরিদাসী বিরক্তভাবে বলে, 'ওমা, দেখ একবার! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! বেশ যাচ্ছি। এই ধর তোমাদের সিন্নীর পেসাদ।'

'ও তুই নিয়ে যা।'

'আমি নে যাবো কিগো? এ যে এখেনের জন্যে দিল মামীমা!'

'ঠিক আছে, তুই না নিস রাস্তায় ফেলে দিগে যা।'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা!' হরিদাসী সভয়ে প্রসাদটা মাথায় ঠেকিয়ে বলে, 'হিঁদুর মেয়ে হয়ে—'

এই খানিক আগে নগদ চারগণ্ডা পয়সা বখশিশ দিয়েছে মেজবৌ, তাই মুখে বেশি বলে না, মনে মনে বলে, 'সাধে আর গুষ্টিসুদ্ধু লোকে তোমার নিন্দে করে!'

বসাক-কর্তা বয়সে প্রবীণ, তবু রাতদুপুরে একা সুবর্ণর কাছে যেতে তাঁর সাহস হয় না। গৃহিণীর সাহায্য নেন।

বসাক-গৃহিণী নেমে এসে করুণা-ঢালা সুরে বলেন, 'ইস, ছেলেপুলে যে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি! রাস্তার ওপর! ধুলোয় মাথামাখি! ব্যাপার কি মেজবৌমা, একা কোথায় গিয়েছিলে?'

মেজবৌমা নিরুত্তর।

বসাক-গৃহিণী আরো মমতা ঢালেন, 'বুঝেছি, রাগারাগির ব্যাপার। কিন্তু যতই যা হোক, রাতদুপুরে বৌ-ছেলেকে পথে বসিয়ে রেখে দোর দিয়ে ঘুমোবে, এমন দুর্দান্ত রাগ? কোথায় গিয়েছিলে? বাপের বাড়ি বুঝি?'

মেজবৌমার 'বাপের বাড়ি' বস্তুটা যে কোন্ পর্যায়ে আছে, সেটা পাড়ার কারোরই অবিদিত নেই, তবু ও ছাড়া আর কিছুও মনে পড়ে না মহিলাটির।

সুবর্ণ এবার কথা কয়।

স্থির গলায় বলে, 'না।'

'তা হলে?'

বোকা হলেও চন্নটা ইদানীং খুব কথা শিখেছে, সে ঘুম-চোখেও বলে ওঠে, 'মামীঠাকুমার বাড়ি সিন্নি ছিল, তাই নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম—'

'মামীঠাকুমার বাড়ি?' বসাক-গৃহিণী ক্রমশই কৌতূহলাক্রান্ত হন, 'তোরা একা গিছলি? আর কেউ যায় নি? ঠাকুমা?'

'না।' মেয়েটার চোখের ঘুম ছেড়ে আসে, বলে, 'না, মামীঠাকুমা যে মকদ্দমায় জিতেছে, ঠাকুমা যাবে কেন?'

বসাক-গৃহিণীর আর ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয় না, কারণ মুক্তকেশীর ওই ভাজ বনাম ভাইপোর মামলা জানতে কারো বাকী নেই। সাত বছর চলছিল।

বসাক-গৃহিণী বুঝতে পারেন।

গম্ভীরভাবে বলেন, 'তা তোরা গেলি যে?'

'তা জানি না। মা গেল তাই। দিদি, দাদা, মেজদা তো যায় নি। দিদি বলেছিল, যেখানে ঠাকুমা যাচ্ছে না, সেখেনে--'

'চন্নন, তুই চুপ করবি?'

মায়ের ধমকে চমকে চুপ করে যায় চন্দন।

সঙ্গে সঙ্গে বসাক-গৃহিণীর করুণার প্রস্রবণও শুকিয়ে যায়। চুপ করবার নির্দেশ দিয়ে এই যে ধমক, এ কি সুবর্ণর শুধুই মেয়ের প্রতি?

ওই ধমক তাঁর কৌতূহলের ওপরও একটা চড় বসিয়ে দেওয়া নয় কি?

পড়শিনীর ঘরের এই অদ্ভুত 'কেচ্ছা'টা সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর হয়েছিল, হবেই তো। যা নয় তাই কাণ্ড, তবু হবে না কৌতূহল? বেশ, ঠিক আছে!

গম্ভীর গলায় বলেন, 'থাক্, মেজবৌমা, তোমাদের ঘরের "কেলেঙ্কার" শোনবার দরকারও নেই আমার, প্রবৃত্তিও নেই। তবে যা দেখছি, আজ রাতে আর দরজা ওরা খুলবে না। তা কুচোকাচা নিয়ে সারারাত পথে পড়ে থাকবে? মানুষের চামড়া চোখে নিয়ে এ অবস্থায় ফেলে চলে গিয়ে নিশ্চিন্দির ঘুম তো ঘুমনো যাবে না! বাকি রাতটুকু আমার ঘরে এসে শোও।'

পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে কথা কওয়ার রেওয়াজ বৌ-ঝির নেই, কিন্তু সুবর্ণ ওই রেওয়াজটার উপর দিয়ে চলে। সুবর্ণ কথা বলে।

এখনও বলল।

'শোবার আর দরকার হবে না বসাক-কাকীমা!'

বসাক-গৃহিণী তবু টলেন না, সুবর্ণর একটা হাত ধরবার চেষ্টা করে বলেন, 'আচ্ছা না শোও, নয় বসেই থাকবে, তবু তো একটা আচ্ছাদনের নিচে! তোমার দরকার নেই, ছানাপোনা ক'টার দরকার আছে। এভাবে পড়ে থাকলে রাতের মধ্যে 'নিমুনি' হবে যে!'

'হবে না কাকীমা, কিছু হবে না। হলেও ওরা মরবে না, রক্তবীজের ঝাড় কিনা! আপনি আর ব্যস্ত হবেন না, যান ঘুমোন গে যান।'

বটে!

যান ঘুমোন গে যান!

বসাক-গৃহিণী প্রসারিত হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, ও মাগো! কলিতে ভালোর বালাই নেই।...চলো গো চলো, দোর দিয়ে শুয়ে পড়বে চল। সাধে কি আর সুবোর মা অমন করে! বৌ নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরেই—বাব্বাঃ, বৌ নয় তো যেন কেউটের ফণা!'

রাগ করে বাড়ির দরজায় খিল লাগান বসাক-গৃহিণী, অথচ কৌতূহলকে রোধ করতে পারেন না, সেই রাতদুপুরে ছাতে উঠে দেখতে থাকেন, কী হয়

শেষ অবধি।

জ্যোৎস্নায় চারিদিক ফাটছে, দেখা যাচ্ছে সবটাই।...কিন্তু নতুন আর কী দেখবেন, সেই তো বৌ একই ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে—ছেলেগুলো সেই ভাবেই ঘুমোচ্ছে।

কতক্ষণ আর দেখা যায় ছাতে দাঁড়িয়ে? রাত গভীর হতে হতে ক্রমশ শেষ হয়ে যায়।

সকালবেলা দরজা আটকে রাখা শক্ত, গোয়ালা আসবে, আসবে ঝি, আসবে শাক-তরকারিওয়ালী।

কখন কার ফাঁকে ছেলেমেয়েগুলো ঢুকে পড়ে টুপটাপ করে খুব খানিকটা ব্যঙ্গ প্রশ্নের সামনে গিয়ে পড়ে।

যেখানে গিয়েছিল, সেখানেই থাকলি না কেন, এ প্রশ্ন করতে থাকে সেজ-কাকা, ছোটকাকা, আরো ভাইবোনেরা। তারা অপ্রতিভ হয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'তোমরা এমন ঘুম ঘুমোবে জানলে তাই থাকতাম!'

কিন্তু সে তো ওরা, সুবর্ণলতা?

সুবর্ণলতাও কি খোলা দরজার সুযোগে আবার ঢুকে পড়ল?

নাঃ, সুবর্ণকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেতে হল মুক্তকেশী আর তাঁর মেজছেলেকেই।

উপায় কি? কথাতেই তো আছে—'দোরের মড়া ফেলবি তো ফেল্!'

মড়া অবিশ্যি নয়, মরা এতো সোজাও নয়। মরণ এত সহজ হলে মানব-হৃদয়-ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়গুলো তো লেখাই হতো না।

সুবর্ণলতা মরে নি, শুধু শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারে যাকে বলে 'মূর্ছা', আর বিজ্ঞ পরিজনেরা বলে 'আদিখ্যেতা'।

এত বড় আদিখ্যেতার পরও কিন্তু ভয়ানক রকমের অদ্ভুত কিছু ঘ... না। হ্যা, সেই এক আশ্চর্য রহস্য! হয়তো বা—এই গলিটা নিতান্তই গলি আর গলির বাসিন্দারা নেহাতই মধ্যবিত্ত বলে তাদের জীবনের সব লীলাগুলোই ওই মধ্যপথে থেকে যায়, চরমে পৌঁছতে পারে না।

না, চরমও জানে না এরা, পরমও বোঝে না, তাই সেই চিরাচরিত কড়া মন্তব্য, বিস্ময়াহত মন্তব্য, আর তীব্র তিরস্কার, ব্যস তার বেশি কিছু নয়।

যেন বড় একটা আয়োজন করে ফেঁসে যাওয়া!

আর সুবর্ণ?

সে তো বেহায়া।

তাই সে জ্ঞান হয়েই বলে, 'তুলে আনতে মাথার দিব্যি দিল কে? লোক-লজ্জা? তা সে লজ্জা তো ঘুচেই গিয়েছিল।...পাড়াসুদ্ধ সকলেই তো জেনে ফেলেছিল, এ বাড়ির মেজবৌ কুলের বার হয়ে গিয়েছিল—'

॥ ১৫ ॥

সুবর্ণর লজ্জা নেই, কিন্তু সুবর্ণর বিধাতার বোধ করি কিছু পরিমাণ লজ্জা অবশিষ্ট ছিল, তাই হঠাৎ একটা নতুন ঢেউ আনিয়ে ক'টা দিনের জন্যে অন্তত ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সুবর্ণকে। তৎক্ষণাৎ আবার ভাতের হাঁড়ির ধারে পাঠিয়ে দিলেন না তাকে।

হঠাৎই।

হঠাৎই প্রকাশচন্দ্র দেশের মহামারীর খবর নিয়ে এসে আছড়ে পড়ল।

প্লেগ।

আবার প্লেগ! যে প্লেগ ক-বছর যেন আগে শ্মশান করতে বসেছিল দেশটাকে!

কলেরা, বসন্ত তবু ভালো। কিন্তু প্লেগ?

ওরে বাবা, সাক্ষাৎ যম!

পালাও পালাও!

যে যেখানে পারো পালাও! দক্ষিণের লোক উত্তরে এসো, পুবের লোক পশ্চিমে। চললো সেই ছুটোছুটি!

কলকাতার বাইরে যেখানে যত লোক আছে, তাদের বাড়ি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আগত আগন্তুকে। যাবেই তো।

প্লেগ থেকে রক্ষা পেতে যে সব অসহায় আত্মীয় ছুটে এসে পড়েছে, তাদের তাড়িয়ে দেবে কী করে তারা?

সব বৌরাই বাপের বাড়ি কি মাসীর বাড়ি, নিদেনপক্ষে পিসির বাড়িও ছুটেছে।...শুধু সুবর্ণলতার ব্যাপার আলাদা।

সুবর্ণলতার বাপের বাড়ি নেই। বাপের গুষ্টির কেউ নেই ঠাঁই দেবার। তবে?

সুবর্ণলতা কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবে?

সুবর্ণলতার শাশুড়ী পর্যন্ত নবদ্বীপে গুরুপাটে গিয়ে উঠেছেন। চাঁপা তাঁর সঙ্গে যাবে কিন্তু সুবর্ণলতা আর তার ন্যানজারি ক'টা?

সুবর্ণলতা বলল, 'আমি মরব না, এ প্রমাণ তো হয়ে গেছে, প্লেগ আবার কী করবে আমার?'

কিন্তু সেটা তো কাজের কথা নয়।

পুরুষেরা যে কোনো মুহূর্তে পালাতে পারে, শহরের অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠলে পালাবেও। অফিস-কাছারিও তো খোলা থাকবে না আর বেশিদিন, তালা পড়ল বলে। স্কুলগুলো তো বন্ধ হয়েই যাচ্ছে। ইঁদুর দেখলেই মারার বদলে, দেখামাত্রই মরে যাচ্ছে লোকে।

তা সেই অবস্থায় তুমি লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ কোলে কাঁধে পাঁচটা আর জঠরের অভ্যন্তরে একটা অপোগণ্ড নিয়ে পুরুষদের পায়ে বেড়ি হয়ে বসে থাকবে? তুমি তো বলছ তোমার ছেলেদের অন্য কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দাও!

কে নেবে ভার?

বলে নিজের ভারেই অস্থির লোকে।

ওদের নিয়েই মরতে চাও?

বটে! ওরা তোমার খাস তালুকের প্রজা! তাই মারতে ইচ্ছে হলে মারবে! ওদের বাঁচাবার জন্যেই তোমায় চলে যেতে হবে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে! যেখানে এই রাক্ষসী মহামারীর থাবা পোঁছয় নি।

কিন্তু কোথায় সেই জায়গা?

সহসা সুবর্ণর ভাসুর সুবোধচন্দ্র বাতলে দিল সেই জায়গা।

চাঁপতা!

সুবালার বাড়ি।

সম্প্রতি দেখে এসেছে সুবোধ, দেখেছে দৈন্যের মধ্যেও সুখের সংসার সুবালার। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, বাগানে তরকারি, ক্ষেতে ধান।

তবে দৈন্যটা কোথায়?

দৈন্যটা নগদ টাকায়। তবু মনে দৈন্য নেই সুবালার আর তার বরের। এই তো মা-ভাই সাতজন্মে খোঁজ নেয় না, একবার অসুখ শুনে ভাই একটু দেখতে গিয়েছিল বলে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে।

কী যত্ন! কী আদর!

সুবর্ণকে অনাদর পেতে হবে না।

যে মানিনী উনি, যেখানে সেখানে থাকতে পারবেন না তো।

এই তো প্রকাশের বৌয়ের সংগে তার শ্বশুরবাড়িতে যাবার কথা হয়েছিল একবার, সুবর্ণ হলো রাজী?

এই বেশ।

এই ঠিক জায়গা।

সুবোধচন্দ্র নিজেই হঠাৎ হাল ধরলো।

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে নেপথ্যের উদ্দেশে বলল, 'মেজবৌমা, আমার ইচ্ছে নয় তুমি এই মড়কের সময় এখানে থাকো, সুবালার কাছে গিয়ে থাক দু-দশদিন।'

একটা ছেলে ঘর থেকে বলে ওঠে, 'জেঠাবাবু, মা বলছে, সবাই চলে গেলে আপনাদের রেঁধে দেবে কে?'

সুবোধ হেসে উঠে বলে, 'ও হরি, এই কথা! সে যা হয় হবে। বামুনদের ছেলে, দুটো ফুটিয়ে নিয়ে খেতে পারা যাবে না? তাছাড়া আমরাই বা আর কদিন? এ শহরে যা অবস্থা হয়ে উঠছে ক্রমশ...যাক, ওই কথাই থাকল।'

ছেলেটা বলল, 'আচ্ছা জেঠাবাবু, তুমি যা বলছ তাই হবে।'

তাই হবে!

সুবর্ণ বলছে তাই হবে!

অবাক কথা বৈকি!

তবু রীতিমত স্বস্তির কথা।

সবাইকে স্বস্তি দিয়ে সুবর্ণ তার প্রায় অপরিচিত ননদের বাড়ি যাত্রা করে মড়কের হাত থেকে বাঁচতে।

মরার জন্যেই যার আজীবন আকিঞ্চন।

কেউ বোধ হয় ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে, সুবালা ভিজে শাড়ি সপসপিয়ে জলভর্তি ঘড়াটা কাঁখে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক মিনিটে এসে হাজির।

দুম করে ঘড়াটা দাওয়ায় বসিয়ে সেই ভিজে কাপড়েই একটা পেন্নাম ঠুকে উল্লসিত স্বরে বলে ওঠে, 'মেজদা গো, যাই ভাগ্যিস তোমাদের কলকেতায় "পেলেগ" এসেছিল, তাই না এই কাঠকুড়ুনীর কুঁড়েয় মহারাণীর পদধুলি পড়লো!'

সুবর্ণ তার বয়সে বড় মান্যে ছোট ননদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। দেখল ব্যঙ্গ নয়, কৌতুক। হুল নয়, মধু।

মনটা জুড়িয়ে গেল।

চোখ জুড়োচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠে পর্যন্ত। এই গ্রামে নেমে পর্যন্ত। গরুর গাড়িতে আসতে হয়েছে খানিকটা, সেও তো পরম লাভ। সুবর্ণ তো যতক্ষণ তাদের গলি ছেড়েছে, ততক্ষণ ওই কথাই ভেবেছে।

ভাগ্যিস কলকাতায় প্লেগ এসেছিল!

কে বলতে পারে, সেই ভয়ঙ্কররূপী সুখদাতা না এলে সুবর্ণর জীবনে কখনো আর রেলগাড়ি চড়া হতো কিনা।

হয়তো হতো না।

অতএব গ্রাম দেখাও হতো না আর কখনো।

কিন্তু সুবর্ণ কি কখনো গ্রাম দেখে নি?

দেখেছে বৈকি।

সেই তার পিতৃভূমি বারুইপুর গ্রাম।

সেও এমনি ছায়া-সুশ্যামল নিভৃতে শীতল বাংলার পল্লীগ্রাম। কিন্তু সুবর্ণর স্মৃতিতে সে ছায়া কেবল অন্ধকার। সে শ্যামলিমায় দাবদাহ। হায়, সুবর্ণ যদি সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে 'বাবার সঙ্গে ঠাকুমার কাছে যাব' বলে না নাচতো!

সুবর্ণর দেখা গ্রামের স্মৃতিতে সুবর্ণর জীবনের অভিশাপ জড়িত, তবু এই মাঠ পুকুর ফল বাগান, ছোট ছোট ঝোপঝাড়, সব কিছু তার সবুজের সমারোহ আর শীতলতার স্পর্শ নিয়ে সুবর্ণকে যেন মায়ের স্নেহের স্বাদ যোগাচ্ছিল।

খাস কলকাতার বৌ না হয়ে সুবর্ণ যদি এরকম এক গ্রামের বৌ হতো!

গরুর গাড়িতে আসতে আসতে বলেও ফেলেছিল সুবর্ণ সে কথা।

'আমার যদি এরকম একটা পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি হতো!'

প্রবোধচন্দ্র অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মোহভঙ্গ করিয়ে দিতে বিদ্রূপহাস্যে বলেছিল, 'বল কি! তোমার মতন "আলোকপ্রাপ্তা"র এই পচা পাড়াগাঁ পোষাতো? এখানের মেয়েরা স্বপ্নেও কখনো দেখেছে বৌমানুষ বসে খবরের কাগজ পড়ে? বৌমানুষ রাতদিন মুখে মুখে তর্ক করে? বৌমানুষ দেশের কথা ভেবে মাথা গরম করে?'

সুবর্ণ দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিল, 'দেখে নি, দেখতো।'

'হুঃ! তা হলে আর ভাবনা ছিল না। সে বৌকে ঢেঁকিতে ফেলে কুটতো। শহরের দোতলায় পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবার সুখ জুটলে সবাই অমন

পাড়াগাঁর শোভা দেখতে পায়। ক্ষারে কাপড় কাচতে কাচতে আর ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে জান নিক্লে যেত!'

সুবর্ণ মৃদু তীক্ষ্ম হাসির সঙ্গে বলেছিল, 'তেমন নিক্লোলে একটা সুবিধে তো রয়েইছে। দীঘি-পুকুর! ঝাঁপ দিলেই নিশ্চিন্দি!'

প্রবোধচন্দ্র সহসা স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠেছিল, 'তোমায় এখানে আনা দেখছি ঠিক হয় নি। সর্বনেশে মেয়েমানুষ তুমি, তোমায় বিশ্বাস নেই!'

ছোট ছেলেমেয়েরা সকৌতুকে দেখছিল, বাবা মা'র হাত ধরেছে। দশ এগারো বছরের ভানু কানু দুই ভাই যেন লজ্জিতও। সুবর্ণ সেটা অনুভব করে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবোধ ছাড়ে না। ভয়ানক আতঙ্কিত গলায় বলে, 'তুমি এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, ওসব দুর্মতি করবে না!'

সুবর্ণ মৃদু হেসে বলে, 'দুর্মতি যদি করি, এই পৃথিবীর সঙ্গে তো সব সম্পর্কই চুকে যাবে, গা ছুঁয়ে দিব্যির আর কি মূল্য থাকবে?'

প্রবোধ আহত হয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, 'ওঃ! তাই বটে। তুমি তো আবার সম্পর্কটা যে জন্ম-জন্মান্তরের সে কথা মানোই না!'

'তুমি মানো?' সকৌতুকে প্রশ্ন করে সুবর্ণ।

প্রবোধ সতেজে বলে, 'হিঁদুর ছেলে হয়ে জন্মেছি, মানবো না! সবই মানি।'

'আচ্ছা তা হলে তো এ কথাও মানো, অপঘাতে মলে ভূতপেত্নী হয়?'

'আলবাৎ মানি। না হলে আর শাস্ত্রে বলত না অপঘাতে অনন্ত নরক!'

'তবেই তো।' সুবর্ণ হেসে ওঠে, 'আমি ধর অপঘাতে মরে অনন্ত নরকে পচছি, তুমি মহত্তর বলে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রত্ব করছ, তখন? তখন ওই জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কটার গতি?'

'কুতার্কিক মেয়েমানুষের সঙ্গে কেউ কথায় পারবে না!'

বলে রাগ করে মুখ হাঁড়ি করে বসেছিল প্রবোধ। কিন্তু সুবর্ণ তা নিয়ে বিচলিত হয় নি। সুবর্ণ দেখছিল গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে, তার সামনের উঠানে তুলসীমঞ্চ, পিছনে গোয়াল। উঠোনগুলি মাটি-ল্যাপা, গোয়ালগুলি খড়ের চালের, ছবির মতই সুন্দর।

এই সৌন্দর্যকে লালন করছে তো গ্রাম তার হৃদয়রস দিয়ে।

চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

তবু মনের মধ্যে ছিল একটা তীক্ষ্ম প্রশ্ন। যেখানে যাদের কাছে যাচ্ছে, তারা নিকট-আত্মীয় হলেও দূরত্বের ব্যবধান অনেকখানি। সুবর্ণরা তো সাত-জন্মেও ওদের নাম মুখে আনে না। সুখের সময় তাদের বিস্মৃত হয়ে থেকে অসুবিধের সময় গলায় এসে পড়া, এর চাইতে নির্লজ্জতা আর কী আছে?

মেজননদ যদি সেই নির্লজ্জতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায়! যদি বলে, 'কিগো, এখন বুঝি দায়ে পড়ে রায়মশাই? দরকারে পড়ে বোন?' বলা তো অসম্ভব নয়!

যে কেউই এ অবস্থায় বলতে পারে এ কথা।

তার উপর আবার সুবালা মুক্তকেশীর মেয়ে।

কিন্তু মুক্তকেশীর মেয়ে মুক্তকেশীর মত মুখে মুখে উপযুক্ত জবাব দেবার

জন্যে তৎপর হলো না। সে উল্লাসে পুলকে বলে উঠল, 'ভাগ্যিস "পেলেগ" এসেছিল, তাই মহারাণীর পদধূলি পড়লো!'

কান জুড়িয়ে গেল সুবর্ণর, জুড়িয়ে গেল প্রাণ।

সুবর্ণর আবির্ভাবে কেউ পুলকিত হচ্ছে, এ অনুভূতিটা নতুন।

সুবর্ণ এর স্বাদ জানে না।

সুবর্ণ জানে, সুবর্ণর আবির্ভাবও নেই, তিরোভাবও নেই। সে যেখানে বিরাজিত, সেটা তার নিত্যধাম। জানে তার সেই নিত্যধামের চারিপাশের বায়ু-মণ্ডল সমালোচনার প্রখর তাপে তপ্ত থাকবে, আর তার মাথার উপরের আকাশ আর পায়ের নিচের মাটি সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে, 'তোমাকে আচ্ছাদন দিয়েছি এই ঢের, তোমাকে দাঁড়াতে দিয়েছি এই যথেষ্ট!'

'সুবর্ণ তুমি এলে? কী আনন্দ কী সুখ!'

এ ভাষা সুবর্ণর জন্য নয়।

অথচ জগতের দীনাতিতম দীনের জন্যও আছে এ ভাষা। ভিখারিণী মাও প্রার্থনা করে, 'নবমী নিশি গো, তুমি আর পোহায়ো না—'

সুবর্ণর জন্যে এ প্রার্থনা নেই।

সুবর্ণ কি মূল্যহীন?

সুবর্ণ 'মূল্যবান' হবার সৌভাগ্য থেকে চিরবঞ্চিত?

সুবর্ণর মূল্য ধার্য হয়েছে শুধু একটা অভ্যাস-মলিন শয্যায়। সেখানে সুবর্ণর জন্যে আগ্রহের আহবান অপেক্ষা করে।

কিন্তু সে আগ্রহ কি প্রেমের?

সে আহ্বান কি পুরুষের?

তা নয়।

সে শুধু অভ্যাসের নেশা।

তাই সে আহবান সুবর্ণর চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ুদের পীড়িত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে।

তাই সুবর্ণর মূল্য কি জানে না সুবর্ণ।

তাই এক যৌবন-থাকতে-প্রৌঢ়া, খেটে খেটে শীর্ণ, শ্রীহীন মেয়ের এই খুশিটুকু সুবর্ণর প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

প্রবোধ বলে, 'তা পড়লো পায়ের ধুলো! কিন্তু এই পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে থেকে চিনে তো ফেলেছিস ভাজটিকে? মহারাণীই বটে। এখন মহারাণীর মেজাজ বুঝে চলতে নাজেহাল হ!'

'আহা, এখনই নয় যাওয়া-আসা নেই তেমন, তা বলে কি দেখি নি আমি ওকে!' সুবালা পায়ের দিকের শাড়ীটা নিংড়ে নিংড়ে জলটা ফেলতে ফেলতে বলে, 'আমার মা জননীর হাতে পড়লে শিবও বাঁদর হয়ে ওঠে। গুরুজন নিন্দে করছি না, তবে বুঝি তো।'

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকায়।

ওই হাতে-পায়ে শির ওঠা, শীর্ণ মুখ, পাতলা চুল, প্রায় বাসনমাজা ঝিয়ের মত চেহারার মানুষটার মধ্যে এমন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তি! সুবর্ণকে বুঝতে পারে ও!

প্রবোধ অবশ্য অবাক হয় না। হেসে বলে ওঠে, 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! তা যাক্, বোনাইকে দেখছি না যে?'

'দেখবে কোথা থেকে? এখন যে মর্নিং ইস্কুল! ছেলে ঠেঙাতে গেছে সেই প্রাতঃকালে উঠে। বাড়িও তাই ঠাণ্ডা দেখছ, সবগুলো তো সেই গোয়ালে—'

সুবর্ণ ফস করে বলে বসে, 'মেয়েরা?'

'মেয়েরা?' সুবালা উঠোনের দড়ি থেকে গামছাখানা টেনে নিয়ে চুলগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে ওঠে, 'বড়টা তো শ্বশুরবাড়ি, ছোট তিনটে ওই গোয়ালেই।'

'ইস্কুলে?'

'হুঁ। আমার দ্যাওর যে গাঁয়ের লোকের পায়ে ধরে ধরে গাঁয়ে একটা মেয়ে-পাঠশালা বসিয়েছে গো! তা নিজেদের ঘরের মেয়েদের তো আগে পাঠাতে হবে! নচেৎ ফাঁসি!'

'তোমার দ্যাওর?' আহ্লাদে উজ্জ্বল দেখায় সুবর্ণর মুখ, 'খুব ভাল, তাই না?'

'ভাল বল ভাল, বাউণ্ডুলে বল বাউণ্ডুলে, তবে—' সুবালা গলা একটু নামিয়ে বলে, 'ইদানীং স্বদেশী বাতিকে বড়ভাইকে একটু ভাবনায় ফেলেছে—'

ভিজে কাপড় ছাড়তে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় সুবালা। চেঁচিয়ে বলে, 'হাত-মুখ ধুতে যেন ঘাটে যেও না বাপু, আমি দিচ্ছি জল।'

প্রবোধ চিন্তিতভাবে বলে, 'এই হল এক ঝামেলা। ভগ্নীপতির ভাই যদি আবার স্বদেশে-ফদেশী হয় তাহলেই তো—'

'কী তা হলে? তোমার ফাঁসি হবে?'

'আমার কথা হচ্ছে না। তোমাদের রেখে যাব—পুলিসকে তো জানো না, পচা গণ্ডগ্রামের বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে, পুকুরের পাঁকের নিচে থেকে আসামীকে টেনে বার করে—'

'কলকাতার রাজরাস্তা থেকেও করছে।'

'করছে! আমরা তো আর কেউ ওই সব গোঁয়ার্তুমির মধ্যে মেতে যাই না! বলে গোলমালের টুঁ শব্দটি উঠলে সে পথের দিক দিয়ে হাঁটি না।'

সাবধানী প্রবোধ আপন সাবধানতার মহিমায় স্ফীত হয়।

সুবর্ণ এখন আর তর্ক করতে বসে না, সুবর্ণর মনের মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, একটা স্বদেশীবাতিক ছেলেকে দেখতে পাবে সে! কত বড় সেই দ্যাওর? বিয়ে হয়েছে? ঘর-সংসারী? মনে হয় না, সুবালা বলেছে 'বাউণ্ডুলে'।

এরপরই সুবালা আতিথ্যের ধুম লাগায়। মাজা ঝকঝকে গাড়ুতে জল এনে দেয় হাত-মুখ ধুতে, বড় বড় ফুল কাঁসার রেকাবিতে করে ঢেলে দেয় মুড়ি, নারকেল কোরা, নাড়ু।

ভাইপো-ভাইঝিদের সযত্নে কাছে টেনে টেনে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আর তারপরই বলে ওঠে, 'ওই যে আমার দ্যাওর আসছে।...এই খবরদার, কেউ পেন্নাম করতে যাবি না! পেন্নাম করা দেখতে পারে না দুচক্ষে।'

পেন্নাম করা দেখতে পারে না দুচক্ষে! এও এক অভিনব ভাষা! যা সুবর্ণর কানকে আর একবার শীতল করে। হয়তো বা মুখটাকেও দীপ্ত করে।

কিন্তু প্রবোধের কাছে এই আগ্রহদীপ্ত মুখমণ্ডল অবশ্যই প্রীতিকর হয় না। হবার কথাও নয়। প্রবোধের মনে হয়—ছেলেদের ক'টাকে তাদের পিসির কাছে

রেখে সুবর্ণকে নিয়ে চলে যায়। কে জানতো যে সুবালার সংসারে আবার এরকম একটা সাংঘাতিক জীব আছে!

স্ত্রীকে এরকম একটা বাউণ্ডুলে পরপুরুষের কাছাকাছি রেখে চলে যাওয়ার থেকে তাকে যমের মুখে তুলে দেওয়াও ভাল।

একেই তো নিজের মনের কাছে নিজের দিকের বাটখারা তার হাল্‌কা, সুবর্ণর মন যে তার নাগালের অনেক উঁচুতে তা আর জানতে বাকী নেই প্রবোধের। কোনোমতে আগলে আগলে রেখে বয়েসকালটা পার করে দেওয়া এই পর্যন্ত!...কিন্তু সেই কালটার ঠিক নির্দিষ্ট সীমারেখাটা কি? বারো বছরের মেয়ে সুবর্ণর, আরও পাঁচটা ছেলে-মেয়ে তার নিচে, তবু তো দেখলে মনে হয় না বয়েসকালটা চলে যাচ্ছে তার!

সেকালের নবাবরা যে বেগমদের হারেমে পুরে রাখতো, সেটাই ঠিক ছিল। হায়, কোথা থেকে এই প্লেগের হুড়ো এল! আশ্চর্য, প্রবোধের এমন বুদ্ধি হলো না যে রেখে যাবার আগে একবার দেখে যায়, জায়গাটা কেমন?

সুবালার সংসারই আছে শুধু, আর বুড়ী শাশুড়ী আছে, এইটাই তো জানা, ওই দ্যাওরটার কথা তো সঠিক জানা ছিল না।

কক্ষনো যেন না ওর সামনে বেরোয় সুবর্ণ!

প্রবোধ অতএব ভ্রুভঙ্গী করে স্ত্রীকে ভিতরে যেতে নির্দেশ দেয়, কিন্তু বিফল হয় সেই ইশারা। সুবর্ণও ভ্রূভঙ্গীতে জানায়, 'কেন, হয়েছে কি?'

ইত্যবসরে সেই ভয়ংকর জীবটি উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে নতুন একটি 'সংসার' দেখে ঈষৎ থমকে দাঁড়ায়।

কিন্তু মুহূর্তই।

সুবালা সহর্ষে বলে ওঠে, 'আমার মেজদা আর মেজবৌ গো! আর এরা ভাইপো-ভাইঝি! এর নাম ভানু, এর নাম কানু, এ চন্নন, এ পারুল, এ খোকা। ডাকনামই জানি বাপু, পোশাকী নাম জানি না। কই চাঁপাকে তো দেখছি না মেজবৌ? হরেকেষ্ট, এতক্ষণ খেয়ালেই আসে নি! সে?'

প্রবোধ কিছু বলার আগেই ফট করে সুবর্ণ ওই ছোঁড়ার সামনে বলে বসে, 'সে তার ঠাকুমার সঙ্গে গেছে।'

শুনে মাত্র সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় প্রবোধের।

কেন?

তোমার তাড়াতাড়ি কণ্ঠসুধা বিতরণ করা কেন? কী দরকার ছিল? ছোঁড়া কি খোকা নাকি? শুঁটকো হাড়গিল্লের মত দেখতে, তাই মনে হচ্ছে কম বয়স। সুবর্ণর থেকে ছোট হবে না কক্ষনো। আর ছোট হলেই বা বিশ্বাস কি? দেখতে খারাপ? তাতেই বা কি? অবিশ্বাসিনী মেয়েমানুষের কাছে ওসব বাধা বাধাই নয়।

হায় হায়, কী কাজই করে বসলো প্রবোধ!

আবার কিনা আজই চলে যেতে হবে তাকে! জাহাজঘাটার অবস্থা টলমল, কুলি-কামিন সব পিটটান দিচ্ছে—প্লেগের ভয় যত না হোক, জোর করে টিকে দেওয়া হবে এই ভয়ে।

দু-চারদিন থাকতে পারলে লক্ষ্য করা যেত, আর তেমন বেচাল দেখলে টেনে নিয়ে যাওয়াও যেত। এ যে কিছুই হচ্ছে না।

না-না।

অথচ ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হতভাগা ছোঁড়া ফট করে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'বাঃ, গ্র্যান্ড দেখতে তো! সকলকেই দেখছি খাসা! মেজবৌদির যত্নের গুণ আছে। হেল্‌দি ছেলের বড় অভাব আমাদের দেশে।'

'নমস্কার মেজদা, কিছু মনে করবেন না, আমি একটু বেশি কথা বলি। এই যে এই বৌদিটি, আমার নামকরণ করেছেন "বাক্যবাগীশ"! ওঁকে রাতদিন গঞ্জনা দিই আমি, ছেলেমেয়েগুলোর হাড়সার চেহারার জন্যে—'

হঠাৎ আরো ভয়ানক আরো অসমসাহসিক এক কাণ্ড করে বসে সুবর্ণ।

শুধুই কি অসমসাহসিক?

কুশ্রীতা নয়? অসভ্যতা নয়? শাস্ত্রসমাজের বিরোধী নয়? কেন? কেন এই বদমাইশি?

ফট করে বলে বসলো কিনা, 'আর আপনার নিজের কী?'

আচ্ছা সুবালা তো গাঁয়ের বৌ, সুবালাই বা ভাজকে এই নির্লজ্জতার জন্যে কিছু বলল না কেন? তার মানে বুদ্ধি-সুদ্ধির বালাই নেই। বালাই থাকলে কখনো এর পরও হাসে? হেসে উঠে বলে, 'ওর কথা বাদ দাও। ও যে দেশোদ্ধার করছে! ওর কি নাইবার-খাবার অবকাশ আছে? অযত্নে অযত্নে অমন পোড়াকাঠের মত দশা—'

'বৌদি, আমি আপত্তি করছি—,' ইয়ারটা বলে ওঠে, 'একজন ভদ্রমহিলার সামনে কিনা পোড়াকাঠ বিশেষণ দেওয়া! মেজদা, দেখুন আপনার বোনের কাণ্ড!'

মেজদা তাঁর বোনের কাণ্ডর দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই চন্নন, হচ্ছে কি? এত মুড়ি ছড়াচ্ছিস যে?'

বাকি সবাই চমকে ওঠে, থমকে যায়।

তবু চলে-যেতে হয়।

প্রাণপাখীকে পিঞ্জর ছাড়া করে বনে-জঙ্গলে উড়িয়ে দিয়ে।

উপায় কি?

সত্যি তো পাগল নয় যে বলবে, 'নিয়ে চলে যাই ওকে!'

তবে একটা খবরে একটু ভরসা এসেছে, ছোঁড়া অমূল্যর নিজের ভাই নয়, জ্ঞাতিভাই। অন্য বাড়িতে থাকে। আবার বেশি ভরসাও নেই,—শূন্য একটা বাড়িতে থাকে বলে এ বাড়িতে খায়। সুবালাই ধরে-করে এই ব্যবস্থা করেছে, ওর একমাত্র দেখবার লোক পিসি মরে পর্যন্ত।

বাউণ্ডুলে যাকে বলে!

কেউ কোথাও নেই, শূন্য একখানা বাড়িতে একা থাকা!

প্রবোধ বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তা বিয়ে করেন নি কেন দয়াময়?'

সুবালা দাদার রাগে হেসেই খুন।

'হরেকেষ্ট। ও বিয়ে করবে তো দেশ স্বাধীন করবে কে?'

'ফাজলামি। বলি আজ না হয় তুই ওর ভাত রাঁধছিস। চিরকাল পরের ঘাড় দিয়ে চলবে?'

সুবালা আহত হয়।

সুবালা গম্ভীর হয়।

বলে, 'পর বললে পর, আপন বললে আপন, তবে কদিন ভাত রাঁধতে পাবো ওর, তাই বা কে জানে! কোন্ দিন যে জেলের ভাত খেতে হয়, এই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।'

প্রবোধের নিজের বোনকেও আদিখ্যেতার জাহাজ মনে হয়। জ্ঞাতি দ্যাওরকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা! আরও বিরক্তস্বরে বলে, 'আর সেই লোককে বাড়িতে আসতে দিচ্ছিস?'

সুবালা অবাক হয়।

'আসতে দেব না? কাকে? অম্বিকা ঠাকুরপোকে? কী যে বল মেজদা!'

'তা তোর না হয় আদর কর্তব্য উথলে উঠল, বলি অমূল্যর হাতে দাঁড় পড়লে?'

সুবালা বিচলিত হয় না।

সুবালা বলে, 'নিয়তি ছাড়া পথ নেই মেজদা, সে নিয়তি থাকলে—'

'আগুনে হাত ডুবিয়ে যদি বলি, "নিয়তি থাকলে পুড়বে", তবে আর বলবার কিছু নেই'—প্রবোধ প্রায় খিঁচিয়ে ওঠে, 'তবে কাজটা ভাল হচ্ছে না। এ বাড়িতে ওর যাতায়াত কমাও! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অন্যত্র করতে বলতে হবে—'

সুবালা হেসে ওঠে।

সুবালা ওর পূজনীয় মেজদার কথা অমৃতং বালভাষিতং হিসেবে গণ্য করে। তাই সুবালা আর তর্ক না করে বলে, 'পাগল হয়েছ? ওকে খাওয়াতে হয় ধরেবেঁধে, তিনবেলা না খেলেও ওর খেয়াল থাকে না।'

'তবে আর কি? কৃতার্থ—', প্রবোধ বলে, 'তোমরা নিজের কপালেও তেঁতুল গুলছো, ছেলেপুলেদেরও ক্ষতি করছো।...ওইরকম একটা ব্যাড্ এগ্-জাম্পল্ চোখের সামনে—'

সুবর্ণ এতক্ষণ ভাইবোনের ওই তর্ক-বিতর্ক, স্নেহ-আলাপের মাঝখানে কথা বলে নি। এইবার বলে উঠল, বলল, 'চোখের সামনে এটা কুদৃষ্টান্ত নয়, বরং মহৎ আদর্শ! মেজঠাকুরঝির ছেলেদের ভাগ্য ভাল যে এমন একটা আদর্শ চোখের সামনে পাচ্ছে।'

'চমৎকার! যখন পুলিস এসে ঠেঙাতে ঠেঙাতে ধরে নিয়ে যাবে, তখন "মহৎ আদর্শ"র লীলা বুঝবে। এমন জানলে আনতাম না তোমাদের!'

সুবর্ণ তীব্রকণ্ঠে বলে, 'তোমাদেব সহোদর বোন যেখানে রয়েছে, সেখানে তোমার বৌ-ছেলে থাকতে পারবে না?'

'থাকতে পারবে না কেন? বিপদের আশঙ্কা, সেই কথাই হচ্ছে।'

'সে আশঙ্কা তোমার বোন-ভগ্নীপতিরও আছে—'

'চুলোয় যাক্ ওরা—', প্রবোধ বলে ওঠে, 'মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে আমার!'

তা সেই মাথার মধ্যে জ্বলন্ত আগুন নিয়েই বিদায় নিতে হলো প্রবোধকে। উপায় কি? আর সমস্ত রাগটাই শেষ পর্যন্ত সুবর্ণর ওপর পড়ল। সুবর্ণই বা আসতে রাজী হল কেন?

এদিকে তো এত জেদ, পাহাড় নড়ে তো জেদ নড়ে না, অথচ ভাসুর একবার অনুরোধ করলেন তো গলে গেলেন! চিরকাল দেখছি, এই 'আমি' হত-

ভাগা কেউ নয়, ভাসুরের কথা শিরোধার্য! বদ্ মেয়েমানুষদের স্বধর্মই এই। কেদারবাবুকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা। সে বুড়ো আর আসে না তাই বাঁচা গেছে।

'গুরুজন' বলে যদি ছেন্দা করতো তো মাকে আগে করতো। তার বেলায় নয়। তার বেলায় রাতদিন শাশুড়ীর মুখে মুখে চোপা! আসল কথা বেটাছেলে! সেটা হলেই হলো! যা বুঝছি, সুবালাটা মুখ্যুর ধাড়ি, ওই ঘোড়েল অম্বিকাটা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে-দাচ্ছে। অতএব সুবালার ওপর ভরসা নেই। ওর চোখের সামনেই অনেক কিছু ঘটে যাবে, টেরও পারে না।

সুবালার শাশুড়ীটি যে কোথায় থাকেন দেখতেও পাওয়া গেল না। তবু একটা বুড়ো মানুষ ছিল সংসারে!

নাঃ, ওসব বুড়ো-ফুড়োর কর্ম নয়, অমূল্যকেই বলে এলে হতো, তোমার শালাজের বাপু একটু পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব আছে, চোখে চোখে রেখো।

বলে এলে হতো।

বলা হয় নি।

এ কথা যত ভাবতে থাকে প্রবোধ, ততই তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

কী উপায়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় সুবর্ণকে?

ভগবান! প্লেগকে যদি আবার তোমার ভাণ্ডারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পার তো তোমার এই ভক্তপ্রজা প্রবোধকে প্লেগ দাও! অত বড় একটা কারণ ঘটলে অবশ্যই আনা যাবে সুবর্ণকে!

॥ ১৬ ॥

পড়ন্ত বেলার রোদ সরতে সরতে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমেছে, ফুলেশ্বরীও তাঁর সেলাইয়ের সরঞ্জামসহ সরতে সরতে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমেছেন। এরপর ছাদে উঠবেন।

প্রদীপের আলোয় আর চোখ চলে না আজকাল, তাই দিনের আলোর শেষ বিন্দুটির পিছনেও ছুটোছুটি।

ছেলে নিষেধ করে। বলে, 'মা, তুচ্ছ ওই কাঁথা কাঁথা করে চোখের মাথাটা আর খেও না। জীবনভোর তো কাঁথায় ফুল তুললে, আর কেন?'

অমূল্যর মা ফুলেশ্বরী ছেলের এই বকুনিতে হাসেন। বলেন, 'জীবনভোর তো ভাত খাচ্ছি, তবু আবার খাই কেন?'

'তার সঙ্গে এর তুলনা! না মা না, তুমি এবার ক্ষ্যামা দাও। নইলে শেষ অবধি অন্ধ হয়ে যাবে—'

ফুলেশ্বরী সতেজে বলেন, 'অন্ধ অমনি হলেই হল? ভগবানের লীলা নিয়ে কাজ করছি—'

সুবর্ণ শুনতে পায়।

সুবর্ণ অবাক হয়।

সুবর্ণ প্রশ্ন না করে পারে না।

প্রশ্ন করে, 'কিসের কাজ করছেন?'

সুবালা হেসে ওঠে, 'জানো না? আর জানবেই বা কোথা থেকে? আমার শাশুড়ীর এই এক বাতিক! বারো মাস কাঁথা সেলাই করছেন। কে শোবে, কার দরকার, সেসব চিন্তা নেই। ওই সেলাই! আর তাই কি সোজাসুজি ফুল-লতা যে, হলো না হলো মিটিয়ে নিলাম? তা নয়, এ একেবারে রীতিমত ঝঞ্ঝাটে ব্যাপার। পুরাণ উপপুরাণের গল্প নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন কাঁথায়। এখন "যা যশোদার ননী মন্থন" লীলাটি সেলাই করে করে তুলছেন!'

'সে কি?'

'তবে আর বাতিক বলছি কেন! ওই লীলার যাবতীয় খুঁটিনাটি সব বসে বসে "সিলোচ্ছেন"। যতক্ষণ আকাশের আলো থাকবে, ততক্ষণ তাকে কাজে লাগাবেন। আমি বলি তা একরকম ভালো। পাড়ার অন্য গিন্নীদের মতন পরকুচ্ছো না করে বসে বসে কাঁথা "সিলোন", তা ভাল।'

সুবর্ণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে।

সুবালার ছেলেমেয়েরা তো বড় হয়ে গেছে, ও কাঁথায় শোবে কে?

শোবে কে?

ও বাবা, ও কি শোবার কাঁথা? মা যশোদার মূর্তি আঁকা! ও শুধু গায়ে দেবার: গায়ে দেবে সুবালার ভবিষ্য-কালের নাতি! ফুলেশ্বরী তো আর থাকবেন না তখন, হাতের কাজটুকু রেখে যাবেন। লোকে সোনাদানা রেখে যায়, ওঁর তো সেসব নেই, তাই—

সুবর্ণ ভাবে, কী সুন্দর!

বাড়ির গিন্নী বাড়ির সকলের ওপর চোখ ফেলে ফেলে তাদের খুঁত বার করে করে গালমন্দ করে না বেড়িয়ে ছুঁচের ওপর চোখ ফেলে সুতোয় আঁকা ছবিটিকে নিখুঁত করছেন বসে বসে।

সুবালা কী সৌভাগ্যবতী!

সুবর্ণ নিঃশ্বাস ফেলে।

সুবর্ণ বলে, 'সোনাদানা থেকে ঢের দামী! আচ্ছা, ছুঁচে সুতো পরাতে পারেন?'

'ও বাবা! আমার থেকে ভাল। পঞ্চাশটা ছুঁচে পঞ্চাশ রকম সুতো পরাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। নেশা নেশা!

নেশা! নেশা মাত্রেই কি ক্ষতিকর?

অপর মানুষের গায়ে ছুঁচ বেঁধাবার প্রবৃত্তির থেকে তো অনেক ভাল নেশা এই কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় তোলা!

কী অদ্ভুত নিষ্ঠা!

বিশ্বাস রাখেন 'দেবতার লীলা' আঁকতে বসে চোখ নষ্ট হতে পারে না!

ওই কাঁথার ফুল থেকেই মুক্তি মানুষটার!

নামটিও তেমনি সুন্দর, ফুলেশ্বরী!

সুবালা তারি ভাগ্য সম্পর্কে কৃতজ্ঞ কিনা কে জানে!

কিন্তু সুবর্ণ যদি ওই ফুলেশ্বরীর বৌ হতো!

সুবালা আরো বলেছে, 'কারুর সাতে-পাঁচে নেই, জগৎ আছে কি নেই জ্ঞান নেই, ওই শিল্পকম্ম নিয়েই মশগুল।'

তবু বলবে না সুবর্ণ, সুবালা কী ভাব্যবতী?

সুবর্ণ আস্তে আস্তে ফুলেশ্বরীর কাছের গোড়ায় গিয়ে বসে।

ফুলেশ্বরী ছুঁচে সুতো পরাতে পরাতে বলেন, 'কে? কলকাতার বৌমা? এসো বসো! ছেলেরা?'

'এদিক-ওদিক ঘুরছে।'

'আহা, শহুরে বেচারাদের কী কষ্ট!'

'কষ্ট কি মাউ-ই মা, সুখ বলুন। এমন খোলামেলা, আলো-বাতাস জীবনে দেখেছে ওরা?...আচ্ছা মাউ-ই মা, ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা, তাতে এত খেটে কি হয়? এত ফুল কেটে কি হয়?'

সুবর্ণর কি এ কথা নিজের কথা?

না, ওই বৃদ্ধার মর্মকথা আদায় করতে চায় সে?

তা মর্মকথাই বলেন ফুলেশ্বরী। হেসে ফেলে বলেন, 'ফুল কাটি কি আর ছেঁড়া কাঁথার গায়ে মা, ফুল কাটি মনের গায়ে। জীবনভোর তো শুধু ধান সেদ্ধ করছি, গোবর কুড়োচ্ছি, কাঠ কাটছি, জল তুলছি, ভাত রাঁধছি, ভাল কাজের তো কিছুই করলাম না, তবু একটা ভাল কাজ—'

হঠাৎ গলা নামান ফুলেশ্বরী।

বলেন, 'তোমার কাছে ছেঁড়া পাড় আছে কলকাতার বৌমা? রগরগে ঝক-ঝকে পাড়? যাতে সুতো ভাল ওঠে—'

গলা নামালেও কথাটা সুবালার কানে ওঠে।

সুবালা বলে ওঠে, 'মা'র যেমন কথা! কদিনের জন্যে এসেছে মেজবৌ, ও বুঝি ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এসেছে!'

সহসা সুবর্ণ বলে ওঠে, 'এনেছি, এনেছি মাউ-ই মা, এক্ষুনি দিচ্ছি!'

ফুলেশ্বরী বলে ওঠেন, 'রাজরাণী হও, হাতের নোয়া বজ্জর হোক।...কী পাড় আছে? লাল আছে?'

লাল কালো দুই-ই আছে।

'আহা, আমার সোনার মেয়ে! ওই দুটো রঙের জন্য কাজ আটকে পড়ে আছে।...তা হ্যাঁগা কলকাতার বৌমা, বিলিতি কাপড়ের পাড় নয় তো? তা হলে কিন্তু অম্বিকা আস্ত রাখবে না আমায়!'

সুবর্ণ একবার ফুলেশ্বরীর মুখের দিকে তাকায়। অবাক হয়। বলে, 'এই কাপড়, এই সব সুতো, সমস্ত দিশী জিনিস?'

ফুলেশ্বরী মৃদু হাসেন।

বলেন, 'মিছে কথা বলব কেন, এ কাপড়ও বিলিতি, এর সুতোও অর্ধেক বিলিতি। আরম্ভ যখন করেছি, তখন দেশী বিলিতির ধুয়ো ওঠেই নি। দেখছ না, আগের সেলাই সব ঝকঝকে, এখনকার সব ম্যাড়মেড়ে! মন ওঠে না। কিন্তু কি করবো, ছেলেটা মনে কষ্ট পায়। বলে, ওইটুকু চকচকেটাই বড় হল তোমার? বলে, "নেহাৎ নাকি মা যশোদা এঁকে বসে আছ তাই, নইলে পুড়িয়ে দিতাম!" তা স্বদেশী পাড়ের সুতো থাকে যদি—'

'এই যে এক্ষুণি দিচ্ছি—', উঠে যায় সুবর্ণ।

সুবালা বলে, 'সাধে বলেছি বাতিক! যাকে পাবেন তাকেই বলবেন, ছেঁড়া কাপড়ের পাড় আছে? তুমি ছেঁড়া পাড় কোথায় পাবে বল তো?'

'পাবো পাবো, এই যে আছে গো!'

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়, ট্রাঙ্ক খুলে আস্ত আস্ত দুখানা শাড়ি বার করে ফ্যাসফ্যাস করে তার পাড় ছিঁড়ে স্তূপাকার করতে থাকে। পাড়ের

রং একটু ম্যাড়মেড়ে, সেটাই রক্ষে।

॥ ১৭ ॥

বড় গলায় আশ্বাস দিয়েছিল সুবোধ তার ভাদ্রবৌকে, 'বামুনের ছেলে, দুটো ভাত সেদ্ধ করে নিতে পারবো না?'

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ-সন্তানের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকছে না। জগতের সহজতম এবং 'ওঁচাতম' কাজ ওই 'ভাত সেদ্ধ'টাই চার-চারটে জোয়ান পুরুষকে হিমসিম খাইয়ে ছাড়ছে।

হয় অতিসেদ্ধ হয়ে পিণ্ড পাকিয়ে বসে থাকে, ফেন ঝরানোর অবস্থা থাকে না, নয়তো অতি সাবধানে প্রায় চালই থেকে যায়। অথবা হয়তো জলের অঙ্কে ঘাটতি ঘটে সহসা সুগন্ধে পাড়া আমোদিত করে তোলে। তা ছাড়া ফেন ঝরাতে আঙুলের ডগায় ছোটখাটো ফোস্কা চারজনেরই হয়েছে। কারণ একজনের অপটুতায় ব্যঙ্গহাসি হেসে অপরজন হাত লাগাতে এসেছে কিনা!

আনুষঙ্গিক ব্যাপার উনুন ধরানোও সোজা কাজ নয়। হয়তো বা তুল্য-মূল্য। উনুনের ভিতরদিকে ঘুঁটে পেতে পেতে আগুন জেবলে দিয়ে তার উপর কয়লা ঢেলে দিতে হয়, এ পদ্ধতিটা অবিদিত কারুরই নেই! গেরস্থর ছেলে, মা চিরকাল খেটেছে, ওরা আশেপাশে ঘুরেছে।

কিন্তু সেই জানা জগতের কাজটা যে হাতে-কলমে করতে গিয়ে এমন রহস্যময় হয়ে উঠবে এটা কে জানতো?

পদ্ধতিমত কাজ হয়, কিছুক্ষণের মত বাড়িটা ধূম্রলোকে পরিণত হয়, কিন্তু সেই ধূম্রজাল থেকে মুক্ত হয়েই দেখা যায় ধূমের পিছনে বহ্নি নেই। কেন যে এমনটা হয় সেটা দুর্বোধ্য! ওই একই পদ্ধতিতেই তো আবার জবলেও শেষ পর্যন্ত! বার তিন-চার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে শেষ অবধি আগুনের মুখের দেখা মেলে।

কাজ দুটো যে এমন গোলমেলে, তা তো কই মনে হতো না কোনোদিন? বরং চোখে একটু ধোঁয়া লাগলেই রাগারাগি করা হয়েছে, 'এত ধোঁয়া কেন? রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে না কেন?'

মুখরা হরিদাসী বলতো, 'চুলোয় আগুন দিলে ধোঁয়া হবে না তো কি পুষ্পবৃষ্টি হবে দাদাবাবুরা? আপনারা বৈঠকখানা ঘর থেকে ভেরিমেরি করছো, অথচ বৌদিরা ওই ধোঁয়ার মধ্যে বসে কুটনো-বাটনা করছে। কই তারা তো কিছু বলছে না!'

হরিদাসীর এই দুঃসাহসিকতার উপর মুক্তকেশীর ধমক এসে পড়তো, 'তুই থাম তো হরিদাসী! কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা? বৌদিরা ধোঁয়ায় বসে আছে বলে দাদাবাবুরাও থাকবে তাই? বলি পায়ে মাথায় এক হবে?'

হরিদাসী মুক্তকেশীকেও ছেড়ে কথা কইত না, বেজার গলায় বলতো, 'জানি নে মা, কে পা, কে মাথা! আর মাথাটাই দামী, পা-টাই সস্তা, তাই বা কেন, তোমরাই জানো সে-কথা। পায়ের ওপরই তো দাঁড়ায় মাথাটা। আর আমরা

তো পায়ের তলা, তবু তো আমাদের নইলে তোমাদের দিন চলে না দেখি। ভগবান সকল মনিষ্যির শরীল একই বস্তু দিয়ে তৈরি করেছে, সেই কথাই কইছি।'

'তা কইবি বৈকি, মেজবৌদির সাকরেদ যে! রাতদিন তো ওই সব কথার চাষ করছেন মা-জননী!' বলে থামতেন মুক্তকেশী। কারণ জানেন হরিদাসীর মতন পরিষ্কার কাজ শ'য়ে একটা মেলে কি না মেলে। ওকে বেশি চটানো চলবে না।

ওখানে চুপ করে এখানে ছেলেদের কাছে এসে অভিযোগ করতেন মুক্ত-কেশী, 'দেখছিস তো মাগীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! মেজবৌমাই এইটি করছেন। অনবরত ওদের সামনে গাওয়া—"গরীবরা কি মানুষ নয়?...ছোটলোক কথাটা কারুর গায়ে লেখা থাকে না, ব্যাভারেই ছোটলোক ভদ্দরলোক!...মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে বলেই কি আমরা ওর মাথা কিনে নিয়েছি? ও কাজ দিচ্ছে আমরা পয়সা দিচ্ছি, হয়ে গেল শোধবোধ।"...এতে আর ছোটলোকের মাথা বিগড়োবে না?'

ছেলেরা বলতো, 'বিদেয় করে দাও না মাগীকে। ঝি আর মিলবে না কলকাতা শহরে?'

মুক্তকেশী ভিতরের রহস্য ব্যক্ত করতেন না, বলতেন না, 'অমনটি আর সহজে মিলবে না।' বলতেন, 'যে আসবে লঙ্কায়, সেই হবে রাক্কোস! মেজ-বৌমা হয়তো আবার তাকে নিয়ে "পাঠশালা" খুলবে। এই তো শুনি নিত্যি বলছে, হরিদাসী, তোর ছেলেটাকে এই বয়সেই পানের দোকানে কাজ করতে দিয়েছিস? কেন, একটু লেখাপড়া শেখাতে হয় না? আমাদের এখানে আনিস না, সন্ধ্যেবেলা ছেলেপুলের কাছে বসে থাকবে, পড়া শুনে শুনেও শিখবে একটু!'

এ কথা শুনে হেসে উঠেছে ওরা হা হা করে। 'হরিদাসীর ছেলের লেখা-পড়ার ভাবনায় মেজগিন্নীর আমাদের ঘুম হচ্ছে না! ভাল ভাল। কী বলবো, ওই মেয়ে লেখাপড়া করলে নির্ঘাত সামলা এ'টে কাছারি যেত।...তবে হরি-দাসীর যে রকম বোলচাল ফুটছে, তাতে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই দরকার। এর ওপর আবার নাকি "স্বদেশীবাবু"-দের চ্যালা হচ্ছেন। বিদেয় কর, বিদেয় কর।'

কিন্তু এখন মুক্তকেশীর ছেলেরা কাতর আক্ষেপে বলছে, 'হরিদাসীটা সুদ্ধ ভাগলো! ওটা থাকলে তো এমন ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না!'

প্রকাশ-ই বেশি খাপ্পা, কারণ এ'টো বাসন মাজার দায়টা পড়েছে সম্পূর্ণ তারই ঘাড়ে। সে ছোট, তারই এটা কর্তব্য। বড়রা তো আর ছোটর এ'টো সাফ করবে না! আবার সুবোধ যে প্রস্তাবটা করেছিল, যে যার নিজ নিজ থালা সাফ করে নেবার, তাতে রাজী হতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে।

অতএব প্রকাশের কষ্ট বেশি।

ভাত সেদ্ধ এবং চুলো ধরানো ব্যাপারে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নস্যাৎ করতে এসে নিজে নস্যাৎ হয়েছে। এখন সকলেই একযোগে রান্নাঘরে এসে হুটোপাটি করে, প্রকাশকে আবার উঠোনেও নামতে হয়।

ঘর, দালান, সি'ড়ি সাফ করার প্রশ্ন অবশ্য ওঠে না, মেয়েরা যাওয়া পর্যন্তই ও কাজটা বাদ। হরিদাসী তো আগেই গেছে। এ'টো থালাটা যে অমোঘ,

অনিবার্য! তাই চৌবাচ্চার পাড়ের উপর থালাটা বসিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাজা-পর্ব সারতে সারতে প্রকাশ খিঁচিয়ে ওঠে: 'আমার হাতে যদি সংসারের ভার থাকতো, মাগীকে কেমন যেতে দিতাম দেখতে! উনি সুদ্ধ ছুটলেন মড়ক থেকে প্রাণ বাঁচাতে! বড্ড দামী প্রাণ! লোকসান গেলে পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে!'

কথাটা সুবোধের কানে যেতে প্রতিবাদ করে উঠল সে, 'তা পৃথিবীর লোকসান না হোক, তার তো লোকসান রে বাপু। নিজের প্রাণ সকলেরই নিজের কাছে দামী। মড়কের ভয়ে কে না পালাচ্ছে!'

'ও বাবা! দাদাও যে দেখছি ভাদ্দরবৌয়ের চ্যালা হচ্ছে।' প্রকাশ হেসে ওঠে, 'বলি এই আমরা তো রয়েছি। দিব্যি জলজ্যান্ত বেঁচেও রয়েছি। হরি-দাসীর চাইতেও কিছু আর অধম নই আমরা!'

'আহা তা কেন? আমাদের যে প্রাণের মায়ার থেকে চাকরির মায়া অধিক, ওদের তা নয়। ওরা বলবে, আগে তো বাঁচি, তারপর দেখা যাবে কাজ!'

'আচ্ছা দেখে যেন। এলে কিন্তু আমার হাতে ওর শাস্তির ভার দিতে হবে তা বলে রাখছি। দেখি কেমন করে আবার ও এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোয়!'

সহসা কথায় ছেদ পড়াতে হয়।

একটি বাজখাঁই গলা কর্ণ বিদারণ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কার চৌকাঠ ডিঙানো বন্ধর হুকুম হচ্ছে রে? আমি তো এই ডিঙোলাম!'

'আরে জগুদা নাকি?'

এরা বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে।

জগু সবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'আরে, তিনটে মদ্দতে মিলে রান্নাশালে কী করা হচ্ছে?'

'কী আবার করা হবে!' প্রবোধ বীরত্বের গলায় বলে, 'রান্না করা হচ্ছে!'

'রান্না! তোরা আবার রান্না শিখলি কবে রে?'

জগু হা-হা করে হেসে ওঠে আকাশ-ফাটানো গলায়, 'দেখি নি তো কখনো অন্দরমহলের ধারে-কাছে! হ্যাঁ, সে বটে আমি। রেঁধে রেঁধে হাড়পাকা! স্বর্গাদপি গরীয়সীর অসুখ করলেই তো এই হতভাগার প্রমোশন! ওই ভয়ে জননী আমার রোগ অসুখ লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ান। আমিও তেমনি ঘুঘু, মুখ-চোখের বেভাব দেখলেই তেড়ে আসি। নাড়ি দেখি, জিভ দেখি, দিব্যি দিই। শেষ অবধি গাল পাড়তে পাড়তে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয়।'

প্রভাস সকৌতুকে বলে, 'তা বেশ! রান্নায় ওস্তাদ তো—এখন তো স্বপাক চলছে? আচ্ছা একদিন খেয়ে আসা যাবে তোমার হাতে।'

জগু চোখ কুঁচকে বলে, 'কেন, এখন স্বপাক কেন? বলতে নেই ষষ্ঠীর কৃপায় বাছা এখন আছেন ভাল।'

'আছেন!'

অর্থাৎ শ্যামাসুন্দরী এখনো এই মড়কের কলকাতায় বিরাজমান?

এরা হৈ-চৈ করে ওঠে, 'মামী এখেনেই আছেন নাকি? দেশের বাড়িতে চলে যান নি?'

'দেশের বাড়িতে!'

জগু আর একবার আকাশ ফাটায়।

'দেশের জ্ঞাতিদের সঙ্গে যে মায়ের আমার একেবারে গলায় গলায়!

বলেছিল' একবার মানদা পিসি, আমি যাচ্ছি বড়বৌ, যাবি তো চ। আমি সাফ বলে দিলাম, কেন? এই হতভাগা গরীবটাকে মাতৃহীন করতে সাধ? হাতে পেলে শ্যামাসুন্দরীকে জ্যান্ত রাখবে তোমরা? মেরে পুকুরপাড়ে গ'ুজে রাখবে কিনা বিশ্বাস কি?'

সুবোধ আক্ষেপের গলায় বলে, 'ইস, তা তো জানি না। ওই মানদা মাসীই মাকে বলেছিল, "আমি যাচ্ছি, বড় বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাব।" তাই জানি। ইস, এমন জানলে মামীকে তো মায়ের সঙ্গে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতাম। তখন একেবারে ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি—'

জগু হেসে ওঠে, 'হ্যাঁ, যমের বাড়িকে ফাঁকি দেবার তালে কত লোক কত শালার বাড়িতেই ঠেলে উঠলো। শালার বাড়ি, বোনাইয়ের বাড়ি, মামার বাড়ি, পিসির বাড়ি, গুরু-বাড়ি, বলি যমের বাড়িটা কোন্ বাড়িটায় নেই বল দিকি? পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে যমের হাত এড়াবি? সে ব্যাটা পেয়াদা পাঠালে সমুদ্দুরের তলায় গিয়ে লুকোলেই কি ছাড়ান আছে?'

'তা হলেও, এটা তোমার উচিত হয় নি জগুদা! বিপদ মেয়েছেলেকে নিয়েই!' প্রভাস বলে, 'আমার এক মক্কেল নবদ্বীপেই যাচ্ছে কাল, মামীকে বরং তার সঙ্গে—'

'ক্ষেপেছিস?' জগু সতেজে বলে, 'যেখানে মা, সেখানে ছা, আমার হচ্ছে এই সাদা বাংলা। দুজনে দু ঠাঁই হই, আর যম ব্যাটা দূত পাঠাক, তখন? হয় মা বেটি ছেলের হাতের আগুন পাবে না, নয় ছেলে ব্যাটা মরণকালে মায়ের পায়ের ধুলো পাবে না। রক্ষে করো। জগু শর্মা ওসব গোলমেলে কাণ্ডর মধ্যে নেই! মা আবার "মেয়েছেলে" কী রে? জগজ্জননীর অংশ না?'

'তা বটে!'

'পাগলা জগা'র কথায় চিরকালই সবাই হাসে। এখনও হাসলো। বলল, 'তা বটে!'

জগু এবার এগিয়ে এসে বলে, 'পাকশালের ভার তাহলে এখন তোদের ঘাড়ে? দেখি তো তিন মন্দয় কী "পঞ্চ-ব্যঞ্জন" রেঁধেছিস!'

দুম্ দুম্ করে রান্নাঘরে ঢুকে আসে জগু, এদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। রান্নার পদ যা হচ্ছে কদিন, সে তো কহতব্য নয়। যা কিছু আনাজ-তরকারি সবই তো সেই ভাতসেদ্ধর সঙ্গে সেদ্ধ। তাতেই তেল, নুন, কাঁচালঙ্কা মেখে যা হয়!

আজ আবার ভাতের ফেন পড়ে রান্নাঘরের এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা। অন্যদিন তো খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে 'ঘর ধোওয়া' হয়। আজ যে কী হবে!

সারা ঘরেও যেন ভাত ছড়াছড়ি।

জগু এসেই হৈ-হৈ করে ওঠে, 'কী ব্যাপার! এ যে একেবারে অন্নের বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্রের মেলা! এত ভাত ছড়াছড়ি কেন?'

'ও কিছু না, ওই ফেনটা ঝরাতে গিয়েই—'

'হুঁ, তা তো দেখছি-ই—', জগু বলে, 'দৃশ্য দেখেই মালুম হচ্ছে সব। পিসি ঠাকরুণটি যে আমার সভ্য করে ছেলে মানুষ করেছেন! আরে বাবা অন্নচিন্তা সর্বত্র! কখন কোথায় কী অবস্থায় পড়তে হয়! সঙ্গে স্ত্রীলোক না গেলে খেতে পাবি না?'

'পাব না মানে?' প্রভাস বীরদর্পে বলে, 'এই তো আজ সাতদিন ওরা কেউ

নেই. খাচ্ছি না দুবেলা?'

'হুঁ। যা খাচ্ছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। সর দিকি, আমিই আজ তোদের ভালমন্দ দুটো রেঁধে খাইয়ে যাই। কাল থেকে দুবেলা ওবাড়ি গিয়ে খাবি, বুঝলি? এর আর নড়চড় হয় না যেন।'

এরা অবশ্য দুটো ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই সমস্বরে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। আজ রেঁধে খাওয়ানো এবং কাল থেকে ওবাড়ি খাওয়া, দুটোর বিরুদ্ধেই।.

কিন্তু জগু তো ততক্ষণে উনুনের সামনে গুছিয়ে বসেছে।

ভাতের মধ্যে থেকে তরিতরকারিগুলো বাছতে বাছতে বলে, 'এ ভাত তো দেখছি গরুর মুখে ধরে দিতে হবে। মানুষের ভোগ্য তো হয় নি। আর চারটি চাল বার কর, চড়িয়ে দিই। মাছ-টাছ এনেছিস, না কি আনিস নি? তা না এনেছিস. নাই হল। ভাল। বড়ি আছে? আমসি? শুকনো কুল? আছে নিশ্চয়। পিসি তো আমার অগোছালো নয়!'

ওরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে।

আছে হয়তো জিনিসগুলো, কিন্তু কোথায় আছে কে জানে?

জগু মেয়েলী ভঙ্গীতে বঁটিতে আলু ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, 'বুঝতে পেরেছি, জানিস না। যাক খুঁজে নেব। মাছ আনবি তো আন।'

'যত সব মেয়েলী!' প্রভাস হাত ধুয়ে এদিকে সরে এসে বলে, 'বসেছে দেখ! যেন একটা গিন্নী! মেয়েলী ব্যাটাছেলে আমার দু-চক্ষের বিষ!'

সুবোধ বলে. 'বাজারে মাছ-ই বা কোথা? মেছুনী জেলেনীরা আছে? সব ভেগেছে। তোমাদের বাজারে পাচ্ছ নাকি?'

'আমাদের? আমাদের খুঁজছে কে? মাছ কি আমাদের লাগে?'

'সে কী? তুমি খাও না?'

দূর, কবে ও পাট চুকিয়ে দিয়েছি!'

সুবোধ অবাক গলায় বলে, 'কেন? তোমার তো আর বোষ্টম মন্তর নয়, শাক্ত মন্তর। তবে মাছ খেতে বাধা?'

'বাধা!'

জগু আগ্রহভরে বলে, 'বাধা কিসের? দুই মায়ে-পোয়ে থাকি, অত ঝামেলায় দরকার? মায়ের ঘাড়েই তো দু হেঁসেলের ভার পড়বে!'

'তাই বলে তুমি মাছ খাবে না?'

'তুমি'টার ওপর জোর দেয় সুবোধ।

জগু চালের থেকে ধান বাছতে বাছতে বলে, 'তা আমি ব্যাটাই বা কি এত তালেবর? এত বিধবা হবিষ্যি করছে—'

'শোন কথা! সাধে আর তোমায় পাগল বলি জগুদা! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা!'

জগু জুৎ করে হাঁড়িটা উনুনে বসিয়ে দিয়ে সরে এসে উদাত্ত উত্তর দেয়, 'কিসের সঙ্গে কিসের মানে? মানুষের সঙ্গে মানুষের তুলনাই করছি। মেয়েছেলেরা চিরজন্ম হবিষ্যির উপর থাকতে পারে, ব্যাটাছেলেরা থাকতে পারে না! বলতে চাস ব্যাটাছেলেগুলো মেয়েছেলের অধম! হুঁ! কোনো বিষয়ে খাটো হতে রাজী নই, বুঝলি? নে, সর দিকি, দেখি পিসির কোথায় কি আছে! মাছ না আনিস বয়ে গেল, দেখবি এমন পোস্তচচ্চড়ি বানাবো, খেয়ে যে বয়েসে আছিস, সেই বয়েসেই থাকবি। কই, শিলপাটাটা কই?'

খুঁজে-পেতে শিলটা এনে পেতে, তাকের উপরকার শিশি-কৌটো, হাঁড়ি-মালসা উটকোতে থাকে জগু।

পিসি ফিরে এসে তো আর এসব নেবে না, আগাগোড়া ধোবে, মাজবে। ছুঁত নাড়তে বাধা কি?

মেয়েলী কাজে যে মেয়েদের থেকে একতিলও খাটো নয় জগু, তার প্রমাণ দেয়।

এই সাতদিন পরে ওরা আজ রান্নার গন্ধ পায় এবং ঠিকমত শব্দও। রূপও দেখা যাচ্ছে, রসাস্বাদটার জন্যে রসনা উৎকণ্ঠিত!

রেঁধেবেড়ে হাত ধুয়ে কোঁচায় মুছতে মুছতে দৃঢ় আদেশ দেয় জগু, 'বাস! কাল থেকে খবরদার আর হাঁড়ি নাড়বি না! ওখানে চলে যাবি—'

মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও সুবোধ বলে ওঠে, 'তাই কি হয়? চার-চারটে মানুষ মামীর ঘাড়ে চাপা—'

'ঘাড়ে চাপা মানে? রাঁধেই, দুটো বেশি করে রাঁধবে, এই তো! কেন, মা কি আমার গতর-কুঁড়ে? প্যান্ প্যান্ করিস নে বাবা! হ্যাঁ, মামারবাড়ির আদর জুটবে এ আশা দেব না, ডাল-চচ্চড়ি-ভাত দুটো খাবি, ব্যস।'

ডাল-চচ্চড়ি!

হায়, ডাল-চচ্চড়ি-ভাতই যে এদের কাছে এখন কী পরম পদার্থ তা জগু কি বুঝবে! চচ্চড়ি নামটা কানে আসা মাত্রই তো রোমাঞ্চ এসে গেছে!

কোন্ বস্তুর যে কতটা মূল্য, তা বোধ করি তার অভাব না হলে বোঝা যায় না।

এখন যেন মনে হচ্ছে, ভাত সেদ্ধ করা বা ডাল-চচ্চড়ি রাঁধাটা একেবারে তুচ্ছ নয়। মনে হচ্ছে মেয়েমানুষহীন বাড়ি শ্মশানতুল্যই বটে।

আজকের খাওয়াটি মন্দ হল না, কাল থেকে বাড়া ভাতের আশ্বাস, মনটা ভাল হবার কথা। কিন্তু প্রবোধের মনের মধ্যে পাগলা জগুর কথাগুলো যেন বিঁধছিল।

'জগুদা আবার মানুষ?...জগুদার কথা আবার কথা!' এই তো চিরদিনের মনোভাব, কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে লোকটা যা বলে খুব ভুল বলে না।

'কোন্ বাড়িতে "যমের বাড়ি" নেই?...যমের পেয়াদার হাত এড়িয়ে যাবে কোথায় মানুষ?...নিয়তির ওপর কথা নেই।...রাখে কেষ্ট মারে কে?'

প্রত্যেকটি কথাই হীরের টুকরোর মত দামী!

যতক্ষণ খুন্তি নেড়েছে ততক্ষণ বকবক করেছে, কিন্তু কথাগুলো বলেছে মূল্যবান।

বলছিল, 'আমার পিসির খুরে গড় করি। তোর যাবার কি দরকার ছিল শুনি, তোর যাবার কি দরকার ছিল? এখনও মৃত্যুভয়? মরে যাবি, ড্যাং ড্যাং করে চার ছেলের কাঁধে চড়ে কাশী মিত্তিরের ঘাটে চলে যাবি, চুকে গেল! যত দিন না মরিস ছেলেদের ভাতজল কর। তা নয়।'

ঠিক।

ঠিক বলেছে জগুদা।'

মা'র যাওয়া উচিত হয় নি।

মা অনায়াসে থাকতে পারতো।

আর মা থাকলে, অনায়াসে একটা বৌকেও রাখা যেত। বলাই যেত, যাদের বাপের বাড়ি, মাসি-পিসির বাড়ি আছে তারা যাক ; যার সেসব নেই, সে থাকবে। উপায় কি? রাখে কেষ্ট মারে কে?

হায়, জগদ্দা যদি তখন একবার বেড়াতে আসতো, মাকে জ্ঞান দিত!

বিপদের কথা কি বলা যায়!

এই যে পুকুরের দেশে রেখে এল প্রবোধ ছেলেপুলেকে, তাতে বিপদ হতে পারে না? যুক্তি ক্রমশই ভারী হতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, সামনের রবিবারেই গিয়ে নিয়ে আসবে। আর এই তো বেশ দিব্যি ঠাণ্ডা। 'বল হরি' কদাচিৎ শোনা যাচ্ছে।

তবে?

তবে কেন প্রাণপাখীকে খাঁচার বাইরে বার করে বেড়াল-কুকুরের মুখে রেখে আসা?

ভগবান জানেন ইত্যবসরেই থাবা বসিয়েছে কি না!

মেয়েমানুষটির তো বুদ্ধি-সুদ্ধির বালাই নেই, 'স্বদেশী' শুনেই গলেছেন। নির্ঘাৎ এতদিনে দিব্য মাখামাখি চলছে!

নিশ্চয়।

তা নইলে চিঠি দিল না একটা? অথচ নিজমুখে বলেছিল, 'চিঠি দিলে রাগটাগ করবে না তো?'

হ্যাঁ, প্রবোধের ফেরার সময় সেই কাঠ-কাঠ ভাবটা বদলে গিয়েছিল যেন সুবর্ণলতার। অনেক দিন আগের মত নরম আর হাসি-খুশি দেখিয়েছিল। নিচু হয়ে নমস্কার করে পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, 'হঠাৎ যদি মরে-টরে যাই, মাপ চেয়ে রেখে দিলাম।'

প্রবোধের কি ইচ্ছে হচ্ছিল সেই বনবাদাড়ের মধ্যে ওই 'সুবর্ণলতা'কে ফেলে রেখে চলে আসে। কিন্তু উপায় কি? 'না না, ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাই' বললে পাগল বলবে না লোকে?

তা ছাড়া বোন-ভগ্নীপতির পক্ষে রীতিমত অপমানও সেটা। অতএব প্রাণ রেখে দেহটা নিয়ে চলে আসা!

ইচ্ছে হচ্ছিল একবার সাপটে ধরে আদর করে নেয়। কিন্তু ছেলেগুলো আশেপাশে ঘুরছে। তাই চোখে দীনতা ফুটিয়েই মনোভাব প্রকাশ।...

'চিঠি দিলে রাগ করবো?'

'তা কি জানি, তোমাদের বাড়িতে ও রেওয়াজ আছে কি না! বিয়ে হয়ে এস্তক তোমাদের গলাতেই তো পড়ে আছি, চিঠি লেখা কাকে বলে জানিই না।'

'এইবার জেনো।'

বলে চলে এসেছিল প্রবোধ, ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে।

ঠিক যে অবিশ্বাসিনী হবে সে ভয় অবশ্য নেই। কিন্তু স্বভাবটাই যে পুরুষ-ঘেঁষা। যেখানে পরপুরুষ, সেখানেই চোখ কান খাড়া। আবার বলে কিনা, 'কান পেতে শুনি নতুন কথা কিছু বলছে কি না।'...বলে, 'নাঃ, সই গঙ্গাজল পাতাবার শখ আমার নেই। কার সঙ্গে পাতাবো? কারুর সঙ্গে মনই মেলে না। রাতদিন আর ওই মেয়েলী গল্প শুনতে ইচ্ছে করে না।'

তা হলেই বোঝো!

মেয়েমানুষ তুমি, তোমার মেয়েলী গল্পে অরুচি, কারো সঙ্গে তোমার

মন মেলে না!

'তবে আর কি, একটা ব্যাটাছেলে খুঁজেই তবে "মনের মানুষ" পাতাও!' বলেছিল প্রবোধ কতকটা রাগে, কতকটা ব্যঙ্গে।

'সই পাতানো'র একটা ঢেউ এসেছিল তখন।

'সই গঙ্গাজল' বাদেও নতুন নতুন সব আঙ্গিকে।

সেজবৌ তার বাপের বাড়ির দিকের কার সঙ্গে 'ল্যাভেন্ডার' পাতিয়ে এল, ছোটবৌ এখানেরই পাশের বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে পাতালো 'গোলাপপাতা'!

বিরাজ তার জায়ের বোনের সঙ্গে পাতিয়ে নিল 'বেলফুল', এমন কি মুক্তকেশী পর্যন্ত এই বুড়ো বয়সে মকর সংক্রান্তিতে 'সাগরে' গিয়ে দু-দুটো গিন্নীর সঙ্গে 'সাগর' আর 'মকর' পাতিয়ে এলেন।

বিধবার পাতাপাতিতে তো খরচ বেশি নেই।

মাছ নয়, মিষ্টি নয়, পান-সুপুরি নয়, শাড়ি নয়, শুধু পাঁচখানা বাতাসা আর কাঁচা সুপুরি হাতে দিয়ে সূর্য সাক্ষী করে চিরবন্ধনের প্রতিজ্ঞা!

সধবাদের খরচ বেশী।

তা সধবারা সাধ্যমত করেছে।

শাড়ি সিঁদুর, পান মিষ্টি!

কিন্তু সুবর্ণ কারুর সঙ্গে কিছুই পাতালো না। হেসে বললো, 'বন্ধুত্ব যদি হয় কারো সঙ্গে, এমনিই হবে। "পুজো পাঠ" করে না করলে হবে না! ওতে আমার রুচি নেই।'

ওরা আড়ালে বলেছিল, 'তা নয়, কাউকে তুমি যুগ্যি মনে কর না, তাই!'

সুবর্ণর বরও রাগে ব্যঙ্গে বললো, 'তবে আর কি, মেয়েমানুষে যখন রুচি নেই, তখন একটা ব্যাটাছেলে খুঁজে "মনের মানুষ" পাতাও?'

সুবর্ণর চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। সুবর্ণ মাথা দুলিয়ে প্রবোধের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া একটি ভঙ্গী করে বলেছিল, 'তা বলেছ মন্দ নয়! তেমনি যদি কাউকে পাই তো "বন্দেমাতরম্" পাতাই।'

বন্দেমাতরম্!

এতদিন পরে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রবোধের।

ঘটে যায় নি তো সেই ঘটনা?

পাতানো হয়ে যায় নি তো?

কে বলতে পারে মনের মানুষ জুটে বসে আছে কিনা?

নাঃ, রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার হেতু নেই। কাল-পরশুই চলে যাওয়া যাক। কাল হবে না, বেস্পতিবার। পরশু—পরশুই!

আর দ্বিধা নয়।

সুবর্ণর সেই কৌতুকের ভঙ্গীটা মনে পড়ে গেল।

সে ভঙ্গী যেন ভুলেই গেছে সুবর্ণর!

অথচ কী হাসিখুশিই ছিল আগে! সেই ছোটবেলায়!

মাঝে মাঝে ক্ষেপতো বটে, কিন্তু স্বভাবটা কৌতুকপ্রিয়ই তো ছিল। এবং অত হাসিখুশি অত রঙ্গরস দেখলে বিরক্তিই ধরতো প্রবোধের, মাঝে মাঝে তো রাগে মাথার রক্ত আগুন হয়ে উঠত। তার জন্যে শাসনও করেছে কত!

সেই একবার প্রকাশের ফুলশয্যায় আড়িপাতা নিয়ে? শাসনের মাত্রাটা

বড় বেশিই হয়ে গিয়েছিল সেদিন! তা রাগটা যে প্রবোধের বেশি, সে তো প্রবোধ অস্বীকার করে না। মাপও তো চায় তারপর।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সামলাতে পারে না নিজেকে। বিশেষ করে ওবে পুরুষদের কাছাকাছি দেখলেই। বিরাজের ছোট দ্যাওরটা বুঝি প্রকাশের বন্ধু। সেটাও জুটেছিল সোহাগের 'মেজবৌদি'র সঙ্গে।

আর করেও ছিল তেমনি কাণ্ড!

রান্নাঘরের ছাতের আলসে ডিঙিয়ে কার্নিশ বেয়ে ঘুরে চলে গিয়েছিল ফুলশয্যার ঘরের জানলায়। তার সঙ্গে সেই ছোঁড়া। একটু ঠেলাঠেলি হলেই স্রেফ নিচের গলিতে।

আর সেই দৃশ্য চোখে পড়ে গেল ঠিক প্রবোধেরই। কোথা থেকে? ন পাশের বাড়ির ছাত থেকে—যাদের ছাতে হোগলা দিয়ে লোকজন খাওয়ানো হয়েছে। অবশেষে প্রবোধ তদারক করছিল বাসনপত্র কিছু পড়ে আছে কি না হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ওটা কী ব্যাপার?

ওরা কে ওখানে? সুবর্ণ? আর ও?

পরবর্তী ঘটনাটা একটু শোচনীয়ই।

প্রহারটা বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল।

এতদিন পরে সেই কথাটা মনে পড়ে মনটা কেমন টনটনিয়ে উঠল প্রবোধচন্দ্রের। অতটা না করলেও হত! ছোঁড়াটা তো সেই বোকা হাবা গদাই! গোঁফই বেরিয়েছিল, পুরুষ নামের অযোগ্য। আর তা নইলে প্রকাশটার বন্ধু হয়?

আশ্চর্য, ওই হাবাটাকে 'মানুষ' বলে মান্য দিত সুবর্ণ!

সুবর্ণর মুখের হাসি তো প্রবোধের চিরকাম্য, কিন্তু ঘরের বাইরে কোথাও সেই হাসি দেখলেই যে কেন মাথায় রক্ত চড়ে যায়!

জায়ে জায়ে কথা কইতেও হয়তো কখনো হেসে উঠল, অমনি মনটা বেজার হয়ে গেল প্রবোধের। 'আমার এ রোগটা সারাতে হবে,' মনে মনে ঠিক করে প্রবোধ। সুবর্ণর স্বভাবটা হয়তো ওতেই ক্রমশ এত কাঠ হয়ে যাচ্ছে। নইলে এমন তো ছিল না!

চোখের আড়ালে থাকায় সুবর্ণর দোষগুলো নিষ্প্রভ আর গুণগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে, সুবর্ণর মনে আপন-পর নেই। সুবর্ণ যদি সাবান কাচে তো বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের বিছানার ওয়াড় খুলে এনে ফর্সা করে। সুবর্ণ যদি জুতো সাফ করে তো সকলের জুতোয় কালি লাগাতে বসে।... ছেলেরা একটা জিনিসের বায়না করলে, বাড়ির সব ক'টা ছেলেমেয়েকে দিয়ে তবে নিজের ছেলেকে দেয়। এসব সদ্‌গুণ বৈকি!

কার্যকালে প্রবোধ আদৌ এগুলোকে সদ্‌গুণ বলে না, বরং 'বাড়াবাড়ি' বলেই অভিহিত করে। কিন্তু এখন বোধ করি হঠাৎ নিজের মধ্যেই সদ্‌গুণের উদয় হওয়ায়, সুবর্ণর ওই গুণগুলোকে সদ্‌গুণ বলে মনে হচ্ছে তার!

পিয়ন এ বাড়িতে দৈবাৎ আসে।

সুরাজ চিঠি দেয় মাঝে মাঝে, এইটাই প্রধান, আর সবই কালে-কস্মিনের ব্যাপার।

তথাপি পাড়ায় তার আসার একটা 'টাইম' আছে।

সেই টাইমে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবোধ রাস্তায়।

কিন্তু কোথায়?

সুবর্ণর সেই মুক্তোর মত সাজানো অক্ষরে লেখা ঠিকানার চিঠি কোথায়?

তার উপর ভয়ানক কষ্ট হল, বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ল, প্রকাশের নামে এক খামের চিঠি আসা দেখে। আঁকা-বাঁকা অপটু অক্ষর। বাড়ির মালিকের নামে লিখেছে 'ক্যায়ার অব সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়!'

তবু চিঠি তো! বৌয়ের চিঠি!

প্রকাশের এ ভাগ্য হল।

অথচ প্রবোধের হল না।

যার বৌ রাতদিন খাতায় গান তুলছে, ছেলেদের 'হাতের লেখা' মক্স করাচ্ছে। হাতের লেখা দেখলে কে বলবে মেয়েমানুষের লেখা।

ছোট ভাই। ভাবতে লজ্জা।

তবু বুকের মধ্যে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে প্রবোধ।

প্রকাশের চিঠিটা যে তার হাতেই এসে পড়লো!

ছোট ভাইকে তো আর হাতে হাতে দেওয়া যায় না, ওর ঘরে রেখে এসে ডেকে বলে দিল, 'ওরে পেকা, তোর নামে বোধ হয় একটা চিঠি এসেছে।'

মামীর কাছে খাচ্ছে কাজ থেকে, কাজ নেই কিছু, কাজেই শূন্য প্রাণ আরও শূন্য লাগে। তাসের আড্ডাও এই হুজুগে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। জমছে না তেমন।

ঘরে বৌ না থাকলে কোনো কিছুতেই জুত্ হয় না। কারুরই না।

তাকে দেখি বা না দেখি, তবু থাকুক।

এই হচ্ছে কথা!

প্রবোধ সংকল্পে দৃঢ় হল।

কালই যাত্রা।

বিনি খবরেই যাবে! গিয়ে বলবে, 'চিঠিপত্র নেই, এদিকে হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে—'

এখানে?

এখানে বলবার কথাও ঠিক করে ফেলেছে। বলবে, 'মামীর ঘাড়ে আর কতদিন খাওয়া যায়? ওদিকে বোনাই-বাড়িতেই বা কতদিন স্ত্রী-পুত্র রাখা যায়?'

কিন্তু কী দেখব গিয়ে?

আনন্দ আর আতঙ্ক এই দুয়ের তাড়নায় ছটফটিয়ে বেড়ায় প্রবোধ।

ঠাকুমার সঙ্গে নবদ্বীপে আসায় উৎসাহের অন্ত ছিল না চাঁপার। উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন যে মা জবরদস্তি করে নি। মা যদি জেদ করতো, যেতেই হত মায়ের সঙ্গে। ঠাকুমা যতই রাগী হোক, চাঁপাদের ব্যাপারে যে শেষ পর্যন্ত ঠাকুমার কথা খাটে না, মা'র কথাই বজায় থাকে, সে জ্ঞান জন্মে গেছে চাঁপার!

অতএব কাঁটা হয়ে ছিল চাঁপা,—ওই বুঝি মা বসে বসে, 'না, সবাই আমার সঙ্গে যাবে!'

কিন্তু চাঁপার ঠাকুর ফুল নিলেন।

ঠাকুমা যখন বললো, 'চাঁপি মল্লিকা আমার সঙ্গে চলুক, চোখে চোখে থাকবে। ক্রমশ তো ডাগর হয়ে উঠছে।' তখন সুবর্ণলতা 'না না' করে উঠল না। শুধু বললো, 'নিয়ে গেলে তো আপনারই ঝঞ্ঝাট। ওরা কখন খাবে, কখন শোবে, এই চিন্তা করতে হবে। এরা গেলে যখন যা খুশি করলেন।'

ঠাকুমাও বোধ করি আশঙ্কিত ছিলেন, তাই এক কথায় ছাড়পত্র পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'সে কিছু অসুবিধে হবে না। শুধু আপনার হাত-পা নিয়ে বসে থাকার থেকে বরং কাজ থাকবে একটা। তীর্থে তীর্থে ঘোরা সে এক, এ তো একই ঠাঁই চেপে বসে থাকা। তাও দিন নির্দিষ্ট নেই, কবে কলকাতার অবস্থা ভাল হবে। চলুক ওরা।'

অতএব চলুক।

'নে থো' করে গুছিয়ে নেওয়া, তবু ওরই মধ্যে মা কাপড়, জ্যাকেট, চুলের দড়ি-কাঁটা সব গুছিয়ে দিল। দুজনেরই দিল। মল্লিকার মা তো এদিকে তেমন গোছালো নয়। ভাঁড়ার গোছাতেই পটু। ছেলেমেয়েদের দিকটা তাকিয়েও দেখে না। আর সে না দেখাটাকেই সে বেশ একটু মহত্ত্ব ভাবে। বড় বড় মেয়েগুলোর সাজ-সজ্জার তদ্বির চাঁপার মা-ই করে। এতে যে চাঁপার হিংসে হয় না তা নয়, কিন্তু সে হিংসে প্রকাশ করা চলে না। মা তাহলে জ্যান্ত পুঁতবে।

সে যাক্, মা তো দিল গুছিয়ে দুজনকার। ঠাকুমার পুঁটলিও গুছিয়ে দিল। আহ্লাদে নাচতে নাচতে বেরোবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মল্লিকা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসলো। জেদ করে, কেঁদে-কেটে চলে গেল অর মা'র সঙ্গে।

বললো, ভাই-বোনদের জন্যে মন-কেমন করছে।

ভাই-বোনদের জন্য মন-কেমন!

বিশ্বাস করবে চাঁপা এই কথা?

বলে দুদণ্ড ওরা চোখছাড়া হলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়। রাতদিন উৎখাত করছে, রাতদিন 'চ্যাঁ-ভ্যাঁ' করছে, খাটতে খাটতে প্রাণ যাচ্ছে ওদেরই জন্যে। আবার মন-কেমন।

চাঁপা তো বরং বলে না, কারণ সত্যি বলতে চাঁপার মা মেয়েকে 'পড়া পড়া' করে ব্যস্ত করলেও অন্য কাজে তত খাটায় না। কিন্তু মল্লিকাকে খাটতে হয়, আর মল্লিকা বলতেও ছাড়ে না। বড়দের আড়ালে এলেই—কোলের ভাইটা-

বোনটাকে ঠুকে ঠুকে বসায়, আর বলে, 'শত্তুর শত্তুর! একটু যদি শান্তি দেয়! মা'র যদি এই সাতগণ্ডা ছেলেমেয়ে না হত, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচতাম রে! এই "চ্যাঁ-ভ্যাঁ"গুলোর জ্বালায় জান্ নিকলে গেল!...জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই কাঁথা পাট করছি আর ছেলে বইছি!'

ছোট ভাই-বোনেরা পুতুলের বাক্সটায় একটু হাত দিলে কী মারটাই মারে তাদের!

অবিশ্যি চাঁপাও ও-দোষে দোষী।

পুতুলের বাক্স তার প্রাণ। কেউ হাত দিলে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে না পড়ে পারে না। কিন্তু চাঁপা তো ঢং করে বলতে যায় নি, 'ভাই-বোনের জন্যে মন-কেমন করছে!'

মন-কেমন! রাতদিন যাদের বলছে 'মর মর, এক্ষুণি মর লক্ষ্মীছাড়ারা! যমের বাড়ি যা, নিমতলার ঘাটে যা! তোরা ম'লে আমি হরির লুট দিই!' তাদের জন্যে মন-কেমন! ন্যাকামি! চালাকি! শেষ অবধি ওর মা কিছু লোভ-টোভ দেখিয়ে কি ঘুষঘাষ দিয়ে মেয়েকে ফাঁদে ফেলেছে। জানে তো মেয়ে নইলে চলবে না!

বিয়ে হয়ে গেলে করবে কি?

তখন তো চালাতেই হবে!

মাঝখান থেকে চাঁপারই ঘোরতর কষ্ট!

পুতুলের বাক্সটা এনেছে চাঁপা, কিন্তু খেলার সঙ্গিনীই যে 'ভাগলবা'! মল্লিকার এই বিশ্বাসঘাতকতায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল চাঁপার। তবু প্রথম দুচার দিন ঠাকুমার সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখে বেড়িয়ে, গঙ্গায় নেয়ে এবং ঠাকুমার গুরুবাড়ির সংসারযাত্রার নতুনত্ব দেখে একরকম ভালই কাটছিল, ঠাকুমাও 'মেয়েটা একা পড়েছে' বলে একটু হৃদয়বত্তার পরিচয় দিচ্ছিলেন কিন্তু সে অবস্থা আর থাকল না।

গুরুর নিজেরই মেয়েজামাই, নাতিনাতনী আর শ্বশুরবাড়ির দিকে কে সব এসে হাজির হল, কে জানে কী উপলক্ষে! তবে সেই উপলক্ষে চাঁপা মুক্তকেশীর আদর ঘুচলো।

ঘরের অকুলান হওয়ায় দালানের চৌকিতে শুতে হল ঠাকুমা-নাতনীকে, এবং গুরুমার ব্যাজার ব্যাজার ভাব যেন সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, 'তোমরা এখন অবান্তর'। প্রশ্ন করতে লাগল, 'আর কতদিন'?

অন্য কোথাও এ ভাব দেখলে নির্ঘাত মুক্তকেশী পুঁটলি-বোঁচকা গুটিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু জায়গাটা গুরুবাড়ি, দীনহীন হয়ে থাকাই নিয়ম। তাই মুক্তকেশী গুরুমার কাজের সাহায্য করেন, গঙ্গাজল বয়ে এনে দিয়ে মন রাখতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু চাঁপার মন কে রাখবে?

মুক্তকেশী ওদিকে যতই আহত হন, ততই এদিকে ঝাল ঝাড়েন। উঠতে বসতে 'আপদ, বালাই, পায়ের বেড়ি, ঘাড়ের বোঝা' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতে থাকেন নাতনীকে। নাতনীর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটি মনঃপুত না হলে নাতনীকেই টিপে টিপে গঞ্জনা দেন এবং বলতে থাকেন, 'নিরিমিষ্যি মুখে রুচছে না! সাহেবের গিন্নী হবেন! কত ভাগ্যে নারায়ণের অন্ন-পেসাদ জোটে তা জানিস হারামজাদি?'

বলা বাহুল্য, গুরুমার কানেই যায় কথাটা। কিন্তু 'নিরিমিষে'র কষ্ট পূরণ করতে এখন আর দুধটুকু, দইটুকু, আচারটুকু, আমসত্ত্বটুকু পাতে পড়ে না। নারায়ণের বালভোগের জোড়া মণ্ডাটি তো গুরুর ছোট নাতির একচেটে হয়ে গেল। অথচ প্রথম দিকে গুরুদেব পুজো করে উঠে এসেই 'মেয়ে কই? মেয়ে কই?' করে ডেকে ডেকে ওই মণ্ডাটি হাতে দিতেন চাঁপার।

কিন্তু তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না।

চাঁপা একটা বুড়ো মেয়ে, ছোট্ট কেউ বাড়িতে নেই বলেই আদর জুটছিল তার। নাতি এল একটা, তিন-চার বছরের শিশু, আদরটা স্বভাবতই তার দিকে গড়াবে। আর নিজের নাতি এবং যজমানের নাতনীতে আদরের পার্থক্য থাকবে না, এ আবার হয় নাকি? সংসারত্যাগী যোগী গুরু নয়, ঘরসংসারী গৃহী গুরু। যজমান-ঘর বিস্তর, তাই অবস্থা ভাল। আর সেই জন্যেই যজমানরা নবদ্বীপ এলে ওঠে ওঁর কাছে। আদরযত্নও পায়।

কিন্তু সে তো আর অনির্দিষ্ট কালের জন্যে নয়, ব্যাজার আসাই স্বাভাবিক।

ব্যাজার আসাই স্বাভাবিক, এটা মনে মনে হৃদয়ঙ্গম করেন মুক্তকেশী, তাতেই মেজাজ আরো খাপ্পা হয়। এবং সেই মেজাজটা চাঁপার উপরই পড়ে।

প্রথম প্রথম এখানে ঠাকুমার ভক্তিবিগলিত নম্র মূর্তি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল চাঁপা, কারণ ঠাকুমার এ মূর্তি তাদের কাছে অভূতপূর্ব। কিন্তু ভাগ্যে সইল না। এখন ঠাকুমা উঠতে বসতে চাঁপাকে খিঁচোচ্ছেন। হয়তো নিরুপায়তার প্রকাশই এই। অধস্তনের উপর বীরত্ব ফলানো।

তাই পুরুষজাতি যখন 'দরবারে না মুখ পায়, তখন ঘরে এসে বৌ ঠ্যাঙায়'।

চাঁপা এত মনস্তত্ত্ব বোঝে না, চাঁপা ঠাকুমার ভর্ৎসনায় মর্মাহত হয়। এবং তেমন দুঃখময় মুহূর্তে বলেও বসে, 'কেন আনলে আমাকে? মল্লির মতন মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই হত?'

তখন আবার আর এক হাত নেন মুক্তকেশী।

নিঃসঙ্গ চাঁপা অতএব বড়ই মনঃকষ্টে আছে। এখন ওর সর্বদাই মনে হয়, মা বকলেও এমন নিষ্ঠুরের মত বকে না। মা ঠাকুমার মতন এমন বিতিকিচ্ছিরী করে চুল বেঁধে দেয় না, মা'র কাছে থাকলে কখন কি পরতে হবে ভাবতে হয় না। ভাবতে হয় না জ্যাকেট কাপড় শুকলো কিনা, ভিজেগুলো সময়ে মেলা হল কিনা।

গুরুমার মেয়ে আবার খুব সরেশ!

চাঁপা যে কিছু কাজ জানে না, সেটা ইতিপূর্বে ধরা পড়ে নি, ধরা পড়লো ওই মেয়ের চোখে। দু'দিন না যেতেই সে বলে বসলো, 'নাতনী যে তোমার কুটো ভেঙে দুটো করতে শেখে নি মুক্তদি! শ্বশুরঘরে যেতে হবে না?'

বাবার শিষ্য, অতএব দিদি!

আর বয়েস যাই হোক, 'তুমি'!

মুক্তকেশী নিজের সাফাই গাইতে তাঁর মেজবৌমার গুণকীর্তন করেন, এবং ওই বৌটির জন্যেই যে তাঁর নাতি-নাতনীকে সনাতন হিন্দুধর্মে তালিম দিতে পারেন নি, সে কথা ঘোষণা করেন।

চাঁপার মাতৃভক্তির খ্যাতি নেই, নিজেরা যখন জাঠতুতো পিসতুতো বোনেরা

একত্র হয়, তখন চাঁপা মাতৃনিন্দায় পঞ্চমুখ হয়, কিন্তু নিতান্ত পরের সামনে এসব কথা ভালো লাগে না তার। তাছাড়া মা'র কাছ থেকে দূরে এসে কেমন যেন অসহায়-অসহায় লাগে নিজেকে।

কেউ কোথাও যেন নেই চাঁপার—এমনি মনে হয়। বাড়িতে তো ঠাকুমাই ছিল পৃষ্ঠবল, এখানে কেন তেমন মনে হয় না কে জানে!

মনটা সর্বদাই দুঃখু-দুঃখু লাগে।

তাছাড়া শুধু কলকাতার জন্যেও যেন মন-কেমন করে। কলকাতার বাড়ি, কলকাতার রাস্তা, মামীঠাকুমার বাড়ি, গঙ্গার ঘাট, না মনে করে তাতেই প্রাণ 'হু-হু' করে ওঠে!

কলকাতায় যে 'কী' আছে তা বলতে পারবে না চাঁপা, তবু যেন মনে হয় কত 'কী' আছে!

আরো কষ্ট হয়েছে চাঁপার—ওই নতুন আসা লোকগুলোর মধ্যে একটা যে ছেলে এসেছে তার ব্যবহারে। গুরুর শ্বশুরবাড়ির কে যেন। শ্রীরামপুর থেকে এসেছে। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে খুব, কিন্তু কলকাতার নিন্দে ছাড়া কথা নেই মুখে!

কতই বা বয়েস?

চাঁপার থেকে ছোট হবে তো বড় হবে না, কিন্তু কী পাকা পাকা কথা! চাঁপা-মল্লিকাকে সবাই 'পাকা' মেয়ে বলে, আর এই ছেলেটা কী?

মুখে মুখে আবার ছড়া বলে!

আর চেনা নেই জানা নেই, 'তুই'!

খোঁচা খোঁচা চুল, মোটা মোটা পা, বেঁটে বেঁটে গড়ন—দেখলে গা জ্বলে যায়! আর সেইটা বুঝতে পারে বলেই উৎখাত করে চাঁপাকে, 'তোমাদের কলকাতায় আছে কি? কিচ্ছু না। খালি কায়দা আর কল! কল আর কেতা, এই দুই নিয়ে কলকেতা! কেতা মানে জানিস? কেতা মানে কায়দা। কলকেত্তাই বাবুদের আছে শুধু কায়দা!'

চাঁপাও অবশ্য নীরব থাকে না, রেগে উঠে বলে, 'থাকবেই তো কায়দা। যত সায়েবদের আপিস কলকাতায় না? লাটসায়েবের বাড়ি কলকাতায় না?'

হি-হি করে হাসে ঘণ্টু।

বলে, 'তবে তো সবাই লাট, কি বলিস? তোর বাবা লাট, তোর কাকা লাট।'

চাঁপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'এই, তুই আমার বাবা তুলে কথা বলছিস? বলে দেব?'

ঘণ্টু কিন্তু রাগের ধার দিয়ে যায় না; বলে, 'দে না বলে! আমি বলবো, বাবার নাম করলেই বুঝি বাবা তোলা হয়? তাহলে তো ওকে ওর বাবার নাম জিজ্ঞেস করাও চলবে না।'

মুখরা চাঁপা নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এবং বোকার মতই রাগে, 'তা কলকেতাকেই বা নিন্দে করবি কেন!'

'করবো! নিন্দের যুগ্যি তাই নিন্দে করবো!'

'নিন্দের যুগ্যি?'

'নিশ্—চয়।'

'তা হলে তোদের শ্রীরামপুরও খুব বিচ্ছিরী! যত ইচ্ছে নিন্দে করবো!'

ঘণ্টু চোখ পিটপিটিয়ে হাসে। বলে, 'কর। দেখি কি নিন্দের কথা বার করতে পারিস!'

চাঁপা অবশ্য পারে না।

কারণ শ্রীরামপুর নামটা শুনেছে সে এই ঘণ্টুদের দৌলতেই। কোথায় সেই পরমধাম, কী তার গুণাগুণ কিছুই জানে না। তাই বিপন্ন হয় চাঁপা।

ঘণ্টু পরিতুষ্ট মুখে বলে, 'পারলি না তো? পারবি কোথা থেকে? দোষ থাকলে তো? কলকেতা? হি হি হি!

কলকেত্তাই বাবু
এক ছটাকে কাবু!
কোঁচার ঝুল লম্বমান,
উদর ফাঁকা মুখে পান।'

আশ্চর্য, ওইটুকু ছেলে, মুখস্থও করেছে এত!

নির্ঘাত ওদের বাড়িটা ঘোরতর কলকাতা-বিদ্বেষী, রাতদিন এরই চাষ চলে। চাঁপার এত হাতিয়ার নেই, ওর সম্বল শুধু রাগ। সেই সম্বলেই লড়তে আসে সে, 'আর তোদের শ্রীরামপুরে বুঝি কেউ পান খায় না?'

'খাবে না কেন? ভরা পেটে খায়।'

'কলকাতার লোক ভাত খায় না?'

ঘণ্টু গম্ভীরভাবে বলে, 'সে গরীব-দুঃখীরা খায়। বাবুরা খায় শুধু চপ কাটলেট আর মদ!'

মদ!

চাঁপার চোখ গোল হয়ে যায়।

চাঁপার মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'মদ খায়! তার মানে আমরা মদ খাই?'

'তোরা? হি হি হি, তোরা কি বাবু? তোরা তো মেয়েমানুষ। হচ্ছে বাবুদের কথা। শুনবি আরো? "চড়েন বাবু জুড়ি গাড়ি, চেনেন খালি শুঁড়ির বাড়ি!" শুঁড়ির বাড়ি মানে জানিস?'

জানবে না কেন, কী না জানে চাঁপা? রাতদিন তো শুনছে এসব। নিজেরাই ঝগড়ার সময় বলে, 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল'! কিন্তু সত্যি মানে ভেবে বলে নাকি? অথচ এই পাজী ঘণ্টুটা!

'কক্ষনো তুই কলকাতার নিন্দে করবি না বলছি,' চাঁপা অগ্নিমূর্তি হয়।

ঘণ্টু নির্বিকার।

ঘণ্টু নির্ভয়।

ঘণ্টুর এই মেয়েটাকে ক্ষ্যাপানোই আপাতত শৌখিন খেলা। আর খেলাটাকে সে নির্দোষই ভাবে। তাই ঘণ্টু হঠাৎ তারস্বরে বলে ওঠে, 'আচ্ছা করবো না নিন্দে, বল তবে একটা ধান গাছে কখানা তক্তা হয়?'

চাঁপা ক্ষোভে দুঃখে উঠে যায়।

ঘণ্টু মহোৎসাহে চেঁচায়, 'কলকেতার বিবিদের ছড়াটা শুনে গেলি না?'

চাঁপা গিয়ে কেঁদে পড়ে, 'ঠাকুমা, ওই ঘণ্টুটা যা ইচ্ছে বলছে! বলছে কলকাতা ছাই—বিচ্ছিরি! থাকবো না আর আমি!'

মুক্তকেশীর অজানা নয় ব্যাপারটা, তাই ব্যাজার মুখে বলেন, 'ও ক্ষ্যাপাচ্ছে বলেই তুই ক্ষেপবি? বাড়িতে তো খুব দুঁদে, এখানে একেবারে কচি খুকি হয়ে গেলি যে!'

গুরুকন্যা বলে ওঠেন, 'যা বলেছ মুক্তদি, নাতনীর তো তোমার বিয়ের বয়েস বয়ে যায়, কী ন্যাকা বাবা! ঘণ্টু কি একটা মানুষ, তাই ওর কথায় ক্ষেপছে!'

মুক্তকেশী আড়ালে গিয়ে চাপা গলায় বলেন, 'নেকি, তুমি রাতদিন ওই দস্যি ছোঁড়ার সঙ্গে মেশই বা কেন? ওসব হচ্ছে পাজীর পা-ঝাড়া! খবরদার ঘণ্টুর সঙ্গে মিশবি না।'

চাঁপা কেঁদে ফেলে।

কলকাতার দুঁদে চাঁপার সব মর্যাদা ঘোচে। বলে, 'আমি কি মিশতে যাই? ওই তো আসে সেধে সেধে!'

'তা হোক। তুই আমার কাছে কাছে থাকবি।'

'তোমার কাছে? তুমি যেন বড্ড থাকো? রাতদিন তো রাস্তায়। তার থেকে চলে যাই চল।'

'চলে যাই বললেই তো হয় না? তোর বাপ-জ্যাঠা হুকুম দেবে, তবে তো?'

চাঁপা অতএব এদের ছাতে উঠে কাঁদতে বসে।

কলকাতার নিন্দেয় তার এমন জ্বালাই বা করে কেন? কলকাতার কথা মনে পড়লেই বা প্রাণের মধ্যে এমন 'হু-হু' করে ওঠে কেন?

ছাতে নির্জনে বেশিক্ষণ বসা যায় না, বেলা পড়ে গেলেই গা ছমছম করে, আর দুপুরবেলা বুক ঢিপঢিপ করে।

তবু আসে একবার একবার।

আলসের ধারেই একটা নারকেল গাছ, তার পাতাগুলো ঝিরঝির করে, সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাঁপার মনটা হারিয়ে যায়।...

যে বাড়ির দেওয়াল চারখানা চাঁপার মা'র কাছে জেলখানার দেওয়ালের মত লাগে, সে বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় চাঁপার মন।...আর সকাল থেকে রাত অবধি যেখানে যা কিছু হয় সব মনে পড়ে যায়। বাবা জ্যাঠা কাকারা কে কি করেন, কখন খাওয়া হয়, কখন শোওয়া হয়। তাছাড়া সকালবেলায় মাথায় বড় একটা হাঁড়ি নিয়ে যে লোকটা গলির মধ্যে এসে হেঁকে যায়—'মুড়ির চাকতি, চিঁড়ের চাকতি, ছোলার চা--কতি'--সে লোকটার গলার আওয়াজ যেন এখান থেকেই কানে এসে বাজে।...কানে বাজে 'চাই কুলপী!...মা—লাই কুলপী!' কানে বাজে চুড়িউলির 'চুড়ি চা--ই চুড়ি'! 'আতা চাই আতা', 'টেঁপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু—ল'?

চলছেই তো সারাদিন।

এখানেও শব্দের অবধি নেই। সে কেবল ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ।

ঠাকুর জাগছেন, ঠাকুর খাচ্ছেন, ঠাকুর ঘুমোচ্ছেন, ঠাকুর সাজছেন, সব কাঁসর পিটিয়ে পিটিয়ে জানানো! বাবাঃ! এই ঠাকুরের দেশে আর থাকতে সাধ নেই।...ঢের ভালো ওই বহুবিধ শব্দতরঙ্গে তরঙ্গায়িত কলকাতা!... এখানে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না—আশ্চয্যি!...

এখানে পয়সা হাতে দিয়েই কী বলবেন ঠাকুমা?

'পেন্নাম কর! পয়সাটা ওই থালায় ছুঁড়ে দে!'

দূর!

অথচ ওখানে একটা পয়সা পেলে কত কী করা যায়! ডবল পয়সা পেলে

তো কথাই নেই। আধলা একটা ঘরের মেঝেয় কুড়িয়ে পেলেও তা দিয়ে দুখানা মুড়ির চাকতি কিনে ফেলা যায়।

মা মোটেই পয়সা হাতে দিতে চায় না। আঁচলে পয়সার পুঁটলি নিয়ে বেড়ায়, তবু একটা পয়সা চাইলে দেবে না। চাইলেই বলবে, 'কী চাই শুনি? কি কিনতে হবে?'

কি কিনতে হবে তা কি ঠিক থাকে? পয়সাটাই আসল। ওটা পেলেই কত কীই কেনা চলে। কিন্তু তা হবে না। বলতে হবে। অগত্যাই যা হোক একটা কিছু বলে ফেলতে হয়। পেয়ারা কি আতা, ঝালবিস্কুট কি তিলকুট!

ব্যস, গুষ্টির যে যেখানে আছে, মা সবাইয়ের জন্যে কিনতে বসবেন। এতে কি রোজ রোজ আবদার করা যায়? চাঁপার বাবার যে বেশী পয়সা, তার জন্যে আলাদা কোন সুখ নেই চাঁপার! অথচ বাবাদের ওই হেমা মাসী? তাঁদের বাড়িতে নাকি তাঁর বড় ছেলের ছেলেমেয়েরা মুড়ি খায়, আর ছোট ছেলের ছেলেমেয়েরা পরোটা খায়!

কেন?

ওই পয়সা কম বেশি বলেই।

মা'র সামনে বল দেখি ওসব কথা, খুন করবে!

চুড়িউলি এলে সবাই চুড়ি পরবে, মা দাম দেবে। কিন্তু চাঁপা একটু বেশি পরতে যাক দিকি? নয়তো 'রেশমী চুড়ি' পরতে যাক? হবে না! পরলে সবাই পরবে।...তা এখন তো চুড়ি পরাও ঘুচেছে। চুড়ি নাকি বিলিতি! কে জানে বাবা!

তা বাবা দেয় পয়সা। লুকিয়ে দিয়ে বলে, 'খবরদার, তোদের মাকে দেখাস নে।'

কিন্তু লুকিয়ে কিনে লুকিয়ে খাওয়া কী কম গেরো?

তবু আঁচলে দু-একটা পয়সা থাকলেই মনটা কী ভরাট থাকে! আর রাস্তা দিয়ে যখন 'ওলা'রা হেঁকে যায়, কী আহ্লাদ হয়!...আর হাঁকছেই তো চাব্বিশ ঘণ্টা!...সেই কলকাতাকে কিনা বলে খারাপ?

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল।

নারকেলপাতায় ঝিরঝিরিনিটা যেন জমাট জমাট দেখাচ্ছে। নিচে নামবার জন্যে উঠে পড়ে চাঁপা...মনে পড়ে যায় কলকাতায় এ সময় রাস্তার গ্যাসবাতি জ্বালনেওয়ালারা মই ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে।

চাঁপাদের গলির বাঁকে একটা 'গ্যাস' আছে, লোকটাকে চাঁপাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। বাতিওলা চলে যেতে না যেতেই ফুলওলার আওয়াজ পাওয়া যায়। গলিতে ঢোকে না, বড় রাস্তা থেকেই আওয়াজ আসে, 'চাই বেলফুল।...চাই কে—য়া ফুল!'

ছোট খুড়ি কেয়াফুলের ধুলোগুলো দিয়ে কেয়া খয়ের বানায়। বাবাদের তাসের আড্ডার লোকেরা বলে, 'আপনাদের বাড়ির পানটভালো!'

যে কথাটাই মনে পড়ে যায়, প্রাণটা 'হু-হু' করে ওঠে।

কলকাতা আর কলকাতার ওই বাড়িটা যেন চাঁপাকে লক্ষ বাহু দিয়ে টানতে থাকে।

আর এই কষ্টকর মুহূর্তে আরো ভয়ানক কষ্টকর একটা আশংকা

চাঁপাকে যেন পেঁচিয়ে ধরে।...অথচ এ আশঙ্কাটা এযাবৎ যেন চোখের সামনে একটি রঙিন ফুলের মত দুলছিল।

ইদানীং ঠাকুমাকে প্রায়ই লোকে বলতে শুরু করেছে, 'আর কি, চাঁপা-মল্লিকা তো দিব্যি বিয়ের যুগ্যি হল, এবার নাতজামাই খোঁজো?'

ঠাকুমাও অনুকূল একটা জবাব দিচ্ছেন। কাজেই অদূর ভবিষ্যতেই যে 'সেই' দিনটি আসছে তা বুঝতে পারছে চাঁপা। আর সেই বুঝতে পারার আশেপাশে ঝলসে উঠছে নতুন গহনা, জরির শাড়ি, মালাচন্দন, লোকজন, ডাক-হাঁক, ঘটাপটা।

টোপর পরা একটা ছেলেও আছে বৈকি এই সমারোহের কোনো একখানে। ...কাজেই সবটা মিলিয়ে, ওই একটি রঙিন ফুলই।

কিন্তু আজ, ঠিক এই মুহূর্তে ফুল উধাও হল। একটা বুনো জন্তু যেন হাঁ করে এল।

বিয়ে হওয়া মানেই তো ওই বাড়ি থেকে চলে যাওয়া। হয়তো বা কলকাতা থেকেও? কত মেয়েরই তো বিয়ে দেখছে চাঁপা, কই, কলকাতায় কোথা? অতএব চাঁপার ধরে নিতে হবে, কলকাতা থেকে বিতাড়ন!

হঠাৎ যেন ডুকরে কান্না পায় চাঁপার।

যেন এখনই কলকাতা থেকে নির্বাসন ঘটে গেছে তার।

তা যাওয়াই।

আর বড় জোর ছ মাস এক বছর।

তার বয়সী কত মেয়েরই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

হায় হায়, কেনই বা বিয়েটাকে ভাল মনে হত তার!

আচ্ছা, যদিই বা কলকাতাতেই বিয়ে হয় তার ছোট পিসির মত, কিন্তু পড়তে তো হবে একটি দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে, তার ঠাকুমার মত। পিসির শাশুড়ী কেমন চাঁপা জানে না, মা খুড়ির শাশুড়ীকেই দেখে আসছে জীবন-ভোর। কাজেই 'শাশুড়ী' শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তকেশীর মুখটাই ভেসে ওঠে। বলা বাহুল্য, তাতে বুকে খুব একটা বল আসে না।

সন্ধ্যার ছায়া মনে নিয়ে নিচে নেমে আসতে আসতে আরো একটা কথা মনটাকে তোলপাড় করে তোলে চাঁপার।

চাঁপার মা'র নাকি ন বছরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার মানে চাঁপার বয়েস থেকে দু বছর আগে। আর মা বেচারীকে এসে পড়তে হয়েছিল ঠাকুমার মত শাশুড়ীর হাতে!

উঃ কী কষ্ট! কী কষ্ট!

জীবনে এই প্রথম বোধ করি মাকে বেচারী ভাবল চাঁপা।

তারপর আরো আতঙ্ক গ্রাস করতে বসলো চাঁপাকে। শুনেছে মা'র ঠাকুমা নাকি মা'র মাকে লুকিয়ে, আর মাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে ফেলেছিলেন!

সেই রাগে মা'র মা, যিনি নাকি চাঁপাদের দিদিমা, সংসার ত্যাগ করে কাশী চলে গেছেন। জীবনে আর মা তার মাকে দেখতে পেল না।

চাঁপার ঠাকুমাও যদি হঠাৎ এইখানে কারুদের বাড়িতে বিয়ে দিয়ে ফেলে তার!

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে চাঁপার। বলা যায় না, বিশ্বাস নেই! মা'র ঠাকুমা তো চাঁপার ঠাকুমার 'সইমা'! একই রকম বুদ্ধি হতে পারে।

হে ঠাকুর, তা হলে কি হবে?

লোকে চাঁপার দিদিমার গল্প শুনে বলে, 'বাবা, এত রাগ?' বলে, অনাছিষ্টি।' বলে, 'মাথার দোষ ছিল বোধ হয়।'

কিন্তু চাঁপার তা মনে হয় না।

চাঁপার ঠাকুমা যদি অমন কাণ্ড করে বসে, চাঁপার মাও নির্ঘাত চাঁপার দিদিমা সত্যবতী দেবীর মতনই করে বসবে।

করবেই! সন্দেহ নাস্তি!

অথচ চাঁপার মা সুবর্ণলতা পাগল-টাগল কিছুই নয়। তা পাগল না হোক, চাঁপা কিন্তু কিছুতেই তার মা'র মতন হবে না। বাপ, রাতদিন যেন মারমুখী! তার থেকে সেজ খুড়ি, ছোট খুড়ি, জেঠি, পিসি সবাই ভাল।

দিদিমা ওইভাবে মাকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়াতেই বোধ হয় মা'র মেজাজ অমন খাপ্পা। সত্যি মা হয়ে তুমি দেখলে না একবার! কী নিষ্ঠুর! চাঁপার মাও ঠিক তাই হবে। তাছাড়া আর কি হবে?...হে ভগবান, ঠাকুমা যেন চাঁপার বিয়ে দিয়ে না বসে!

আগে আগে, যখন চাঁপা ছোট ছিল, মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনেছে, 'সেই ন বছর বয়সে এদের সংসারে এসে পড়েছি, মা বস্তু কী তা ভুলেছি!'

এখন আর বলে না।

সুবর্ণলতার যে কখনো কেউ ছিল, তা আর বোঝা যায় না।

ঠাকুমা যদি লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁপার বিয়ে দিয়ে ফেলেন? তখনও তাহলে বোঝা যাবে না, সুবর্ণলতার একটা চাঁপা নামের মেয়ে ছিল।

আর বাঁধ মানে না।

উথলে উথলে কান্না আসে।

তাড়াতাড়ি পুতুল-বাক্সটা টেনে বার করে খেলতে বসে!

কিন্তু খেলতেও তো সেই পুতুল-বৌয়ের শ্বশুরবাড়ির জ্বালা আর খাটুনি। তাছাড়া আর কী ভাবেই বা খেলা যায়? কিন্তু এখন যেন সব কিছুর মধ্যেই চাঁপা নিজের ছায়া দেখছে।

পুতুলও আকর্ষণ হারালো!

মুক্তকেশীর কাছে ডুকরে গিয়ে পড়লো, 'ঠাকুমা, আমরা আর এখানে থাকব না, বাড়ি চল।'

॥ ১১ ॥

অন্য ভুবন!

সুবর্ণলতার কাছে এ এক আশ্চর্য নতুন ভুবন! অন্য ভুবন! এ ভুবনে শুধু আকাশেই উদার উন্মুক্ত আলো নেই, মানুষগুলোর মধ্যেও রয়েছে সেই আলো, উদার, উন্মুক্ত, উজ্জ্বল!

পাড়ার লোকের কথা জানে না সুবর্ণলতা, জানে না সেখানে আলো না অন্ধকার, সে শুধু এই সংসারটাকেই জানছে। দেখছে আর জানছে।

ভেবে অবাক হয় সুবর্ণ, সুবালাকে বরাবর সবাই 'গরীব' বলে এসেছে। এই সেদিনও ভাসুর গিয়ে বললেন, 'গরীবের সংসার বটে, তবে অমূল্যটা পরিশ্রমী

আছে তো? খেটেপিটে সংসার করে। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, বাগানে ফল-তরকারী, গায়ে-গতরে খেটে সব বজায় রেখেছে। তাতেই চলে যায় একরকম করে।'

চলে যায় একরকম করে!

গরীব!

কিন্তু সুবালা যদি গরীব, তো ঐশ্বর্যবতী কে? হোক আড়ম্বরহীন টানাটানির সংসার, তবু এই সংসারখানির সম্রাজ্ঞী তো ওই সুবালা। এ সংসার পরিচালিত হচ্ছে সুবালার ইচ্ছানুসারে, সুবালার নির্দেশে। শাশুড়ী নির্লিপ্ত কিন্তু নির্মায়িক নয়। যথাসাধ্য খাটেন তিনি, কিন্তু সে খাটুনির বেশির ভাগ ছেলে-বৌ নাতি-নাতনীদের যত্ন পরিচর্যা বাবদ।

সুবালা যদি বলে, 'থাক্ গে বাবা ঠাণ্ডা দুধ—,' ফুলেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'ওমা কেন? জ্বালানির ঘরে অত নারকেলপাতা, আমি একটা বুড়ী বসে রয়েছি, ঠাণ্ডা খাবে কেন? ঠাণ্ডা খেলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় বৌমা।'

সুবালা দিব্যি উত্তর দেয়, 'শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় না হাতী বৃদ্ধি হয়! ও কেবল আপনার নাতি-নাতনীদের সোহাগ করা।'

ফুলেশ্বরী রেগে উঠে যাচ্ছেতাই করেন না, হেসে উঠে বলেন, 'তো তাই! তোমার নাতি-পুতিকেও তুমি করবে সোহাগ!'

'আমার বয়ে গেছে—'

'হুঃ, দেখবো!'

সুবালা স্বচ্ছন্দ গলায় বলে, 'দেখবেন তো সেই স্বর্গে বসে! কী দেখলেন তা নিয়ে কে তর্ক করতে যাবে?'

রাগারাগি নয়, কড়া কথা নয়, সহজ হাস্য-পরিহাস। আশ্চর্য! সুবালার কী সাহস! সুবর্ণলতা তো দুঃসাহসের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এ সাহসের সঙ্গে তুলনা হয়? সুবর্ণলতার সাহস হচ্ছে—তিক্ততার শেষ সীমানায় পৌঁছে তীব্রতায় ফেটে পড়া।

আর সুবালার?

সুবালার সাহস আদরিণীর সাহস, বিজয়িনীর সাহস, প্রশ্রয়ের সাহস। সুবালার শাশুড়ী সুবালার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন, কারণ

সুবর্ণ? দেবররা ভ্রাতৃজায়াদের ব্যাখ্যানা করবে, এটাই তো মুক্তকেশীর বাড়ির নীতি। তারা ব্যঙ্গ করবে, হুল ফোটাবে, নিন্দে করবে, এই তো নিয়ম। কে জানে এ নিয়ম শুধুই মুক্তকেশীর বাড়ির, না আরো অনেক অনেক বাড়ির!

কিন্তু এদের বাড়িতে—?

হ্যাঁ, সুবালার বাড়িতে অন্য নিয়ম।

তাই না অন্য ভুবন!

এই অন্য ভুবনে অম্বিকা তার বৌদির কথায় বলে ওঠে, 'নাও কোথায় তোমার পান্তো-টান্তো আছে বার করো দেখি, পেটকে শান্ত করি। খাণ্ডবদাহন হচ্ছে সেখানে।'

বসে পড়ে নিজেই পিঁড়ি পেতে।

সুবালা পরম যত্নে ভাত বেড়ে দিয়ে বলে, 'ভারী তো ছিরির রান্না, ভাতটা গরম থাকতে খেলে তবু—'

অথচ এ ছাড়া আর কিছু ব্যবস্থা হয়ও না।

ঝি-চাকরের তো পাট নেই, সুবালাকেই বাসন মাজতে হয়, রান্নাঘর নিকোতে হয়, এতক্ষণ অবধি আলাদা গরম ভাতের তম্বির নিয়ে থাকলে সময়ে কুলোয় না।

অম্বিকা বলে, 'ছিরির মানে?...আচ্ছা মেজবৌদি, আপনার কি আপনার ননদের রান্না বিচ্ছিরি লাগে?'

সুবর্ণর হঠাৎ খুব ভালো কোনো কথা যোগায় না, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কী যে বলেন! আমার তো অমৃত মনে হয়।'

হুঁ, দেখুন! আমিও তো তাই বলি, অমৃততুল্য। আহা, যখন জেলের লপসি খেয়ে দিন কাটবে, তখন আপনার ননদিনীর হাতের এই মৌরলা মাছের ঝালের স্মৃতিতে মনটা কেঁদে কেঁদে উঠবে।'

'থামো তো!' সুবালা বকে ওঠে, 'সব সময় জেল জেল করো না।'

'আহা, সইয়ে রাখছি। নচেৎ আচমকা ঘায়ে মূর্ছা-টূর্ছা যাবেন।'

সুবালা বোঝে সব, তবু বলে, 'বলি তুমি কি চোর-ডাকাত, না খুনে গুণ্ডা যে জেলে যাবে?'

'তার থেকে কিছু কমও নয়!'

অম্বিকা কড়াই ডাল মাখা ভাতটা শপ শপ করে মুখে তুলতে তুলতে বলে, 'বরং বেশি। মাতৃভূমিকে "মা" বলা তো গুণ্ডামির অধিক!'

সুবালা বলে, 'এই হল শুরু। মেজবৌ, তুই শোন বসে বসে। তোর মনের মতন প্রসঙ্গ। আমি বরং ততক্ষণ ওই রাবণের গুষ্টির জলপানিগুলো গোছাই।'

সুবর্ণ আহত গলায় বলে, 'ওকি মেজ ঠাকুরঝি, নিজের ছেলেদের ওই সব বলতে আছে?'

সুবালা হেসে হেসে বলে, 'সত্যি কথা বলতে দোষ কি? রাবণের গুষ্টি ছাড়া আর কি? ভগবান এক মনে দিয়েছে, আমি একমনে নিয়েছি, গোনা-গুণতি করি নি। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হতে দেখি আধ কুড়ির কাছাকাছি!'

উঠে চলে যায়।

সত্যিই কাজের তার অবধি নেই।

তাছাড়া সুবর্ণ বসে থাকে বলে স্বস্তি থাকে একটু। বেটাছেলে একা বসে খাচ্ছে, এটা তো আর হতে পারে না।

সুবালা চলে যায়, অম্বিকা সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই একটি মহিলা, একেবারে নির্ভেজাল!'

সুবর্ণ বলে, 'আপনার মত মানুষের ধারে কাছে থাকতে থাকতে আপনিই বিশুদ্ধ হয়ে যায় মানুষ।'

হ্যাঁ, প্রবোধের সন্দেহকে অমূলক করে এইভাবেই একটা অপর পুরুষে বিমোহিত হচ্ছে সুবর্ণ।

রোদে পোড়া রুক্ষ কালো শীর্ণ একটা ছেলে, তবু তাকে দেখলে সুবর্ণর মনটা আহ্লাদে ভরে ওঠে। তাকে অনেক উঁচুস্তরের মানুষ মনে হয়। মনে হয় কী সুন্দর!

প্রশস্তি গাইতে ইচ্ছে করে তার।

অম্বিকা বলে, 'সেরেছে! পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

একদিন হঠাৎ বলে বসলো, 'আচ্ছা, শুনেছি তো আপনার ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আর—মনে করবেন না কিছু, দাদার শ্বশুরবাড়িটিই যখন আপনার শ্বশুরবাড়ি, তখন সেখানেই স্থিতি, তবে এত সুন্দর করে কথা বলতে শিখলেন কেমন করে বলুন তো?'

সুবর্ণ বিমূঢ়ভাবে বলে, 'সুন্দর করে?'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখি। যা কিছুই বলেন, বেশ বিদুষী-বিদুষী লাগে।'

সুবর্ণ হেসে উঠে বলে, 'ওঃ "লাগে"! যেমন পেতলকেও অনেক সময় সোনা-সোনা লাগে।'

অম্বিকা বলে, 'আপনার মত পেতল যদি আমাদের এই সোনার বাংলার ঘরে ঘরে থাকতো, দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, বুঝলেন উদ্ধার হয়ে যেত!'

দেশ উদ্ধার!

ব্যস, এই খাতে এসে পড়ে আবেগের বন্যা।

সুবর্ণর চোখে এসে যায় জল, মুখে ফুটে ওঠে দীপ্তি।

সুবর্ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বসে স্বদেশী ছেলেদের কথা। কী তাদের কার্যকলাপ, কী তাদের পদ্ধতি, কী বা তাদের সাফল্য!

অম্বিকা হাসে।

গলা নামিয়ে বলে, 'এই মেজবৌদি, টিকটিকি পুলিসের মত অত জেরা করবেন না, সব কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দেওয়ালেরও কান আছে।'

সুবর্ণ লজ্জিত হয়।

বলে, 'বড্ড ইচ্ছে করে সব জানি।'

'তার মানে আপনি অনুভব করেন জিনিসটা।' অম্বিকা বলে, 'বুঝতে পারেন পরাধীনতার গ্লানি কি! সেটাই আশ্চর্য করে আমাকে।'

সুবর্ণ উদ্দীপ্ত হয়, বলে, 'আশ্চর্যের কি আছে? পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা মেয়েমানুষরা বুঝবো না তো আর কে বুঝবে? আমরা যে চাকরেরও চাকরানী।'

'রাণী হতে হবে।' অম্বিকা জোর দিয়ে বলে, 'মেয়েদেরও এসে হাত মেলাতে হবে!'

'নেবেন? নেবেন আপনারা?' সুবর্ণ আরো উদ্দীপ্ত হয়, 'মেয়েমানুষকে নিতে রাজী আছেন আপনাদের দলে?'

'দলে!'

অম্বিকা ধীর গলায় বলে, 'বলে কয়ে টিকিট কেটে দলে নেওয়া তো নয় মেজবৌদি, যে আসতে পারবে সে এসেই যাবে। বৃষ্টি যখন পড়ে, হাজার হাজার গাছের একটা পাতাও শুকনো থাকে না, কিন্তু পাতা ধরে ধরে ভেজাতে গেলে ?...দেশ জাগবে, মেয়েদের মধ্যে আসবে সেই প্রবল প্রেরণা, আপনিই দলে এসে পড়বে। করছে বৈকি, অনেক মেয়েই দেশের কাজ করছে—কিন্তু থাক্ এ আলোচনা।'

সুবর্ণ হতাশ গলায় বলে, 'আলোচনাটুকুও যদি করতে নেই তো কি করে এগিয়ে যাবে মেয়েরা ? আমি যদি আজ বলি সে প্রেরণা আছে আমার—'

অম্বিকা আরো আস্তে বলে, 'বুঝতে পারছি। অনুভব করছি আছে. কিন্তু আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার ছেলেমেয়ে রয়েছে—'

সুবর্ণ হতাশ গলায় বলে, 'জানি, জানতাম! আমার যে সব দিক থেকে হাত-পা বাঁধা তা জানি!'

অম্বিকা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর সহসাই হেসে উঠে বলে, 'আপনাকে দলে নিই, আর আমাদের মেজদা পুলিস লেলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করুন। ওনাকে তো দেখেই ভয় করছিল।'

সুবর্ণ ব্যঙ্গহাসি হাসে।

বলে, 'কেন? খুব তো সুকান্তি সুপুরুষ!'

'সে কথা কোনো কাজের কথা নয়', অম্বিকা বলে, 'বাইরে ভেতরে এক, এ আর কজনের হয় ? আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে আছে, তাকে দেখলে মনে হবে দাঁড়কাক, কিন্তু তার ভিতরটা চাঁদের মত সাদা সুন্দর!'

সুবর্ণ খপ্ করে বলে বসে, 'আচ্ছা, আমাকে দেখলে আপনার কী মনে হয় ? বাইরে ভিতরে দু রকম ?'

অম্বিকা মাথা নিচু করে বলে, 'আপনার মত মেয়ে আমি আর দেখি নি মেজবৌদি। শুধু এই ভেবে দুঃখ হয়, আমাদের দেশের কত সম্পদের অপচয় হচ্ছে সর্বদা। আপনি যদি দেশের কাজে আসতে পারতেন—'

সুবর্ণ অভিমানে ফেটে পড়া মুখে বলে, 'ওসব আপনার মৌখিক কথা। এক কথায় তো নাকচ করে দিলাম। যার ছেলেমেয়ে ঘরসংসার আছে, সে একেবারে পতিত হয়ে গেছে, এই তো কথা!'

'এভাবে সাড়া দিতে হলে যে সর্বস্ব পণ করতে হয় মেজবৌদি, সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়।'

'তুমি কি ভাবো—'

আবেগের মাথায় হঠাৎ "তুমি" বলে সুবর্ণ, 'তুমি কি ভাবো মেয়েরা পারে না তা ? আমি এই বলে রাখছি, এই মেয়েদের কাছেই একদিন মাথা হেঁট করতে হবে তোমাদের।...বলতে হবে: "এতদিন যা করেছি অন্যায় করেছি। সত্যিই তোমরা শক্তিরূপিণী"।'

অম্বিকা এবার মাথা তুলে বলে, 'আপনার কথা বেদবাক্য হোক। দেশ যেদিন একথা বলতে পারবে, সেদিন দেশ এই অপমানের কুণ্ডু থেকে ঝেড়ে উঠবে।...সত্যি ভাবুন, কী অপমান, কী অপমান! সমুদ্রের ওপার থেকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এক মুঠো লোক এসে এই এত কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব করছে, তাই দেখছি বসে বসে আমরা আর নিঃশ্বাস ফেলছি। এক-

সঙ্গে সবাই যদি রুখে উঠতে পারতো! মেয়ে বলে নয়, ছেলে বলে নয়, দেশের সন্তান বলে—'

সুবর্ণ আরো ব্যগ্রভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, অমূল্য এসে হাজির হয়। বলে, 'এই হয়েছে তো! জুটেছেন দুটি পাগলে!'

সুবর্ণর তো এখানে এসে খুব বাড় বেড়েছে। অমূল্যর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে সে।

বলে, 'পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ কাজ, তা এই পাগলেরাই করে। যা কিছু বড় ঘটনা ঘটেছে, তার মূল মানুষই হচ্ছে পাগল, বুঝলেন?'

অম্বিকা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়।

অমূল্য হেসে উঠে বলে, 'বুঝলাম!...কিন্তু অম্বু, তুই যেন আবার তোর ওই মহৎ কাজের মধ্যে এই পাগলটিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করিস নি, তাহলে আমার সেই গুন্ডা শালা এসে তোর মাথা ফাটাবে!'

অম্বিকা বোঝে, দাদা তাকে সাবধান করছে। অম্বিকা জানে দাদার তাকে নিয়ে স্বস্তি নেই। তাই মৃদু হেসে বলে, 'সেই কথাই তো বোঝাচ্ছিলাম মেজ-বৌদিকে। তবে দেশের কাজ তো মাত্র একটাই নয়! বাইরে থেকে যেমন এই দুশো বছরের পাপ ধ্বংস করতে হবে, ভেতর থেকে তেমনি আরো অনেক বছরের পাপ ধুয়ে সাফ করতে হবে।...মেয়েদের মধ্যে চেতনা জাগানোও একটা মস্ত কাজ মেজবৌদি। সে চেতনা জাগানো, তাদের বোঝানো কোন্‌টা সম্মান কোন্‌টা অসম্মান। বোঝানো শুধু খেয়ে পরে সুখে থাকাই মানুষের ধর্ম নয়। বোঝানো কেউ খেয়ে উপচে বসে থাকবে আর কেউ না খেয়ে মরবে, এটা ভগবানের নিয়ম নয়। এই পৃথিবীর অন্ন সবাই সমান ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাবে, সবাই পৃথি-বীর সন্তান।'

অমূল্য প্রশংসার গলায় বলে, 'বললি তো ভালো, শুনলাম ভালো, কিন্তু শুনছে কে?'

সুবর্ণও বলে, 'হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি, শুনবে কে? পাথরে কি সাড় আসে?'

'আনতে হবে।' অম্বিকা বলে, 'অসাড় পাথরে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। মাটি-পাথরের বিগ্রহে যেমন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!'

সুবর্ণ আস্তে মাথা নাড়ে।

বলে, 'চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখলে রসাতল, পর্দার মধ্যে জীবন, তারা আবার কাজ করবে! শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই—'

'ঠিক!' অম্বিকা বলে, 'এই জন্যেই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে। আপনি সব বুঝতে পারেন। এই দেখুন, গলদের ঠিক মূলটি বুঝেছেন আপনি। শিক্ষা, সকলের আগে চাই শিক্ষা। এই হতভাগা দেশের সব আছে, নেই খালি চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি এনে দিতে হবে। আমার কোনো সুবিধে নেই, আমার হবে কি করে বললে চলবে না। মাটি কাটতে হয়, পাথর ভাঙতে হয়, তবে তো রাস্তা তৈরি হয়, তবে তো সেই রাস্তা দিয়ে জয়রথ চলে।'

'ঠাকুরপো!' সুবর্ণলতা ব্যাকুল গলায় বলে, 'জানো, একথা আমার মা'র কথা!'

'আপনার মা'র কথা?'

অম্বিকা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

সুবর্ণ তেমনিভাবে বলে, 'হ্যাঁ। মা'র স্মৃতি আমার কাছে ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে, তবু এ কথাটা মনে আছে। মা বলতেন এ কথা। আমি জন্মাবার আগে মা মেয়েদের পাঠশালায় পড়াতে যেতেন।'

'পড়াতে যেতেন! আপনার মা!' অম্বিকা অবাক গলায় বলে, 'তাজ্জব তো! সে তো আরো আগের ব্যাপার। সমাজ আরো কড়া ছিল। তবু নিশ্চয়ই তিনি আরো শক্তিমতী ছিলেন! কতদিন হল মারা গেছেন?'

সুবর্ণ শিউরে ওঠে।

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি বলে, 'মারা যান নি। আছেন, কাশীতে থাকেন।— আমার মায়ের কথা বলবো আপনাকে। আপনিই পারবেন বুঝতে।'

অম্বিকা ধীরে বলে, 'বুঝেছি, এই মন আপনি কোথায় পেলেন ভেবে অবাক হতাম, এখন বুঝতে পারছি!'

অমূল্য বুদ্ধিমান।

অমূল্য সমাজ-সংসারের জীব।

অমূল্য তার এই 'স্বদেশী' ভাইটার জন্যে সর্বদাই চিন্তিত। তাই দুজনের এই বিমুগ্ধ ভাবটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। সন্দেহ নেই এই মুগ্ধতা অতি পবিত্র, অতি নির্মল, তথাপি এ থেকেও বিপদ আসতে পারে। আসা অসম্ভব নয়। সুবর্ণ 'স্বদেশী' করে ক্ষেপে উঠলেই তো সর্বনাশ। সুবর্ণ তার বাড়ির অতিথি।

সুবর্ণ সম্পর্কে তাকে বেশি অবহিত হতে হবে।

তাই অমূল্য বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, মেজবৌদির মা অন্য ধরনের ছিলেন। আমিও জানি কিছু কিছু, বলবো পরে। মা ভাল না হলে কি আর "ছা" ভাল হয়? কিন্তু বসে বসে গল্প করছিস, আজ তোর কাজ নেই?'

'নাঃ, আজ বেরুব না। আজ শরীরটা একটু ইয়ে আছে।'

অমূল্য আর একটু বাঁধ দেয়।

অন্তত ভাবে, বাঁধ দিচ্ছি।

বলে, 'তবে আর কি, কোটরে বসে পদ্য লিখ গে।'

কিন্তু ফল বিপরীত হয়।

এই উল্টো বাঁধে উপচে ওঠে নদীস্রোত। 'পদ্য! কবিতা লেখেন আপনি?' চমকে ওঠে সুবর্ণ।

'আপনি নয়, আপনি নয়, একটু আগে তুমি বলেছেন—'

'ওমা, কখন আবার?'

'বলেছেন। অজ্ঞাতসারে। তবে সেটাই বহাল থাক।'

'আচ্ছা থাক্ তাই। আমি তো বড়ই। কিন্তু কথা চাপা দিচ্ছ তুমি! তুমি কবিতা লেখ? কই বল নি তো?'

অম্বিকা হেসে ওঠে, 'মাইকেলের থেকে সামান্য কম, তাই আর বলি নি! দাদার যেমন কাণ্ড, কবিতা লেখে!'

অমূল্য বলে, 'আহা, কেন? লিখিস তো বাপু সেই ছেলেবেলা থেকে। বুঝলেন মেজবৌদি, বারো-তেরো বছরের ছেলে, দেশমাতা নিয়ে ইহা বড় এক পদ্য!...তা আপনার ননদিনী তাঁর গুরুদেব দ্যাওরটির গুণগরিমার কথা সব বলেন নি? তোলা আছে বোধ হয় সে পদ্য আপনার ননদের কাছে। দেখবেন?'

'আমি সব কবিতা দেখবো। ঠাকুরপো, তোমার কবিতার খাতা দেখাতে হবে।'

'খাতা!'

অম্বিকা হেসে ওঠে।

'খাতা কোথায় পাবো? ছেঁড়া কাগজের ফালি হচ্ছে আমার ভাবের বাহন। হাতের কাছে যখন যা পেলাম!'

'তা তাই দেখবো।'

'কে তুলে রেখেছে!'

'দেখো, তুমি আমায় ঠকাচ্ছো। বেশ তো, নতুন একটা লেখো।'

'এই সেরেছে! দাদা, বুঝতে পারছো? বিশ্বাস করছেন না আমার বিদ্যে। হাতে হাতে প্রমাণ চান।'

'মোটেই না। আমি শুধু দেখতে চাই।'

'তবে তো লিখতেই হয়—', অম্বিকা হেসে ওঠে, 'দাদা আবার মাতালকে মদের বোতলের কথা মনে পড়িয়ে দিলেন!'

অমূল্য বলে, 'তবে যা, ঘরে বসে মাতাল হগে যা। চললাম আমি। ভীষণ কাজ।'

দুজনকে বিভোর হয়ে গল্প করতে দিতে অস্বস্তি বোধ করে অমূল্য পাড়ার লোকের চোখের জন্যে। চোখগুলি তো ভাল নয়। সুবালার মত সরল আর ক'জন আছে?

ভাইকে এই ইঙ্গিতটা দিয়ে কাজে চলে যায় অমূল্য।

অনুমান করতে পারে না, খাল কেটে কুমীর এনে গেল।

অনুমান করতে পারল না, ইঙ্গিতের মর্ম বুঝবে না এরা। তার পাগলী শালাজ অম্বিকার সেই 'কোটরে' গিয়ে উঠবে কবিতা হাতড়াতে!

॥ ২০ ॥

চাঁপার ধারণা ভুল ছিল না।

বড় মেয়ে মল্লিকাকে স্রেফ ঘুষ দিয়েই নিজের দিকে টেনে এনেছিল উমাশশী। পুরো আস্ত একটা টাকাই ঘুষ দিয়ে বসেছিল। ঝুটি-বাঁধা মহারাণী মার্কা এই টাকাটি কবে থেকে যেন তোলা ছিল লুকানো একটি কৌটোয়, সেটি দেখিয়েছিল মেয়েকে।

ভীরু ভীরু গোপন অনুরোধ।

'চল না আমার সঙ্গে, দিয়ে দেব এটা।'

মল্লিকার লুব্ধ দৃষ্টি জ্বলে উঠেছিল বটে, তবু সে বেজার মুখে বলেছিল, 'আহা, তোমার সঙ্গে যাই আর তোমার ছেলে বইতে বইতে প্রাণ যাক আমার!'

বলেছিল।

বলে দিব্যি পার পেয়েও ছিল।

সাধে কি আর চাঁপা আড়ালে বলে, 'আমি যদি জেঠিমার মেয়ে হতাম,

হাজারগুণ ভালো হত আমার।'

চাঁপার জেঠিমা এ-হেন অপমানেও জ্বলে ওঠে না, বরং আরো মিনতির গলায় বলে, 'ওখানে গিয়ে ছেলে বইতে হবে কেন রে? ওখানে কি আমাকে হেঁসেল সামলাতে হবে? শরৎদির বাড়িতে কত ঠাকুর চাকর লোকজন!'

ঠাকুর চাকর লোকজন সমৃদ্ধ সেই বড়লোক মাসতুতো মাসীর বাড়ির লোভনীয় আকর্ষণে আর একবার মনটা টলে মল্লিকার, তবু অটল ভাব দেখায়, 'লোকজন তো লোকজন, তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে ঠাকুমা তোমার গলা টিপে দেবে না?'

নিয়ে যেতে চাইলে!

উমাশশী শিউরে বলে, 'আমি চাইবো কি বল্? তুই বলবি যে মন-কেমন করছে!'

'আহা রে! লোকে যেন বিশ্বাস করবে!'

এবার উমাশশীর চোখের কোণে জলের আভাস দেখা দেয়, 'লোকে বিশ্বাস করবে না? মা-ভাই-বোনেদের জন্যে মন কেমন করাটা অবিশ্বাসের?'

মল্লিকা ঈষৎ অপ্রতিভ হয়।

বলে, 'আর চাঁপি? চাঁপিকে যে তাহলে একলা যেতে হবে! চাঁপি আমার গায়ে ধুলো দেবে না?'

উমাশশী অতঃপর চাঁপির সম্পর্কে ঠাকুমার একদেশদর্শিতার উল্লেখ করতে বাধ্য হয়। বলে, 'চাঁপাকে তো মা বুকে করে রাখবেন। যত টান তো ওর ওপরেই, দেখিস না? তোর অভাব ও টেরই পাবে না।'

চাঁপা সম্পর্কে যে মুক্তকেশীর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, সে কথা এরা সকলেই জানে, কিন্তু এমন স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা হয় না কোনো দিন। উমা-শশী নিরুপায় হয়েই আজ সে আলোচনা করে। এক-একটা দিনের উদাহরণ দেখায়, যে উদাহরণে চাঁপা-মল্লিকার ঝগড়া মেটাতে মুক্তকেশী মল্লিকাকে ধমক এবং চাঁপাকে পয়সা দিয়েছেন, এমন বর্ণনা আছে।

ঝগড়া?

তা হয় বৈকি দুজনের।

ভাবও যত, ঝগড়াও তত।

তা সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মেয়েকে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছিল উমাশশী এবং একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা দিয়েছিল।

ব্যাণ্ডেলে মাসতুতো দিদি শরৎশশীর বাড়িতে। যে সে দিদি নয়, দারোগা-গিন্নী।

কিন্তু দশটা ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রায় অপরিচিত মাসতুতো ভগ্নীপতির সংসারে এল কি বলে উমাশশী? সুবোধই বা পাঠালো কোন্ লজ্জায়?

তা জীবনমরণের কাছে আবার লজ্জা!

তাছাড়া—আপাতত উমাশশীর মা সুখদা বোনঝির বাড়িতেই বাস কর-ছিলেন। অতএব মা যেখানে ছাঁ সেখানে।

শরৎশশী অবশ্য হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করেছে মাসীর মেয়েকে এবং তার বাহিনীকে। কারণ নিজের তার ষষ্ঠীর কৃপা নেই। অথচ ঘরে মা-লক্ষ্মী উথলে পড়ছেন। এই উথলে ওঠা চেহারা আত্মজনকে দেখাতে পারাও তো একটা পরম সুখ।

অবশ্য উমাশশীর ওপর একটু অভিমান তার ছিল, কারণ উমাশশীর যখন এ বছর আর বছর হচ্ছে, আর নিজে সে বন্ধ্যাই এ সত্য স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, তখন ও মাসীর মারফৎ প্রস্তাব করেছিল, 'উমি'র একটা ছেলেকে দত্তক দিতে।

উমাশশী রাজী হয় নি।

উমাশশী বলেছিল, 'এ প্রস্তাব শুনলে আমার শাশুড়ী আমায় বঁটি দিয়ে দুখানা করবেন।'

সুখদা বার বার বলেছেন, 'তা ভাবছিস কেন? লক্ষ্মীর ঘরে ছেলেটা সুখে থাকবে, রাজার হালে কাটাবে—'

'তুমি বল তবে শাশুড়ীকে।'

'আমি কেন বলে দোষের ভাগী হতে যাব বাবা! তোর শাউড়ী বলবে, দুঃখী মাগী হয়তো বোনঝির কাছে ঘুষ খেয়ে বলছে!'

অতএব প্রস্তাবটা হয় নি।

শরৎশশী তখন চিঠি লিখেছিল।

বলেছিল, 'পাকাপাকি দত্তক না দিস, মানুষ করতে দে আমায় একটিকে। তোর পাঁচটি আছে, আমার ঘর শূন্য।'

উমাশশী শিউরে উঠে 'ষাট ষাট' করেছিল এবং মা'র কাছে কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'শাশুড়ী হয়তো রাজী হবেন, আমিই পারবো না মা। যার কথা ভাবছি, তার জন্যেই বুক ফেটে যাচ্ছে।'

সুখদা বিরক্ত হয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'বুক তো ফাটছে, কিন্তু কি সুখেই বা রাখতে পেরেছ ছেলে-পেলেকে? নেহাৎ মোটা চালের মধ্যেই আছে। অথচ শরতের পুষ্যি হলে—'

'তা হোক, পারবো না মা। গেরস্ত ছেলে, গেরস্ত হয়েই থাক।'

ভগ্নদূতের বার্তা সুখদাকেই বহন করতে হয়েছিল এবং মেয়ের দুর্মতিতে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি বোনঝির কাছে। তদবধি শরৎশশী উমাশশীর প্রতি ক্ষুণ্ণ। অথচ 'মা ছেলে ছাড়ল না' এটাকে ঠিক অপরাধ বলেও ভাবতে পারে নি। তবে যোগাযোগও রাখে নি। এবারে যখন মান খুইয়ে নিজেই এল উমাশশী, খুশিই হল শরৎশশী।

বললো, 'তবু ভালো যে দিদি বলে মনে পড়লো!'

তারপর খাওয়ামাখা আদরযত্নের স্রোত বহালো।...সুখদা আড়ালে মেয়েকে বলেন, 'দেখছিস তো সংসার! তখন বুঝলি না, আখের খোয়ালি। এখন ওর মন বদলে গেছে। বলে, "ভগবান না দিলে কার সাধ্যি পায়!" তবে-' ফিস-ফিস করেন সুখদা, 'নজরে ধরাতে পারলে, মেয়ের বিয়েতেও কিছু সুরাহা হতে পারে।'

এসব প্রসঙ্গ অস্বস্তিকর।

কিন্তু তদপেক্ষা অস্বস্তিকর জামাইবাবু করালীকান্তর পেশাটা।

পুরুষমানুষ সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে স্নানাহার সেরে 'আপিস' কাছারী যায়, সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফেরে এই উমাশশীর জানা, মেজ দ্যাওর ব্যবসা না কি করে বটে, তবু তারও আসা-যাওয়া সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ কী?

না আছে আসা-যাওয়ার ঠিক, না আছে নাওয়া-খাওয়ার ঠিক। অর্ধেক দিন তো বাড়া-ভাত পড়েই থাকতে দেখা যায়, খাওয়াই হয় না। এসে বলে, অসময়ে আর ভাত খাব না, দুখানা লুচি দাও বরং।'

তখন আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যায় লুচি রে আলুর দম রে করতে।

আর শুধুই কি দিনের বেলা?

হঠাৎ হঠাৎ রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে দেখে আলো জ্বলছে, চাকর-বাকর ছুটোছুটি করছে, শরৎদি হাতে হাতে জিনিস নিয়ে ঘুরছে, আর জামাইবাবু পুলিসী ধড়াচুড়ো আঁটছেন।

চুপিচুপি দেখে, জামাইবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন, একটা লালমুখো ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন ঝিমঝিম করা নিকষ অন্ধকারের মধ্যে।

দেখেশুনে উমাশশীর হাত-পা ঝিমঝিম করে আসে। খামোকা উঠে নিজের ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে হাত দিয়ে দেখে, হয়তো বা গোনে। যেন হঠাৎ দেখবে একটা কম!

বুকটা ছমছম্ করতে থাকে কি এক আশঙ্কায়।

কেন যে এমন হয়!

এমনিতে তো জামাইবাবু দিব্যি রসিক পুরুষ। 'শালী শালী' করে ঠাট্টা-তামাশাও করেন। মন ভাল থাকলে ডাক-হাঁক করেন, 'ওহে বিরহিণী, গেলে কোথায়? একলা বসে শ্রীমুখচন্দ্র ধ্যান করছো বুঝি?'

কথা শুনে লজ্জায় মরতে হয়।

ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে।

কিন্তু মন যখন ভাল থাকে না জামাইবাবুর?

তখন কী রুক্ষ! মুখে কী কটু কুৎসিত ভাষা! চাকরদের গালাগাল দেওয়া শুনলে তো কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। শরৎশশীও বাদ যায় না, তাকেও কাঁদিয়ে ছাড়েন। তাছাড়া এক-এক সময়, বিশেষ করে রাতের দিকে সহসাই যেন বাড়ির হাওয়া বদলে যায়, বাইরে বৈঠকখানায় নানারকম সব লোক আসে, দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা হয়, কী যেন গোপন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে, জামাইবাবু বাড়ির মধ্যে আসেন যান, স্ত্রীর সঙ্গে চাপা গলায় কী যেন কথা বলেন, হয়তো সেই লোকগুলোর সঙ্গেই বেরিয়ে যান, কোন্ রাত্তিরে যে ফেরেন, টেরই পায় না উমাশশী।

দিদি না খেয়ে বসে থাকলো, না খেলো কে জানে!

এমন গোলমেলে সংসার ভাল লাগে না উমাশশীর। মনেই যদি স্বস্তি না থাকলো তো কী লাভ রাশি রাশি টাকায়, ভাল ভাল খাওয়া-পরায়!

সেই কথাই একদিন বলে বসে উমা।

আর বলে মল্লিকার মুখে একটা কথা শুনে। মল্লিকা নাকি দেখেছে মেসোমশাই বাগানের ওধারে একটা লোককে মুখ বেঁধে চাবুক মেরে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছেন। আর সে নাকি চোর-ডাকাতের মতন মোটেই নয়, ভদ্রলোকের ছেলের মতন দেখতে।

উমাশশী বলে বসে, 'যাই বল দিদি, ও তোমার গেরস্তাবলী চাকরিবাকরিই ভাল। টাকা গয়না কম থাকলেই বা কি, মনে শান্তি থাকে। জামাইবাবুর কাজটা বাপু ভাল নয়।'

সুখদা চমকে যান।

আড়চোখে বোনঝির মুখের দিকে তাকান, দেখেন সেখানে দপ্ করে আগুন উঠেছে জ্বলে।

হয়তো কথাটা বড় আঁতে-ঘা-লাগা বলেই।

হয়তো নিজেও শরৎশশী অহরহ ওই কথাই ভাবে। ধু-ধু মরুভূমির মত জীবনের স্তব্ধ বালুভূমিতে যখন টাকার স্তূপ এসে পড়ে, তখন সে টাকাকে যে বিষের মতই লাগে তার।

বাড়িতে গোয়ালভর্তি গরু, রাশি রাশি দুধের ক্ষীর ছানা মিষ্টি খাবার তৈরি করে শরৎশশী, যদি তার দুটো খায় তো দশটা বিলোয়। কোথা থেকে কে জানে বড় বড় মাছ এসে পড়ে উঠোনে, কাটলে যজ্ঞি হয়, সেই মাছ চাকর-বাকরে খায় তিন ভাগ। কারণ পাড়ার লোককেও সর্বদা দিতে অস্বস্তি বোধ হয়।

বাগানের ফল আসে ঝুড়ি ঝুড়ি, আম কাঁঠাল কলা পেঁপে, এটা সেটা। এখন উমাশশী রয়েছে তাই আদর হচ্ছে সেই ফলেদের, নচেৎ তো ফেলাফেলি!

শরৎশশীর গায়ে এবং বাক্সে গহনার পাহাড়। কিন্তু সুখ কোথায় তার? বরের মাইনে জানতে না পারলেও, উমাশশীর বরের মাইনের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়, এ জ্ঞান শরতের আছে। তবে? কিসের টাকায় এত লপচপানি করালী-কান্তর?

উপরি আয়েই তো!

আর দারোগার উপরি আয় কোন্ ধর্মপথ ধরে আসে?

ভিতরে জ্বালা আছে শরৎশশীর।

তদুপরি জ্বালা আছে স্বামীর চরিত্র নিয়ে। কিন্তু সেসব তো প্রকাশের বস্তু নয়! উমাকে আর তার ছেলেমেয়েকে খাইয়ে-মাখিয়ে দিয়েথুয়ে চোখ ধাঁধিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল, হঠাৎ দেখতে পেল নির্বোধ উমারও চোখ ফুটেছে। কিসে শান্তি, কিসে সুখ, সেটা ধরে ফেলেছে।

অতএব শরৎশশীর চোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক।

শরৎশশী সে আগুন চাপা দিতেও চেষ্টা করে না। বলে ওঠে, 'জামাই-বাবুর কাজটা ভাল নয়? ও! তবে ভালটা কার? চোর ডাকাত খুনে গুন্ডা-দের? ওলো, এই "খারাপ কাজ" করা লোকগুলো আছে বলেই এখনো রাজ্য চলছে, বুঝলি? নচেৎ অরাজক হয়ে উঠতো।'

ভীতু উমাশশী ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়, শিউরে উঠে বলে, 'তা বলি নি দিদি। বলছি জামাইবাবুর পক্ষে ভাল নয়। সময়ে নাওয়া-খাওয়া নেই, দিনে-রাতে জিরেন নেই, সদাই ভয়-ভয়—'

হঠাৎ নিজেকে সংবরণ করে নেয় উমা, অলক্ষ্যে মা'র কাছে চিমটি খেয়ে।

চিমটির সাহায্যে সতর্ক করে দিয়ে সুখদা নিজেই হাল ধরেন।

না ধরে করবেন কি?

বলতে গেলে শরৎশশীর সাহায্যেই মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বছরে দু-চার মাস তো থাকেনই তার কাছে, তাছাড়া বাকী সময়টা যেখানেই থাকুন, হাতখরচটা এখান থেকেই যায়!

নেহাৎ নাকি বদলির চাকরি করালীকান্তর, তাই এক নাগাড়ে থাকা হয় না। ব্যান্ডেলে বদলি হয়ে এসে পর্যন্ত আছেন। এখানে যত বড় কোয়ার্টার, তত বড় বাগান, তত লোকজনের সুবিধে, এলাহি কান্ড! এর অধিকারিণীকে চটাবেন? হাল অতএব ধরতেই হয়।

ধরেন, বলে ওঠেন, 'আগে কি এমন ভয়তরাস ছিল? না এত খাটুনীই ছিল? সোজাসুজি চুরিডাকাতি খুনখারাপি হতো, সোজাসুজি ব্যবস্থা ছিল। পোড়ারমুখো স্বদেশী ছোঁড়াগুলো যে উৎপাত করে মারছে। গুলি বারুদ তৈরি

করে ব্রিটিশ রাজত্ব উড়িয়ে দেবে! ভদ্দরঘরের ছেলে হয়ে ডাকাতি করবে! এইসব জ্বালাতেই বাছার নাওয়া-খাওয়া নেই। লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াদের না হয় মা-বাপ নেই, পুলিস বেচারাদের তো ঘরে বৌ ছেলে আছে!'

'স্বদেশী, স্বদেশী', এই শব্দটা অনবরতই কানে আসে বটে উমাশশীর, কিন্তু স্বদেশী ছোঁড়াদের গুণাগুণ কি, তাদের কার্যকলাপ কি. তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় নি কোনদিন. তাই আজ একটু থতমত খায়।

ভয়ে ভয়ে বলে, 'রাগ কোর না শরৎদি, এত কথা তো জানি না। তাই

'না, রাগের কি আছে?' শরৎশশী উদাস গলায় বলে, 'আগেকার আমলে চোরের পরিবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো বর কখন ধরা পড়ে, আর এখন পুলিসের পরিবারকে সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়. বর কখন মারা পড়ে, এই আর কি! কাজটা ভাল নয়, একপক্ষে বলেছিসই ঠিক।' নিঃশ্বাস ফেলে শরৎশশী। হয়তো উমার কুণ্ঠা লজ্জা ভয় দেখে মায়া হয়, তাই আগুনটা সামলে নেয়, বলে, প্রাণ হাতে করে থাকা! এই যে রাত-বিরেতে বেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ, যাচ্ছে তো সাপের গর্তে হাত দিতে, বাঘের গুহা খোঁচাতে! ফিরবে তার নিশ্চয়তা আছে? তবু বুক বেঁধে থাকতেই হবে. কর্তব্য করতেই হবে। ইংরেজের রাজত্বটা তো লোপাট হতে দেওয়া চলে না!'

সুখদা ফোড়ন কেটে ওঠেন, 'কার অন্ন খাচ্ছিস? কার হাতে ধনপ্রাণ? তা ছোঁড়ারা ভাবছে না গো। কই. পারছিস গোরাদের সঙ্গে? শয়ে শয়ে তো জেলে যাচ্ছিস. পুলিসের লাঠিতে মুখে রক্ত উঠে মরছিস, তবু হায়া নেই!'

রক্ত ওঠার কথায় শিউরে ওঠে উমা। আস্তে বলে, 'জামাইবাবুর হাতে ধরা পড়েছে কেউ?'

'পড়ে নি?' শরৎশশী দৃপ্ত গলায় বলে, 'গাদা-গাদা! তোর জামাইবাবু বলে, "আমি গন্ধ পাই। সমুদ্দুরের তলায় লুকিয়ে থাকলেও টেনে বার করতে পারি"।'

উমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

জামাইবাবুর কর্মদক্ষতায় খুব বেশি উৎসাহ বোধ করে না। হলেই বা স্বদেশী ছোঁড়া, মা-বাপের ছেলে তো বটে। আর এই সূত্রে তার মেজ জায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

'স্বদেশী' শব্দটার ওপর যার প্রাণভরা ভক্তি।

অথচ আসলে ওই শব্দটা যে ঠিক কি তাই ভাল করে জানে না উমা।

মানুষ?

না জিনিস?

নাকি কোনো কাজ?

কে জানে! ঠিক ধরা যায় না!

মেজ বৌকে জিজ্ঞেস করতেও ভয় করেছে। ওসব কথায় এমন চড়ে ওঠে, এমন বিচলিত হয়, দেখলে ভয় করে। উমা ভাবে, থাক্ গে, জেনেই বা কি হবে? আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি?

কিন্তু এখানে এসে জামাইবাবুর কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, একটু বুঝি জানা-বোঝা ভালো। তাহলে এমন অন্ধকারে থাকতে হয় না। বুঝতে পারা যায়, কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য!

সুখদা সগৌরবে বলেন 'শুনলি তো?'

সুখদার কথায় শরৎশশী সচেতন হয়। বলে, 'থাক মাসী ওসব কথা। দেশের সর্বনাশ যে আসন্ন তা বোঝাই যাচ্ছে। গোরারা একবার ক্ষেপলে কি আর রক্ষে থাকবে! তবে যারা কর্তব্যনিষ্ঠ, যারা বৃটিশের নেমক খাচ্ছে, তারা মরবে তবু নেমকহারামী করবে না, এই হচ্ছে সার কথা। তাতে প্রাণ চলে যায় যাক।'

কিন্তু এইটাই কি শরৎশশীর প্রাণের কথা? নাকি সে শাক দিয়ে মাছ ঢাকে? কথা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখে! ওই নির্বোধ উমাটা একেই 'দশমাতা' হয়ে অহঙ্কারে মরছে, তার পর যদি টের পায়, শরৎশশীর যা কিছু চাকচিক্য সবই ভুয়ো, যা কিছু আলো জোনাকির আলো, তা হলে আর রইলো কি?

তা যতই শরৎশশী তার ভাগ্যকে আড়াল করুক, ছোট ছেলেমেয়েগুলোর চোখ এড়ায় না। তারা মহোৎসাহে খবর সন্ধান করতে থাকে।

তারা টের পেয়ে যায় মেসোমশাই যাদের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কন, তারা হচ্ছে গোয়েন্দা, যেখানে যেখানে ওই স্বদেশী গুণ্ডারা লুকিয়ে আছে সেখানের সন্ধান এনে দেয় ওরা। মেসোমশাই তখন ছোটেন সেখানে। সেই ছেলেদের চাবুক মারতে মারতে পিঠের ছাল তোলেন, লাথি মারতে মারতে পেট ফাটান, ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরেন।

ভীষণ একটা উত্তেজনা অনুভব করে ওরা। নেহাৎ ছোট পাঁচটাকে বাদ দিলেও, বাকি কজন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আর সেই সূত্রে পাকা মেয়ে টেঁপি একটা প্রখর সত্য দাদা-দিদিদের সামনে ধরে দেয়।

'মেজখুড়ি যদি টের পায় আমরা পুলিসের বাড়িতে আছি, মেজখুড়ি আর ছোঁবে না আমাদের। কথাই কইবে না।'

চমকে যায় তার দাদা-দিদিরা।

বলে, 'তাই তো রে, টেঁপি তো ঠিক বলেছে!'

'বাঃ, আমরা বুঝি ইচ্ছে করে পুলিসের বাড়িতে আছি?' বললো একজন।

আর একজন চিন্তিতভাবে বলে, 'তা বললে কি হবে, মেজখুড়ির রাগ জানিস তো। তার ওপর আবার শুধু পুলিস নয়, স্বদেশী মারা পুলিস!'

মেজখুড়ি রাগ করলো তো বয়ে গেল, এ কথা ওরা ভাবতেই পারে না। মেজখুড়ির অপ্রসন্নতা, সে বড় ভয়ঙ্কর দুঃখবহ।

অবশেষে ওরা ঠিক করে, বলা চলবে না। দরকার কি রাগিয়ে মেজ-খুড়িকে!

মল্লিকা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'মা'র জন্যেই এইটি হল আমার। চাঁপির সঙ্গে ঠাকুমার সঙ্গে চলে যেতাম চুকে যেত। তখন বললো, ছেলে সামলাতে হবে না রে—' মা'র ভঙ্গীর অনুকরণ করে মল্লিকা, 'আমাকে তো আর হেঁসেল সামলাতে হবে না ওখানে—, এখন দেখছিস তো? রাতদিন কাঁথা বদলা, ন্যাতা কেচে আন, দুধ খাইয়ে দে! কেনই যে এতগুলো ছেলে-মেয়ে হয় মানুষের? ছোট খুড়ির বেশ! শুধু বুদো—ব্যাস!'

হঠাৎ মল্লিকার ভাই গৌর হেসে বলে ওঠে, 'তাহলে তো তোকে আর জন্মাতেই হোত না। শুধু আমি, ব্যাস্! তুই নিতাই, রামু, টেঁপি, টগর, ফুটি পাঁচকে খোকা, খুকী, সব্বাই পড়ে থাকতো ভাগবানের ঘরে।'

এটা অবশ্য খুব একটা মনঃপুত হল না মল্লিকার। মল্লিকা জন্মায় নি,

সেটা আবার কেমন পৃথিবী!

অনেক আলোচনান্তে অবশেষে কিন্তু স্থির হয় মেজখুড়ির কাছে কিছুই গোপন করা চলবে না, কারণ মেজখুড়ি পেটের ভেতরকার কথা টের পায়। স্পষ্টই তো বলে, 'আমার একটা দিব্যচক্ষু আছে, বুঝলি! তোরা কে কি লুকোচ্ছিস সব বুঝতে পারি।' মিথ্যে কথায় বড় ঘেন্না মেজখুড়ির, অতএব বলা হবে। তবে এটাও জোর করে বোঝাতে হবে, তাদের কী দোষ? তারা তো ইচ্ছে করে মাসীর বাড়ি বেড়াতে আসে নি?

হঠাৎ একসময় শরৎশশীর নজরে পড়ে, সব কটায় মিলে কি যেন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসে ভুরু কুঁচকে বলে, 'কি করছিস রে তোরা?'

ওরা অবশ্য চুপ।

শরৎশশী বিস্মিত হয়, বার বার প্রশ্ন করে এবং সহসাই বিশ্বাসঘাতক টেঁপি বলে ওঠে, 'মেসোমশাই পুলিস তো, সেই কথাই হচ্ছে—'

দাদা-দিদিদের সব ইশারা ব্যর্থ হয়।

চিমটি কাটা বিফলে যায়।

শরৎশশী যখন কঠিন গলায় বলে, 'পুলিস তো কি হয়েছে!' তখন টেঁপি বলে ওঠে, 'স্বদেশীমারা পুলিস খুব বিচ্ছিরি তো। মেজখুড়ি যদি শোনে আমরা এ বাড়িতে আছি, তাহলে আর ঘেন্নায় ছোঁবে না আমাদের, তাই মেজখুড়িকে বলা হবে না—'

'মেজখুড়ি!'

শরৎশশী শুধু এইটুকুই বলতে পারে।

টেঁপি মহোৎসাহে বলে, 'হ্যাঁ, মেজখুড়ি যে স্বদেশীভক্ত! জানো না? পুলিসকে ঘেন্না করে, সাহেবকে ঘেন্না করে।'

শরৎশশী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সহসাই কঠোর গলায় বলে ওঠে, 'বেশ, তবে থাকতে হবে না পুলিসের বাড়ি, চলে যা নিজেদের ভাল বাড়িতে। আজই যা!'

॥ ২১ ॥

স্বাধীনতা পরাধীনতা নিয়ে যে যেখানে মাথা ঘামাক, সত্যিকার স্বাধীনতা যদি কেউ পেয়ে থাকে তো পেয়েছে সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা পিসির বাড়ি এসে।

রাতদিন অনেকগুলো রক্তচক্ষুর তলায় থাকতে থাকতে ওরা জানতো না মুক্তির স্বাদ কি, স্বচ্ছন্দচারণের সুখ কি? কারণে-অকারণে হঠাৎ আচমকা কেউ ধমকে উঠবে, এমন আশঙ্কা নিয়েই তাদের জীবন।

বিশেষ করে সেজকাকা!

ছেলেপুলেকে একবার একটু হুড়োহুড়ি করতে দেখলে বা একবার তাদের একটু হেসে উঠতে শুনলেই তিনি সেই ছেলেপুলের পেটের পিলে চমকে দিয়ে হাঁক দেবেন, 'কে ওখানে? শুনে যা এদিকে!'

ব্যস, তাতেই এমন কাঁপুনি ধরে যায় যে এদিকে আসবার ক্ষমতা আর

থাকে না। অতএব সেই না আসার অপরাধেই 'বিরাশী সিক্কা', 'মোগলাই গাঁট্টা', 'রামচিমটি, শ্যামচিমটি' ইত্যাদি করে অনেক কিছুরই স্বাদ পেতে হয়।

সুবর্ণলতা তার ছেলেদের মারে না বলেই বোধ করি সুবর্ণলতার ছেলেদের মারবার জন্যে এত হাত নিসপিস করে সেজকাকার।

মা ঠেঙায় না ছেলেদের, এমন মেমসাহেবীয়ানা অসহ্য বলেই হয়তো সেজকাকা মায়ের সেই মেমসাহেবীয়ানার শোধ নেন।

ভাগ্নের গায়ে হাত তুলতে না হয় হাত কাঁপে, ভাইপোর গায়ে হাত তোলায় তো সে আশঙ্কা নেই!

সেই আবহাওয়া থেকে এসে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কাদা, মাটি, খড়, বাঁশ, পাতা লতা নিয়ে যতরকম খেলা তা সব খেলছে। পিসতুতো ভাই-বোনেরা সঙ্গী।

কিন্তু আসল মজা হচ্ছে, এখানে এসে অবধি শুধু পিসতুতো দাদা-দিদিরাই নয়, আরো একজন তাদের খেলার মহোৎসাহী সঙ্গী। তিনি হচ্ছেন মা।

হ্যাঁ, মা!

সুবর্ণলতা তার বয়েস এবং পদমর্যাদার ভার ফেলে সমবয়সীত্বে নেমে আসে, রীতিমত যোগ দেয় খেলায়। যেমন ছেলেরা উঠোনের মাঝখানে দুদিকে দুটো পুকুর কেটে মাঝখানে একটা সাঁকো বানাবে, অথচ জুৎ করতে পারছে না, কঞ্চি আর বাঁখারি নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সুবর্ণলতা এসে পড়ে এবং বসে পড়ে একগাল হেসে বলে ওঠে, 'আমায় যদি তোদের খেলায় নিস তো আমি করে দিতে পারি।'

মাকে 'নেওয়া না-নেওয়া' আবার একটা কথা নাকি? ছেলেরা কৃতার্থমন্য হয়ে বলে ওঠে, 'তুমি আসবে?'

'বললাম তো, যদি নিস!'

'নেবো নেবো, এসো তুমি খেলতে।'

অতঃপর নেমেই আসে সুবর্ণলতা, নেমে আসে শিশুর খেলাঘরে। তোড়-জোড় দেখে কে।

'এই, একটা বাঁশ নিয়ে আয় দিকিন!...এই, একটা বড় দেখে গাছের ডাল নিয়ে আয় দিকি!...এই চারটি বুনো ফুলের চারা আনতে পারিস? আলাদা একটু বাগান করবো!'

এমন সব ফরমাশ করে সুবর্ণলতা, আর সেই আদেশ পালন করে ধন্য হয় ছেলেরা।

মা একমুখ হাসছেন।

মা সহজ হালকা স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন। এর থেকে আনন্দের আর কি আছে!

তা আজও সেই আনন্দ দিতে এল সুবর্ণলতা।

ওরা কৃতার্থমন্য হয়ে এগিয়ে আসে।

সুবর্ণলতা বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'খেলবো তোদের সঙ্গে। কিন্তু একটা শর্তে!'

সুবর্ণলতার মুখটা আলো-আলো দেখায়।

তারপর মাটি মাখতে মাখতে আসল কথাটি বলে সুবর্ণলতা, 'আমায় তোদের অম্বিকাকাকুর বাড়িতে একবার নিয়ে যাবি?'

'অম্বিকাকাকুর বাড়ি!

পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে হেসে ওঠে।

'অম্বিকাকাকুর বাড়ি! সে তো ওই—ওইটা। ওখানে আবার নিয়ে যাওয়া কি?'

অর্থাৎ ওটা আবার একটা নিয়ে যাবার জায়গা নাকি!

সুবর্ণলতাও কি তা জানে না?

তবু সুবর্ণলতা তার ছেলের সাহায্য প্রার্থনা করে।

একা ফট্ করে যেতে পারে না তো, শুধু একটা পুরুষ ছেলের নির্জন ঘরে যাওয়া!

ছেলে একটা সঙ্গে থাকাই ভাল।

তাই কৌতুক-কৌতুক মুখ করে নিয়ে বলে, 'তা জানি রে বাপু, তবু চল না। মানে খেলার শেষে!'

আজকের খেলা একটা সত্যিকার 'বাড়ি' তৈরি। গতকাল অনেক মাটি মেখে ছোট ছোট চৌকো চৌকো ইঁট তৈরি করে রেখেছিল, আজ সেইগুলো জুড়ে জুড়ে সত্যিকার পাকা বাড়ি করা হবে।

প্ল্যান!

সে তো মাথাতেই আছে।

ছোট ছোট সেই ইঁটগুলো রোদে ভাজা ভাজা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সুবর্ণলতা সেগুলি নাড়তে নাড়তে বলে, 'এই ঠিক কাজ করছিস। ইঁট তৈরি করে নিয়ে তবে বাড়ি বানানো খুব ভাল। মজবুত হয়। কারণ শুধু কাদার দেওয়াল নেতিয়ে পড়ে!'

তারপর ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে দেওয়াল তুলে দেয় সুবর্ণ ওদের। তৈরি হয় শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঠাকুরঘর।

ভানু পুলকিত গলায় বলে, 'মা!'

'কী রে?'

'তুমি আর-জন্মে বোধ হয় মিস্ত্রি ছিলে!'

সুবর্ণ হেসে ওঠে, 'তা ছিলাম হয়তো।'

তারপর সুবর্ণ কাদামাটির হাত ধুতে ধুতে বলে, 'এইবার তবে চল্!'

'চলো।'

অকৃতজ্ঞ ভানু অনিচ্ছা-মন্থর গতিতে চলে। এইমাত্র মা তাদের বাক্যদণ্ড করিয়ে নিয়েছে তাই, নচেৎ কে চায় এই খেলা ফেলে অম্বিকাকাকার বাড়ি যেতে! যে অম্বিকাকাকাকে নিত্য দেখতে পাওয়া যায়!

তবু চলে।

সুবর্ণলতাও যায়।

সুবর্ণলতার বুকটা দুরদুর করে, মনটা ভয়-ভয়, উত্তেজিত-উত্তেজিত। যেন বিরাট এক অভিযানে বেরিয়েছে সে।

কবিতার সন্ধানে অম্বিকার বাড়িতে এসে হাজির সুবর্ণলতা।

সংসারজ্ঞানহীন অম্বিকাও কিঞ্চিৎ বিপন্ন না হয়ে পারে না। এতটা সেও আশা করে নি। বারেবারেই তাই বলতে থাকে, 'কী মুশকিল, বলুন তো! আপনি নিজে এলেন, হুকুম হলে গন্ধমাদন পর্বতটাই বয়ে নিয়ে যেতাম!'

তারপর হেসে ফেলে বলে, 'অবশ্য তারপর নিশ্চয়ই হতাশ হতেন। বিশল্য-করণীর চিহ্ন খুঁজে পেতেন না।'

কিন্তু কি পেত আর না পেত সেকথা ভাবতে বসছে না সুবর্ণলতা। সুবর্ণলতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে আর দুরন্ত আবেগে একটা ধূলিধূসরিত সেল্‌ফের মধ্যে রাখা প্রায় জঞ্জালসদৃশ্য কাগজের স্তূপ হাতড়াচ্ছে।

প্রকাণ্ড সেল্‌ফটার তাকে তাকে 'নেই' হেন জিনিস নেই। খবরের কাগজের কাটিঙের ফাইল, ইংরিজি-বাংলা নানা পত্রিকার সম্ভার, গোছাগোছা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, ক্যালেণ্ডার, হ্যাণ্ডবিল, চিঠিপত্রের রাশি, কী নয়! এর মধ্যে থেকে কবিতা উদ্ধার করতে হবে। তাও খাতায় নয়, খুচরো কাগজে লেখা।

সুবর্ণলতা সব উল্টোতে থাকে।

অম্বিকা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'দেখছেন তো কী অবস্থা! সৃষ্টির আদি থেকে ধুলো জমে চলেছে। পর পর কেবল চাপানোই হয়, নামানো তো হয় না কোনো-দিন!'

'পদ্য-টদ্য এই জঙ্গলের মধ্যে রাখো কেন?' ক্ষুব্ধ আবেগে বলে সুবর্ণ-লতা।

'পদ্যই' বলে। 'কবিতা' বলতে হয়, বললে ভাল শোনায়, অত খেয়াল করে না!

অম্বিকা হেসে বলে, '"রাখি না" তো, "ফেলি"। কোনো কিছু ফেলার পক্ষে জঙ্গলই শ্রেষ্ঠ জায়গা।'

অম্বিকাদের এই বাড়িটি জ্ঞাতিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড় বাড়ির ভগ্নাংশ নয়, ছোট্ট একটু একতলা, সম্পূর্ণ আলাদা। অম্বিকার বাবা জ্ঞাতিদের থেকে পৃথক হয়ে আম-জাম-কাঁঠালের বাগানের ধারে এই ছোট বাড়িখানি করিয়ে-ছিলেন। অম্বিকার মা বেঁচে থাকতে ছবির মত রাখতেন বাড়িটিকে, রাখতেন ধূলিমালিন্য শূন্য করে। কিন্তু ছেলের ঘরের এই সেল্‌ফটিতে হাত দেওয়ার জো ছিল না তাঁর। হাত দিলেই নাকি অম্বিকার রাজ্য রসাতলে যেত।

এখন সারা বাড়িতেই ধুলো।

সুবালা অথবা তার মেয়েরা এক-আধদিন এসে ঝাড়ামোছা করে দিয়ে যায়, অম্বিকা বকাবকি এবং ঝাঁটা কাড়াকাড়ি করে, ব্যাস!

কিন্তু সুবর্ণর তো ধুলোর দিকে দৃষ্টি নেই। সে ধুলোর আড়াল থেকে মাণিক খুঁজছে।

আরো সেই খোঁজার সূত্রে পেয়ে যাচ্ছে অনেক মণিরত্ন। কত বই, কত পত্রিকা! ইস্, ভাগ্যিস এল সুবর্ণ এখানে!

'ঠাকুরপো, এত বই তোমার? কই বল নি তো?'

অম্বিকা অপ্রতিভ হাস্যে বলে, 'বই দেখে এত খুশী হবেন, জানি না তো।'

'জানো না, বাঃ।' সুবর্ণ বলে ওঠে, 'আমি কিন্তু এগুলো সব পড়বো। রয়েছি তো এখনো, পড়ে নেব তার মধ্যে।'

অম্বিকা হাসে, 'পড়লে তো বেঁচে যায় ওরা। ধুলোর কবরের মধ্যে পড়ে আছে, উদ্ধার হয় তার থেকে।'

সুবর্ণ দীপ্ত প্রসন্নমুখে বই বাছতে থাকে, এবং বেছে বেছে প্রায় গন্ধ-মাদনই করে তোলে। আলো-জ্বলা মুখে বলে, 'এই আলাদা করা থাকলো, কিছু কিছু করে নিয়ে যাব, আবার পড়ে পড়ে রেখে যাবো।'

অম্বিকা বলে, 'জিনিসগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে বলতে লজ্জা করছে, রেখে না গেলেও ক্ষতি নেই, নিয়েই রাখতে পারেন। রাখলে ওই মলাট-ছেঁড়া ধুলোমাখা কাগজপত্রগুলো কৃতার্থ হয়ে যায়।'

সুবর্ণ এবার হাসিমুখে বলে, 'অতয় কাজ নেই, একবার পড়তে পেলেই বর্তে যাই। এতদিন রয়েছি, জানি কি ছাই! জানলে তো রোজ এসে হানা দিতাম। উঃ, আজও যাই ভাগ্যিস এসেছিলাম!'

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুবর্ণলতার চোখমুখ সর্বাবয়ব।

অম্বিকা সুবর্ণলতার মা সত্যবতীকে দেখে নি। দেখে নি, তাই সহসা অনুভব করতে পারে না এই আলোর উৎস কোথায়!

অম্বিকা অবাক হয়।

অম্বিকা বোধ করি অপ্রতিভও হয়।

যেন সুবর্ণলতা যে এতদিন টের পায় নি অম্বিকার ঘরের সেলফে চারটি মলাট-ছেঁড়া সেলাই-ঢিলে পত্রিকা আছে, সেটা অম্বিকারই ত্রুটি। সেই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে বলে, 'আমারই উচিত ছিল আপনাকে দিয়ে আসা-'

সুবর্ণলতা সরল আনন্দে হেসে ওঠে।

'ওমা! তুমি কী করে জানবে যে তোমাদের মেজবৌদি এমন বই-হ্যাংলা! কিন্তু তা তো হলো, যার জন্যে এলাম তার কি! তোমার পদ্যের খাতা কোথায়?

'কী মুশকিল! বললাম তো, খাতাটাতা নেই, কদাচ কখনো প্রাণে জাগলো কিছু, হাতের কাছে যা পেলাম তাতেই লিখলাম, তারপর কোথায় হারিয়ে গেল!'

'কখনো না, তুমি ঠকাচ্ছ।'

'আরে না, বিশ্বাস করুন।'

অম্বিকা হাসে, 'এই যে তার সাক্ষী—'

হঠাৎ বালিশের তলা থেকে টেনে বার করে কয়েক টুকরো বালির কাগজ। হেসে হেসে বলে, 'কাল রাত্রে হচ্ছিল খানিকটা কবিত্ব।'

'কই দেখি দেখি—'

সুবর্ণ পুলকিত মুখে হাত পাতে।

অম্বিকা চৌকির ওপর রাখে।

হেসে বলে, 'যা হস্তাক্ষর, তার ওপর আবার কাটাকুটি—'

সুবর্ণ অবশ্য ততক্ষণে টেনে নিয়ে দেখেছে এবং হস্তাক্ষর সম্পর্কে যে অম্বিকা "অতি বিনয়" করে নি তা অনুভব করেছে। তাই কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'বেশ, তবে তুমিই পড়।'

সুবর্ণলতা অবোধ বৈকি।

প্রস্তাবটা যে অশোভন, অসামাজিক, এ জ্ঞান হয় না কেন তার? হলেই বা পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মা, তবু বয়েস যে তার আজো ত্রিশেও পেঁছয় নি, এ খেয়াল নেই? একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবাপুরুষের একক গৃহে এসে বসে তার মুখে কবিতা শুনতে চাওয়ার কথা উচ্চারণ করলো সে কী বলে?

আর অম্বিকা!

সেও কি বাংলার গ্রামের ছেলে নয়?

হয়তো এ একটা নতুন উত্তেজনা বলেই লোভটা সামলাতে পারছে না। তা

লোভই। লেখে সে ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু তার কবিতা সম্পর্কে কে কবে আগ্রহ দেখিয়েছে! কে কবে এমন আলোভরা উৎসুক মুখ নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে 'শোনাও' বলে!

তাছাড়া আর পাঁচজনের থেকে তফাত বৈকি অম্বিকা। তার পরিমণ্ডলে একটা নির্মল পবিত্রতা, তার অন্তরে একটা অসঙ্কোচ সরলতা। তার কাছ সুবালা এবং সুবর্ণলতা একই পর্যায়ের গুরুজন। সুবালার প্রতিও তার যেমন একটি সশ্রদ্ধ ভালবাসা, সুবর্ণর প্রতিও তেমনি একটি সশ্রদ্ধ প্রীতি।

তাই সেই খুচরো কাগজ কটা গুছিয়ে নিতে নিতে হেসে বলে, 'শুনে বুঝবেন বৃথা সময় নষ্ট। এটা হচ্ছে দেশের এখনকার এই পরিস্থিতি নিয়ে—'

'মা!' ভানু ডেকে ওঠে। 'আমি যাই!'

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে।

ভানু যে এখনো এখানেই ছিল তা খেয়ালই ছিল না। বই দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিল।

এখন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে বলে, 'কেন, চলে যাবি কেন? অম্বিকাকাকার লেখা পদ্য শোন্ না!'

'পদ্য' সম্বন্ধে ভানু যে বিশেষ উৎসাহী, ভানুর মুখ দেখে তা মনে হল না। বললো, 'আমাকে ওরা দেরি করতে বারণ করেছে।'

'কেন, তুই আবার কী রাজকার্য করে দিবি ওদের?'

'এমনি।'

হঠাৎ সুবর্ণলতা ছেলের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তৎপর হয়। 'লেখাপড়া তো সব শিকেয় উঠেছে, কর এবার! এরপর যেতে হবে না ইস্কুলে?'

অম্বিকা হেসে ওঠে, 'না, আপনি বড় সাংঘাতিক! একে বেচারাকে জোর করে কবিতা গেলাবার প্রস্তাব, তার উপর আবার পড়ার কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া। যেতে দিন ওকে। চলুন বরং ও-বাড়ি গিয়েই পড়া যাক। আমার লাজলজ্জার বালাই নেই। দিব্যি ছাত ফাটাবো!'

অম্বিকা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই সুবর্ণলতার সঙ্কোচ বোঝে, তাই ও-বাড়ির কথা তোলে।

কিন্তু সুবর্ণ সহসা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ছি ছি, কী মনে করলো অম্বিকা ঠাকুরপো!

মনে করলো তো, সুবর্ণ একা তার ঘরে বসতে ভয় পাচ্ছে, অস্বস্তি পাচ্ছে।

ছি ছি!

সুবর্ণলতা সেই অস্বস্তিকে কাটালো।

সুবর্ণলতা দৃঢ় হলো।

বলে উঠল, 'না না, আবার এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি। পড় তুমি।...এই মুখ্যুটা, যা তুই, পিসি জিজ্ঞেস করলে বলিস, আমি এখানে আছি।'

সুবর্ণ বলেছিল, 'বলিস আমি এখানেই আছি।' কিন্তু সত্যিই কি তা ছিল সে?

না, আর এক জগতে এসে পড়েছিল!

তা মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল বটে।

'আর এক জগতের—!
অম্বিকা পড়ছিল।

'ওই শোনো শোনো সাড়া জাগিয়াছে
কালের ঘূর্ণিপথে—
ভাঙনের গান গেয়ে ছুটে আর
মরণের জয়রথে।
ওই দেখ, কারা আসে দলে দলে,
দেশজননীর পূজাবেদীতলে,
অক্লেশে প্রাণ করে বলিদান
হোমের আহুতি হতে।
তাই স্বারে স্বারে ডাক দিয়ে যাই
চল চল ছুটে চল—
কে ওরা ভাঙিছে বন্দিনী মা'র
চরণের শৃঙ্খল।
ওদের সঙ্গে দে মিলায়ে হাত,
বৃথা পশ্চাতে কর আঁখিপাত,
বাঁধিবে কি তোরে শিশুর হাস্য,
প্রিয়ার অশ্রুজল?
এখনো না যদি ভাঙিতে পারিস—'

পড়তে পড়তে থেমে যায় অম্বিকা। কুণ্ঠা-কুণ্ঠা হাসি হেসে বলে, 'দূর, নিশ্চয় আপনার ভাল লাগছে না—'

ভাল লাগছে না!

সুবর্ণ উত্তেজিত গলায় বলে, 'ভাল লাগছে না মানে? কে বলেছে ভাল লাগছে না? পড়ো—পড়ে যাও। যে লাইনটা পড়লে, আবার ওইটা থেকে পড়ে যাও।'

অম্বিকার অস্বস্তি হচ্ছিল।

অম্বিকার নিজের মন যতই উদার আর নির্মল হোক, পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে। অনাত্মীয় তো দূরের কথা, নিকট-আত্মীয় পুরুষের ঘরেও এমন একা বসে গল্প করলে যে মেয়ের ভাগ্যে ভর্ৎসনা জোটে, তার নামে নিন্দে রটে, তা তার জানা।

তার ওপর আবার কবিতা শোনা!

তবু সুবর্ণর ঐ আবেগ-আবিষ্ট ভাল লাগার মুখটা বেশ একটা নতুন আনন্দের স্বাদ এনে দিচ্ছে। সত্যি এমন করে এমন একটা আগ্রহ-উৎসুক মনের সামনে কবে অম্বিকা নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পেরেছে?

তাছাড়া অস্বস্তি যেমন ওদিকে, তেমনি এদিকেও। অম্বিকার অস্বস্তি ভাবটা যদি মেজবৌদির চোখে ধরা পড়ে যায়! তাতেও লজ্জার সীমা নেই। উনি স্ত্রীলোক হয়ে সাহস করে বসে রইলেন, আর অম্বিকা—

দূর, উনি কত বড় গুরুজন, ওঁর কাছে আবার—

অতএব আবার গলা ঝেড়ে শুরু করে দেয় অম্বিকা,

'এখনো না যদি ভাঙিতে পারিস,
কখনো কি হবে আর?

লৌহনিগড় গড়িবে আবার
প্রবলের অনাচার।
মরণকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে এসে,
নতশিরে কি করে ফিরে যাবি শেষে?
মস্তকে বহি কাঁটার মুকুট
ললাটে অন্ধকার!
বিশ্বজগৎ টিটকারি দেবে
ধিক্কৃত উপহাসে,
যষ্টি-আহত পশুর সমান
কাপুরুষ ক্রীতদাসে।
ভাবী তনয়ের ললাটে কি ফের—
দিয়ে যাবি এই কলঙ্ক-জের—

এই সেরেছে!'

অম্বিকা হাতের কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। বিপন্নমুখে বলে, 'এর পরের পৃষ্ঠাটা আবার কোথায় গেল?'

'নেই!'

সুবর্ণ চমকে ওঠে।

আশাভঙ্গের উত্তেজনায় বলে, 'কি করে রাখো কাগজপত্র! কি করলে ছাই! রয়েছে তো কাগজ তোমার হাতে—'

অম্বিকা অপ্রতিভ মুখে বলে, 'এটা শেষ পৃষ্ঠা। মাঝখানটা একটা টুকরো কাগজে ছিল—'

আশ্চর্য! সুবর্ণর মনে আসে না, সুবর্ণ অম্বিকার অভিভাবক নয়। মনে আসে না, ওকে তিরস্কার করবার তার অধিকার আছে কিনা। প্রায় অভিভাবকের ভঙ্গীতেই ক্রুদ্ধ তিরস্কার করে ওঠে, 'ধন্যি ছেলে! অমন ভাল জিনিসটা হারিয়ে ফেললে?'

অম্বিকা অপরাধী-অপরাধী ভাবে বালিশের তলায় হাত বুলোয়, তোষক উল্টে দেখে। সুবর্ণও চৌকির তলায় উঁকি মারে হেঁট হয়ে, তারপর বিফলমনোরথ হয়ে বলে, 'নাঃ! সে নির্ঘাত হাওয়ায় উড়ে বনেজঙ্গলে চলে গেছে। মুখস্থ নেই?'

অম্বিকা কুণ্ঠিত হাসি হাসে, 'নাঃ! এই তো মাত্র কাল রাত্রে লিখেছি—'

'যাক গে, শেষটাই পড়। এত ভাল লাগছিল!'

অম্বিকা আবার পরের পাতাটায় চোখ ফেলে। বোধ করি নিজের ওই মুখস্থ না থাকার জন্যে মরমে মরে। সেই কুণ্ঠিত গলাতেই পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—

'কালিমাখা মুখে পৃথিবীর বুকে
টিঁকে থেকে কিবা ফল,
অকারণ শুধু ধ্বংস করিতে
ধরার অমঙ্গল?
ক্ষুদ্র ক্ষতির হিসাব কষিয়া,
যে মাটি আগুলি রহিবি বসিয়া—
দাবিদাওয়াহীন সে মাটির ঋণ

শোধ দিবি কিসে বল?
নাড়া দিয়ে ভাঙ্ পুরনো দেওয়াল,
কতকাল রবে খাড়া?
শাসন রক্ত-ভ্রূকুটির তলে
মাথা তুলে আজ দাঁড়া!
বীরদাপে যারা করে অন্যায়,
তারা যেন আজ ভাল জেনে যায়,
বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ লাগি,
মাটিতেও জাগে সাড়া!'

'অম্বিকা ঠাকুরপো!'

সহসা যেন একটা আর্তধ্বনি করে ওঠে সুবর্ণলতা। কী ভাগ্যি অম্বিকার হাতটাই চেপে ধরে নি!

'অম্বিকা ঠাকুরপো, ওইখানটা আর একবার পড়ো তো—'

অম্বিকা বিস্মিত হয়।

অম্বিকা বিচলিত হয়।

তাকিয়ে দেখে সুবর্ণর মুখে আগুনের আভা, সুবর্ণর চোখে জল।

আশ্চর্য তো!

মানুষটা এত আবেগপ্রবণ?

একটু যেন ভয়-ভয় করছে।

'কই পড়ো?'

সুবর্ণর কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা, 'এ তো শুধু এই পরাধীন দেশের কথাই নয়। এ যে আমাদের মতন চিরপরাধীন মেয়েদের কথাও। কী করে লিখলে তুমি? পড়ো, পড়ো আর একবার—'

অম্বিকা যেন বিপন্ন গলায় আর একবার পড়ে—

'নাড়া দিয়ে ভাঙ্ পুরোনো দেওয়াল—
কতকাল রবে খাড়া?
শাসন রক্ত-ভ্রূকুটির তলে
মাথা তুলে আজ দাঁড়া!
বীরদাপে যারা করে অন্যায়,
তারা যেন আজ—'

নাঃ, সুবর্ণলতার আজকের দিনটা বুঝি একটা অদ্ভুত উল্টোপাল্টা দিয়ে গড়া!

ভালো আর মন্দ!

আলো আর ছায়া!

পদ্ম আর পঙ্ক!

তা নইলে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে?

যখন সুবর্ণলতা মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা পরপুরুষের মুখের দিকে, যখন সুবর্ণর মুখে আলোর আভাস আর চোখে জল এবং যখন এই অনাসৃষ্টি দৃশ্যের ধারে-কাছে কেউ নেই, তখন কিনা সে দৃশ্যের দর্শক হবার জন্যে দরজায় এসে দাঁড়ায় সুবর্ণলতার চিরবাতিকগ্রস্ত স্বামী! যে নাকি এযাবৎকাল আপন চিত্তের আগুনেই জ্বলে-পুড়ে খাক্ হলো!

সেই জ্বলে-পুড়ে-মরা মানুষের সামনে জ্বলন্ত দৃশ্য!

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

থিয়েটারি ঢঙে বলে উঠেছে, 'বাঃ বাঃ—কেয়াবাৎ! এই তো চাই!'

'পুরনো দেওয়াল' অটুট রইল, 'বিষবৃক্ষে'র পাতাটি মাত্র খসলো না, 'মাটির সাড়া' মাটির মধ্যেই স্থির হয়ে রইল, সুবর্ণ তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি হঠাৎ? চাঁপা ভালো আছে তো?'

হ্যাঁ, যে মুহূর্তে আচমকা দরজায় প্রবোধের মূর্তিটা ফুটে উঠেছিল, সেই চকিত মুহূর্তটুকুতে চাঁপার কথাটাই মনে এসেছিল সুবর্ণলতার।

হঠাৎ ও কেন এমন বিনা খবরে—?

চাঁপার কোনো রোগবালাই হয় নি তো?

কিন্তু সেই চকিত চিন্তার পরমুহূর্তেই দূর হয়ে গেল সে আশঙ্কা। তেমন হলে ঐ থিয়েটারি ঢঙে 'কেয়াবাৎ'টা হতো না নিশ্চয়। এ আর কিছু নয়, গোয়েন্দাগিরি!

ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো মাথা, সারা শরীরের মধ্যে বয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ, তবু ফেটে পড়তে পারা গেল না। সামলে নিতে হলো নিজেকে। মাথায় কাপড় টেনে উদ্বিগ্ন গলায় বলতে হলো, 'তুমি যে হঠাৎ? চাঁপা ভালো আছে তো?'

বিদ্যুৎপ্রবাহকে সংহত করতে শক্তিক্ষয় হচ্ছে বৈকি, তবু উপায় কি? ঐ সভ্য ভদ্র উদার ছেলেটার সামনে তো আর সুবর্ণ তার স্বামীর স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করতে পারে না, তাদের ভিতরের দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ!

কিন্তু সুবর্ণর শক্তিক্ষয়ে কি রক্ষা হলো কিছু?

সুবর্ণর স্বামী কি মহোল্লাসে নিজের গায়ে কাদা মাখল না? নিজের মুখে চুন-কালি?

মাটিতে মিশিয়ে দিল না সুবর্ণর সমস্ত সম্ভ্রম? দিল। সুবর্ণর জীবনের সমস্ত দৈন্য উদ্ঘাটিত করে দিল সুবর্ণর স্বামী। বলে উঠলো, 'চাঁপা? ওসব নাম মনে আছে তোমার এখনো? আশ্চর্য্যি তো!—চাঁপার খবর জানি না, তবে চাঁপার মা যে খুব ভালো আছে, তা প্রত্যক্ষ করছি। বাঃ! চমৎকার! সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে, সাপ আর স্ত্রীলোক এই দুইকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।'

সুবর্ণ হঠাৎ অদ্ভুত রকমের শান্ত হয়ে যায়।

শান্ত-শান্ত ভাবেই হেসে ওঠে। হেসে উঠে বলে, 'শাস্ত্রে বলে বুঝি? দেখছো অম্বিকা ঠাকুরপো, আমার স্বামীর কী শাস্ত্রজ্ঞান! তা বলেছ ঠিকই, ভালই আছি। খুব ভাল আছি। তোমার এই বোনের দেশ থেকে যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না—'

'যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না!' প্রবোধ নিমপাতা গেলা গলায় বলে, 'তা অনিচ্ছে তো হবেই, এখানে যখন এত মধু!...কী মশাই, আপনিই না আমার বোনাইয়ের সেই "দেশোদ্ধারী" ভাই? তা দেশোদ্ধারের পথটা দেখছি ভালই বেছে নিয়েছেন! নির্জনে পরস্ত্রীর সঙ্গে রসালাপ—'

'আঃ মেজদা, কী বলছেন যা তা—', অম্বিকা যেন ধমক দিয়ে ওঠে, 'ছোট কথা বলবেন না। ছোট কথা আর কারো ক্ষতি করে না, নিজেকেই ছোট করে!'

মেজদা! ধমক!

প্রবোধ একটু থতমত খায়, কারণ প্রবোধ এই উল্টো ধমকের জন্যে প্রস্তুত

ছিল না। তবে থতমত খাওয়াটা তো প্রকাশ করা চলে না, তাই সামলে নেয়। তবে গলায় আগের জোর ফোটে না।

ফিকে ফিকে গলায় বলে, 'ছোট! হুঁ, আমরা ক্ষুদ্র মনিষ্যি, আমাদের আবার ছোট হওয়া!'

'ক্ষুদ্রই বা ভাববেন কেন নিজেকে?' অম্বিকা ধীর গলায় বলে, 'নিজেকে ক্ষুদ্রও ভাবতে নেই, অধমও ভাবতে নেই। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বিকাশ!'

ওঃ, লম্বাচওড়া কথা! উপদেশ! গুরু এসেছেন! প্রবোধ এবার নিজ মূর্তিতে ফেরে। বলে, 'ওঃ, নিরালায় ঈশ্বরসাধনাই হচ্ছিল তা হলে? আমি এসে ব্যাঘাত ঘটালাম! কী আর বলবো, আপনি কুটুমের ছেলে, বোনাইয়ের ভাই, আপনার অপমান তার অপমান। তাই পার পেয়ে গেলেন। এ অন্য কেউ হলে তাকে জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলতাম। আর এই যে বড় সাধের "মেজবৌদি"! চল তুমি, তোমাকে আমি দেখে নিচ্ছি গিয়ে। অবাক কান্ড! একঘর ছেলেপিলে, বয়সের গাছপাথর নেই, তবু কুবাসনা ঘোচে না? তবু ইচ্ছে করে পরপুরুষের দিকে তাকাই? যাক্, তার জন্যে ভাবি না। মেয়েমানুষকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।'

অবাক কথা বৈকি, তবু সুবর্ণ ফেটে পড়ে না। বরং প্রায় হেসেই বলে, 'জানো নাকি? তা তবু তো শায়েস্তা করে উঠতে পারলে না আজ অবধি।.. নাও চলো, এখন দেখ শায়েস্তা করে শূলে দেবে কি ফাঁসি দেবে! এই ভালমানুষ ছেলেটাকে আর ভয় পাইয়ে দেব না বাপু, পালাই।...অম্বিকা ঠাকুরপো, ওই পদ্যটা কিন্তু আমার চাই ভাই। একটু কষ্ট করে ওর একটা নকল করে দিও আমায়।'

তা প্রবোধ দেবতা নয়!

রক্তমাংসের মানুষ সে।

অতএব গোড়ার জিনিস ঐ রক্তটাই তার টগবগিয়ে ফুটে ওঠে স্ত্রীর ঐ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের দাহে।

সুবর্ণ যদি ভয় পেত, যদি গুটিয়েসুটিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো, আর ঐ পাজী লক্কা ছেলেটা যদি প্রবোধকে দেখে বেত-খাওয়া-কুকুরের মত ঘাড় নিচু করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো, তা হলে হয়তো প্রবোধ এত ফেটে পড়তো না।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকটা হলো না।

হলো একটা অভাবিত বিপরীত।

ছোঁড়াটা এলো বড় বড় কথা কয়ে উপদেশ দিতে, আর সুবর্ণ কিনা স্বামীকেই ব্যঙ্গ করলো!

অতএব প্রবোধও ফেটে পড়লো।

উগ্রমূর্তিতে বলে উঠলো, 'শূল কেন, ফাঁসি কেন? পায়ে জুতো নেই আমার? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার মতন বেহায়া মেয়েমানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না! বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো বলছি! এতদিন পরে স্বামী এলো, ধড়ফড়িয়ে উঠে আসবে, তা না, পরপুরুষের বিছানায় বসে বসে স্বামীকে মস্করা! আর তুমি শালা—'

তা অনেক সামলেছে নিজেকে প্রবোধ। স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে নি, এবং শালা শব্দটা উচ্চারণ করেই থেমে গেছে।

সুবর্ণ এবার উঠে আসে।

কেমন একটা অবিচলিত ভাবেই আসে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এর পরও সেই পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়। বলে, 'মিথ্যে তোমরা দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছো অম্বিকা ঠাকুরপো। দেশকে আগে পাপমুক্ত করবার চেষ্টা করো।...এই মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না এই অপমানের নরককুণ্ডু থেকে উদ্ধার করতে পারবে, ততদিন সব চেষ্টাই ভস্মে ঘি ঢালা হবে।'

প্রবোধের সঙ্গে এসেছিল সুবালার ছোট ছেলেটা। তাকেই বলেছিল সুবালা, 'এই যা যা, ছুটে যা, তোর মেজমামীকে ডেকে নিয়ে আয়, অম্বিকা কাকার বাড়িতে আছে বোধ হয়।'

প্রবোধ সেই মাত্র খুলে রাখা জুতোটা আবার পায়ে গলিয়ে বলেছিল, 'চল, আমিও যাচ্ছি!'

সুবালা প্রমাদ গনেছিল।

সুবালা তার মেজদাকে অনেকদিন না দেখলেও একেবারে চেনে না তা তো নয়! তাই বলে উঠেছিল, 'তুমি আবার কি করতে যাবে গো? এই তেতে-পুড়ে এলে, তুমি বোসো, হাতমুখ ধোও, ও যাবে আর আসবে! তুমি ততক্ষণ একটু মিছরির পানা খাও—'

প্রবোধ বোনের এই সহৃদয় আতিথ্যের আহ্বানে কর্ণপাত করে নি। গট গট করে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেটাকে 'চল্' বলে একটা হুমকি দিয়ে।

সুবালা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মেজদার পিছু পিছু গেলে যে ভাল হতো, সেটা তখন মনে পড়ে নি তার।

মনে পড়িয়ে দিলেন ফুলেশ্বরী। বললেন, 'তুমিও গেলে পারতে বৌমা, মনে হচ্ছে মেজ ছেলে একটু রাগী মানুষ—'

'একটু রাগী?' সুবালাও রেগে ওঠে, বলে, 'আজন্মের গোঁয়ার! বৌটাকে কি তিলার্ধ স্বস্তি দেয়! রাতদিন সন্দেহ, ওই বুঝি বৌ মন্দ হলো! তার ওপর আবার—মেজবৌই বা মরতে একা মেয়েমানুষ পদ্য শুনতে ওর ঘরে গেল কেন ছাই, তাও জানি না।'

'পদ্য শুনতে!'

'হ্যাঁগো, বললো তো তাই কানু। "মা অম্বিকা কাকার বাড়ি আছে পিসি, পদ্য শুনবে!" পদ্যটদ্য লেখে তো ঠাকুরপো, আর মেজবৌও তেমনি পাগল! জানিস যখন বর ওইরকম—'

ফুলেশ্বরী আস্তে বলেন, 'সংসারে এই পাগলদেরই সবচেয়ে বিপদ বৌমা! সুবর্ণর মতন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। কিন্তু সবাই তো ওকে বুঝবে না। একা বেটাছেলের বাড়িতে যেতে নিন্দে, এ বোধই নেই ওর, গঙ্গাজলে ধোওয়া মন ওর।'

'তা তো ধোওয়া! এখন জানি না কি খোয়ার হয়। যা আগুন হয়ে গেল মেজদা!'

'তাতেই বলছিলাম, তুমি সঙ্গে গেলে পারতে!'

'তাই দেখছি। কিন্তু এখন আবার গেলে—'

'তা হোক বৌমা, তুমি যাও। রাগের মাথায় যদি ছেলে সুবর্ণকে একটা চড়া কথা বলে বসেন, ভারী লজ্জার কথা হবে। অম্বু আমাদের আপন, ওদের

তো কুটুম!'

'তবে যাই। উনুনে যে আবার দুধ বসানো।'

'দুধ আমি দেখছি। তুমি যাও। আমার মন নিচ্ছে দাদা তোমায় বকাবকি করবে।'

সুবালা অতএব দাওয়া থেকে নামে।

আর মনে মনে ভাবে, মেজদার এই দুম্ করে আসাটাই ফন্দির। জানি তো সন্দেহবাতিক মানুষ। আর মজা দেখ, কোনদিন মেজবৌয়ের এ খেয়াল হয় না, মরতে ছাই আজই! মেজদাকে বলিহারি! অমন পরিবার, মর্ম বুঝল না। বুঝবে কি, 'মর্ম' বস্তু নিজের থাকলে তো!

দ্রুত এগোতে থাকে সুবালা।

হয়তো সুবালা ঠিক সময় পৌঁছতে পারলে ব্যাপার 'সমে' আসতো। হয়তো সুবালাই গিয়ে বলে উঠতো—'কী জ্বালা! মেজবৌ, তুই এখানে বসে বসে পদ্য শুনছিস? আর মেজদা যে ইদিকে মন-কেমনের জ্বালায় ছুটেপুটে চলে এসে তোকে না দেখে বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখছে!'

হয়তো 'যা হোক' করে কেটে যেত ফাঁড়া।

কিন্তু কাটবার নয়, তাই কাটল না।

সুবালা বেরিয়ে দু'পা যেতেই ওদের রাখালটা কাঁদো কাঁদো হয়ে ধরলো, 'অ মা, মুংলির বাছুরটা পেলে গেছে—'

'পালিয়ে গেছে!'

'হি' গো মা! ক্যাতো খুঁজনু—' বলে বিবরণ দিতে বসে তার খোঁজা পর্বের।

'আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি আসছি—', বলে সুবালা এগিয়ে যায়, কিন্তু যখন পৌঁছয়, তখন তার মেজদা শেষ বাণী উচ্চারণ করছে!

জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে না দিলে যে মেয়েমানুষ শায়েস্তা হয় না, সেই অভিমত ব্যক্ত করছে।

সুবালার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে যায়।

সুবালা মরমে মরে যায়।

অম্বিকা ঠাকুরপোর সামনে এইসব কথা! তা-ও সুবালারই দাদার মুখ থেকে! নিরুপায় একটা আক্ষেপে হঠাৎ চোখে জল আসে তার। যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুতপায়ে ফিরে যায়।

সুবর্ণলতা টের পায় না, তার এই অপমানের আরো একজন সাক্ষী রয়ে গেল।

কিন্তু অত অপমানের পর আবার সুবর্ণ সেই স্বামীর পিছু পিছু সেই স্বামীর ঘরে ফিরে গেল?

সুবর্ণলতা না সত্যবতীর মেয়ে?

॥ ২২ ॥

তাই তো! সুবর্ণলতা না সত্যবতীর মেয়ে! যে সত্যবতী স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এক কথায় স্বামী-সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরে নি!

মায়ের সেই তেজের কণিকামাত্র পায় নি সুবর্ণলতা?

সত্যবতী তার মেয়ের এই অধোগতি দেখে ধিক্কার দেবে না? বলবে না, 'ছি, ছি, সুবর্ণ তুই এই!'

সে ধিক্কারের সামনে তো চুপ করে থাকতে হবে সুবর্ণকে মাথা হেঁট করে!

নাকি করবে না মাথা হেঁট?

মুখ তুলেই তাকাবে মায়ের দিকে?

বলবে, 'মা, তোমার অবস্থার আর আমার অবস্থায়? সেখানে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!'

তা বলতে যদি পারে সুবর্ণ, বলতে যদি পায়, মিথ্যা বলা হবে না। আকাশ-পাতালই। সুবর্ণর মা'র জীবনের পৃষ্ঠপটে ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সূর্যজ্যোতি, সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা, সত্যবতীর জীবনের বনেদ, সত্যবতীর মেরুদণ্ডের শক্তি।

সুবর্ণর পৃষ্ঠপটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা। সুবর্ণর কাছে বাবার স্মৃতি—বাবা, প্রতারণা করে তার বিয়ে ঘটিয়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে।

সুবর্ণর বাবা সুবর্ণর ভাগ্যের শনি!

আর স্বামীভাগ্য?

সেও কি কম তফাৎ?

সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল কিন্তু অসভ্য অশ্লীল ছিল না। সত্যবতীর অযোগ্য হতে পারে, তবে সে অত্যাচারী নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে তো মাত্র ওই দ্বিতীয় বিশেষণগুলোই। আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য, অশ্লীল আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে!

ত্যাগ করে চলে যাবে কখন?

সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখবার আগেই তো ঘাড়ে পিঠে পাহাড়ের বোঝা উঠেছে জমে। ওই বোঝার ভার নামিয়ে রেখে চলে যাবে সুবর্ণ তার সন্তানদের মধ্যেও নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে? হয়তো আরো কালিমাখা হবে সে ছবি।

সুবর্ণ তাই তার মা'র সামনে মুখ তুলে বলতে পারবে, 'মা, তোমার মেয়ে তোমার মত নিষ্ঠুর হতে পারে নি, এই তার ত্রুটি! তোমার মত হাল্কা ছোট্ট সংসার পায় নি, এই তার দুর্ভাগ্য!'

তোমার মেয়ে মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো তেজটা ফলাবে তবে কোন্ পতাকাতলে দাঁড়িয়ে? ধিক্কার তুমি দিতে এসো না মা, শুধু এইটুকু ভেবো, সকলের জীবন সমান নয়, সবাইকে একই মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায় না! যাকে বিচার করতে বসবে, আগে তার পরিবেশের দিকে তাকিও!

সুবর্ণর পরিবেশ সুবর্ণকে অসম্মানের পাঁকেই পুঁতে রেখেছে, সুবর্ণ আবার এইটুকু অসম্মানে করবে কি?

আর সুবর্ণর দেহকোটরে এখনো না শত্রুর বাসা! তাকে বহন করে নিয়ে যাবে কোন্ মুক্তির মন্দিরপথে?

সুবর্ণকে অতএব সেই পথেই নেমে যেতে হবে, যে পথের শেষে কি আছে সুবর্ণ জানে না, পথটা অন্ধকারে ভরা এই জানে শুধু।

কিন্তু সুবর্ণ হয়তো একদিন তার সন্তানের মধ্যে সার্থক হবে। মাথা তুলে দাঁড়াবে পৃথিবীর সামনে। সেই স্বপ্নই দেখে সুবর্ণ। সেই ভবিষ্যতের ছবিতেই রং দেয়।...

এখন অতএব আর কিছু করার নেই সুবর্ণর, তার স্বামীর পিছু পিছু চলে যাওয়া ছাড়া!

ফুলেশ্বরী ন্যাড়া মাথাটায় ঘোমটা টানেন।

ফুলেশ্বরী অবাক গলায় কুটুমের ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন, 'সে কি বাবা? এই এসে এই চলে যাবে কি? বোনের বাড়ি এসেছ, একটা বেলাও তো থেকে যাবে?'

প্রবোধচন্দ্র গম্ভীর গলায় বলে, 'থাকবার জো থাকলে থাকা যেত, সময়ের অভাব।'

'আহা, আসছে কাল তো ছুটির বার—'

'অন্য কাজ আছে।'

নীরস গলায় বলে কথাটা প্রবোধ, 'মাউইমা'র অনুরোধের সম্মান রাখবে এমন মনে হয় না।

কিন্তু ফুলেশ্বরী তবু অনুরোধ করেন।

কারণ ফুলেশ্বরীর বৌ তাঁর শরণ নিয়েছে। বলেছে, 'মা, যা মুখ করে বসে আছে মেজদা, দেখেই তো পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আপনি একটু বলুন। আপনার কথা ঠেলতে পারবে না। আহা, অকস্মাৎ এমন দুম করে নিয়ে যাবে, পোয়াতি বৌটাকে একটু মাছ-ভাত মুখে না দিয়ে পাঠাবো কোন্ প্রাণে?'

ফুলেশ্বরী তাই আপ্রাণ করেন।

বলেন, 'বুঝলাম কাজ আছে, কিন্তু যো-সো করে সামলে নিও বাবা। পুরুষ ছেলে, তোমাদের অসাধ্যি কি আছে? মেজো মেয়ে এই অবস্থায় যাত্রা করবে, একটু মাছ-ভাত মুখে না দিয়ে যেতে দিই কি করে? আমি তোমার হাতে ধরে অনুরোধ করছি বাবা—'

কিন্তু প্রবোধের কি এখন ওই সব তুচ্ছ ভাবপ্রবণতার মানরক্ষা করার মত মানসিক অবস্থা?

মাথার মধ্যে রক্ত তার টগবগ করে ফুটছে না? সেই উত্তাপকে প্রশমিত করে সে এই পাপ-পুরীতে রাত্রিবাস করবে? গুছিয়ে-গাছিয়ে বোনাইয়ের পুকুরের মাছের ঝোল খেয়ে তবে যাত্রা করবে? এই দণ্ডে সুবর্ণকে কোনো একটা নির্জন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে মেরে পাট করে দিতে ইচ্ছে করছে না?

বোন!

বোনের বাড়িতে বিশ্বাস করে পরিবার রেখে গিয়েছিলাম, বোন সে বিশ্বাসের মান রেখেছে যে! কেন, চোখে চোখে রাখতে পারে নি? শাসন করতে পারে নি? বলতে পারে নি, 'বেচাল কোরো না মেজবৌ?'

তা নয়, সোহাগের দ্যাওরের সঙ্গে মাখামাখি করতে ছেড়ে দিয়েছেন!

সেই বোনের মান রাখতে যাব আমি!

অতএব প্রবোধকে বলতেই হয়, 'বৃথা উপরোধ করছেন, আজ না গেলেই নয়।'

এবার অমূল্য গলা বাড়ায়।

বলে, 'তা কাজটা যখন এত জরুরী, সেরে নিয়ে দুদিন বাদে এলে তো ভালো হতো মেজদা।'

মেজদা ভুরু কুঁচকে নেপথ্যবর্তিনীর উদ্দেশে একটি কড়া দৃষ্টি হেনে তেতো গলায় বলে, 'হুঁ, কারুর কারুর অন্তত ভালো হতো, তাতে আর সন্দেহ কি!'

অমূল্য অত বোঝে না। বলে ফেলে, 'সত্যি, সেটাই ভালো ছিল মেজদা। এমন হঠাৎ এঁদের যাবার তো কোনো কথা ছিল না—'

কথা ছিল না!

আইন দেখাতে এসেছ!

ফুটন্ত রক্ত উছলে ওঠে, 'বরাবর তোমার বাড়িতে থেকে যাবে, এমন কথাও ছিল না নিশ্চয়? আমার পরিবার, তার ওপর আমার জোর চলবে না?'

হঠাৎ নেপথ্যবর্তিনী বেরিয়ে আসে, বলে ওঠে, 'চলবে না কি বল? একশোবার চলেব। ইচ্ছে হলে কোমরে দড়ি বেঁধে কাঁটাবন দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়াও চলবে।...যাত্রার আয়োজন করে দিন আপনি ঠাকুরজামাই। গরুর গাড়িকে তো বলে পাঠাতে হবে!...ঠাকুরঝি, তুমি মনখারাপ করো না। মেজকে মাছ-ভাত খাইয়ে পাঠাবার বাসনা তো তোমার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে? আমার আর তাতে রুচি নেই ভাই। মুখ ফুটে বললামই সে কথা!'

সুবালা মনে মনে শিউরে উঠে বলে, 'দুর্গা দুর্গা!' অমূল্যও বোধ করি বিচলিত হয় এবং অমূল্যর মেজ শালা হঠাৎ গগনবিদারী চীৎকারে বলে ওঠে, 'শুনলে? শুনলে তো? নিজ কর্ণে শুনলে তো? এই মেয়েমানুষকেও সতী বলে বিশ্বাস করতে হবে! তোমরা কি বল? মেয়েমানুষ স্বামীর অকল্যাণ চায়, তার রীতি-চরিত্তির ভাল, একথা বল তোমরা?'

কেউ আর কিছু বলে না।

গরুর গাড়ি আসে।

ছেলেমেয়েগুলো কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ওঠে সে গাড়িতে। বড় আশা ছিল তাদের, আরো কিছুদিন থাকবে। কত সুন্দর করে আজই তারা ইঁট সাজিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করেছিল, সব গেল ঘুচে।

সুখ বস্তুটা তা হলে জলের আলপনা? অতি সুন্দর নক্সা নিয়ে ফুটে উঠেই মুহূর্তে মিলিয়ে যায়?

আনন্দ কি বস্তু, স্বাধীনতা কাকে বলে, ভারহীন মন কেমন জিনিস, এখানে আস্বাদ পেয়েছিল তারা। কিন্তু কদিনই বা? 'শিকারী ঈগলপাখী'র গল্পের সেই ঈগলটার মতই যেন বাবা ঠকাস করে এসে নামলো আর ছোঁ মেরে

নিয়ে গেল!

কানু, ভানু আর চন্নন ওরই মধ্যে যতটা পারলো সংগ্রহ করে নিল—কষা পেয়ারা, কাঁচা কুল, টক বিলিতি আমড়া, ইত্যাদি। তা ছাড়াও থোড়, করমচা, গাব, মাদার পর্যন্ত অনেক কিছুই জমে উঠলো তাদের সঞ্চয়ের ঘরে।

তা জমে উঠতে উঠতেই তো জীবনের জমা-খরচ!

শুধুই কি জমে ওঠে ঘৃণা ধিক্কার অসন্তোষ? জমে ওঠে না ভালবাসার সঞ্চয়, কৃতজ্ঞতার সঞ্চয়, শ্রদ্ধার সঞ্চয়?

না জমলে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে কি করে? নিজের কেন্দ্রে পাক খেতে খেতে এই যে তার অনন্তকালের পরিক্রমা, এ তো কেবলমাত্র ভারসাম্যের উপর!

তাই সুবর্ণলতার শুকিয়ে ওঠা স্নায়ুশিরার আবরণের মধ্যে কাঠ হয়ে থাকা আগুনের ডেলার মত চোখ দুটো দিয়েও জল ঝরে পড়ে।

বারে বারে পড়ে।

সুবালা যখন আলতা পরিয়ে দিতে দিতে অনবরত হাঁটুতে মুখ ঘষটে চোখ মোছে তখন পড়ে, সুবালার ছেলেরা যখন সুবর্ণর ছেলেদের জন্যে এক চুপড়ি সেই ওদের মাটির ইঁট এনে রেখে যায় সুবর্ণর তোরঙ্গের কাছে তখন পড়ে, আর উথলে উপচে শতধারে পড়ে, যখন ফুলেশ্বরী তাঁর সুদূর ভবিষ্যতের প্রপৌত্রের উদ্দেশে রচিত বহু পরিশ্রমসঞ্জাত আর বহু কারুকার্য-খচিত কাঁথাখানি ভাঁজ করে এনে বলেন, 'জিনিসের মতন জিনিস একটু হাতে করে দেবার ভাগ্যি তো করি নি মেজমেয়ে, একখান লালপেড়ে কোরা শাড়ি এনে দেবার সময়ও দিলেন না ছেলে। এইখানি রাখো, যে মানিষ্যটুকু আমার সংসারে কদিন বাস করে গেল, অথচ কিছু দেখল না জানল না, তার জন্যে ঠাকুমার হাতের এই চিহ্নটুকু—'

তখন!

তখন চোখের জলে পৃথিবী ঝাপ্‌সা হয়ে গেল সুবর্ণর।

সুবর্ণর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, সুবর্ণ শুধু সেই অমূল্য উপহারখানি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকালো।...

সুবর্ণর চোখে এত জল!

সুবর্ণ আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত যাত্রাকালে কেঁদে ভাসাচ্ছে!

একটু যেন অপ্রতিভ হলো প্রবোধ, একটু যেন বিস্মিত। যাত্রাকালে তাই বেশি শোরগোল তুলল না, আর গরুর গাড়িতে ওঠার পর অমূল্য যখন বিরাট একটা বোঝা এনে চাপিয়ে দিল গাড়িতে, তখনও বিনা প্রতিবাদে নিল সেই ভার।

আরও একবার চোখের জল!

সুবর্ণ সেই বোঝাটার দিকে তাকালো। সুবর্ণ মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে রইল। সুবর্ণর চোখ দিয়ে আস্তে আস্তে বড় বড় মুক্তোর মত কয়েকটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো।

ধুলো মাখা মলাট ছেঁড়া দড়ি দিয়ে থাক করে করে বাঁধা একবোঝা পুরনো মাসিকপত্র।

নিয়ে এল অমূল্য।

ব্যস্ত ভঙ্গীতে বললো, মেজদা, যদি একটা উপকার কর! বইগুলো

কলকাতায় একজনকে দেবার কথা, তো এই সুযোগে তোমার গলায় চাপাচ্ছি, যদি নিয়ে যাও—'

প্রবোধ "আমার দ্বারা হবে না" বলে চেঁচিয়ে উঠল না। নিমরাজির সুরে বললো, 'তা আমি কাকে দিতে যাবো—'

'আরে না না, তোমায় দিতে যেতে হবে না, সে যখন কলকাতায় যাওয়া-টাওয়া হবে, দেখা যাবে। তুমি শুধু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরে রেখে দিও।'

'এত জায়গা কোথায়? ঘর তো বোঝাই—'

এইটুকু বলে প্রবোধ।

অমূল্য আরো ব্যস্ততার ভাবে বলে, 'চৌকির তলায়টলায় যে করে হোক! দেখতেই তো পাচ্ছ দামের জিনিস নয়, তবে জহুরীর কাছে জহরের আদর! জায়গা একটু দিও দাদা—'

চোখের জল পড়ে পড়ে এক সময় শুকিয়ে যায়, সুবর্ণ তবু নির্নিমেষে সেই 'জহর'গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর এক সময় খেয়াল হয় তার, অম্বিকা নামের সেই উদোমাদা ছেলেটা সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়!

কিন্তু এই নির্মল ভালবাসার উপহারগুলির পরিবর্তে একটু নির্মল প্রীতির কৃতজ্ঞ হাসি হাসবার অবকাশও পেল না সুবর্ণ। হয়তো জীবনেও পাবে না।

আগে ইচ্ছে হয়েছিল, ওদের গ্রামের আওতা থেকে বেরিয়ে একবার রেল-গাড়িতে উঠতে পারলে হয়, সুবর্ণকে বুঝিয়ে ছাড়বে মেয়েমানুষের বাড় বাড়লে তার কি দশা হয়। কিন্তু করায়ত্ত করে ফেলার পর সে দুরন্ত দুর্দমনীয় ইচ্ছেটা কেমন যেন মিইয়ে গেল। আর বোধ করি ওই মিইয়ে যাবার দরুনই হঠাৎ প্রবোধচন্দ্রের একটু বিচক্ষণতা এল।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ওদের সামনে ওদের মাকে বেশি লাঞ্ছনা না করাই ভালো।

তবে?

কাঁহাতক আর চুপ করে বসে থাকা যায় অপ্রতিভের চেহারা নিয়ে!

হয়তো প্রবোধের ওই উগ্র মেজাজের গভীরতম মূল শিকড়ের কারণটা এই। চুপ করে থাকলেই নিজেকে ওর কেমন অপ্রতিভ আর অবান্তর লাগে, তাই হয়তো সর্বদাই ওই হাঁকডাকের ঢাকঢোল!

যাতে নিজের কাছেও না নিজে খেলো হয়ে যায়। যাতে নিজের ওই অবান্তর মূর্তিটা কারোর চোখে ধরা না পড়ে।

অতএব চুপ করে বসে থাকা যায় না।

ছেলেদের সঙ্গেই কথা পাড়ে প্রবোধ। 'গুচ্ছির "আকোচ্-খাঁকোচ্" নিয়ে এলি যে? গিলবি ওইগুলো?'

চন্নন তাড়াতাড়ি কোঁচড়ের পেয়ারাগুলো আঁচলে ঢেকে ফেলে বলে, 'সবগুলো খাবো নাকি?'

'আহা তা না হোক, কিছুও যাবে তো! পেটে গেলে রক্ষে থাকবে? ফেলে দে, ফেলে দে—'

'বাঃ রে—'

চন্দনের স্বর অনুনাসিক হয়ে ওঠে· 'কত কষ্টে গাছ ঠেঙিয়ে নিয়ে এলাম—'

'আহা কী অমূল্য নিধি!' প্রবোধ আবার কৌতুকরসও পরিবেশন করে, 'অমূল্য পিসের দেশের অমূল্য বস্তু!'

তারপর ভানু-কানুকেও কিছু উপদেশ দেয়, কিছু জেরা করে। এবং একটু পরেই গলাটা ঝেড়ে নেয়।

সুবর্ণলতা কি বোঝে না কিছু?

বোঝে না, ছেলেদের সঙ্গে ওই বৃথা বাক্যব্যয়টা আসলে গৌরচন্দ্রিকা! এই বার আসল পালা ধরবে!

কম দিন তো দেখছে না লোকটাকে।

তা অনুমান মিথ্যা হয় না।

গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে মূল পালায় আসে প্রবোধ।

হাসির মত সুরে বলে, 'বাবাঃ, এমন কান্না জুড়লে তুমি, মনে হচ্ছিল যেন বাপের বাড়ির মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে!'

বলা বাহুল্য উত্তর জুটল না।

শুধু নিরুত্তর কথাটা আর চেষ্টাকৃত হাসিটা যেন বাতাসে মাথা কুটলো।

একটু অপেক্ষা করে আবার বলে ওঠে, 'কি করবো, কাজ বলে কথা! মেয়েমানুষের বোঝবার ক্ষমতাই নাই। তবে এও বলি, বাড়াবাড়িটা কিছুই ভাল নয়। জামাই, বেয়াই, ননদাই, এই সব হলো গিয়ে তোমার আসল কুটুম্ব, তাদের বাড়ি থেকে আসছো। যেন সমুদ্দুর বহাচ্ছো!'

তবুও নিরুত্তর থাকে সুবর্ণ।

চুপচাপ বসেই থাকে ছইয়ের মধ্যে আকাশের দিকে চেয়ে।

প্রবোধ আবার বলে, 'যাই বল, আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি! কখনো যার চক্ষে জল দেখিনি, সেই মেয়েমানুষ কিনা কেঁদে ভাসালো!'

সুবর্ণ তবু তেমনি নির্বিকার চিত্তে বসেই থাকে।

প্রবোধ এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

আপন মনে বলে, 'উঃ, খাটুনি যে কী জিনিস! তা এই শালাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে!'

তবু সুবর্ণ নীরব।

প্রবোধ এবার আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। ক্লিষ্ট-ক্লান্তর ভূমিকা নেয়। বলে, 'কথায় বলে ব্যথার ব্যথী! তা বিয়ে করা স্ত্রীই যার ব্যথার ব্যথী নয়, তার আবার কিসের ভরসা! এ কথা কারুর একবার মনে এল না যে,—তাই তো! লোকটা বিনা নোটিসে এমন হুট্ করে এল কেন? দোষটাই দেখে জগৎ, কারণটা দেখে না!'

তথাপি সুবর্ণর ঘাড় ফেরে না।

এইবার অতএব শেষ চাল চালে প্রবোধ।

'মাথাটা যা টিপটিপ করছে, হাড়ের জ্বর টেনে না বার করে!'

এইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সুবর্ণ এই ডাহা মিথ্যেটা বরদাস্ত করতে পারে না। বলে ওঠে, 'শুধু জ্বর? জ্বরবিকার নয়?'

হয়তো প্রবোধের সন্ধির মনোভাব দেখে ঘেন্নাতেই বলে।

রাগ করবার কথা।

রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠবার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, সেসব করে না প্রবোধ। বরং নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'তা সেটা হলেই বোধ হয় খুশি হও তুমি!'

সুবর্ণ আবার মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে রাখে।

শুধু উদাস উদাস গলায় বলে, 'খুশি? কি জানি! জিনিসটার আস্বাদ তো জানলাম না একাল অবধি!'

॥ ২৩ ॥

মেয়ে-গাড়িতে শুধু বৌকেই তুলে দেয় না প্রবোধ, সব ছেলেমেয়ে কটাকেই তুলে দেয়। মালপত্র তো বটেই। নিজে হাত-পা ঝেড়ে পাশের কামরায় বসে মনে মনে চিন্তা করতে থাকে, কি করে আবার অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে!

নিতান্তই যে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়ার এবং তৎপরে মামীর বাড়ি গিয়ে গিয়ে খাওয়ার যন্ত্রণাতেই বৌকে আনতে গিয়েছিল সে, এবং গিয়ে মাত্র দেখতে না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, সেটাই বোঝাতে হবে বিশদ ব্যাখ্যায়।

তা ছাড়া শরীর খারাপের ভানও করতে হবে একটু, নচেৎ যে পাষাণ মেয়েমানুষ, মন গলবে না!

আশ্চর্য এই, বৌ যতই বেচাল করুক আর প্রবোধ তাতে যতই ক্ষেপে যাক, শেষ পর্যন্ত নিজেকেই যেন 'ক্ষুদ্র' মনে হয়। সুবর্ণকে কিছুতেই সত্যি 'অসতী মেয়েমানুষ' ভাবা যায় না। ও যেন আপন মহিমায় মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন নিজেকে সমর্থন করতে, কৌশল করতে বসা ছাড়া আর কি করা যায়?

তা এবার সুবিধে আছে।

বাড়িতে কেউ নেই।

অত বড় বাড়িটায় শুধু তো তারা চার ভাই। আর গিয়ে পড়বে শুধু প্রবোধেরই নিজ পরিবারটুকু। অতএব—

কিন্তু হায় প্রবোধের কপাল!

একবেলার জন্যে ঘুরে এসে দেখলো কিনা পরিস্থিতি বিপরীত! বাড়ি লোকে লোকারণ্য।

গুরুবাড়ি থেকে মুক্তকেশী এসে গেছেন নাতনীকে নিয়ে, বোনের বাড়ি থেকে উমাশশী এসে গেছে দশ ছেলেমেয়ে নিয়ে।

প্রভাসের বৌ এসে গেছে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে।

তা তার জন্যেই মুক্তকেশীর আসার সুবিধে। সে ছিল কাটোয়ায় পিসির বাড়ি, শাশুড়ী রয়েছেন নবদ্বীপে, এই সুবিধেয় পিসির সঙ্গে গিয়েছিল শ্রীপাট নবদ্বীপ দেখতে। মুক্তকেশী এমন সুযোগ ছাড়লেন না, ওকে ধরে বসে বললেন, 'আর দীর্ঘকাল পরের বাড়ি বসে থেকে কাজ নেই সেজবৌমা, চলো

চলে যাই। রোগবালাই কিছু চিরকাল থাকছে না। আর সব কথার সার কথা "রাখে কেষ্ট মারে কে"?'

সেজবৌ সুবর্ণলতা নয়।

সেজবৌ শাশুড়ীর মুখের উপর বলে বসলো না, 'তা সেই সার কথাটা তো জানাই ছিল মা আপনার, তবে এত বড় সংসারটাকে নিয়ে সাত্র-ছরকোট করলেন কেন?'

বললো না। বলতে জানলেও বলতো না।

কারণ সেজবৌও এ প্রস্তাবে বাঁচলো।

অধিক দিন যে পরের বাড়ি বাস সুবিধের নয়, সে কথাটা সেও বুঝে ফেলেছে।

অতএব সেই যাত্রাতেই কলকাতার ট্রেনে চেপে বসা! পুরুষ অভিভাবক হিসেবে পিসির ছেলে এল সঙ্গে। বছর ষোলর ছেলেটা, তা হোক, পুরুষ তো বটে!

পাকেচক্রে অথবা প্রবোধের গ্রহের ফেরে, ক্রুদ্ধ অভিমানাহত দিদির নির্দেশে উমাশশীও সেই দিনই চলে এসেছে দিদির বাড়ি থেকে। এরা সকালে, ও বিকেলে।

তার মানে বৌ নিয়ে নির্জন গৃহবাসের রোমাঞ্চময় কল্পনাটা ভূমিসাৎ হয়ে গেল প্রবোধের। একা বাড়িতে গলা খুলে উপদেশ আদেশ দিয়ে দিয়ে বৌকে গড়ে পিটে নতুনভাবে তৈরি করে নেবার স্বপ্ন গেল ভেঙে। অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করেই মনে মনে সংসার-পরিজন সকলের সম্পর্কে একটা কটূক্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আর আজ সুবর্ণর মত তারও মনে হল, বাড়িতে বড় বেশি লোক! এত লোকের চাপে সত্যিই নিজের আর কিছু খোলে না। অথচ সুবর্ণ যখন দুমদাম করে বলে বসে, 'বাবাঃ, এ বাড়িতে মানুষ আর "মানুষের" বুদ্ধি খেলাবে কোথা থেকে, বৃথা গজালি করতে করতেই দিনরাত্তির কেটে যায়,' তখন প্রবোধ তাকে "একোলষেঁড়ে, আত্মসুখী" বলে গঞ্জনা দিয়েছে।

এখন মনে হচ্ছে বাস্তবিক এত লোকের চাপে নিজের মাহাত্ম্য ফোটানো যায় না কোথাও। মনে হচ্ছে, সেই রাতদুপুরের আগে আর সুবর্ণর সঙ্গে মোকাবিলার উপায় নেই।

দূর! শালার সংসারে নিকুচি, বেশ আছে জগুদা! তারপরেই মনে হয় মামীর বাড়িতে খবর দেওয়া আবশ্যক।

সেই দিকেই পা চালায়।

'ওরা তো সব এসে গেল।'

নৈর্ব্যক্তিক সুরে খবরটা ঘোষণা করলো প্রবোধ।

শ্যামাসুন্দরী দাওয়ায় বসে মালা ঘোরাচ্ছিলেন, ইশারায় প্রশ্ন করলেন, কারা?

প্রবোধ তেমনি নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'আর কে? মা আর মায়ের চেলা-চামুণ্ডো! তোমাকে আর ভাগ্নেদের ভাত বাড়তে হবে না, সেই কথাই বলতে এলাম।'

জগু কোথায় যেন ছিল, ভাইয়ের গলা শুনে এদিকে আসতে আসতে

ভাবছিল, আজ যে প্রবোধ এমন সকাল সকাল? খিদে লেগেছে বোধ হয়। যাক্, মার তো বেলাবেলিই রান্না প্রস্তুত হয়ে যায়।

কানে এল, 'ভাত বাড়তে হবে না, সেই কথাই বলতে এলাম।'

এক পায়ে খাড়া হল জগু।

ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'সেই কথাই বলতে এলাম মানে? খাবি না আজ?'

প্রবোধ অবহেলার গলায় বলে, 'আর দরকার কি? এসেই গেছে যখন সবাই—রান্নাবান্না হচ্ছে বাড়িতে—'

জগু আরো ক্রুদ্ধ হয়, 'দরকার নেই! বলি মায়া-মমতা বলেও কি কোনো বস্তু নেই তোর শরীরে পেবো? একটা বুড়ী আশা করে একঘর রেঁধে রেখেছে, আমি একটা পাগল-ছাগল দাদা আলাদা করে উঠোনে উনুন জেবলে হাঁসের ডিমের ডালনা, ইলিশ মাছের ঝাল, আর মৌরলার টক্ বানিয়ে রেখেছি, আর তুমি নবাব আলি এসে অমনি হুকুম দিলে, ভাত বাড়বার দরকার নেই, বাড়িতে রান্না হচ্ছে। ধন্যি বটে! লেখাপড়া শিখে এমন বুনো জংলি হলি কি করে রে পেবো?'

শ্যামাসুন্দরীর আর মালাজপা হয় না। শ্যামাসুন্দরী প্রবোধের মেজাজ জানেন, অতএব শঙ্কিত শশব্যস্ততায় মালাটি কপালে ছুঁইয়ে রূঢ় গলায় বলে ওঠেন, 'তা তুই বা ভাল করে সব না শুনে গেছো বাঁদরের মতন কথা কইছিস কেন? হঠাৎ ওরা এল কেন, কে কে এল, ঠাকুরঝি হা-ক্লান্ত হয়ে এসে হঠাৎ রান্নাই বা করতে বসলেন কি করে এখুনি, শুধো সে সব?'

'শুধোতে আমার দায় পড়েছে!' জগু বলে, 'দেখছ না দেমাকে দমদম করছেন বাবু। "মা" এসেছে আবার কার তোয়াক্কা, কেমন?'

প্রবোধ বেজার গলায় বলে, 'শুধু মা কেন, সগুষ্টির যে যেখানে ছিল, সবাই তো এসেছে। যেন ভাগাড়ের শকুন, একসঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল! খবর নেই বার্তা নেই—'

'এই শোনো উল্টোপাল্টা—', জগু হাত উল্টে বলে, 'তবে যে পেকা বললো, তুই মেজবৌমাদের আনতে চাঁপতা গেছিস? আবার বলছিস খবর নেই বার্তা নেই—'

'আরে বাবা আনতে গেছলাম কে বললে?' প্রবোধ সাফাইয়ে তৎপর হয়, 'গিয়েছিলাম খবরাখবর নিতে। তোমাদের মেজবৌমা যে একেবারে 'কলকাতায় ফিরবো' বলে দড়ি-ছেঁড়া হলো। ফ্যাশানি তো? পাড়াগাঁয়ে আর পোষাচ্ছিল না আর কি বিবির! ভাবলাম, এতই যখন ইয়ে, তখন চলুক। এসে দেখি—'

এসে কী দেখেছে প্রবোধ, সে কথায় কান না দিয়ে জগু সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'মেজবৌমা অন্যায় বায়না নিয়ে দড়ি-ছেঁড়া হলো? বানিয়ে বানিয়ে বলছিস না তো হতভাগা? তোর তো সে-গুণে ঘাট নেই! নিজেই ছুটিস নি তো আনতে?'

প্রবোধ অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়েই বলেছিল কথাটা। কারণ জানে যে সুবর্ণ কিছু আর ভাসুর বা মামীশাশুড়ীর কাছে এসে প্রকৃত ঘটনা জানাতে যাচ্ছে না অতএব নিজের মুখটাই রক্ষা হোক! বৌয়ের জন্যে হেদিয়ে মরছিল সে, এ কথাটা উহ্যই থাক্।

কিন্তু জগু সেই নিশ্চিন্তির ঘরেই কোপ মারলো। মুশকিল! আবার

এখন ভেবে ভেবে কথা বানানো!—'শোনো কথা, অকারণ মিছে কথা বলতে যাব কেন? যেতে মাত্রই তো কে'দে পড়লো। বললো, আর এই পচা পুকুরের দেশে পড়ে থাকতে পারছি না। অগত্যাই আমাকে নিয়ে আসতে হল। এসে দেখি, হরেকেন্ট! নদে থেকে মা, কাটোয়া থেকে সেজবৌমা, ব্যাণ্ডেল থেকে বড়বৌ ছেলেপুলে সমেত, সব এসে হাজির। তাই ঝালাপালা হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

শ্যামাসুন্দরী সকলের একসঙ্গে আসার খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে তারপর বলেন, "তা এসেছে এসেছে। আজ আমাদের এখানে রান্নাবান্না হয়েছে যখন, খেয়ে যাও চার ভাই। নচেৎ মনে বড় কষ্ট হবে। আর ওই আমিষগুলোও নষ্ট হবে। জগা তো খায় না ওসব। তোরা খাবি বলেই দুরকম মাছ এনেছে, হাঁসের ডিম এনেছে—'

বলা বাহুল্য সেদিন জগু মুখে ওদের শুধু 'ডাজ চচ্চড়ি'র নিরাশার বাণী শোনালেও, মামার বাড়ির আদরই করছিল পিসতুতো ভাইদের। নিত্য নতুন।

তবে আজকের 'পদ' দুটো শুনেই হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো প্রবোধের।

সুবর্ণ ইলিশ মাছের পরম ভক্ত। হাঁসের ডিমেরও কম নয়। মন ভাল থাকলে তোড়জোড় করে বাড়িসুদ্ধ সকলকে 'ভোজ' খাওয়ানো বাতিক ওর। প্রায়ই সে ভোজের মূল হচ্ছে খিচুড়ি। এবং অনুপান উপকরণ ওই দুটো জিনিস।

ইলিশ আর হাঁসের ডিম ভাজা।

উমাশশীর জন্যে ডিম হে'সেলে ওঠে না, সুবর্ণই আলাদা উনুন জেলে মহোৎসাহে—তা নিজে ভাল না বাসলে কেউ শুধু পরের জন্যে এত করে?

মনটা উতলা হতে লাগলো, শেষ অবধি এক কৌশল ফে'দে বসলো প্রবোধ। অমায়িক গলায় বললো, 'বুঝছি সবই। তবে কিনা মাও তো এতদিন পরে "ছেলেরা" বলে হামলাচ্ছে। তা তুমি বরং এক কাজ কর মামী, ওই মাছটা, হাঁসের ডিমটা আর তোমার দিকের ব্যান্ননের ভাল দু-একটা পদ বাগিয়ে নিয়ে যাবার মতন দুটো বাসন দাও, আমি নিয়ে যাই। মা'র ভাতের সঙ্গে মামার বাড়ির ব্যঞ্জন! আহা!'

'নিয়ে যাবি তুই? এখান থেকে বয়ে?'

জগু অবাক হয়।

প্রবোধ হঠাৎ জগুর কাছে সরে আসে এবং নীচু গলায় ফিসফিস করে কি যেন বলে, সঙ্গে সঙ্গে জগু প্রবলভাবে ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে হেসে ওঠে। হাসতেই থাকে হা-হা করে।

প্রবোধ লজ্জিত হয়, শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত। বলেন, 'পাগলের মতন হাসছিস যে?'

জগু আরো উদাত্ত হয়।

আর একবার থাবড়া মারে প্রবোধের পিঠে। বলে, 'হাসব না? কে বলে ভায়া আমার কাঠখোট্টা? ভেতরে ভেতরে ভায়া—'

সুবর্ণও প্রথমটা এসে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বৈকি। এসে যে বাড়ি এমন গুলজার দেখবে সে ধারণা ছিল না। তবে চাঁপাকে দেখে ভাল লাগল। আবার দেখে চোখে জলও এল। কী হাল হয়েছে মেয়েটার! অথচ এরা? বড় জায়ের ছেলেমেয়েরা! মাসির ভাত খেয়ে বলতে নেই দিব্যি হয়ে উঠেছে!

মেয়ের রোগা হয়ে যাওয়ার কথা তোলে না সুবর্ণ। কে বলতে পারে সে কথায় কত কথা হবে! তোলে রঙের কথা। বলে, 'কী রঙ্ হয়েছে রে তোর চাঁপা? একেবারে যে কালি-ঝুল! গঙ্গার জলে নেয়ে নেয়ে চুলগুলোও তো গেছে!'

কথাটা মিথ্যা নয়।

মুক্তকেশী নিজেই পঞ্চাশবার এ আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এখন সহসা চাঁপার মায়ের মুখের আক্ষেপবাণীতে অপমান বোধ করেন। যেন এই রং আর চুলের খর্বতার সঙ্গে মুক্তকেশীর ত্রুটির কথা নিহিত আছে।

অথচ অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, চুলের কথা বাদ দিলেও মেয়েটা শুধু কালোঝুলই হয় নি, রোগা দড়িও হয়ে গেছে। আর সেটা আরো বেশী চোখে পড়ছে উমাশশীর ছেলেমেয়েগুলোর স্বাস্থ্যের লক্ষণীয় উন্নতির পাশে।

মাসির বাড়ি থেকে এত গোলগাল হয়ে আসা কেন! এটা যেন মুক্তকেশী-কেই অপমান করা!

অপমানের দাহে জ্বলতে জ্বলতে একসময় শোধ নেন। উল্টোপথে নেন।

একটা নাতনীকে ডেকে বলে বসেন, 'বড়লোক মাসীর বাড়ি গিয়ে খুব আদেখলার মত খেয়েছিলি, কেমন?'

নাতিকে বললেন, 'নজর' লাগবে। মেয়েসন্তানে 'নজর' লাগে না।

মেয়েটা থতমত খেয়ে বলে, 'বাঃ, আমরা বুঝি চেয়ে খেয়েছি?'

'চেয়ে খেয়েছিস কি মেগে খেয়েছিস তা জানি নে, তবে খেয়েছিস তা মালুম হচ্ছে। তা হঠাৎ চলে এলি যে? আরো থাকলেই পারতিস? ইস্কুল-মিস্কুল তো খোলে নি ভাইদের!'

ভাইদেরই! কারণ ওদের ইস্কুলের বালাই নেই! মেয়েমানুষের পড়ার ওপর দস্তুরমত খাপ্পা মুক্তকেশী। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বাচাল, আর ম্লেচ্ছ ভাষা শিখলে বিধবা হয়, এটা যে অবধারিত, তা তাঁর জানা আছে। কাজেই ওদের পড়ার বালাই নেই।

তবু চাঁপাকে সুবর্ণ জবরদস্তি করে বাড়িতেই নিজে পড়ায়, কিন্তু চাঁপা আর এ পর্যন্ত 'কথামালা' ছাড়িয়ে 'বোধোদয়ে' উঠল না। বরং চন্ননটা দাদা-দিদির বই টেনে টেনে নিজেই দিব্যি পড়তে শিখে গেছে। সেজমেয়ে পারুলটাও দুলে দুলে পড়া মুখস্থর ভান করে। কাকারা ওদের ঘরের দৃশ্য দেখতে পেলে বলে, 'মেজগিন্নীর পাঠশালা'!

কিন্তু সে যাক্, উমাশশীর মেয়ে মোটা হওয়ার অপরাধে ধিক্কার খেয়ে অপ্রতিভ গলায় বলে, 'নাই বা ইস্কুল খুললো! কুটুমবাড়িতে কত দিন থাকা হবে?'

'থাকলেই বা! বড়মানুষ কুটুমবাড়ি! তোর মা তো বোনের সংসারের গপ্পো করতে দিশেহারা হচ্ছে!'

হঠাৎ মেয়েটা অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে বলে ওঠে, 'হবে না কেন? তোমার মতন তো ওখানে কেউ রাতদিন খিটখিট করে না!'

মুক্তকেশী স্তম্ভিত হয়ে যান।

মুক্তকেশী যেন আপন ভবিষ্যতের অন্ধকার ছবি দেখতে পান। মানবে না, আর কেউ মানবে না, মনে হচ্ছে মান-সম্মানের দিন শেষ হয়ে এল! এক-

জন চোপা করলেই সবাই সাহস পাবে।

এইটি করলো মেজবৌমা।

দুঃসাহস ঢোকালো সবাইয়ের মধ্যে!

মেজবৌমাই দেখালো গুরুজনের মুখে মুখে কথা কয়েও পার পাওয়া যায়।

মুক্তকেশীর তবে গতি কি?

মাসতুতো বোন হেমের মতন 'পাশ-ঠেলা' বুড়ী হয়ে পড়ে থাকবেন?

হেমের দুর্দশা তো নিজের চক্ষে দেখে আসছেন। তার তো ওই একটা বৌ থেকেই শনি ঢুকলো!

কিন্তু মুক্তকেশী কি এখনই হার মানবেন?

মুক্তকেশী আর একবার শক্ত হাতে হাল ধরবার চেষ্টা করবেন না?

করেন।

অতএব সেই মেজবৌমাকেই নিয়ে পড়েন।

'বলি মেজবৌমা, পেবা নয় বেটাছেলে, এত কথা জানে না। তুমি কি বলে চলে এলে? তুমি জানো না "আটে-কাঠে" চড়তে নেই? এটা তোমার আট মাস পড়েছে না?'

সুবর্ণ এতক্ষণ বড় এবং সেজ জায়েদের সঙ্গে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার গল্প করছিল এবং বলতে কি মনটা একটু ভালই ছিল। চাঁপা 'নেটিপেটি' হয়ে গায়ের কাছে বসে ছিল আর ঠাকুমার গুরুবাড়ি সম্পর্কেও ভাল-মন্দ গল্প তুলে হাসছিল। মোট কথা, একা বাড়িতে এসে পড়ার থেকে, ওই জনারণ্য তার পক্ষে ভালই হয়েছিল যেন।

কিন্তু শাশুড়ীর এই গায়ে পড়ে অপদস্থ করায় চাপা-পড়া আগুন জ্বলে উঠল। কঠিন গলায় বলে উঠল সে, 'জানব না কেন মা? তবে সেই আদিখ্যেতা করতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে দাঁড়িয়ে জুতো খাব?'

'জুতো!'

মুক্তকেশী বলে ওঠেন, 'তুমি খাবে জুতো? গলবস্ত্র জোড়হস্ত সোয়ামীকেই তো ফি হাত জুতো মেরে তবে কথা কইছ মেজবৌমা? তাকে বলতে পারলে না, এখন যাওয়া চলবে না? সুবালাও তো বুড়োমাগী, সে জানে না?'

সুবর্ণ তীব্রস্বরে বলে, 'সবাই সব জানে মা, শুধু আপনি আপনার ছেলেকে জানেন না। তবে "আটে-কাঠে" চড়ে যদি কিছু বিপদ ঘটে তো বুঝবো সেটা আমার পুণ্যফল।'

'পুণ্যফল! বিপদ ঘটলে তোমার পুণ্যফল?' মুক্তকেশী যেন অসহ্য ক্রোধে এলিয়ে পড়েন। 'মেজবৌমা, তুমি না মা?'

'মা বলেই তো বলছি মা।' সুবর্ণ এবার খুব শান্ত গলায় বলে, 'তবু তো পৃথিবীতে একটা হতভাগাও কমবে!'

'হতভাগা!' মুক্তকেশী এবার স্বক্ষেত্রে আসেন। বলেন, 'তা বটে! তোমার মত মায়ের গর্ভে যে জন্মাতে এসেছে, তাকে হতভাগাই বলতে হবে!'

'তা সেই কথাই তো আমিও বলছি মা! কেনা বাঁদীর পেটের সন্তান হতভাগা ছাড়া আর কি?'

চলে যায় সেখান থেকে।

আর গল্পের আসরে গিয়ে যোগ দেয় না, চলে যায় নিজের ঘরে। আর দড়ি বাঁধা-বাঁধা সেই পুরনো পত্রিকাগুলো টেনে নিয়ে বাঁধন খোলে।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটা পত্রিকাব খাঁজে ভাঁজ করা রয়েছে সেই কবিতার পৃষ্ঠা দুটো! তার সঙ্গে আলাদা একটা টুকরো! যেটুকু হারিয়ে গিয়েছিল। খুঁজে বার করে সঙ্গে দিয়েছে।

সুবর্ণর অজ্ঞাতসারে সুবর্ণর চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে।

সুবর্ণর জন্যেও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আছে, সম্মান আছে, প্রীতি আছে। নির্মল ভালবাসার স্পর্শ আছে। তবে পৃথিবীর উপর একেবারে বিশ্বাস হারাবে কেন সুবর্ণ? কেন একেবারে হতাশ হবে? সুবর্ণর গর্ভজাত সন্তান-দের কি 'মানুষের' পরিচয় দিতে পারবে না সুবর্ণ? যে মানুষ পৃথিবীর উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, আশা ফিরিয়ে আনতে পারে, তেমন মানুষ?

কিন্তু সে কি এই পরিবেশে সম্ভব?

জলের ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ে আবার শুকিয়ে যায়, বইগুলো ওল্টাতে থাকে সুবর্ণ।

টের পায় না তখন—ওর জায়েরা ভাঙা গল্প জোড়া দিয়ে আবার জমিয়ে বসে হেসে হেসে বলছে, 'ওর পেটের সন্তান হতভাগা? বাবা, ভাগ্যবন্ত তা হলে কে? বলে ও'র ছেলেমেয়ের আদর দেখলে—'

যত্নকেই আদর বলে ওরা।

ঘরে ঢুকলো প্রবোধ।

চোরের মত চুপি চুপি।

কোঁচার খুঁটে কি যেন একটা চাপা দিয়ে।

এ-ঘরটা বাড়ির একটেরে, সুবর্ণর সেই গৃহপ্রবেশের দিনের আহত অভি-মানের ফলশ্রুতি। সেইটাই কায়েম হয়ে গেছে। প্রবোধ অবশ্য বরাবরই আক্ষেপ জানিয়ে আসছে "ও'চা ঘর" নিয়ে। তবে সুবর্ণ বলে, 'এই ভাল! এ ঘরে যে সহজে কেউ ঢুকতে আসে না, সেই আমার পরম লাভ!'

তা কেউ ঢুকতে আসে না জেনেও প্রবোধ আস্তে দরজাটা আধভেজানো করে ফিসফিস করে বলে, 'এই শোনো, চট্ করে এটুকু সেরে ফেল দিকি।'

সুবর্ণ এই অভিনব ধরন-ধারণে অবাক হয়। এবং সেই জন্যই বোধ করি পুঞ্জীভূত অভিমান দমন করেও কথা বলে।

বলে, 'কি সেরে ফেলবো?'

'আরে এসো না এই জানলার ধারে। চট্ করে মুখে পুরে ফেল।'

কোঁচার তলা থেকে বার করে ছেঁড়া খবরের কাগজ আর শালপাতায় মোড়া তরকারির ঝোলমাখা একটা চেপ্টে যাওয়া হাঁসের ডিম, আর একখানা ভেঙে টুকরো হওয়া ইলিশ মাছ!

সুবর্ণ রাগ করতে ভুলে যায়।

সুবর্ণ স্তম্ভিত গলায় বলে, 'এর মানে?'

'আরে বাবা, মানে পরে শুনো, করবো গল্প। আগে খেয়ে তো নাও। ছেলেপুলে কে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়বে। জিনিস দুটো তোমার প্রিয় বলেই

অনেক কৌশলে সরিয়ে নিয়ে এলাম।'

'আমার প্রিয় বলে! আমার প্রিয়!'

সুবর্ণর মুখে একটা অলৌকিক রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।

সুবর্ণ সেই হাসির মধ্যে থেকে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের গলায় বলে, 'কে বললো জিনিস দুটো আমার প্রিয়?'

'কে বললে?'

তা রহস্যের হাসি প্রবোধের মুখেও ফুটে ওঠে। সেও বেশ একটু কৌতুকের গলায় বলে, 'না বললে বোঝা যায় না? আমিই না হয় তোমার দু-চক্ষের বিষ, তুমি তো আমার—ধর ধর, গেল আমার কোঁচাফোঁচা! তেলে ঝোলে একসা!'

সুবর্ণ কিন্তু স্বামীর এই বিব্রত ভাবকে উপেক্ষা করেই বসে থাকে, এবং স্থির গলায় বলে, 'কিন্তু বাহাদুরি নেওয়াটা আর হল না তোমার! দুটোর একটাও খাই না আমি।'

'খাও না তুমি! দুটোর একটাও?' প্রবোধের গলায় ক্রুদ্ধ অবিশ্বাসের সুর ফুটে ওঠে।

বাস্তবিকই অনেক কসরত করে আনতে হয়েছে তাকে অকিঞ্চিৎকর জিনিস দুটো। এনেছে নেহাতই প্রাণের টানে। সাধ জেগেছিল, এনেই সুবর্ণর মুখে পুরে দিয়ে হাসাহাসি করে পূর্ব অপরাধের পাষাণভারটাকে সরিয়ে ফেলবে। কিন্তু মেয়েমানুষটি নিজেই যেন কাঠ-পাথর। এগিয়ে এলো না, দেখলো না, আবার মিছে করে বলছে 'খাই না'!...আর কিছু নয়, পোষা রাগ! আচমকা নিয়ে চলে আসার রাগটি পুষে রেখেছেন! তাই স্বামীর এই বেপোট অবস্থা দেখেও মমতা নেই একটু।

তাই তারও গলায় ভালবাসার সুর মুছে গিয়ে ক্রুদ্ধ সুর ফোটে।

'খাও না? ডাহা একটা মিথ্যে কথা বললে?'

সুবর্ণ খুব শান্ত গলায় বলে, 'মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন শুধু শুধু? আর মিথ্যে কথা বলা আমার স্বভাব কি না ভালই জানো তুমি। ইলিশ মাছে আমার কাঁটার ভয় সেকথা বাড়ির সবাই জানে।'

'ওঃ, সবাই জানে! শুধু আমি শালা—তা এটাতে তো আর কাঁটা নেই, এটা কি দোষ করলো?'

'ওতে আমার কেমন গন্ধ লাগে। তাছাড়া—যে জিনিস রান্নাঘরে ঢোকে না, তা খেতে আমার রুচি হয় না।'

তথাপি প্রবোধের এসব কথা বিশ্বাস হয় না। নিত্য এসব এত উৎসাহ করে আনায় সুবর্ণ অমনি নাকি?

বলেও বসে সেকথা।

'রুচি নেই বললেই হল! বাঙালকে আর হাইকোর্ট দেখিও না মেজবৌ! বারো মাস এত আহ্লাদ করে আনাচ্ছ, রাঁধছ, আর নিজে খাও না! তা তো নয়, আমার আনা জিনিস খাবে না—তাই বল।'

সুবর্ণ ওর অভিমানক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

সুবর্ণ ওর স্বামীর অভিমানের কারণটার দিকে তাকিয়ে দেখে। চেপ্টে যাওয়া আর ভেঙে যাওয়া খাদ্যবস্তু দুটো যেন সুবর্ণর দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে তাকায়।

তবু সুবর্ণ নরম গলায় বলে, 'ওকথা বলছো কেন? তোমার আনা জিনিস খাব না! এমন অহঙ্কারের কথা বলবোই বা কি করে? আমি তো পাগল নয়! সত্যিই আমি ওসব খাই না। ইচ্ছে হয় তো জিজ্ঞেস করে দেখো দিদিকে।'

এবার হয়তো বিশ্বাস হয় প্রবোধের।

আর হয়তো এই আশাভঙ্গেই হঠাৎ তার চোখে জল এসে যায়। নিজেকে ভারী অপমানিত লাগে। অতএব আক্রোশটা গিয়ে পড়ে হাতের জিনিস দুটোর ওপর।

'চুলোয় যাক তবে! ফেলে দিই গে রাস্তায়!'—বলে দ্রুতপদে চলে যায় ঘর থেকে।

বইয়ের পাতা ওল্টাতেও ইচ্ছে হয় না আর।

বইপত্তরগুলো সাবধানে চৌকির তলায় ঠেলে দিয়ে, হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে থাকে সুবর্ণ।

আর মনে মনে তার বিধাতাকে প্রশ্ন করে, 'আমার দাম কষতে একটা কানা-কড়ি ছাড়া কি আর কিছুই জোটে নি তোমার ঠাকুর?'

॥ ২৪ ॥

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়ালো প্রভাস।

ওটা কি হচ্ছে?

একটা মেয়েলী গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে কী শোনা যাচ্ছে ওসব মেজদার ঘরের ওদিক থেকে?

পদ্য!

পদ্য আওড়ানো হচ্ছে!

কিন্তু এ তো ছোট ছেলেমেয়ের পড়া মুখস্থ নয়! এ যে নাটক!

'বল বল বল সবে,
শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

সিঁড়ি থেকে নয়, পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মেজদার দরজার কাছেই এসে পৌঁছায় প্রভাস, আর দুটোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। শোনা এবং দেখা।

মেজগিন্নী ইস্কুলই খুলেছেন।

তিনি একখানা বই খুলে ধরে খানিকটা আওড়াচ্ছেন, আর তার পর ক'টা ছোট ছেলেমেয়ে তার 'দোয়ার' দিচ্ছে। সুবর্ণর ছেলেমেয়ে আছে, উমাশশীর আছে।

ইস্কুলই বা কেন, কেত্তনের দল বললেও তো হয়।

তাই পরবর্তী ঝঙ্কারে যখন ছোটরা ভুল-ভাল উচ্চারণে বলে ওঠে—

'ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে।
নব দিনমণি উদিবে আবার—

পুরাতন এ পুরবে—'

তখন চৌকাঠে পা রেখে চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাস, 'বাঃ বাঃ! কেয়াবাৎ! এ যে একেবারে পুরোপুরি কেত্তনের দল! মূল গায়েন সুর দিচ্ছেন, চেলা-চামুণ্ডারা দোয়ার দিচ্ছেন, শুধু তবলার বোল্‌টাই বাকি! তবে তোদের মাকে বলে দে চন্নন, পাশের ঘরে তোদের সেজখুড়ির ভাই এসেছে। শুনে শুনে তাজ্জব হচ্ছে বোধ হয় ভদ্রলোকের ছেলেটা!'

বলা বাহুল্য চুপ হয়ে গিয়েছিল সকলেই।

প্রভাসও এতেই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল, সহসা শুনতে পেল বড়দার একটা নিতান্ত ছোট ছেলে বলে উঠলো, 'সেজকাকা, মেজখুড়িমা আমাদের আবার গাইতে বলেছেন। বলছেন "এটা কেত্তন নয়"।'

প্রভাস শেষ কথাটা শোনে না, প্রথমটাই শোনে।

অসহ্য বিস্ময়ে বলে, 'আবার গাইতে বললেন!'

'হ্যাঁ গো।৻ বলছেন এ গান সবাইয়ের শেখা দরকার। এর পরে "বন্দেমাতরং" শেখাবেন।'

'খবরদার!' প্রভাস হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, 'ভেবেছেন কি তোদের মেজখুড়ি? হাতে দড়ি পরাতে চান আমাদের? বলে দে, চলবে না ওসব। এ ভিটেয় বসে এত বাড়াবাড়ি চলবে না।'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে জবাব দেয়, 'মেজখুড়িমা বলছেন, বাড়িসুদ্ধু সকলের ওপর আপনার শাসনই চলবে? আর কারুর কোনো ইচ্ছে চলবে না?'

ছেলেটা কথা শিখেছে তোতাপাখীর মত। কথার গুরুত্ব কি, ওজন কি, তা শেখে নি, তাই বলতে পারে এত কথা। আর সব কটা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। সেজকাকার মুখের ওপর কথা! এ কি ভয়ঙ্কর অঘটন!

তা 'সেজকাকা' নিজেও সেই বিস্ময়েই প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর মুখের ওপর কথা! অবশ্য স্তব্ধতাটা মুহূর্তের। পরক্ষণেই মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করে ওঠেন তিনি, 'বটে! বাড়িতে তা হলে এখন এইসব কুশিক্ষার চাষ চলছে? তা নিজের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন খান, পরের ছেলের মাথাটি চর্বণ করা হচ্ছে কেন?...খোকা, উঠে আয় বলছি! চলে আয় ও ঘর থেকে...আর বলে আয় তোর মেজখুড়িকে, না, চলবে না। যার না পোষাবে, সে যেন পথ দেখে।'

এরপরই বজ্রপতন হয়।

এবার আর "খোকা" নয়, স্বয়ং মেজবৌ-ই দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। খোকাকে মাধ্যম মাত্র করে বলে, 'খোকা, জিজ্ঞেস কর তোর সেজকাকাকে, উনিই কি এ বাড়ির কর্তা? ইচ্ছেমত কাউকে রাখতে পারেন, কাউকে তাড়াতে পারেন? তা যদি হয়, বলুন পষ্ট করে, কালই "পথ" দেখবো। কিছু না জোটে, গাছতলা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!'

তা অঘটনও ঘটে পৃথিবীতে।

নইলে এই দুঃসহ স্পর্ধা প্রকাশের পরও সুবর্ণ সোজা সতেজে দাঁড়িয়ে থাকতে পায়: আকাশের বাজ তো পড়েই না তার মাথায়, স্বয়ং সেজকর্তাও তেড়ে গিয়ে মেরে বসেন না। বরং হঠাৎ যেন লোকটা ভাষা হারিয়ে মূক হয়ে যায়।

তারপর, কথা যখন কয়, যেন শিথিল সরল ভঙ্গীতে। চলে যেতে যেতে বলে, 'আমারই ঘাট হয়েছে, তাই শাসন করতে এসেছিলাম। পাশের ঘরে একটা কুটুমের ছেলে বসে, লজ্জা হল, তাই আস্পর্দা প্রকাশ করতে এসেছিলাম। যাক্, তোদের খুড়ি চৈতন্য করিয়ে দিয়েছে। রাতদিন বই কাগজ নিয়ে পড়ে থাকা বিদুষী মেয়েমানুষ, হবেই তো এসব! তবে বলে দে খোকা তোর খুড়ীকে, এ বাড়িতে তাঁর ভাগ রয়েছে বলেই যে যা খুশি করতে পারেন তা নয়, তা হলে তো বোমাও করতে পারেন তিনি।'

চলে যায় প্রভাস, তীব্র বিদ্বেষে মুখ কালি করে।

বলা বাহুল্য, পদ্য মুখস্থর পাঠশালা আর বসানো যায় না, সুর কেটে যায়।

কিন্তু শুধুই কি 'সেদিন'?

নাকি শুধু পদ্যর ক্লাসের 'সুর'?

কান্না! কান্না!

কটু কুৎসিত কদর্য কান্না!

শুনলে করুণা আসে না, মায়া আসে না, আসে বিতৃষ্ণা।

গিরিবালা পোস্ত বাটতে বাটতে বলে, 'মেজদির এই শেষ নম্বরেরটি যা হয়েছে—উঃ! গলা বটে একখানি। মানুষের ছা কাঁদছে কি জন্তু জানোয়ার চেঁচাচ্ছে—বোঝবার জো নেই।'

'জন্মাবধি রুগ্ন যে—', বলে উমাশশী।

'তুমি আর জগৎসুদ্ধ সবাইয়ের দোষ ঢেকে বেড়িও না দিদি', গিরিবালা ঠেস দিয়ে বলে, 'কে যে তোমায় কি দিয়ে রাজা করে দিচ্ছে, তুমিই জানো!'

'দোষ ঢাকা আবার কি!' উমা অপ্রতিভ হয়, 'রুগ্ন তাই বলছি।'

গিরিবালা কাজ সেরে শিল তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'আমার এই হয়ে গেল বাবা, চললাম এবার। উনুন দুটো তো জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল. যার পালা তার হুঁশ নেই!'

উমার ধারণা ছিল এবেলার পালাটা আজ ছোটবৌয়ের. তাই বলে, 'কোথায় ছোটবৌ?'

'ছোটবৌ? কেন ছোটবৌ কি করবে? পালা তো মেজদির!'

'ওমা সে কি! আজ বুধবার না?'

'বুধবারই! কিন্তু গেল হপ্তায় ছোটবৌয়ের বাপেরবাড়ি যাবার গোলমালে পালা বদলে গেল না?'

উমাশশী বড়ো, উমাশশী নির্বোধ, উমাশশী গরীবের মেয়ে। আবার উমাশশী কিছুটা প্রশংসার কাঙালও। তাই উমাশশী একাই সংসারের অর্ধেক কাজ করে।

প্রতিদিন সকালে এই রাবণের গোষ্ঠীর রান্না সে একাই চালায়। আর তিনজনে পালা করে বিকেলে।

সুবর্ণ অনেকবার প্রস্তাব করেছে একটা রাঁধুনী রাখবার। মাইনে সে একলাই দেবে। একটা ভদ্র বামুনের ঘরের আধাবয়সী বিধবা খুঁজলে না মেলে তা নয়। কিন্তু উমাশশী শাশড়ীর 'সুয়ো' হতে সে প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, 'ওমা, আমরা হাত পা নিয়ে বসে থাকবো, আর বামনীতে রাঁধবে, ছিঃ!'

সুবর্ণ বলেছে, 'তবে মরো রেঁধে রেঁধে! আমার দ্বারা তো একদিনও সকালে সম্ভব নয়। ওদের লেখাপড়া তাহলে শিকেয় উঠবে।'

উমা বিগলিত স্নেহে বলেছে, 'ওমা, আমি থাকতে সকালবেলা আবার তোরা কেন? সকালবেলা তো আমিই—'

'জানি, তুমিই চালাচ্ছো! হাড়-মাস পিষছো! কিন্তু সেটা বারো মাস দেখতেও ভাল লাগে না। তোমার মেজদ্যাওর তো করছে বেশি বেশি রোজগার, দেবে অখন মাইনেটা—'

উমাশশীই 'না না' করেছে।

অতএব সুবর্ণর আর বিবেকের দংশন নেই। কিন্তু কে বলবে কেন উমাশশীর এমন বোকামী! কেন সে অবিরত সংসারে সকলের মন রাখার চেষ্টা করে মরে? মন কি সত্যিই কারো রাখতে পেরেছে?

মন রেখে রেখে কি কখনো কারো 'মন রাখা' যায়?

যায় না।

শুধু সেই মনের দাবি আর প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাত্র। আর সেই ব্যর্থ চেষ্টা অবিরতই তাকে অবজ্ঞেয় করে তোলে।

উমাশশী বৃথা চেষ্টার বোঝা চাপিয়ে চাপিয়ে জীবনটাকে শুধু ভারাক্রান্তই করে তুলেছে, মন কারো রাখতে পারে নি। মুক্তকেশী সর্বদাই তার উপর ব্যাজার! মুক্তকেশী তোয়াজ করেন উকিল ছেলের বৌকে!

কেন করেন সেটাই আশ্চর্য!

এও এক মনস্তত্ত্ব।

নচেৎ টাকার সচ্ছলতা যদি কেউ তাঁকে দেয়, সে তো মেজছেলে। তবু সেজবৌকে ভয় করেন, তোয়াজ করেন।

ছোঁয়াচ লাগার মত উমাশশীও করে। তাই ভয়ে ভয়ে বলে, 'মেজবৌয়ের মেয়ে আজ যা কাণ্ড করছে, ও আর পেরেছে!'

'না পারেন, যে পারে করুক! আমি বাবা উনুনের ছায়াও মাড়াচ্ছি না। আমার পালার দিনে কি কেউ হাঁড়ি ধরতে আসবে?' বলে "দুম দুম" করে চলে যায় গিরিবালা।

সুবর্ণ নামে না।

খবরটা দোতলায় ছড়িয়ে পড়ে। অসন্তোষ আর সমালোচনার কলগুঞ্জন প্রবল হয়ে ওঠে। এবং সব ছাপিয়ে প্রবলতর হয়ে ওঠে কান্না।

কান্না, কান্না, কুৎসিত কান্না!

ওই আর্তনাদ যেন এই অন্ধকূপ থেকে আকাশে উঠতে চায়।

'বাড়িতে কি হচ্ছে কি?' তীব্র চীৎকার শোনা যায় প্রভাসচন্দ্রের। তাসের আড্ডা থেকে উঠে এসেছে লজ্জায় আর বিরক্তিতে। মেজাজ তাই সপ্তমে।

'বলি, কাঁদছে কোনটা! মেজবৌয়ের শেষ নম্বরেরটা না? মেজবৌ বাড়ি নেই নাকি?'

বাড়ি!

থাকবেন না আবার কেন?

বাড়ি ছেড়ে আবার যাবেন কোথায়?

মেয়ে কোলে নিয়েই বসে আছেন।

'কোলে নিয়ে বসে আছেন? প্রভাস বিরক্তির সব বিষটা উপুড় করে দিয়ে চলে যায়, 'তবু গলা বন্ধ করতে পারছেন না? মেয়ের গলার এমন শাঁখের বাদ্যি? মুখে একমুঠো নুন দিতে বল, বন্ধ হয়ে যাবে!'

চলে যায়।

ঈশ্বরের দয়া, সুবর্ণলতার কানে পৌঁছয় না এই হিত পরামর্শটুকু! সুবর্ণলতার কানের পর্দা কান্নার শব্দে ফেটে যাচ্ছে তখন।

ওদিকে রান্নাঘরে ঝড় উঠেছে।

উমাশশীই হাঁড়ি চড়াবার ভার নিচ্ছিল, প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে সেজবৌ আর ছোটবৌয়ের পক্ষ থেকে। সুবর্ণকেই বা এত আস্কারা দেবে কেন উমাশশী? যার পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে, তার ঘরে তো নিত্যি রোগ লেগে থাকবেই, তাই বলে ওই ছুতোয় সে দিব্যি পার পেয়ে যাবে?

কই বলুক দিকি কেউ, সেজবৌ ছোটবৌ কোনোদিন 'পালা' ফাঁকি দিয়েছে! তাদের নিজেদের ঘর হেজে যাক মজে যাক, তবু সংসারের কাজ 'খাজিয়ে' দিয়ে চলে গেছে। মেজগিন্নীই বা কী এমন সাপের পাঁচ পা দেখেছে যে ইচ্ছামত চলবে?

উমাশশী যদি এইভাবে একচোখোমি করে, তারাও ছেলের সর্দিটি হলেই কাজে কামাই দেবে, এই হচ্ছে শেষ কথা!

উমা ভয়ে ভয়ে হাঁড়িখানাকে তাক থেকে নামিয়ে, চালের গামলা হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। জোর করে কর্তব্য করবার সাহসও তার নেই।

একথা বলবার সাহস নেই, তোমাদের তো কর্তে হচ্ছে না বাপু, তবে অত গায়ের জ্বালা কেন?

কিন্তু কেন যে গায়ের জ্বালা, সে কথার উত্তর কি নিজেরাই জানে ওরা? যেখানে 'ছোট কথা' ছাড়া আর কোনো কথার চাষ হয় না, সেখানে 'বড় কথা', 'মহৎ কথা' তারা পাবে কোথায়? ছোট কথাই জ্বালার জনক।

'মেয়ে নিয়ে ঘরে বসে সোহাগ হচ্ছে? তোমার না আজ রান্নার পালা?'

ঘরের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘায়ের মত একটা হুমকি এসে পড়ে।

নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দনে শক্ত হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে চুপ করাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেই কাঁদো-কাঁদো হচ্ছিল সুবর্ণ, এই শব্দে চমকে পিছন ফিরে তাকায়। তার পরই অগ্রাহ্যভরে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'পালা বজায় রাখতে যাবার মত অবস্থা দেখছো যে!'

এইমাত্র নীচে বহুবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে এসে প্রবোধচন্দ্রের মেজাজ খাপ্পা, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'তোমার অবস্থা অপরে শুনবে কেন শুনি? ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাও। মেয়ে নিয়ে এত আদিখ্যেতা!'

সুবর্ণলতা তেমনি আগ্রহের গলায় বলে, 'কার কাছে ফেলে যাবো শুনি? তুমি সামলাবে?'

'আমি? আমি সামলাতে বসবো তোমার ওই গুণধরী মেয়েকে? আমায় তো ভূতে পায় নি?'

'আমার মেয়ে! একা আমার মেয়ে! সামলাতে ভূতে পায় তোমায়? বলতে

লজ্জা'করল না?' উগ্রমূর্তি সুবর্ণলতা উঠে বসে, 'আর যদি এ ধরনের কথা বল, মান-মর্যাদা রাখবো না বলে দিচ্ছি!'

প্রবোধ এ মূর্তিকে ভয় পায়।

তত্রাচ ভয় পাওয়াটা প্রকাশ করে না। বলে, 'ওঃ, মান-মর্যাদা রেখে তো উল্টে যাচ্ছ! এখন যাও নিজের মান রাখো তো, পালাটা সেরে দিয়ে এসো!'

'আমার মান এমন ঠুনকো নয় যে তাও বজায় রাখতে পিশাচী হতে হবে!'

মেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে সুবর্ণ।

ভংগীতে অবহেলা অবজ্ঞা।

প্রবোধচন্দ্রের গায়ের রক্ত ফুটে ওঠে, তীব্রস্বরে বলে, 'শুনে যে? ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? রোজ রোজ তোমার ভাগের কাজই বা অন্যে করে দেবে কেন শুনি? যাও উঠে যাও। একটু কাঁদলে মেয়ে মরে যাবে না।'

সুবর্ণলতা তথাপি ওঠে না।

শুয়ে শুয়েই বলে, 'একটা রাতে না খেলেও কেউ মরে যাবে না।'

না খেয়ে!

এ কি সাংঘাতিক শব্দ!

তার মানে উঠবে না! শক্ত পাথর মেয়েমানুষ!

অতএব অন্য সুর ধরতে হয় প্রবোধকে। নরম সুর।

'পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে, গায়ে পেতে নেবেই বা কেন? এতে তোমার লজ্জা হয় না?'

সুবর্ণ আবার উঠে বসে।

উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'না হয় না! আমার লজ্জা-সরমের জ্ঞানটা তোমাদের সংগে মেলে না। আমার কাছে তার চাইতে অনেক বেশি লজ্জার, নিন্দুকের মুখের দুটো "কথা" শোনার ভয়ে রুগ্ন সন্তানের দুর্দশা করা! যারা অমন করে তারা মা নয়, শয়তান, মা নয়, পিশাচী।'

'তারা শয়তান? তারা পিশাচী!'

'নিশ্চয়! শয়তান, স্বার্থপর, মহাপাতকী!'

'তোমার সবই সৃষ্টিছাড়া!'

'হ্যাঁ, আমার সবই সৃষ্টিছাড়া। কী করবে? ফাঁসি দেবে?'

'আমি বলছি তুমি যাও, মেয়ে আমি দেখছি—'

'না!'

না, সুবর্ণ সেদিন রাঁধতে নামে নি।

উমাশশীই রেঁধেছিল শেষ পর্যন্ত।

আর আশ্চর্য, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নেমে এসে অম্লান বদনে সেই ভাত খেয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ! ডাকতে পর্যন্ত হয় নি, হঠাৎ এক সময় রান্নাঘরে এসে জল-কাদার উপর মাটিতেই ধপাস করে বসে পড়ে বলেছে, 'এই-বেলা আমায় চারটি দিয়ে দাও তো দিদি। অনেক কণ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।'

এত বড় বেহায়া মেয়েমানুষ, তবু মুক্তকেশী আশা করেছিলেন, আজ হয়তো সকালবেলার রান্নার ভারটা মেজগিন্নী নেবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হল না।

সকালবেলায় দেখা গেল মেয়েটার গায়ে হাম বেরিয়েছে।

কান্নার হদিস পাওয়া গেল।

এবং রান্নার ভরসাও গেল।

একদিন আধদিন নয়। এখন অনেক দিন।...

বলবার কিছু নেই। এ রোগ কারো হাতধরা নয়!

কিছু নেই।

তবু বলাবলি হয়। সকলের মধ্যেই হয়।

কিন্তু সেই বলার মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর পড়লো। বেলা বারোটা নাগাদ জগু এসে হাজির হলো, একটা আধাবয়সী বিধবা বামনী সঙ্গে নিয়ে।

'কই গো পিসি, এই নাও তোমার রাঁধুনী। কি করতে-টরতে হবে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। মা বলেছে কাজকর্ম ভাল হবে।'

মুক্তকেশী অবাক গলায় বলেন, 'রাঁধুনী আনতে হুকুম করলো কে তোকে?'

জগু মেয়েলী ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'শোন কথা! তোমার নিজের ব্যাটাই তো বলে এলো গো! মেজ পুত্তুর! বললো, মেজবৌমার খুকীর হাম বেরিয়েছে, ওদিকে বড়বৌমার খেটে খেটে জান নিকলোচ্ছে, সংসারের অচল অবস্থা, রান্নাবান্নার জন্যে একটি বামুনের মেয়ে চাই। তোমার দেখি সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা!'

মুক্তকেশী একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেজবৌয়ের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'বুঝেছি! কামরূপ কামিখ্যের ভেড়াটা ছাড়া এ কাজ আর কার হবে! তবে আমি এখনো মরি নি জগা, আমার জীবদ্দশায় রাঁধুনী ঢুকতে দেব না বাড়িতে!'

জগা বীরদর্পে বলে, 'দেবে না? বললেই হল? তুমি ওদের আঁশ-হাঁড়ি নাড়বে?'

'আমি? আমার মরণ নেই?'

'তবে?'

'যারা করবার তারাই করবে! লোকের দরকার নেই জগা! মিথ্যে বামুনের মেয়েকে আশা দিয়ে নিয়ে এসে নিরাশা করা!'

জগু যে জগু, সেও এ পরিস্থিতিতে থতমত খায়।

অনুরোধ মাত্র লোক জুটিয়ে আনার মহিমায় উৎফুল্ল হচ্ছিল, কিন্তু এ কী?

বোকার মত বলে, 'তাহলে বলছো দরকার নেই?'

মুক্তকেশী সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হয় না। সহসা সেই ভরদুপুরে শুকনো আকাশ থেকে বজ্রপাত হয়।

সেই বজ্রে ধ্বংস হয়ে যায় সভ্যতা, ভব্যতা, সামাজিক নিয়মনীতি।

আর ধ্বংস হয়ে যায় মুক্তকেশীর পদমর্যাদার মহিমা।

হঠাৎ দরজার ওদিক থেকে সুবর্ণর পরিষ্কার গলার দ্বিধাহীন ভাষা উচ্চারিত হয়, 'আছে দরকার! মা, ভাসুরঠাকুরকে বলে দিন যেন রেখে যান ওঁকে!'

মুক্তকেশী স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলেন, 'আছে দরকার! রেখে যাবে! আমি মানা করছি, তার ওপর তুমি এলে হুকুম চালাতে!'

'হুকুম চালাচালির কথা নয় মা! অবুঝের মতন রাগ করলে তো চলবে না। দিদি একা আর কত দিক দেখবেন? বামুনের মেয়ের কথা আমিই বলে

পাঠিয়েছি।...বামুনদি, তুমি এসো তো এদিকে—'

'জীতা রহো।' চেঁচিয়ে ওঠে মুখ্যু জগু, 'এই তো চাই! আমার পিসিটির এই রকম শিক্ষারই দরকার ছিল।'

মুক্তকেশীর সংসারে যুগ-প্রলয় ঘটে।

মুক্তকেশীর কলমের উপর নতুন কলম চলে।...মুক্তকেশীর সংসারে মাইনে করা রাঁধুনী ঢোকে!

এ যেন অনিবার্য অমোঘের একটা চিহ্ন!

তা বোধ করি এই প্রথম বিন্দু আর গিরিবালা সুবর্ণলতার তেজ আস-পর্দার সমালোচনা না করে তার উপর প্রসন্ন হয়।

বাঁচা গেল বাবা!

শুধু উমাশশীরই মনে হয় সে যেন সর্বহারা হয়ে গেছে!

রান্নাঘর থেকে চ্যুত হলে কিসের দামে বিকোবে উমাশশী? মূলহারা এই দিনগুলোকে নিয়ে করবে কি?

যখন তখন চোখে জল আসে তার।

আর বামুনদির পায়ে পায়ে ঘোরে তার সাহায্যার্থে।

তবু তো বোঝা যাবে, কিছুটা প্রয়োজন আছে উমাশশীর!

সুবর্ণলতার মত সে নিজের উপস্থিতির জোরেই নিজেকে মূল্যবান ভাবতে পারে না।

॥ ২৫ ॥

কালো শুঁটকো পেটে-পীলে ছেলেটার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'ওকে বাড়িতে জায়গা দিতে হবে? কী করবো ওকে নিয়ে?'

জগু তার বাইরের 'বাবু সাজ' আধময়লা ফতুয়াটা খুলে উঠোনের তারে ছড়িয়ে দিতে দিতে অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'করবে আবার কি, সময়ে দুটো ভাত-জল দেবে, খানিক পাঁচন সেদ্ধ করে দেবে, আর কি! মাথায় করে নাচতে বলি নি।'

শ্যামাসুন্দরী ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'মাথায় করে নাচার আবার হাত-পা কি আছে? সময়ে দুটো ভাত-জল দেব, পীলে পেটের জন্যে পাঁচন সেদ্ধ করে দেব, কেন কি জন্যে?'

'কি জন্যে, সেকথা তো রাজকন্যেকে বলা হলো আগেই। মা নেই, দিদিমা পুষতো, সেটাও পটল তুলেছে, কে দুটো ভাত দেয় তার ঠিক নেই।'

'ওঃ, আমাকেই তাহলে ওর দিদিমা হতে হবে?' শ্যামাসুন্দরী মানবিকতার ধার ধারেন না, বলেন, 'তুই আর আমার সঙ্গে জ্ঞাতশত্রুরতা করিস না জগা, চিরটা কাল জ্বলে পুড়ে মরলাম। জগতে অমন ঢের মাতৃহারা আছে, সবাইকে দয়া করতে পারবি তুই?'

'সবাইকে পারবার বায়না নেবে জগা, এমন মুখ্যু বামুন নয় মা', জগু

দৃপ্তস্বরে বলে, 'একটার কথাই হচ্ছে।'

'না হবে না—', শ্যামাসুন্দরী আরো দৃপ্ত হন, 'বলে আমার কে ভাত-জল করে তার ঠিক নেই, হিতৈষী ছেলে এলেন আমার ঘাড়ে একটা রুগী চাপাতে। রাগ বাড়াস নে জগা, যেখানকার নিধি, সেখানে রেখে আয়।'

জগা অবশ্য মায়ের এই শাসনবাক্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বলে, 'রেখে আসবার জন্যে নিয়ে এলাম যে! এই ছোঁড়া, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? নতুন দিদিমাকে পেন্নাম কর! দেখছিস—কেমন ভগবতীর মতন চেহারা! ..এই এই খবরদার, পায়ে হাত নয়, দূরে থেকে আলগোছে। তুই বেটা এমন কি পুণ্যি করেছিস যে আমার মায়ের চরণস্পর্শ করবি! পেন্নাম করে বোস ওখানে।...মা, ছোঁড়াকে দুটো জলপানি দাও দিকি, খিদেয়-তেষ্টায় "টা টা" করছে। দেখো আবার দুঃখীর ছেলে বলে খানিক "আকোচ-খাকোচ" ধরে দিও না! দেখছো তো পেটের অবস্থা? এক-আধটা রসগোল্লা-ফোল্লা আছে ঘরে?'

শ্যামাসুন্দরী ছেলেকে চেনেন, ওই পীলে-পেটাকে যে আর নড়ানো যাবে না, রসগোল্লা খাইয়ে রাজসমাদরেই রাখতে হবে, তা তিনি নিশ্চিত অবলোকন করছেন। তবু সহজে হার স্বীকার না করে ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'না থাকে আনতে কতক্ষণ! এখুনি তো ছুটতে পারো তুমি! কিন্তু বাড়িতে না-হক একটা পুষ্যি বাড়াতে আমি পারব না জগা, বয়েস বাড়ছে বৈ কমছে না আমার! পারব না আর খাটতে—'

জগু এবার উদ্দীপ্ত হয়।

বলে, 'মা তুমি যে দেখছি তোমার ননদের ওপর এককাঠি সরেস হলে! মুখ ফুটে বলতে পারলে এ কথা? ওর জন্য কালিয়া পোলাও রাঁধতে হবে, বলেছি এ কথা? দুবেলা দুমুঠো "পোরের" ভাত আর কাঁচকলা সেদ্ধ, এই তো ব্যাপার। লোকে গরু পোষে কুকুর বেড়াল পোষে, আর একটা মানুষের ছেলেকে দূর দূর করছো? ছি ছি!'

'তা সে তুই আমায় শতেক "ছি" দে'—শ্যামাসুন্দরী অনমনীয় গলায় বলেন, 'বুড়ো বয়সে একটা খোকা পুষে তার "পোরের" ভাত রাঁধতে বসতে পারব না, ব্যস্। ভারী হিতৈষী ছেলে আমার! সেই যে বলে না—ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি, কি দিবি তাই বল, তোর হয়েছে তাই।'... শ্যামাসুন্দরী সহজে একসঙ্গে এত কথা বলেন না, কিন্তু আজ ছেলের গোঁয়াতুমি বায়নায় মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে তাঁর। পাড়ার একটা ছুতোরের ছেলে, তার দিদিমা মরেছে কি ঠাকুমা মরেছে, তাব ভাত রাঁধবার লোক নেই, এই যুক্তি দিয়ে কিনা একটা রুগীকে এনে মা'র গলায় গেঁথে দিতে চায়!

বামুনের ছেলে হলেও বা ভবিষ্যতের একটা আশা ছিল। দিনে অদিনে, কিছু না হোক, জগাকেও এক ঘটি জল দিতে পারতো! কিন্তু এ কি!

ছুতোরের ছেলে!

একেবারে জল অচল!

তারপর শক্তপোক্ত নয় যে চাকরের কাজও করবে।

তবে?

শুধু শুধু কেন শ্যামাসুন্দরী এই নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে অত বড় একটা ঝঞ্ঝাট ঢোকাবেন? একটা আট-দশ বছরের ছেলে, সে তো খোকার সামিল। বুড়ো বয়সে একটা খোকা পুষবেন শ্যামাসুন্দরী?

রেগে বলেন, 'গরু পুষে দুধ আসে, কুকুর বেড়ালেও উপকার আছে, এর থেকে কি উপকার পাওয়া যাবে?'

'উপকার!'

জগু হঠাৎ সত্যিকার রেগে ওঠে।

ফুলে দেড়া হয়ে উঠে বলে, 'উপকার পাবে কি না ভেবে তবে তুমি দয়া দেখাবে? থাক্ মা, দরকার নেই, তোমার ওই ওজন-করা দয়ায় দরকার নেই। উঃ, এমন কথা শোনার আগে জগার মরণ হোল না কেন! ঠিক আছে, ভাত তোমায় রাঁধতে হবে না, জায়গাও দিতে হবে না। চল রে নিতাই—ভুল করে এনেছিলাম তোকে, বাড়িটা যে জগার বাপের নয়, সেটা খেয়াল ছিল না।'

ছেলেটার হাত ধরে টান দেয় জগু।

বলে, 'ভালো বাড়িতে এনেছিলাম তোকে, শিক্ষা পেলি ভালো! এরপর আর কখনো বামুনবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াস নি। হ্যাঁ, বরং কসাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় চাইবি, তবু বামুনবাড়ি নয়।..কী কথা কানে শুনলাম, ছি ছি! কিনা ওকে যে আমি দয়া করবো, ও আমার কি উপকারে আসবে?'

জগু বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়।

শ্যামাসুন্দরী প্রমাদ গণেন।

বোঝেন জগু সত্যি রেগেছে।

আর সত্যি রাগলে পাঁচ দিন জলস্পর্শ করবে না!

উপায় নেই। ছোঁড়াকে গলায় গাঁথতেই হবে। তবে নরম হওয়া তো চলবে না, তিনিও জগুর মা? তাই তীব্রস্বরে বলেন, 'দেখ জগা, রাগ বাড়িয়ে দিস নে! যা দিকিনি এক পা, দেখি কেমন যাস!'

'যাব না? তোমার কথায় নাকি?' বলে হঠাৎ পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জগু, এবং উচ্চ উদাস স্বরে বলে, 'দেখ্ নিতাই, দেখে নে, এত বড় একটা বুড়ো মর্দার মান-প্রতিষ্ঠাটা একবার দেখে নে। রাগ করে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা-টুকুও নেই। এই অসহায় অবলা জীবটাকে আবার একটা মনিষ্যি জ্ঞান করে তোর বাবা মুরুব্বী ধরেছে। হুঁ!'

দাওয়ায় এসে বসে পড়ে নিতাইকে কাছে নিয়ে। যেন সেও ওর মতই বাইরে থেকে প্রার্থী হয়ে এসেছে। নিতাই বিস্ময়াহত দৃষ্টি মেলে বসে থাকে।

শ্যামাসুন্দরী আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে একখানা শালপাতায় করে পয়সায় দুগণ্ডা রসমুণ্ডির গোটাচারেক এনে ধরে দিয়ে জোরালো গলায় বলেন, 'কলে মুখ দিয়ে জল খাওয়া চলবে, না গেলাসে করে দিতে হবে?'

সহসা জগু অন্যমূর্তি ধরে।

যেন সে মানুষই নয়।

চড়া গলায় বলে, 'গেলাসে করে জল দিতে হবে? কেন, আমার গুরু-পুত্তুরের ঠাকুর্দা এসেছে? কলে মুখ দিয়ে জল ওর ঘাড় খাবে না? দেখ্ নিতাই, ওসব রাজকায়দা যদি করতে আসিস, পোষাবে না! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কন্যা তোকে খাবার জল গড়িয়ে দেবে, আর তুই তাই খাবি? ছি ছি! হ্যাঁ, একথা যদি বলিস, "এই রসমুণ্ডি ক'টা আমার জঠরাগ্নির কাছে নস্যি হল গো দিদিমা, আর গোটা চার-পাঁচ দাও", সে আলাদা কথা! ক্ষিদের কাছে চক্ষুলজ্জা নেই। তা বলে "কলে জল খাব না" এ বায়না করতে পাবি না।'

শ্যামাসুন্দরী কড়া চোখে একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে আবার

একেবারে পুরো এক পয়সার রসমুণ্ডি এনে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'আর কিন্তু নেই জগা! কাল চার পয়সার এনেছিলি, তার দরুন গোটাকতক ছিল।'

জগু হৃষ্টগলায় বলে, 'ব্যস্ ব্যস্, ওতেই হবে। আর কত চাই? হ্যাঁ রে নিতাই, শরীরে বল পাচ্ছিস? যে হাজ হয়েছে, ওটাই প্রধান দরকার!...নিজে থেকে মনে করে করে দুধ চেয়ে নিয়ে খাবি, বুঝলি? এই যে ভগবতীকে দেখছিস, এনার কাজের সীমা-সংখ্যা নেই। ইনি যে হুঁশ করে তোকে ডেকে ডেকে দুধ খাওয়াতে বসবেন তা মনে করিস না।'

মা'র প্রতি এই কর্তব্যটি সেরে জগু হৃষ্টচিত্তে বসে পড়ে বলে, 'যাক বাবা, আমার একটা দায় ঘুচলো। মাতৃহীনকে মায়ের কোলে ফেলে দিলাম।'

শ্যামাসুন্দরী ছেলের দিক থেকে এদিকে চোখ ফেলে তীব্র স্বরে বলেন, 'এই ছেলেটা, তোর নাম কি?'

নিতাই এসেই যে পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল, তাতে তার কথা কওয়ার সাহস ছিল না, কিন্তু এখন চুপ করে থাকাও শক্ত। তাই সাবধানে নিজের নাম বলে।

'নিতাই।'

'ও কি নাম বলার ছিরি রে নিতাই,' জগু সদুপদেশ দেয়, 'ভদ্রলোকের মত বলবি, শ্রীনিতাই দাস। নেহাৎ চাকর-বাকরের মত থাকলে তো চলবে না! ভদ্দর লোকের মতন থাকতে হবে।'

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন, এ হচ্ছে ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়া! পাছে তিনি ছেলেটাকে চাকরের পর্যায়ে ফেলেন, তাই জগার এই শাসনবাণী। তা তিনিও সোজা মেয়ে নন, তাই কড়া গলায় বলেন, 'চাকরের মত হবে না কি রাজার মত হবে? এই নিতাই, তোর বাপ কি করে রে?'

নিতাইয়ের আগেই জগু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাপ ব্যাটা তো ছুতোর! কাঠ ঘষে আর কি করে? যাক্ গে, ওসব কথা মনে নিতে হবে না। তুই নিজে মানুষ হবি, বুঝলি? ঘর-সংসার দেখিয়ে দিই গে।'

এই সময় বহুকাল পরে মুক্তকেশীর আবির্ভাব ঘটে এবং মুহূর্তেই ছেলেটার দিকে চোখ পড়ে তাঁর। সন্দেহের গলায় বলেন, 'এ ছোঁড়া কে? চাকর রাখলি বুঝি!'

জগু আভূমি সেলাম করে বলে, 'কী যে বল পিসি! জগা রাখবে চাকর! ভারী তালেবর তোমার ভাইপো! কেষ্টর জীব, কেষ্ট যখন যেখানে রাখেন, থাকে।'

শ্যামাসুন্দরী বিদ্রূপের গলায় বলেন, 'তা বটে! অন্তত যে কদিন পোরের ভাত আর রসগোল্লা ভিন্ন সইবে না, সে কদিন এখানেই থাকবে।'

মুক্তকেশী খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জেনে নেন। মুক্তকেশী গালে হাত দেন। তারপর বলেন, 'জাতটা কি?'

এবার জগু মারমুখী হয়।

'জাত নিয়ে কী হবে পিসি? জাত নিয়ে কি হবে? নাতজামাই করবে?'

'শোনো কথা!' মুক্তকেশী বলেন, 'এই তোকে আর আমার মেজবৌমাকে এক বিধাতায় গড়েছে দেখছি! কথা কয়েছ কি অগ্নিমূর্তি! ঘরে-দোরে ঘুরে বেড়াবে, জাত দেখবি না?'

'না দেখবো না। ঘরে-দোরে মশা মাছি পিঁপড়েটাও বেড়ায়। নর্দমা থেকে উঠে এসে বেড়ায়। তখন তো তোমাদের জাতের বিচার দেখি না?...এই নিতাই, চল আমরা অন্যত্র যাই। দুটো বুড়ীতে মিলে কুটকচালে গপ্পো করুক। ওঁরা আবার ধম্মকথা কইতে আসেন! মানুষ কেষ্টর জীব! অতিথি নারায়ণ! যত ফক্কিকারি কথা! মুখের ওপর যে অপমানটা তোমরা ওই অভাগা নারায়ণটাকে করলে বসে বসে, নেহাৎ নারায়ণ বলেই সহ্য করলো। যতই হোক বেটাছেলে! এ লক্ষ্মীঠাকরুণ হলে মনের ঘেন্নায় পাতাল প্রবেশ করতো! মানুষের ছানা দুটো খাবে, সেই নিয়ে খোঁচা দেওয়া!'

জগু গট গট করে বেরিয়ে যায় নিতাইয়ের হাত ধরে।

মুক্তকেশী পিছন থেকে সাবধান করেন, 'কাজটা কিন্তু ভাল করলি না জগু! কে বলতে পারে ছোঁড়া স্বদেশী কিনা! শুনি পুলিসের ভয়ে নাকি অমন কত ছোঁড়া ন্যাকা সেজে—'

কথা থামান।

জগুর কানে প্রবেশ করাবার আশা আর থাকে না।

শ্যামাসুন্দরীর কানে যেটুকু গেছে তাতেই যথেষ্ট! তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'তোমার ভাইপোর জন্যে ভেবো না ঠাকুরঝি! পুলিসই ওর ভয়ে দুর্গা নাম জপবে!...এই বুড়ো বয়সে একটা কাঁচ খোকা এনে আমার গলায় চাপালো, আপত্তি দেখিয়েছি তাতেই রাগ দেখছো তো? যাক্ গে, তোমার খবর কি? অনেকদিন তো আর আসো না!'

মুক্তকেশী বলেন, 'আর আসবো কি! কোমরটা যে দিন দিন শত্তুরতাই সাধছে। বেশী হাঁটতে পারছি না আর। ওই যো-সো করে গঙ্গাচ্ছানটুকু বজায় রাখা! এসেছি একটা খবর দিতে। মেয়ে দুটোর বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি, তাই তোমায় বলতে আসা! একদিন যাবে, ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসে পরামর্শ হবে!'

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন কোন্ মেয়ে দুটো।

মল্লিকা আর চাঁপা, আর কে!

বলেন, 'তা বেশ! কোথায় সম্বন্ধ হলো?'

'বিরাজের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। ঘর-বর ভালো, দুই জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই—'

শ্যামাসুন্দরী সকৌতুকে বলেন, 'তা তোমার মেজবৌ তো ছোটকালে বিয়ে পছন্দ করে না, রাজী হয়েছে?'

'ছোটকালে?' মুক্তকেশী একটু চাপা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন। 'ছোট আবার কোথায় বৌ? তোমার কাছে তো আর কিছু অছাপা নেই? এগারো বলে চালাচ্ছি, তেরো ভরে গেল না? তা মেজবৌমা আমার মুখে চুনকালি লেপেছে! বিরাজের সেই সম্পর্কে ননদ কুটুম্ব-সূত্র ধরে এসেছিল কনে দেখতে। তুই বৌমানুষ, চুপ করে থাক্, বড়বৌমা তো মুখে রা কাড়ে নি। মেজবৌমা তাদের সঙ্গে গলগলিয়ে গপ্পো করে করে বলে বসেছিল, "ওমা, এগারো আবার কি? সে তো দু বছর আগে ছিল! দুজনই ওরা তেরো পুরে গেছে! মা বোধ হয় ভুলে গেছেন। নাতি-নাতনীর সংখ্যা তো কম নয়! ছেলের ঘর মেয়ের ঘর মিলিয়ে কোন্ না পঞ্চাশ!"...সেই নিয়ে কি হাসাহাসি! বোঝো আমার বৌয়ের গুণ!'

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'একটু সত্যিবাদী আছে কিনা—'

ওগো সত্যিবাদী আমরাও। তবে অত সত্যিবাদী হলে তো আর সংসার চালানো যায় না! সব দিক বজায় রাখবে তুমি কিসের জোরে? মানমর্যাদা রক্ষে রাখবে কিসের জোরে! "মিথ্যে"ই ঘরের আচ্ছাদন, "মিথ্যে"ই চালের খুঁটি! সংসার তো করলে না কখনো—'

শ্যামাসুন্দরীর এই মুক্ত জীবনের প্রতি মুক্তকেশীর বরাবরের ঈর্ষা!

শ্যামাসুন্দরী বোঝেন, এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজন। বলেন, 'বোসো ঠাকুরঝি, ডাব কেটে আনি। তা বিয়েটা কবে নাগাদ হবে?'

'হবে, এই শ্রাবণের মধ্যেই দিতে হবে। নচেৎ তিন মাস হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। যেও তা হলে।'

'যাক। তুমি বোসো।' ডাব কাটতে চলে যান শ্যামা।

॥ ২৬ ॥

কিন্তু ভাগ্নেদের মেয়ের বিয়ের পরামর্শ দিতে এসে যে এমন দিশেহারা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে, এমন ধারণা কি ছিল শ্যামাসুন্দরীর?

দেখতে হবে এমন ধারণা তো ছিল না, বিষয়বস্তুটাও ধারণাতীত।

তবু দেখতে হলো।

দেখলেন সুবর্ণলতা ছেলে পিটোচ্ছে। বরাবর শুনে এসেছেন, সুবর্ণলতা নাকি ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। নাকি ছেলে ঠেঙানো তার দু-চক্ষের বিষ। অন্য জায়েরা ছেলে মারলে রাগ করে। বলে, 'তোমার অধীনের প্রজা বলেই তুমি মারবে? তাহলে আর তুমি যার প্রজা, সে-ই বা তোমায় ছেড়ে কথা কইবে কেন?'

সেই সুবর্ণলতা ছেলে পিটোচ্ছে!

অথবা শুধু পিটোচ্ছে বললে কিছুই বলা হয় না। ক্ষ্যাপা জন্তুর মত ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য আক্রমণে তাকে যেন শেষ করে দিতে চাইছে।

বিধ্বস্ত হয়েছে নিজের কেশবেশ, চেঁচাবার শক্তিও বুঝি নেই। শুধু হাঁপাচ্ছে আর মারছে। উল্টেপাল্টে মারছে।

উমাশশী ছাড়িয়ে নিতে পারে নি, পারে নি ছোটবৌ বিন্দু, মুক্তকেশী তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে? মেরে ফেলবে নাকি? ওমা এ কী খুনে মেয়েমানুষ গো! ওগো বেটাছেলেরা যে কেউ বাড়ি নেই গো, আমি এ বৌকে নিয়ে কী করি? অ সেজবৌমা—'

'সেজবৌমা' অর্থে গিরিবালা।

পারেন নি, কারণ ওটাও ধারণা-বহির্ভূত বস্তু।

পরের ছেলেকে এমন মার মারে কেউ?

অবশ্য ছেলেটাই যে নীরবে পড়ে মার খাচ্ছে এমন নয়। চারখানা হাত-পায়ের সাহায্যে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাতেই সুবর্ণলতার

কাপড় ছিঁড়েছে, চুল খুলে গেছে, গুঁড়ো হয়েছে হাতের শাঁখা।

প্রহারের শব্দ, ছেলেটার চীৎকারের শব্দ, বাড়ির অন্যান্য ছোট ছেলেদের ভীত-ক্রন্দন শব্দ আর সুবর্ণলতার অনমনীয় মনের তীব্র ঘোষণার শব্দ, 'মেরেই তো ফেলবো, খুনই করবো! এমন কুলাঙ্গার ছেলের মরাই উচিত।'...

এমন এক অদ্ভুত পরিবেশের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাসুন্দরী।

তারপর ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর ছুটে এসে মল্লযুদ্ধের দুই যোদ্ধার মাঝখানে পড়ে বলেন, 'কি হচ্ছে মেজবৌমা? খুনের দায়ে পড়তে চাও?'

বললেন।

তবু ব্যাপারটার কতটুকুই বা বোঝা হয়েছে তাঁর!

ছেলেটা যে সুবর্ণর নয়, গিরিবালার, তা বুঝতে পারেন নি।

তবু বলে উঠেছিলেন, 'ছেলেটাকে কি খুন করবে মেজবৌমা?'

'হ্যাঁ, তাই করবো।' সুবর্ণলতা ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। ওকে একেবারে জন্মের শোধ খুন করে ফেলে ফাঁসি যাবার বাসনাটাও ঘোষণা করে।

আর এই সময়ই 'ব্যাপারটা' বুঝে ফেলেন শ্যামাসুন্দরী। বুঝে চমকে ওঠেন।

ছেলেটা গিরিবালার।

তার মানে? এই প্রাণঘাতী প্রহারটা দিচ্ছে সুবর্ণ, নিজের ছেলেকে নয়, পরের ছেলেকে?

সুবর্ণ কি তাহলে সত্যই বিকৃতমস্তিষ্ক?

শ্যামাসুন্দরী এ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু শ্যামাসুন্দরী নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'বুঝেছি কোনো ঘোরতর অন্যায় করেছে ছেলেটা, তবু আমিই ওর হয়ে মাপ চাইছি মেজবৌমা!'

এবার এতক্ষণে গিরিবালার মুখে বাকস্ফূর্তি ঘটে, 'আপনি মাপ চাইলেই তো হবে না মামীমা, থানা-পুলিস করে ছাড়বো আমি!'

পরিস্থিতি যাই হোক, গিরিবালার ওই 'থানা পুলিসে'র ঘোষণাটাও ঠিক বরদাস্ত করতে পারলেন না শ্যামাসুন্দরী, অসন্তুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, 'ছি ছি সেজবৌমা, এ কী কথা! এ কথা উচ্চারণ করা তোমার ভাল হয় নি। ছেলে দোষ করেছে, জেঠি দু ঘা মেরেছে, এই তো কথা? বুঝলাম রাগের মাথায় মারটা একটু বেশীই হয়ে গেছে। তা সে তোমার নিজেরও হতে পারতো। তাই বলে জেঠিকে তুমি পুলিসের ভয় দেখাচ্ছ ছেলের সমক্ষে? ছি ছি!'

শ্যামাসুন্দরী নিতান্তই বাপের বাড়ির সম্পর্কে একমাত্র এবং নিতান্তই নিকটজন, তাই মুক্তকেশী তাঁকে যথেষ্ট পদমর্যাদা দিয়ে থাকেন, তবু আজ্ঞ আর দিয়ে উঠতে পারলেন না।

শ্যামাসুন্দরীর বিরূপ মন্তব্যের উপর ছুরি চালান· 'তুমি থামো বৌ! থানা-পুলিসের নাম সেজবৌমা সহজে করে নি। ও তো মা, না কি? এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে সহ্য করেছে, তাতেই বাহাদুরি দাও ওকে! ওই ঘরজ্বালানী পরভোলানীকে বুঝতে তোমার এখনো দেরি আছে বৌ। এতখানি বয়েস হলো, এমন জাঁহাবাজ মেয়ে দেখলাম না কখনো। ছেলেপুলে কোথায় কি খেলা করছে, সেদিকে তোর নজর দেবার দরকার কি? আর দোষের খেলাই বা

কি খেলেছে? বড়বৌমার ছেলেরা সম্প্রতি দারোগা মেসোর বাড়ি ঘুরে এসে গপ্পোগাছা করেছে, তাই শুনে "দারোগা" সেজে খেলবার বাসনা হয়েছে, এই তো কথা? খেলায় ছেলেপুলে কখনো রাজা হয়, কখনো মন্ত্রী হয়, কখনো চোর হয়, কখনো জল্লাদ হয়, সেটা ধর্তব্য?'

ঘটনাটা ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে শ্যামাসুন্দরীর।

দারোগা-বাড়ির গল্প শুনে গিরিবালার ওই বীর সন্তানটি দারোগা সেজে স্বদেশী পাজীদের শায়েস্তা করা করা খেলা করছিল। নিরীহ দু-চারটে কুচো-কাচাকে স্বদেশী সাজিয়ে নিজে জামা টুপি ও বুটজুতোয় সাজ সম্পূর্ণ করে সেই সবুট পদাঘাতের সঙ্গে স্বদেশীদের প্রতি যথেচ্ছ কটূক্তি করার খেলাটা নাকি ইতিপূর্বে দু-একদিন হয়ে গেছে, এবং সুবর্ণলতা নাকি সে কথা শুনে কড়া নিষেধ করে দিয়েছিল।

তথাপি অমন মনোমত খেলাটি সে ছাড়তে পারে নি, আবার আজ তোড়-জোড় করে শুরু করেছিল, আর পড়বি তো পড় খোদ মেজজেঠিরই সামনে।

একেবারে বুটপরা পা তোলার মহামুহূর্তে।

পরবর্তী দৃশ্য ওই।

শ্যামাসুন্দরীর জানা হয়ে গেছে ঘটনাটা, তাই শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'তা ওকেও বলি, জেঠি যখন দু-তিন দিন নিষেধ করেছে, তখন ওই খেলাটিই বা খেলা কেন?'

মুক্তকেশী বিকৃতকণ্ঠে বলেন, 'ভারী আমার মহারাণী এসেছেন সংসারে! তাই সংসারসুদ্ধ লোক ওঁর নির্দেশে ওঠ-বোস করবে!...বেশ করেছে ও ওই খেলা খেলেছে! ওই স্বদেশী মুখপোড়াদের অমনিই শাস্তি হওয়া উচিত। ওই মুখপোড়াদের জন্যেই তো দেশে যত অশান্তির ছিষ্টি হয়েছে। তাছাড়া অপরের ছেলে কি করেছে, না করেছে, তাতে তোর নাক গলাবার কি দরকার? তুই মারবার কে?

শ্যামাসুন্দরীর চিরদিনের দোষ, শ্যামাসুন্দরী ন্যায়পক্ষ সমর্থন করে বসেন।

অন্তত ওঁর কাছে যেটা ন্যায় মনে হয়। তাই শ্যামাসুন্দরী অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'এ তোমার কি কথা ঠাকুরঝি? ছেলে দোষ করলে জেঠি, খুড়ি, ঠাকুমা, পিসিতে শাসন করবে না?'

'করবে শাসন, তাই বলে খুন করে নয়! সেজবৌমা ঠিক কথাই বলেছে, ওর হাতে দড়ি পরানোই উচিত।'

হ্যাঁ, সেই কথাই বলেছে গিরিবালা।

বলেছে, 'ওঁর হাতে যদি আমি দড়ি পরাতে না পারি তো আমার নাম নেই। আমিও একটা উকিলের পরিবার। কিসে কি হয় জানতে বাকি নেই আমার!'

কিন্তু উকিলের পরিবারের সেই দম্ভোক্তি কি সত্যিই কার্যকরী হয়েছিল?

সুবর্ণলতা নামের বৌটার হাতে দড়ি পড়েছিল?

তা যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই চাঁপা ও মল্লিকা নামে মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে ওঠে নি?

সংসারে একটা ভয়াবহ তছনছ কাণ্ড ঘটে গেছে?

তা সেদিনের সেই পরিস্থিতি মনে করলে তাই মনে হয় বটে!

কিন্তু সেসবের কিছুই হয় নি, যথারীতিই সর্ববিধ অনুষ্ঠান সহকারে বিয়ে হয়ে গেছে।

না হবে কেন?

একেই তো 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।'

তাছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষগুলোর মত এমন মজবুত জীব অল্পই আছে।

এরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না। মনে হয় 'গেল গেল সব গেল—', আবার দেখা যায়, কই কিছুই হল না।

আবার যথারীতি সংসারে ভাত চড়ে, ডাল চড়ে, খাওয়া-শোওয়া হয়, কাঁচগুলো বড়ো এবং বড়গুলো বুড়ো হতে থাকে, এবং 'তিন বিধাতা' ঘটিত ওই জীবনলীলা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

মুক্তকেশীর সংসারেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বিয়েতে শাঁক বেজেছে, উলু পড়েছে, লোকজন খেয়েছে, জগু এসে বিরাট হাঁকডাক সহযোগে যজ্ঞি দেখেছে ও পরিবেশন করেছে এবং শ্যামাসুন্দরীও অন্তঃপুরের অনেক কাজ সমাধা করেছেন। এবং মুক্তকেশী নাতজামাইদের নিয়ে রঙ্গরস করেছেন।

মোটের মাথায় অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নি।

শুধু বিরাজ তখন আর একবার মৃত সন্তানের জের টেনে আঁতুড়ঘরে বসে থেকেছে, আসতে পারে নি, আর আসা হয় নি সুবালার।

সুবালার সংসারে তখন দু-দুটো বিপৎপাত।

একে তো ফুলেশ্বরী হঠাৎ মারা গেলেন, তার উপর হঠাৎ ওই অসময়েই ঘাড়ের উপর উঁচোনো খাঁড়াখানা ঘাড়ে পড়লো সুবালাদের।

অম্বিকা ধরা পড়লো।

অম্বিকার জেল হলো।

হবারই কথা।

আশঙ্কার প্রহরই তো গুনছিল। সে যাক্—বিয়েতে যে আসা হল না সেটাই হচ্ছে কথা।

তবে সব শূন্যতার পূরণ হয়ে গিয়েছিল মুক্তকেশীর সুরাজের আসায়।

বিয়েতে সুরাজ এসেছিল।

অবস্থা আরো ফিরেছে, স্বামীর আরো পদমর্যাদা হয়েছে। দুই ভাইঝিকে দু-দুখানা গহনা দিয়েছে।

আর তারপর?

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

তারপর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকগুলো বর্ষা, বসন্ত, শীত, গ্রীষ্মের আসা-যাওয়ার সূত্র ধরে মানুষের চেহারাগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে।

চেহারা?

তা শুধু চেহারাই।

স্বভাব নামক বস্তুটার তো মৃত্যু নেই। ও নাকি মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করে নিজের খাজনা আদায় করে নেয়।

তাই কাঁচা চুলে পাক ধরে, চোখ কান দাঁত আপন আপন ডিউটি সেরে বিদায় নিতে তৎপর হয়, শুধু স্বভাব তার আপন চেয়ারে বসে কাজ করে চলে।

'দিন আর রাত্রির অজস্র আনাগোনায় অনেকগুলো বছর কেটে গেছে কেটে গেছে অনেক বিষণ্ণ প্রহর, অনেক দুঃসহ দণ্ড আর পল। সেদিন যারা জীবন নাটকের খাতাখানা খুলে মঞ্চে ঘোরাফেরা করছিল, অনেক অঙ্ক, অনেক গর্ভাঙ্ক পার হয়ে গেল তারা।

'স্বদেশী' নামের যে দুরন্ত ক্ষ্যাপামিটা তছনছ করে বেড়াচ্ছিল শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খল, সেই ক্ষ্যাপামিটা যেন নিজেরাই তছনছ হয়ে গেল গুলির বারুদে, ফাঁসির দড়িতে, অন্তহীন কারাগারের অন্ধকারে। হারিয়ে গেল অন্য শাসনের আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়ে, চালান হয়ে গেল কালাপানি পারের 'পুলি-পোলাও' নামের মজাদার দেশে!...শুরু হলো পাকা মাথার পাকামি। আলাপ আর আলোচনা, আবেদন আর নিবেদন। এই পথে আসবে স্বাধীনতা।

এঁরা বিজ্ঞ, এঁরা পণ্ডিত, এঁরা বুদ্ধিমান।

এঁরা ক্ষ্যাপার দলের ক্ষ্যাপা নন।

অনেক ক্ষ্যাপার মধ্যে একটা ক্ষ্যাপা অম্বিকা নামের সেই ছেলেটা নাকি কোথাকার কোন্ গারদে পচছে, কিন্তু তার জন্যে পৃথিবীর কোথাও কিছুই কি আটকে থাকলো?

নাঃ, আটকে থাকলো না কিছুই!

শুধু অবহেলা আর অসতর্কতার অবসরে হারিয়ে গেল সুবর্ণলতার জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। ছড়ানো ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো বার বার উল্টে-পাল্টেও কোথাও সেই ইতিবৃত্তের সূত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানে সুবর্ণলতার 'ঘরভাঙা'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে, সুবর্ণলতা ঘর ভেঙে বেরিয়ে এসে আবার ঘর গড়েছে।

কিন্তু অধ্যায়গুলোতে কি নতুনত্ব ছিল কিছু? চাঁপার পর চন্ননের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল : উল্লেখযোগ্য শুধু এইটুকুই। কারণ মানুষের ইতিহাসের বিশেষ তিনটি ঘটনার মধ্যে ওটা নাকি অন্যতম।

তা শুধু ঐ চন্ননের বিয়ে!

তা ছাড়া আর কি?

সুবর্ণলতার বাকি ছেলেগুলোর গায়ের জামার মাপ বাড়তে বাড়তে প্রমাণ সাইজে গিয়ে ঠেকেছিল, এটাও যদি খবর হয় তো খবর। অথবা মুক্তকেশীর

ছেলেদের চুলে পাক ধরেছিল, মুক্তকেশীর কোমরটা ভেঙে ধনুক হয়ে যাচ্ছিল, আর মুক্তকেশীর বৌরা আর শাশুড়ীর দরজায় গিয়ে 'মা আজ কি কুটনো কুটবো?' এই গুরুতর প্রশ্নটা করতে মাঝে-মাঝেই ভুলে যাচ্ছিল—এসবকেও খবরের দলে ফেলতে চাইলে ছিল খবর!

কিন্তু সবচেয়ে বড় খবর তো 'স্বভাব' নামক জিনিসটা নাকি মরে গেলেও বদলায় না। তাই বাকি ঘটনাগুলোর ছাঁচ খুব বেশি বদলেছিল বলে মনে হয় না।

হয়তো সুবর্ণলতা তেমনিই অবিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক সব ঘটনা ঘটাচ্ছিল, হয়তো মুক্তকেশীর মেজ ছেলে তেমনিই সর্বসমক্ষে একবার করে তেড়ে উঠে বৌকে শাসন করছিল, আর একবার করে আড়ালে গিয়ে নাক-কান মলছিল আর পায়ে ধরছিল।...

হয়তো সুবর্ণলতা সেই ঘৃণায় আর ধিক্কারে আবারও ভাবতে বসেছিল কোন্‌টা সহজ? কোন্‌টা বেশি কার্যকরী? বিষ না দড়ি? আগুন না জল? আর শেষ পর্যন্ত কোনোটাই সহজ নয় দেখে রান্নাঘরে নেমে গিয়ে বলছিল, 'বামুনদি, আমায় আগে চারটি দিয়ে দাও তো! শুয়ে পড়ি গিয়ে!'

আর কি হবে?

দর্জিপাড়ার ঐ গলিটার মধ্যে আর কোন্ স্বাদের বাতাস এসে ঢুকবে? আর কোন্ বৈচিত্রের বাণী উচ্চারিত হবে?

তবে বৈচিত্র্যের কথা যদি বলতে হয় তো বলা যায়—মুক্তকেশীর বড়জামাই কেদারনাথ মুক্তকেশীর মুখরক্ষার চিন্তা না করেই দেহরক্ষা করেছেন, আর পেটরোগা সুশীলা হঠাৎ আলোচাল মটরডাল বাটার খপ্পরে পড়ে গিয়ে রক্ত-অতিসারে ভুগছেন। আর বৈচিত্র্য—উনিশ বছরের মল্লিকা বিধবা হয়ে এসে ঠাকুরমার হেঁসেলে ভর্তি হয়ে ইস্তক শুদ্ধাচারের বহর বাড়াতে বাড়াতে হাতে-পায়ে হাজা ধরিয়ে বসেছে।

মুক্তকেশী আক্ষেপ করে বলেন, 'মনে করেছিলাম পোড়াকপালী সর্বখাকী এসে তবু আমার একটু সংসার হলো, আমার হাত-নুড়কুৎ হবে, আমাকে এক ঘটি জল দেবে! তা নয়, আমি এই তিনঠেঙে বুড়ী ঐ দস্যির ভাত রেঁধে মরছি!'

বড় দুঃখেই বলেন অবশ্য।

বৌদের 'পিত্যেশ' জীবনে কখনো করেন নি, এখনও চান যে অহঙ্কারের মাথায় নিজের ভাত নিজে ফুটিয়ে খেতে খেতে চলে যাবেন, কিন্তু কোমরটা বড়ই বাদ সাধছে।

এখন টের পাচ্ছেন কেন বলে, 'কোমরের বল আসল বল!'

মল্লিকাটার কপাল পোড়ায় নিজের কপাল ছেঁচেছিলেন সত্যি, তবু ভেবে-ছিলেন, এ তো পরের মেয়ে নয়, ঘরের মেয়ে, এর কাছে একটু পিত্যেশ করলে অহঙ্কারটা খর্ব হবে না। তা উল্টো বিপরীত। তার ভাত নিয়েই ডেকে ডেকে মরতে হয়, স্নান আর শেষ হয় না তার।

তা ছাড়া বৌরাই বা কে কোথায়?

সেই বাঁধানো সংসার আর নেই এখন। বড়বৌয়ের শরীর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, মেজবৌ বরের পয়সার দেমাকে এ বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বাড়ি হাঁকড়েছেন। সেজ, ছোট, দুই বৌ একই রান্নাঘরে ভিন্ন হাঁড়ি।...মুক্তকেশী

এখন ভাগের মা!

তবু মেজটারই চোখের চামড়া আছে, দূরে থেকেও মুক্তকেশীর ব্যয়ভার বহন করে সে, সময় অসময়ে দেখে, মুক্তকেশীর ইচ্ছেপূরণের খাতে যা খরচাপত্র হয় দায় পোহায়।

সুবোধের সামান্য ক'টি টাকা পেনসন, করবেই বা কি? আর দুটো তো কঞ্জুসের একশেষ।...নিজের সেই জমজমাট সংসার আর দাপটের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে নিঃশ্বাস পড়ে মুক্তকেশীর...নিতান্ত রাগের সময় ঘরে বসে আঙুল মটকানো আর গাল দেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। এমন কি গলাটা সুদ্ধ বাদ সেধেছে, চেঁচিয়ে কাউকে বকতে গেলেই কাশতে কাশতে দম আটকে আসে।...মুক্তকেশী অতএব আঙুল মটকান, আর ভাঙাগলায় থেমে থেমে বলেন, 'মরছেন সব চক্ষুছরদের অহংকার মরছেন! আমিও মুক্তকেশী বামনী, এই বাসিমুখে বলে যাচ্ছি, যে দুগ্‌গতি আমার হচ্ছে, সে দুগ্‌গতি তোদেরও হোক।'

কিন্তু সেই 'ওরা' কারা?

শুধু কি মুক্তকেশীর বৌ ক'টা?

তা বললে অবিচার করা হবে। মুক্তকেশী অত একচোখা নন। মুক্তকেশী তাঁর নিজের মেয়েকেও বলেন। বিরাজ যখন বেড়াতে এসে ভাই-ভাজদের কাছে সারাক্ষণ কাটিয়ে চলে যাবার সময় একবার এ-ঘরে এসে ঢোকে, বলে 'মা কেমন আছ গো?' তখন মুক্তকেশী ভারীমুখে বলেন, 'খুব হয়েছে! আর মা'র সোহাগে কাজ নেই বাছা। যাদের চক্ষুছরদ আছে, তাদের কাছেই বোসো গে।'

আর চলে গেলে বিড় বিড় করেন।

কিন্তু সে তো শেষের দিকে।

সুবর্ণ যখন ঘর ভাঙলো তখন কি মুক্তকেশীর কোমর ভেঙেছিল?

নাঃ, তখনও মুক্তকেশীর কোমর ভাঙে নি!

তখনও মুক্তকেশী কিছুটা শক্ত ছিলেন।

তখন মুক্তকেশীর শাপ-শাপান্তের গলা আকাশে উঠেছে। তখন মুক্তকেশী বৌ 'ভেন্ন' হয়ে যাওয়ায় বুক চাপড়েছেন, নেচে বেড়িয়েছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'আবার মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে। থোঁতামুখ ভোঁতা হবে!'

হবেই।

কারণ ভেন্ন হয়ে বুঝবে কত ধানে কত চাল। এখন পাঁচজনের ওপর দিয়ে সংসারের দায় উদ্ধার হচ্ছে।

কিন্তু মুক্তকেশীর সে 'বাণী' সফল হয়নি।

সুবর্ণ ফিরে আসেনি।

সুবর্ণ সেই 'ভাড়াটে বাড়ি' থেকে 'নিজের বাড়ি'তে উঠে গিয়েছিল।

এজমালি এই বাড়িটার নিজের অংশের ঘরখানা চাবিবন্ধ করে রেখে যায় নি সুবর্ণ, তার জন্যে টাকাও চায় নি। এমন কি ধীরে ধীরে যে দু চারটে আসবাবপত্র জমে উঠেছিল 'কাঁচা-পয়সা'ওলা প্রবোধের, সে-সবেরও কিছু নিয়ে যায় নি।

নিয়ে যায় নি নিজের বাসনপত্র।

শুধু পরবার কাপড়-চোপড় আর শোয়ার বিছানা—এই সম্বল করে বেরিয়ে

পড়েছিল এই গলি থেকে। একদা যে গলিতে ঢুকে মর্মান্তিক রকমের ঠকেছিল সুবর্ণ। নতুন চুনের আর নতুন রঙের কাঁচা গন্ধে ভরা একখানা বাড়ির গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছিল দক্ষিণের বারান্দা খুঁজতে।

অবশেষে দক্ষিণের বারান্দা হলো সুবর্ণলতার! বড় রাস্তার ধারে!

সবুজ রেলিং ঘেরা, লাল পালিশ-করা মেঝে, চওড়া বারান্দা।

সেই বারান্দার কোলে টানা লম্বা বড় ঘর।

পুবে জানালা, দক্ষিণে দরজা।

ঐ পুবটাকে আচ্ছন্ন করে কোনো বাড়ি ওঠে নি। খোলা একখানা মাঠ পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ভোরবেলায় সূর্য-ওঠা দেখতে পাওয়া যায়।

আর কি তবে চাইবার রইল সুবর্ণলতার?

আর কি রইল অসন্তোষ করবার? অভিযোগ করবার? উত্তাল হবার? বিষণ্ণ হবার?

সুখী, সন্তুষ্ট, সব আশা মিটে যাওয়ায় "সম্পূর্ণ" আর পরিতৃপ্ত সুবর্ণলতার জীবনকাহিনীতে তবে এবার 'পূর্ণচ্ছেদ' টেনে দেওয়া যায়।

এরপর আর কি?

বাঙালী গেরস্তঘরের একটা মেয়ে এর বেশি আর কি আশা করতে পারে? আর কোন প্রাপ্যের স্বপ্ন দেখতে পারে?

চরম সার্থকতা আর পরম সুখের মধ্যে বসে একটির পর একটি ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনা, আর বাকি মেয়ে দুটোকে পার করা। এই তো!

তা তাতেই বা কোথায় ঠেক খেতে হবে?

তিনটে ছেলে তো মানুষ হয়ে উঠলই, ছোটটাও হবে নিশ্চিত। লেখা-পড়ায় রীতিমত ভালো। শেষের দিকের মেয়ে দুটো পারুল আর বকুল, দেখতে-শুনতে তো দিব্বি সুন্দরী, কাজেই ওদের নিয়ে ঝামেলা নেই। যে দেখবে পছন্দ করবে। 'পণে'র টাকা দিতেও পিছপা হবে না প্রবোধ।

টাকা সে রোজগারও যেমন করে অগাধ, খরচেও তেমনি অকাতর এখনো। হয়তো এ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে সুবর্ণই। খরচের নেশা!...কিন্তু হয়েছে নেশা!

অতএব?

অতএব সুবর্ণলতাকে নিয়ে লেখার আর কিছু নেই।

গৃহপ্রবেশের সময় কিছু হয় নি, তাই তার কাছাকাছি সময়ে এই উপলক্ষটা নিয়ে লোকজন খাইয়েছিল প্রবোধ।

কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

এ তো রীতিমত সুখাবহ ঘটনা!

তবে সুবর্ণলতার রীতি অনুযায়ী হয়তো দুঃখের। ওর তো সবই বিপরীত। যারা ওকে নিয়ে ঘর করেছে আর জ্বলেপুড়ে মরেছে তারা সবাই বলেছে, 'বিপরীত! সব বিপরীত! বিপরীত বুদ্ধি, বিপরীত চিন্তা, বিপরীত আচার-আচরণ!'

অতএব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেই দেখা যাক।

প্রথমে নাকি প্রস্তাবটা তুলেছিল প্রবোধই। আর সেই প্রথমে নাকি সুবর্ণলতা বলেছিল, 'গুরু-মন্ত্রতন্ত্র নিচ্ছি না এখন। যদি কখনো তেমন ইচ্ছা

হয়, যদি কাউকে এমন দেখি মাথা আপনি নত হতে চাইছে "গুরু" বলে, তখন দেখা যাবে।'

আলাদা হয়ে আসার পর কিছুদিন চক্ষুলজ্জায় 'ও-বাড়ি' যেতে পারে নি প্রবোধ, কিন্তু সুবর্ণলতার প্ররোচনাতেই যেতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। 'মায়ের হাতখরচ' বলে মাসিক পঁচিশ টাকা করে দিয়ে পাঠিয়েছে সুবর্ণ একরকম জোর করে।

প্রবোধ বলেছে, 'অত ধাষ্টামো করতে আমি পারবো না। ও টাকা মা পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন!'

সুবর্ণ বলেছিল, 'একবার ফেলে দেন, তুমি বার বাব পায়ে ধরে নিইয়ে ছাড়বে! মায়ের পায়ে ধরায় তো লজ্জাও নেই, অমান্যিও নেই!'

তা শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

যদিও ছোট ভাইরা বাঁকা হাসি হেসে 'তুমি যে হঠাৎ?' বলে উত্তরটা না নিয়েই চলে গিয়েছিল, এবং সুবোধ গম্ভীর-গম্ভীর বিষণ্ণ-বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, 'ভাল আছ তো? ছেলেপুলে সব ভালো?' আর বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল, কথা বলে নি, আর মুক্তকেশী দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, তথাপি টাকাটার সদ্‌গতি হয়েছিল।

পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন নি মুক্তকেশী। শুধু ভারী মুখে বলেছিলেন, 'তুমি যখন লজ্জার মাথা খেয়ে আগ্রহ করে দিতে এসেছ, তখন আর তোমার মুখটা ছোট করবো না! দিচ্ছ রাখছি। তবে কেন আর ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা? তুমি তো সব সম্পর্ক তুলেই দিয়েছ!'

উঁচোনো খাঁড়া ঘাড়ে পড়ে নি। ঐ পর্যন্তই হয়েছে।

তা সেদিনের সেই নিশ্চিন্তার পর থেকে প্রবোধ নিত্য ওপাড়ার যাত্রী। ওপাড়ার তাসের আড্ডাও 'প্রবোধহীন' হচ্ছে না।

আর মজা এই—বাড়িতে থাকাকালে দিনান্তে মায়ের সঙ্গে যতটুকু গল্প হতো, মায়ের কাছে যতটুকু বসা হতো, তার 'চতুর্গুণ' হচ্ছে এখন। আর সেই অবসরেই মুক্তকেশী তাঁর অন্য ছেলে-বৌদের সমালোচনা করে করে মনের ভার মুক্ত হয়ে একদিন ঐ গুরুমন্ত্রের কথা তুলেছিলেন।

ওটা না হলে তো আর 'হাতের জল' শুদ্ধ হবে না! এতখানি বয়েস হলো, অদীক্ষিত শরীর নিয়ে থাকা! ছিঃ!

তা ছাড়া মরণের তো ধরন ঠিক করা নেই। কাজেই হঠাৎ একদিন যদি দেহই রক্ষা করে বসে সুবর্ণলতা তো সেই অদীক্ষিত দেহের গতি হবে?

সুবর্ণলতা বরের মুখে শুনে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'গতিটা কি দেহের? না আত্মার? তোমাদের ঐ কুলগুরুর বংশধর বলেই যে ঐ গাঁজাখোর শুঁটকো ছেলেটাকে গুরু বলে পা-পুজো করতে বসবো, সে আমার দ্বারা হবে না।'

এ কথা শুনলে, ঘরে-পরে কে না ছি-ছিক্কার করবে সুবর্ণলতাকে? করেছিল তাই!

বলেছিল, 'এসব হচ্ছে টাকার গরম!'

এমন কি যার টাকার উত্তাপে এত গরম সুবর্ণলতার, সেই প্রবোধই বলেছিল, 'দুটো টাকা হয়েছে বলেই তার গরমে ধরাকে সরা দেখো না মেজবৌ! সেই যে মা বলে, "ভগবান বলে—দেব ধন, দেখবো মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ?"

সেটাই হচ্ছে সার কথা! ভগবান মানুষকে দেন, দিয়ে পরীক্ষা করেন।'

সুবর্ণলতা হেসে ফেলেছিল।

'তোমার মুখে ভগবানের বাণী! এ যেন ভূতের মুখে রামনামের মত কিন্তু কি করবো বল? যাকে গুরু বলে মন সায় না মানে—'

প্রবোধ রেগে উঠে বলেছিল, 'তা তোমার গুরু হতে হলে তো মাইকেল নবীন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, কি রবিঠাকুরকে ধরতে হয়! তাঁরা আসবেন তোমার দেহশুদ্ধির ভার নিতে? দীক্ষাহীন দেহের হাতের জল শুদ্ধ হয় না তা জানো?'

'এই কথা!'

যেন কে না জানে, 'এই কথা!' বলে সুবর্ণ যেন একটু মাত্রা-ছাড়া হাসি হেসেছিল। তারপর হাসির চোখমুখ সামলে বলেছিল, 'শুধু দেহ? তার জন্যে এত দুশ্চিন্তা? তা নেব তাহলে "মন্তর"! ঐ তোমাদের গেঁজেল গুরুপুত্তুরের কাছেই নেব! দেহটার মালিক যখন তুমি, তখন তোমার মনের মতন কাজই হোক।'

প্রবোধ অবশ্য ঐ হাসি আর কথার মানেটা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করে নি তবে চেষ্টাও করে নি। হৃদয়ঙ্গম করতে বোঝা যাচ্ছে রাজী হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।

কারণ একবার যখন কথা দিয়েছেন মেজগিন্নী, আর সে কথার নড়চড় হবে না। এই বেলা লাগিয়ে দেওয়া যাক!

অতএব—

অতএব গুরুমন্ত্রে দীক্ষা হলো সুবর্ণলতার। এ উপলক্ষে সমারোহের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। বিস্তর খরচ করে ফেললো প্রবোধ, বিস্তর গুরুদক্ষিণা দিলো। বললো, 'এতটা কাল ধরে এত রোজগার করছি, সে রোজগারে ভূতভোজন ছাড়া কখনো সৎকাজ হয় নি। এ তবু একটা সৎকাজে একটা মহৎ কাজে লাগলো।'

মুক্তকেশী এসে "যজ্ঞে"র হাল ধরেছিলেন। যজ্ঞশেষে হৃষ্টচিত্তে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'জানি আমার "পেবো" যা করণ-কারণ করবে, মানুষের মতনই করবে। মেজবৌমারও স্বভাবটাই ক্ষ্যাপাটে, নজর উঁচু! আর চিরকালের ভক্তিমতী! দেখেছি তো বরাবর, গো-ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরুত, কালী-গঙ্গা যখন যাতে খরচ করেছি, সব খরচ মেজবৌমাই যুগিয়েছে। যেচে যেচে সেধে সেধে। তা ভগবানও তেমনি বাড়বাড়ন্ত বাড়াচ্ছে। মনের গুণে ধন।'

মেয়েদের বিয়ের সময় যখন ঐ পেবোই একটু খরচপত্তর বেশি করে ফেলেছিল, মুক্তকেশী 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করেছিলেন। বলেছিলেন, 'চালচালিয়াতি দেখানো এসব!'

কিন্তু এখন অন্য কথা বললেন।

এখন কি তাঁর সেই একদার ভবিষ্যৎবাণীর পরাজয়ে লজ্জিত হয়েছেন মুক্তকেশী? নাকি ছেলের এই বাড়িঘর, ঐশ্বর্য, বিভূতি সব দেখে অভিভূত হচ্ছেন?

তাই মুক্তকেশীর মুখ দিয়ে বেরোয়, 'কী খাসা ভাঁড়ারঘর মেজবৌমার, দেখলে প্রাণ জুড়োয়!'

পেবো অবশ্য অনেকবার চুপিচুপি অনুরোধ জানিয়েছিল মাকে, এই থাকাতেই থেকে যেতে।

সুবর্ণলতাও তার স্বভাবগত উদারতায় বলে ফেলেছিল সে কথা।—'তা বেশ তো—এখানেই কেন থাকুন না। এটাও তো আপনারই বাড়ি।'
কিন্তু কেন কে জানে, মুক্তকেশী রাজী হন নি।
মুক্তকেশী 'যজ্ঞি' তুলে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন।
আর কখনো সেকথা নিয়ে কথা ওঠে নি।
শুধু সুবর্ণলতার বড় মেয়ে চাঁপা, যে নাকি এই উপলক্ষে এসেছিল, সে বলেছিল, 'ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি বাবা, আমার মা'টির মতন এমন বেহায়া দুটি দেখি নি! আবার সাহস হলো ঠাকুমাকে এখানে থাকার কথা বলতে?'
কিন্তু সেটা একটা ধর্তব্য কথা নাকি?
চাঁপা তো চিরটা কালই তার মায়ের সমালোচনা করে। ওটা কিছু নয়।
তবে? তবে দুঃখটা কোথায়?
তবে কি সেই পারুর স্কুলে ভর্তি করার কথাটাতেই?
তা হতেও বা পারে!
চিরকালই তো তিলকে তাল করা সুবর্ণলতার স্বভাব।

॥ ২ ॥

'পারু বকুকে ইস্কুলে ভর্তি করার কি হলো? কতদিন ধরে বলছি যে—'
ভানুর কাছে এসে আবেদন জানিয়েছিল সুবর্ণলতা।
বড় ছেলে, তার ওপর আস্থা এনেছিল, বলেছিল, 'তোদের বাপের দ্বারা তো হবে না, তোরা বড় হয়েছিস, তোরা নিবি ভার।'
ভানু 'আজ-কাল' করে এড়াচ্ছিল। একদিন ভুরু কোঁচকালো। ঠিক ওর সেজকাকা যেমন ভঙ্গীতে ভুরু কোঁচকায়।
ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'পারুকে এখনো ইস্কুলে ভর্তি করার সাধ তোমার? আশ্চর্য মা! অত বড় ধিঙ্গী মেয়ে ইস্কুলে যাবে?'
'যাবে।'
স্থির স্বরে বলেছিল সুবর্ণলতা।
ভানু তথাপি কথা কেটেছিল, 'গিয়ে তো ভর্তি হবে সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েদের সঙ্গে! লজ্জা করবে না?'
সুবর্ণলতা একবার ছেলের ঐ বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'লজ্জা তো ওর করবার কথা, লজ্জা করবার কথা ওর বাপ-ভাইয়ের নয় বাবা। কিন্তু একের অপরাধের লজ্জা অপরকে বইতে হয়, এই হচ্ছে আমাদের দেশের রীতি। তাই হয়তো করবে লজ্জা। কিন্তু উপায় কি? একেবারে ঘরে বসে থাকলে তো লজ্জা আরো বেড়েই চলবে।'
ভানু যে মাকে ভয় করে না তা নয়!
ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট করে।
কিন্তু অতটা ভয় করে বলেই হয়তো বাইরে 'নির্ভয়'-এর ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে। তাই অগ্রাহ্যভরে বলে, 'লজ্জার কি আছে? দিদি, চন্নন, ও-

বাড়ির সব মেয়েরা, সবাই লজ্জায় একেবারে মরে আছে। আর এই বুড়োবয়সে তোমার পারুলের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে হবেটা কি? রাতদিন তো নাটক-নভেল গেলা হচ্ছে মেয়ের, আবার শুনি পদ্য লেখেন, আর দরকার?'

সুবর্ণলতা আজকাল অনেক আত্মস্থ হয়েছে বৈকি। অনেক নিরুত্তাপ। তাই ফেটে না পড়ে সেই নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'মনের অন্য কোনো খোরাক নেই বলেই নাটক-নভেল পড়ে। লেখাপড়ার চাপ থাকলে করবে না। যাক্, তুমি পারবে কিনা সেটাই বল!'

'পারা না-পারার কথা হচ্ছে না', ভানু বিরক্ত গলায় বলে, 'এরকম বিশ্রী কাজ করতে যে কী মুশকিল লাগে সে ধারণা নেই তোমাদের। তোমরা স্রেফ হুকুম করেই খালাস। তালগাছের মত এক মেয়ে নিয়ে ভর্তি করাতে যেতে হবে প্রাইমারী স্কুলে! মাথা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতার বড় সাধ ছিল যে তার ছেলেরা বাড়ির ঐ অকালবৃদ্ধ কর্তাদের ভাষা থেকে অন্য কোনো পৃথক ভাষায় কথা বলবে। যে কথার ভাষা হবে মার্জিত, সভ্য, সুন্দর। যাতে থাকবে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য, কৈশোরের মাধুর্য, শৈশবের লাবণ্য।

সুবর্ণর সে সাধ মেটে নি।

পাগলের সব সাধ মেটাও শক্ত বৈকি।

তা ছাড়া কথা শেখার সমস্ত বয়েসটা পার করে ফেলে তবে তো ঐ অকাল-বৃদ্ধদের আবেষ্টন ছেড়ে আসতে পেরেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা!

তা ছাড়া একখানি বড় রকমের 'আদর্শ' তো চোখের সামনেই আছে!

তাই ভানু কর্তাদের ভাষাতেই কথা বলে।

বলে, 'মাথাটা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতা ঐ মাথা কাটার কথাটা নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করে না। সুবর্ণলতা শুধু ঠোঁটটা কামড়ে বলে, 'প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে কেন? বলেছি তো অনেকবার, পারু নিজের চেষ্টায় যতটা শিখেছে, তাতে চার-পাঁচটা ক্লাসের পড়া হয়ে গেছে। সেই বুঝে উঁচু ইস্কুলেই দেবে।'

ভানু অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'হ্যাঁ, মেয়েরা তোমার ঘরে বসে অরু দত্ত তরু দত্ত হচ্ছে! তাই এখন থেকেই পদ্য!'

কথা শেষ করতে পারে না।

সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে ওঠে, 'চুপ, চুপ। আর একটাও কথার দরকার নেই। মিথ্যেই আশা করে মরেছিলাম, চিনেছি তোদের সবাইকে। বুঝেছি জীবনের সর্বস্ব "সার" দিলেও আমড়া গাছে আম ফলানো যায় না।'

হ্যাঁ, সুবর্ণলতা বুঝেছে আমড়া গাছে আম ফলানো যায় না!

তিল তিল করে বুঝেছে!

বুঝে-বুঝেও চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাইছিল এতদিন। যেমন অন্ধকারে ভূতের ভয়কে ঠেকিয়ে রাখতে চায় লোকে খোলা চোখকে বন্ধ করে ফেলে।

কিন্তু ক্রমশই ধরা পড়ছে, আর মনের সঙ্গে মন-ভোলানো খেলা চলবে না। আর 'ছেলেমানুষের মুখের শেষ বুলি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

ভানুর বিদ্রূপব্যঞ্জক মুখভঙ্গিমায়, চোখের পেশীর আকুঞ্চনে, আর ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সুবর্ণলতা, এদের বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

প্রভাসচন্দ্রকে। সুবর্ণলতাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল যার প্রধানতম আনন্দ।

আর সব ভাজেদের আর বোনেদের এবং জানাশুনো সব মেয়েদেরই সুবর্ণলতার সেজ দ্যাওর অবজ্ঞা করে এসেছে বার বার, কিন্তু সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করে যেন সম্যক সুখ হতো না তার।

তাই অবজ্ঞার সঙ্গে মেশাতো বিদ্রূপ।

সেই বিদ্রূপ অহরহ প্রকাশ পেতো চোখের আকুঞ্চনে, ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায়, আর ধারালো হাসির ছুরিতে।

ভানুর প্রকৃতিতে সেই বীজ।

সুবর্ণলতার সারাজীবনের সর্বস্ব 'সার' দেওয়া গাছ!

সুবর্ণলতার আর বুঝতে বাকি নেই, সে গাছ কোনো মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি বহন করছে না। সে গাছ বাঁশঝাড় মাত্র।

যে বাঁশঝাড় বংশধারার অতুলন তুলনা!

আজ আর সন্দেহ নেই।

আজ শুধু নিশ্চিত জানার স্তব্ধ নিশ্চেষ্টতা।

আজ আর নতুন করে আতঙ্কের কিছু নেই।

হঠাৎ আতঙ্কিত হয়েছিল সেই একদিন। অনেকদিন আগে সেই যেদিন 'বড় হয়ে ওঠা' বড় ছেলের কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বলেছিল সুবর্ণ, 'ভানু, তুই তো বড় হয়েছিস, পাস দিলি, কলেজে ঢুকলি, আমায় এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবি? একলা চুপি চুপি—'

একলা চুপি চুপি!

ভানু অবাক গলায় বলেছিল, 'তার মানে?'

'মানে পরে বোঝাবো, পারবি কি না বল্ আগে!'

ভানু এই রহস্য-অভিযানের আকর্ষণে উৎসাহিত হয় নি। ভানু নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল, 'কোথায় যেতে হবে না জেনে কি করে বলবো?'

'আহা, আমি কি বাপু তোকে বিলেতে নিয়ে যেতে বলছি!' সুবর্ণর চোখ ভুরু নাক ঠোঁট সব যেন একটা কৌতুক-রহস্যে নেচে উঠেছিল, 'এখান থেকে এমন কিছুই দূর নয়, বলতে গেলে তোর কলেজেরই পাড়া—'

ভানুর বোধ করি হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগেছিল, তাই ভানু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল, 'কি, তোমার সেই বাপের বাড়ি বুঝি? সে আমার দ্বারা হবে-টবে না।'

সুবর্ণর মুখের আলোটা দপ্ করে নিভে গিয়েছিল, সুবর্ণর চোখে জল এসে গিয়েছিল, সুবর্ণর ইচ্ছে হয়েছিল বলে, 'থাক্, দরকার নেই, কোথাও যেতে চাই না তোর সঙ্গে।'

কিন্তু সে কথা বললে পাছে ভানুর সন্দেহটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাই জোর করে গলায় সহজ সুর এনে বলেছিল, 'বাপের বাড়ির কথা তোকে বলতে আসি নি আমি। তোদের মা হচ্ছে ভুঁইফোঁড়, বাপেরবাড়ি-টাড়ি কিছু নেই তার। বলছিলাম ছেলেবেলার সেই ইস্কুলটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। সেই যে গরমের ছুটিতে চলে এলাম, ইহজীবন আর চক্ষে দেখলাম না—'

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সুবর্ণ, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

কিন্তু ভানু মায়ের এই ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝতে পারে নি, অথবা বুঝতে চেষ্টাও করে নি। ভানু যেন ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠেছিল, 'তা আবার গিয়ে

ভর্তি হবে!'

সুবর্ণ তখনো আতঙ্কিত হয় নি, সুবর্ণ মনে করেছিল সবটাই ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি কৌতুক।

ষোলো বছরের ছেলেকে 'ছেলেমানুষ'ই ভেবেছিল সুবর্ণ।

তাই বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, হবো ভর্তি! তুই জ্যাঠামশাই হয়ে আমাকে ঘাগরা পরিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিবি! আরে বাবা, রাস্তা থেকে একবার চোখের দেখাটা দেখবো।'

'রাস্তা থেকে!'

ভানু যেন পাগলের প্রলাপ শুনেছে।

তা তবুও সুবর্ণ প্রলাপ বকেছে, 'হ্যাঁ, রাস্তা থেকে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভয় নেই বাবা, গাড়ি থেকে নামতে চাইব না, শুধু গাড়িটা একবার সামনে দাঁড় করাবি, জানলা দিয়ে একটু দেখবো।'

বলেছিল আর ঠিক সেই সময় সেই হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল ভানুর মুখে, যে হাসি এ বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রের একচেটে। আর তখনই ধরা পড়েছিল ওর মুখের গড়নটা ওর সেজ কাকার মত।

সুবর্ণ সহসা শিউরে উঠেছিল।

তথাপি সুবর্ণ যেন মনে মনে চোখ বুজেছিল। সুবর্ণ ভেবেছিল, কক্ষনো না, আমি ভুল দেখেছি।

তাই সুবর্ণ আবার তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠেছিল, যেমন ভাবে ছোট ছেলেকে বকে মায়েরা, বলে, 'এত বড় হলি, এটুকু আর পারবি না? তবে আর তুই বড় হয়ে আমার লাভটা কি হলো?'

ভানু নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল, 'কারুর লাভের জন্যে কি আর কেউ বড় হয়! বয়েস বাড়লে বড় হওয়া নিয়ম তাই হয়। ও তুমি বাবার সঙ্গে যেও, আমি বাবা মেয়েমানুষকে নিয়ে কোথাও যেতে-টেতে পারবো না। সাধে তোমায় পাগল বলে লোকে! যত সব কিম্ভূতকিমাকার ইচ্ছে!'

সেই দিন।

সেই দিন ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কে হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণর। সুবর্ণ তার ছেলের মুখে তার সেজ দ্যাওরের ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

সুবর্ণ যে মনে মনে কল্পনা করে আসছে এযাবৎ, ভানু বড় হয়ে উঠলেই সে একটু স্বাধীন হবে, সে পৃথিবীর মুখ দেখতে পাবে, আর সেই দেখার পরিধি বাড়াতে বাড়াতে একদিন ট্রেনে চেপে বসবে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একখানি মুখ দেখতে!

কারো কোনো মন্তব্য প্রকাশের সাহস হবে না, সুবর্ণ বড় গলায় বলবে. 'আমার ছেলের সঙ্গে যাচ্ছি আমি, বলুক দিকি কেউ কিছু! উপযুক্ত ছেলের মা আমি, আর তোমাদের কচি খুকী বৌ নই!'

এবং তার সেই উপযুক্ত ছেলেও বলে উঠবে, 'সত্যিই তো, আমি বড় হয়েছি আর আমার মাকে তোমরা অমন জাঁতার তলায় রাখতে পারবে না।'

কিন্তু স্বপ্ন ভেস্তে গেল।

সুবর্ণলতার ছেলে বললো, 'মেয়েমানুষকে নিয়ে রাস্তায় যাওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

'মেয়েমানুষ!

মেয়েমানুষ!

প্রতিটি অক্ষরে যেন মুঠো মুঠো অবজ্ঞা ঝরে পড়ছে।

এই অবজ্ঞার উৎস কোথায়?

অশোধ্য ঋণের কুণ্ঠাময় অনুভূতি?

'ধ্বনিটির প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।'

একদা যে এই মেয়েমানুষের দেহদুর্গে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তার সহায় ছাড়া গতি ছিল না, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই অবজ্ঞা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে সেই ঋণ।

অথবা আর এক উপায় আছে, 'অতিভক্তি'র জাঁকজমক। যেটা মুক্তকেশীর ছেলেদের, আরো অমন অনেক ছেলেদের।

সুবর্ণর ছেলে দ্বিতীয় পথে যায় নি।

সুবর্ণর ছেলে সহজ পথটা ধরেছে।

রক্ত-মাংসের এই ঋণটা অশোধ্য একথা স্বীকার না করে সবটাই অবজ্ঞা দিয়ে ওড়াবে।

আর তারপর?

যখন বড় হবে?

যখন ওর নিজের রক্ত-মাংস ওর শত্রুতা করবে?

যখন সেই শত্রুর কাছে অসহায় হবে? দুর্বল হবে? চির অবজ্ঞেয় ওই জাতটার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া গতি থাকবে না?

তখন আরো আক্রোশে মরীয়া হবে, অন্ধকারের অসহায়তায় সাক্ষীকে দিনের আলোয় পায়ে ছেঁচবে, অবজ্ঞা করবে আর বিকৃত হয়ে বলবে, 'মেয়ে-মানুষ! মেয়েমানুষ!'

'বেথুন ইস্কুলের বাড়িখানা আর একবার দেখবার' বাসনাটা মেটে নি সেদিন সুবর্ণলতার, তবু সে তখনো একেবারে হতাশ হয় নি। তখনো খেয়াল করে নি, বংশধারার মূল উৎস থাকে অস্থিমজ্জার গভীরে, পরিবেশ বড় জোর পালিশ দিতে পারে, যেটা হয়তো আরো মারাত্মক। কখন কোন্ মুহূর্তে যে সেই পালিশের অন্তরাল থেকে বর্বরতার রূঢ় দাঁত উঁকি মারবে ধারণা থাকবে না, দাঁতের তীক্ষ্ণতায় দিশেহারা হতে হবে।

সুবর্ণলতা তার ছেলেকে পরিবেশ-মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল, তাই তার ছেলের গায়ে পালিশ পড়েছে, নিষ্প্রভ করে দিয়েছে সে তার এ বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট কাকাকে।

তবে কি কানু, মানু আর সুবলও এই এক রকমই হবে? দরজিপাড়ার সেই গলিটা এসে বাসা বাঁধবে সুবর্ণলতার এই হাল্কা ছিমছাম ছবির মত গোলাপী রঙা বাড়িটার মধ্যে?

॥ ৩ ॥

কিন্তু সুবর্ণলতাই বা এমন অনমনীয় কেন?

কিছুতেই ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না কেন? ভেঙে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে কেন? এত প্রতিবন্ধকতাতেও ধাড়ি মেয়ে পারুলকে সে স্কুলে ভর্তি করতে বদ্ধপরিকর কেন?

প্রবোধচন্দ্র বাইরে থেকে ঘরে এসে রাগে গনগন করতে করতে বললো, 'এসব কি শুনছি! পাশের বাড়ির পরিমলবাবুর ছেলেকে দিয়ে নাকি পারুকে ইস্কুলে ভর্তি করতে পাঠিয়েছিলে!'

'পাঠিয়েছিলাম তো'—সুবর্ণ সহজ গলায় বলে, 'পারু বকু দুজনকেই।'

'চুলোয় যাক বকুল! পারুকে পাঠিয়েছিলে কী বলে?'

'এ পর্যন্ত ওটা ওর হয়ে ওঠে নি বলে।'

'হয়ে ওঠে নি বলে!' প্রবোধ সহসা একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করে ওঠে. 'সেই ভয়ঙ্কর দরকারী কাজটা হয়ে ওঠে নি বলে রাজ্য রসাতলে গেছে? পৃথিবী উল্টে গেছে? চন্দ্র-সূর্য খসে পড়েছে? তাই তুমি একটা ছোঁড়ার সঙ্গে ওই ধাড়ি ধিঙ্গী সোমত্ত মেয়েকে—'

'থামো! অসভ্যতা করো না।'

'ওঃ, বটে? অসভ্যতাটা হল আমার? আর তোমার কাজটা হয়েছে খুব সুসভ্য? পরের কাছে মুখাপেক্ষী হতেই বা গেলে কোন্ মুখে? এদিকে তো মানের জ্ঞান টনটনে!'

'অভাবে স্বভাব নষ্ট চিরকেলে কথা—', সুবর্ণ বলে, 'যার নিজের তিন কুলে করবার কেউ না থাকে, পরের দরজায় হাত পাতবে এটাই স্বাভাবিক!'

'ওঃ! তোমার কেউ কিছু করে না? আচ্ছা নেমকহারাম মেয়েমানুষ বটে! বলে সারাটা জীবন এই ভেড়াটাকে একতিল স্বস্তি দিলে না, শান্তি দিলে না, বিশ্রাম দিলে না, নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে মারলে, তবুও বলতে বাধছে না কেউ কিছু করে না?'

সুবর্ণ স্থির স্বরে বলে, 'যা কিছু করেছ সব আমার জন্যে?'

'তা না তো কি? আমার জন্যে? আমার কী এত দরকার ছিল? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পড়ে থাকতাম—'

সুবর্ণ ওই অপরিসীম ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'শুধু মায়ের ছেলে? আর তোমার নিজের জঞ্জালের স্তূপ? তারা? তাদের কথা কে ভাবতো?'

'তারা তাদের বংশের ধারায় মানুষ হতো! এক-একটি সাহেব বিবি করে তোলার দরকার ছিল না কিছু। বলে দিচ্ছি, বকুল যায় যাক, পারুর কিছুতেই বিনুনি দুলিয়ে ইস্কুলে যাওয়া চলবে না, ব্যস!'

'পারু যাবে।'

'কী বললে? আমি বারণ করছি তবু পারু যাবে?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমি যা করেছি বুঝেই করেছি। আর সেটা হবে। এই হচ্ছে আমার শেষ কথা।'

শেষ কথা!

এই শেষ কথার উত্তরে আর কোন্ কথা বলতে পারতো সুবর্ণর স্বামী কে জানে, কিন্তু সুবর্ণর ছেলে কথা কয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে।

পাশের ঘরে কানু বসে খবরের কাগজ পড়ছিল এবং দু ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা থাকার দরুন মা-বাপের প্রেমালাপ শুনছিল, হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলো, 'মা'র মুখে চিরদিনই ঠাকুমাদের সমালোচনা শুনে এসেছি, আর স্বভাবতই ভেবে এসেছি দোষ তাঁদের-ই। এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়!'

বললো।

এই কথা বললো সুবর্ণর মেজ ছেলে।

অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো।

বাবা যখন মাকে 'নেমকহারাম মেয়েমানুষ' বিশেষণে বিভূষিত করেছিল, তখন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে নি সে, যখন বাবা নিজের মেয়ে সম্পর্কে শিথিল মন্তব্য করে রাগ প্রকাশ করেছিল তখনও চুপ করে থেকেছিল, অসহিষ্ণু হয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে উঠল মায়ের দুঃসহ স্পর্ধায়।

বলে উঠলো, 'এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়!'

কিন্তু আশ্চর্য, সুবর্ণলতা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল না তাকে, চীৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠলো না। সুবর্ণলতা যেন হঠাৎ চড়-খাওয়া মুখে শিথিল স্খলিত গলায় প্রশ্ন করল, 'কি বললি? কি বলছি তুই?'

বললো আর মাটিতে বসে পড়লো।

কানু মায়ের সেই নিষ্প্রভ অসহায় মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ও-ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল খবরের কাগজখানা হাত থেকে আছড়ে ফেলে দিয়ে। কানুর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হল, 'আর কি, জানো তো খালি মূর্ছা যেতে, ওইতেই সবাইকে জব্দ করে রাখতে চাও।'

আর কিছু করল না।

'জল জল, পাখা পাখা' বলে ব্যস্ত হলো মুক্তকেশীর ছেলে।

সুবর্ণলতার জীবনটা যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যে নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় নি সুবর্ণলতা।

সুবর্ণর সংসারত্যাগিনী মা নাকি সংসার ত্যাগের প্রাক্‌কালে বলে গিয়েছিল, ওটা 'নাগপাশই' না লতাপাতার বন্ধন, তাই দেখবে বাকী জীবনটা।

কিন্তু তাতে সুবর্ণর কি হলো?

সুবর্ণ কি পেল তা থেকে?

পেল না কিছু।

পায় না।

এইটাই যে নিয়ম পৃথিবীর, অনেক দিনের সাধনা চাই। এক যুগের তপস্যা আর সাধনা পরবর্তী যুগকে এনে দেয় সাধনার সিদ্ধি, তপস্যার ফল। অনেক 'কেন' আর অনেক বিদ্রোহ নিষ্ফল ক্ষোভে মাথা কুটে কুটে মরে, তলিয়ে যায় অন্ধকারে, তারপর আসে আলোর দিন।

তবু—

যারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তাদের জন্যেও রাখতে হবে বৈকি একবিন্দু ভালবাসা, একবিন্দু শ্রদ্ধা, একবিন্দু সমীহ।

হয়তো সুবর্ণলতার জন্যেও আসবে তা একদিন।

হয়তো সুবর্ণলতার আত্মা সেই পরমপ্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে একটু

পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

বলবে, 'সারাজীবন যার জন্যে জ্বলেছি আর জ্বালিয়েছি, পুড়েছি আর পুড়িয়েছি, কোথাও কোনোখানে তবে সার্থক হয়েছে সে!'

কিন্তু কবে সেই পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাসটুকু ফেলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা?

আজো কি অগণিত সুবর্ণলতা মাথা কুটে মরছে না এই 'আলোকোজ্জ্বল যুগের' চোরাকুঠুরীর ঘরে? রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে না, 'তোমরা শুধু সমাজের মলাটটুকু দেখেই বাহবা' দিচ্ছ, আত্মপ্রশংসায় বিগলিত হচ্ছ, আত্মপ্রচারের জৌলুসে নিজেকেই নিজে বিভ্রান্ত করছ, খুলে দেখছ না ওর ভিতরের পৃষ্ঠা? দেখ সেই ভিতরের পৃষ্ঠায় কোন্ অক্ষর, কোন্ ভাষা, কোন্ লিপি?'

সেখানে যে অগণিত সুবর্ণলতা আজও অপেক্ষা করছে 'কবে পাপের শেষ হবে তার প্রতীক্ষায়'!

বলছে না তারা—

'কবে অহঙ্কারী পুরুষসমাজ খোলা গলায় স্বীকার করতে পারবে, তুমি আর আমি দুজনেই ঈশ্বরসৃষ্ট! তুমি আর আমি দুজনেই সমান প্রয়োজনীয়!'

কবে ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষসমাজ মুক্ত মনে বলতে পারবে, 'তোমাকে যে স্বীকৃতি দিতে পারি নি সেটা তোমার ত্রুটির ফল নয়, আমার ত্রুটির ফল! তোমার মহিমাকে মর্যাদা দিতে বাধে সেটা আমার দুর্বলতা, তোমার শক্তিকে প্রণাম করতে পারি না সেটা আমার দৈন্য। নিজেকে তোমার "প্রভু" ভাবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে আমার অভিমান আহত হয়। তাই দাস সেজে তোমায় "রাণী" করি। আজো তোমাকে মুগ্ধ করে মুঠোয় পুরে রাখতে চাই, তাই চাটুবাক্যে তোয়াজ করি। আর আমার শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে সংগীতে যে তোমার বন্দনাগান করি, সে শুধু নিজেকে বিকশিত করতে। তুমি আমার প্রদীপে আলোকিত হও এই আমার সাধ, আপন মহিমায় ভাস্বর হও এতে আমার আপত্তি। তাই তুমি যখন গুণের পরিচয় দাও তখন করুণার হাসি হেসে পিঠ চাপড়াই, যখন শক্তির পরিচয় দাও তখন বিরক্তির ভ্রুকুটি নিয়ে বলি "ডেঁপোমি", আর যখন বুদ্ধির পরিচয় দাও তখন তোমাকে খর্ব করবার জন্য উঠে পড়ে লাগি।...

'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশম্বদ, তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃ-মূর্তির কাছে আমি শিশু মাত্র।...কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্যে হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি' সেই 'তুমি'-টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তবে বাইরের 'তুমি' হচ্ছ বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি।'

কে জানে কবে এসব বলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা!

হয়তো পাবেই না। এই তো পুরুষের হৃদয়রহস্য।

এই মনের ভাব খুলে বলতে পারবে কোনোদিন পুরুষসমাজ? মনে হয় না। শুধু আধুনিকতার বুলি আউড়ে দেখাবে, 'দেখ আমি কত উদার! আমি কত মুক্ত!' যুগের রং লাগিয়ে লাগিয়ে বলবে, 'দেখ তোমাকে কত বর্ণাঢ্য করে তুলেছি।' কিন্তু সে রং পুতুলের রং। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা নেই তার, পুতুলে রং লাগিয়েই খুশি। সেই রংচঙে পুতুলগুলি তুলে ধরবে

বিশ্বসমক্ষে, বলবে, 'দেখেছ? দেখ দেখ আমাদের কত ঐশ্বর্য!'

'বিদ্যেবতীর আর বাড়ির বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না?'

খবরের কাগজখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে কানু তীব্র বিরক্তিভরে এঘরে এসে পারুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে ওই কথাটি।

কানুর এই গায়ে পড়ে ব্যঙ্গ করতে আসায় রাঙা হয়ে উঠলো পারুর মুখ, ঠোঁটটা কামড়ে চুপ করে রইল। সুবর্ণলতার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে হয়তো মিল আছে তার, মিল নেই বাইরের প্রকৃতির। 'চোপা' করবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে চুপ করে থাকে সে।

এখন চুপ করেই থাকে হাতের খোলা বইখানা মুড়ে।

কানু একবার তার সেই বইখানার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'নাটক-নভেলের তো শ্রাদ্ধ করেছো, ওই মাথায় আর যোগবিয়োগ গুণভাগ ঢুকবে?'

পারুল এবার কথা কইলো।

বললো, 'ঢুকবে কিনা সে পরীক্ষা তো করা হয় নি!'

'ইস, কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি খুব! নভেলের যা ফল! লেখাপড়া শেখা তোর কর্ম নয়, বুঝলি? আমার একটা বন্ধুর ছোট বোন, মানে তোর মতন একটা মেয়ে, আসছেবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবে, বুঝলি? সে-সব মাথাই আলাদা।'

'মাথাটা নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিল তোমার বন্ধুর বোন?'

কানু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'তা ছাড়া! তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না, বুঝলে? শুধু মাতৃদেবীর মত বড় বড় কথা শিখবে তুমি!'

পারু তার প্রকৃতিটা লঙ্ঘন করতে চায় না, তবু সে বলে ফেলে, 'মা ভাগ্যিস ওই বড় বড় কথাগুলো শিখেছিলেন মেজদা, তাই তোমারও এত "বড় কথা" বলার সুযোগ হচ্ছে!'

'সত্যি! বাঃ, বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো দেখছি খেঁদুর। নাঃ, ভাল দেখে একটা বর তোকে দিতে হচ্ছে!' বলে চলে যায়। কানু ভানুর মত অত সিরিয়াস নয়, তাই ব্যঙ্গই করে সে।

॥ ৪ ॥

পালকি সত্যিই এবার উঠে যাচ্ছে।

'যাই যাই' করছিল অনেক দিন, এবার মনে হচ্ছে একেবারেই যাবার পথে পা বাড়িয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে যখন-তখন তো দূর-স্থান, বলতে গেলে চোখেই পড়ে না।

পালকির সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুই অবলুপ্তির পথ ধরবে তাতে আর সন্দেহ কি? পালকিই বলে যাবে—'মানুষের কাঁধের উপর মানুষ চড়া নির্লজ্জতা!...মরে গিয়ে 'শবদেহ' হয়ে যাবার পর চড়ো মানুষের কাঁধে, তার আগে নয়।'—বলে যাবে—'আস্ত একটা মানুষকে একটা বন্ধ বাক্সয় ঢুকিয়ে ফেলে ঘেরাটোপ ঘিরে নিয়ে যাওয়াটা হাস্যকর, আমি বিদায় নিচ্ছি ওই ঘেরাটোপ আর পর্দার জঞ্জালগুলো কুড়িয়ে নিয়ে। পথ যে পার হচ্ছে, পথটা সে যেন দেখতে পায়।'

...বলে যাবে, 'দ্রুতযানের সন্ধান কর এবার তোমরা। পৃথিবীটা অনেক বড়, তাকে দেখো চোখ মেলে, ছোটো ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে, ছোটো হাওয়ার বেগে হাওয়াগাড়িতে, ওড়ো মাটি ছাড়িয়ে আকাশে।...তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আপন পরিমণ্ডলটিকেই সমগ্র পৃথিবী জ্ঞান করে আলবোলায় সুখটান দেবার দিন গত হলো।'

হাজার বছরের অভ্যাসের ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ধারা মুছে নিয়ে যারা চলে যায়, তারা কিছু বলে যায় বৈকি। চলে যাবার মধ্যেই বলে যাওয়া।

কালস্রোত যে কাউকে কোথাও নোঙর ফেলতে দেয় না, দুর্নিবার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এইটাই আর একবার বলে যায় সে। আজকের পরম প্রয়োজনীয় পরবর্তীকালে জঞ্জালের কোঠায় ঠাঁই পায়, এই হলো পৃথিবীর পরমতম সত্য আর চরমতম ট্র্যাজেডি।

তবু সহজে কেউ মানতে রাজী হয় না সে কথা। তারা সেই বিদায়ী পথিকের বসনপ্রান্তটুকু মুঠোয় চেপে ধরে রাখতে চায়, আর আলবোলায় শেষ সুখটানটুকু দিতে দিতে বলে, 'এসব হচ্ছে কী আজকাল! সব যে রসাতলে গেল!'

যারা দার্শনিক তারা উদাস হাসি হেসে বলে, 'যাবেই তো, সবই যাবে।'

মুক্তকেশীও একটা তাঁর ছোট্ট নাতনীর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন একথা, 'পালকি আর কই! ক্রমেই কমে আসছে। যাবে সবই উঠে যাবে।'

তবু দেখা যাচ্ছে এখনো মুক্তকেশী তাঁর বয়সের ভারে জীর্ণ দেহখানা নিয়ে চলেছেন পালকি চড়ে।

একাই চলেছেন!

খানিকটা গিয়ে একখানা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়ির সামনে এসে মুক্তকেশী মুখ বাড়িয়ে বেহারাগুলোর উদ্দেশে আদেশজারি করলেন, 'থাম্ মুখপোড়ারা, এই বাড়ি! চলেছে দেখো হুম্ হুম্ করে!'

যেন বাড়িখানা তাদের চিনে রাখার কথা।

নিমেষে বেহারাগুলোর 'হুম্‌হুম্' শব্দ থেমে গেল, পালকিও থামলো। চার-চারটে জোয়ানমর্দ লোক পালকিখানা নামিয়ে কোমরে বাঁধা গামছা খুলে গায়ের ঘাম মুছতে লাগলো।

চারটে দস্যিলোক, অথচ একটা বুড়ীকে বইতে হিমশিম খেয়ে গেছে! পদ্ধতিটা বুদ্ধিহীন বলেই। রিকশাগাড়িরা তখনও আসরে নামে নি, দেখিয়ে দেয় নি একটা লোকই টেনে নিয়ে যেতে পারে চারটেকে!

পালকির দরজা ঠেলে নামলেন মুক্তকেশী।

নড়বড়ে কোমরটা কষ্টে টান করে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মুহূর্তকাল, তারপর আঁচলের খুঁট থেকে দুটি ডবল পয়সা বার করে চারটে বেহারার মধ্যে একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'নে যা, ভাঙিয়ে ভাগ করে নেগে যা!'

কোমরটা দুমড়ে যাওয়া পর্যন্ত মুক্তকেশীর ধারণা হয়েছে, পূর্ব সম্মানের সবটুকু আর জুটছে না। তাই অপর পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলেই প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হন। অনেক সময় হাড়ের খিল ছেড়ে যাওয়ার একটা শব্দ হয়, শিরদাঁড়াটা কনকনিয়ে ওঠে, তবু সাধ্যপক্ষে হেঁট হওয়ার অগৌরব বহন করতে রাজী নন মুক্তকেশী।

তথাপি অপরপক্ষ সম্মান রক্ষায় উদাসীন হল।

বলে উঠলো, 'কেতো দিউছি?'

'যা দেবার ঠিকই দিয়েছি—' বার্ধক্য-মলিন পুরনো চোখের তারায় একটি সম্রাজ্ঞীজনোচিত দৃপ্তভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে মুক্তকেশী সদর্পে তাকালেন, 'আবার কিসের ট্যাঁ-ফোঁ? চাস কত? পুরো তঙ্কা?'

লোকগুলো মুখের প্রত্যেকটি রেখায় অসন্তোষ ফুটিয়ে বলে, 'আটো পয়সা দিয়!'

'কী বললি? আট পয়সা? গলায় ছুরি দিবি নাকি? পয়সা গাছের ফল?' মুক্তকেশী সদর্পে বলেন. 'আর এক আধলাও নয়। কার হাতে পড়েছিস তা জানিস? এখেন থেকে এখেন, আট পয়সা! হুঃ, যা বেরো!'

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বৈকি যে লোকগুলো সত্যিই পালকি তুলে নিয়ে চলে যায় নিতান্ত ব্যাজার মুখে।

তারাও জানছে এ পেশার দিন শেষ হয়ে আসছে ওদের। মুক্তকেশীর মত দু-একটা বুড়ীটুড়ী ছাড়া এরকম শবযাত্রার ভঙ্গীতে মানুষের কাঁধে চড়ে শূন্যে দুলতে দুলতে আর যেতে চাইছে না মানুষ।

তাই বেত ছিঁড়ছে. ডাণ্ডা ভাঙছে, রং চটে দাঁত বেরিয়ে যাচ্ছে. তবু পালকি মেরামতের কথা ভাবছে না ওরা। দলের অনেকেই তো ক্রমশঃ গলায় একটা 'পৈতে' ঝুলিয়ে রাঁধুনী বামুনের চাকরি নিচ্ছে। তার চাহিদা বরং দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

বাড়ছেই।

মেয়েরা ক্রমশই 'বাবু' হয়ে উঠছে. রান্নার ভারটা চাপাচ্ছে উড়িয়া কুলতিলকের হাতে।

বন্ধ দরজা খোলবার জন্যে কড়া নাড়া অথবা দরজায় ধাক্কা দেবার যে একটা প্রচলিত রীতি আছে সে রীতিকে আগ্রাহ্য করে মুক্তকেশী ভাঙা ভাঙা অথচ সতেজ গলায় ডাক দেন, 'পেবো পেবো—'

হ্যাঁ, এ পাড়ার প্রবোধবাবুকেই ডাক দেন তিনি। বাড়ির ছোট ছেলেপুলেদের নাম ধরে ডাক দেবার যে একটা রীতি প্রচলিত, সেটাকেও অস্বীকার করে থাকেন তিনি। এ বাড়ি তাঁর ছেলে 'পেবো'র, তাকেই ডাকবেন তিনি। সে বাড়িতে থাক্ বা না থাক্।

অবশ্য যখনই আসেন, প্রবোধচন্দ্রের উপস্থিতির সম্ভাবনা অনুমান করেই আসেন।

তা এক ডাকেই কাজ হলো।

যদিও 'পেবো' বা সেই জাতীয় কেউ নয়. দরজা খুলে দিল বছর দশেকের একটি মেয়ে। মুক্তকেশী যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তীব্র গলায় বলে উঠলেন, 'কপাট খুলে দিতে হুট্ করে বেরিয়ে এলি যে? বাড়িতে আর লোক নেই?'

মেয়েটা এই প্রশ্নবাণের সামনে থতমত খেয়ে বলে, 'সবাই আছে।'

'আছে তো তুই তাড়াতাড়ি আসতে গেলি কেন? আমি না হয়ে যদি অপর কোনো ব্যাটাছেলে হতো? "পারি"র বিয়ে হচ্ছে না বলে বুঝি তুই

কীচ থুকী আছিস?'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে, 'ছাদ থেকে দেখলাম তুমি এলে, তাই—'

'ছাদ থেকে!'

সেই পুরনো চোখ আবার ধারালো হয়ে ওঠে, 'ভরদুপুরে ছাদে কী করছিলি?'

'কাপড় শুকোচ্ছিল, মা বললেন, তুলে আন!'

'হুঁ, তা বলবেন বৈকি মা। চিরকেলে আয়েসী! নে চল, বাবা বাড়ি আছে?'

'আছেন। ঘুমোচ্ছেন।'

'তা তো ঘুমোবেই।' মুক্তকেশী ধিক্কারের স্বরে বলেন, 'সঙ্গগুণের মহিমা! বুকের ওপর পাহাড় মেয়ে, আরো একটা ধিঙ্গী হয়ে উঠলো, ছুটি-ছাটার দিন কোথায় মাথায় সাপ বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াবে, তা নয় নাকে সর্বের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। নে চল!'

মুক্তকেশী আজকাল মাঝে-মাঝেই আসেন।

ভেন্ন হওয়া রূপ দুরাচারের জন্যে অনেকগুলো দিন পুত্রবধূর মুখ দেখেন নি মুক্তকেশী, কিন্তু পুত্রের আকিঞ্চন ও তোষামোদে সে ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তারপর সেই সুবর্ণলতার গুরুমন্ত্র নেওয়ার সময় বাঁধ ভাঙলো। রাগের, তেজের, লজ্জার।

সময়ে সবই সয়। সর্বতাপহর।

সময় সবই সহজ করে আনে। এবং মুক্তকেশী 'মেজবৌমা' 'মেজবৌমা'ই বেশি করেন। তার জন্যে ঘরে থাকা অন্য বৌদের হিংসের অবধি নেই, কিন্তু এখন যে প্রবোধচন্দ্রের মাতৃভক্তিটা প্রায় ভরতের ভ্রাতৃভক্তির তুল্য মূল্যবান! আর মূল্যেই তো জগৎ বশ!

অতএব এখন মুক্তকেশী যখন-তখন মেজ ছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, হুকুম আর শাসন চালিয়ে যান, এবং অপর ছেলে-বৌদের সমালোচনায় মুখর হন। হাত-খরচের টাকায় ঘাটতি পড়লেই সেকথা কোনো ছলে মেজবৌমার কর্ণগোচর করেন এবং নিজের মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনী বাবদ অর্থঘটিত যা কিছু সদিচ্ছা, সেও মেজছেলের কাছে প্রকাশ করে যান।

বলেন, 'ওদের বলি না, জানি তো বোন বলে এতটুকু মন কারো নেই। তোর তবু সে মন একটু আছে তাই বলা।'

প্রবোধ অবশ্য মায়ের ধারণা অনুযায়ী বোনেদের প্রতি মনের অভিনয়ই করে চলে তারপর। বলে উঠতে পারে না—'মন আমারও নেই মা। তারা ভিন্ন মাটিতে শিকড় নামিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? একদা তারা আর আমরা একই আধারে থেকেছি, শুধু এইটুকু সুবাদের জের আর কতকাল টানা যায়?'

বলে না।

বলে উঠতে পারে না।

অতএব সুবর্ণলতার এই গোলাপী রঙের দোতলাটির মধ্যেও মুক্তকেশী বেশ পুরো চেহারা নিয়েই অবস্থান করেন।

সুবর্ণলতা একবারই পেরেছিল অসাধ্য সাধন করতে। একবারই দেখিয়েছিল 'অসমসাহসিক' শব্দটার মানে আছে।

কিন্তু সে ওই একবারই। সে আওতা থেকে সরে এসে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত সংসার গড়ে তোলবার বাসনা হয়েছিল, সে বাসনাটা ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সেই আওতাটা রয়েই গেছে, হয়তো বা আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে।

সুবর্ণলতার জীবনের এ এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি। কারণ নিজেও সে মুক্তকেশীর সংসারে বসে যত সহজে মুক্তকেশীর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতো, আপন কেন্দ্রে বসে তা পারে না। ভদ্রতায় বাধে, চক্ষুলজ্জায় বাধে, আর সব চেয়ে আশ্চর্য—মমতায় বাধে।

অস্বীকার করে লাভ নেই, এখনকার ওই নখদন্তহীন মানুষটির প্রতি একটা মমতাবোধে সুবর্ণলতাকে নিরুপায় করে রেখেছে।

মৌজের দিবানিদ্রাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে প্রবোধ মায়ের চরণবন্দনা করে, নিজ হাতে হাতপাখা তুলে নেয়।

মুক্তকেশী আসন পরিগ্রহ করে বলেন, 'থাক্ বাতাসে কাজ নেই, বলি নাকে তেল দিয়ে ঘুম দিলেই হবে! মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?'

নখদন্তহীন মুক্তকেশীর কথার জোর কমেছে বলে যে কথার সুর বদলেছে তা নয়। সুরটা ঠিক আছে, ধরনটা ঠিক আছে, শুধু ভারটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু—

তবু সুবর্ণলতা যেন আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ ওই মানুষটাকে ঈর্ষা করে বসে। মুক্তকেশী যখন তাঁর পঞ্চাশোত্তীর্ণ ছেলেকে বলে ওঠেন 'লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা, পোড়ারমুখো বাঁদর', তখন অদ্ভুত একটা ঈর্ষার জ্বালা যেন দাহ ধরায় সুবর্ণলতাকে।

অথচ নিজে কি সুবর্ণলতা কখনো দরাজ ভাষায় ছেলেদের সম্বোধন করবার বাসনা পোষণ করেছে?

এই গ্রাম্যতা কি সুবর্ণলতার অসহ্য নয়?

তবু—

এই 'তবু'র উত্তর নেই, প্রশ্ন জমে ওঠে আরো।

সুবর্ণলতার ছেলেরা কি এই মাতৃভক্ত বংশের ছেলে নয়?

সুবর্ণলতা কি তার মাতৃকর্তব্যে কোনো ত্রুটি করেছে? সুবর্ণলতা তো বরং সেই কর্তব্যের দায়ের কাছেই নিজের সর্বশক্তি বিকিয়েছে বসে বসে।

তথাপি সুবর্ণলতার বিয়ে হওয়া মেয়েরা 'বাপের বাড়ি' বলতে সুবর্ণলতার প্রাণ দিয়ে গড়া এই গোলাপী রঙের দোতলাটাকে বোঝে না, বোঝে সেই দর্জিপাড়ার গলির বাড়িটা। তাদের প্রাণ পড়ে থাকে সেখানেই। সেখানে এসে তারা পুরনো দালানের তেলচিটে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে তাদের মায়ের চালচলনের ব্যাখ্যানা করে।

আর সুবর্ণলতার ছেলেরা?

তারা অবশ্য সেই দেয়ালে তেলধরা জানালায় চুনের হাত মোছা এবং দরজার পিছনে পিছনে পানের পিক্ ফেলা বাড়িটাকে আদৌ পছন্দ করে না, তার প্রতি একবিন্দুও মমতা পোষণ করে না, তবু এই বাড়িটাকেও 'আমাদের' বলে পরম স্নেহে হৃদয়ে নেয় না।

সুবর্ণলতার ছেলেরা যেন বাধ্য হয়ে তাদের এক প্রবলপ্রতাপ প্রতিপক্ষের এক্তারে পড়ে আছে, তাই সুযোগ পেলেই ছোবল বসাতে আসে।

ছোটটাকে অবশ্য এখনো ঠিক বোঝা যায় না, সে যেন বড় বেশি নির্লিপ্ত। সেজটাও আমোদ-প্রমোদ বাবুয়ানা বিলাসিতাটুকু হাতের কাছে পেয়ে গেলে তেমন হিংস্র নয়, কিন্তু ভানু-কানু?

যারা নাকি প্রমাণ সাইজের জামা পরে তবে এ বাড়িতে এসেছে!

তারা যেন ঠিক কাকাদের প্রতিমূর্তি।

বিশেষ করে ভানু।

হঠাৎ যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, কি চান করে এসে গামছাখানাকে জোরে জোরে ঝাড়ে, অথবা মুখ নিচু করে ভাত খেতে খেতে কেমন একটা কঠিন ভঙ্গীতে চোয়ালটা নাড়ে, দেখে চমকে ওঠে সুবর্ণলতা।

মনে হয় সেজ দ্যাওর প্রভাসকেই দেখতে পেল বুঝি।

অপর পাঁচজনেও বলে, 'ভানুকে দেখো যেন অবিকল ওর সেজকাকা!'

শুনে অন্ধ একটা রাগে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে সুবর্ণলতার।

সুবর্ণর রক্ত-মাংসে গড়া, সুবর্ণর ইচ্ছে চেষ্টা সাধন শক্তি দিয়ে লালিত সন্তান সুবর্ণর পরম শত্রুর রূপ নিয়ে সুবর্ণর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে এ কী দুঃসহ নিরুপায়তা!

কী অস্বস্তিকর বড় হয়ে গেছে ভানু-কানু!

কী বিশ্রী লম্বা-চওড়া!

গলার স্বরগুলোই বা কী রকম মোটা। আস্ত দুটো 'লোক' হয়ে গেছে ওরা!

অন্য লোক।

সুবর্ণলতার সঙ্গে যাদের জীবনের আর কোনো যোগ নেই, সুবর্ণলতাকে যাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

সুবর্ণলতার সাধ্য নেই আর ওদের নাগাল পাবার।

আস্তে আস্তে মানু সুবলও হয়তো এই রকমই হয়ে যাবে। তাদের মুখের চেহারায় প্রকট হয়ে উঠবে মুক্তকেশীর ছেলেদের মুখের কাঠামো।

নিরুপায় সুবর্ণলতাকে বসে বসে দেখতে হবে এই পরিবর্তন।

মুক্তকেশীর ছেলেদের ঘৃণা করা যেত অবজ্ঞা করা যেত, এদের বেলায় কোনো উপায় নেই।

আর এদের সম্পর্কে নালিশেরও কোনো পথ নেই। এরা সুবর্ণলতার ইচ্ছানুরূপ শিক্ষিত হয়েছে, সভ্য হয়েছে, চৌকস হয়েছে। সুবর্ণলতার জীবনের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর ধ্বংসের মূল্যে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা, সেই সম্পদের অহঙ্কারেই তারা অহরহ সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করছে।

হয়তো বা সুবর্ণলতার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেও এমনিই হয়।

'বোধ' জন্মালেই 'ঋণবোধ'ও জন্মায়, আর সেই ঋণবোধের দাহই ফণা তুলে থাকে ছোবল হানতে। যেখানে ঋণের ঘর হালকা, সেখানে বুঝি আপন হওয়া যায়, সহজ হওয়া যায়।

নচেৎ নয়।

অথচ আজীবনের স্বপ্ন ছিল সুবর্ণলতার, তার সন্তানেরা তাকে বুঝবে,

তার আপন হবে। কিন্তু তারা আপন হয় নি, তারা সুবর্ণলতাকে বোঝে নি।

হয়তো বুঝতে চায়ও নি।

কারণ সুবর্ণলতার ছেলেরা তার মায়ের সেই মধুর আশার স্বপ্নের সন্ধান-টুকু পায় নি কখনো। তারা শুধু যোদ্ধা সুবর্ণলতাকেই দেখে এসেছে, 'দক্ষিণের বারান্দালোভী স্বপ্নাতুর' সুবর্ণলতাকে দেখে নি কখনো!

যুদ্ধবিক্ষত সুবর্ণলতার বিকৃত আর হিংস্র মূর্তিটা অতএব বিরক্তি আর ঘৃণারই উদ্রেক করেছে তাদের। সন্ধান করে দেখতে যায় নি সুবর্ণলতার ভিতরে 'বস্তু' ছিলো।

ভেবে দেখে নি বস্তু ছিলো, স্বপ্ন ছিলো 'মানুষের মত' হয়ে বাঁচবার দুর্দমনীয় সাধ। ছিলো ভব্যতা, সভ্যতা, সৌকুমার্য। শুধু সে সম্পদ ক্ষয় হয়ে গেছে যুদ্ধের রসদ যোগাতে যোগাতে।

তবে ভেবে দেখবেই বা কখন তারা?

আজো কি যুদ্ধের শেষ হয়েছে সুবর্ণলতার?

হয় নি।

হয়তো যুদ্ধের কারণগুলো আর তত বেশি প্রখর নেই, হয়তো অনভূতি-গুলোও তত বেশি তীব্র নেই, তবু সুবর্ণলতা এক আপসহীন সংগ্রামের নায়িকা!

নোংরামি আর কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নিজে যে সে কত নোংরা আর কুশ্রী হয়ে গেছে, ভব্যতা সভ্যতা শালীনতা সৌন্দর্য বজায় রাখবার লড়াইয়ে যে নিজের চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য শালীনতা জবাই দিয়ে বসে আছে, সে খবর আর নিজেই টের পায় না সে।

সুবর্ণলতার সন্তানেরা মায়ের এই অপরিচ্ছন্ন মূর্তিটাই দেখতে পাচ্ছে।

অতএব তারা অসহিষ্ণু হচ্ছে।

অতএব তারা মাকে ঘৃণা করছে।

মা'র দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সারা জীবনের এই সঞ্চয় সুবর্ণলতার।

অথচ সুবর্ণলতার সন্তানদেরও দোষ দেওয়া যায় না। 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া' কেটে বিরাট পরিবারের মধ্যে থেকে সুবর্ণলতা তাদের শুধু উদ্ধার করেই এনেছে, 'আশ্রয়' দিতে পারে নি।

শুধু যেন ছড়িয়ে ফেলে রেখেছে।

তাদের সদ্য-উন্মোচিত জ্ঞানচক্ষুর সামনে অহরহ উদ্ঘাটিত হচ্ছে মা-বাপের দাম্পত্যলীলার যুদ্ধ আর সন্ধির বহু কলঙ্কিত অধ্যায়।

তারা জানে তারা সুবর্ণলতার স্বপ্ন-সাধনার বস্তু নয়, যুদ্ধের হাতিয়ার মাত্র।

এই অদ্ভুত যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যত বেশি ধাক্কা খাচ্ছে তারা, তত বেশি বিতৃষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি আঘাত হানছে।

পারু পড়তে চায়, কিন্তু পারুর পড়াকে কেন্দ্র করে সুবর্ণলতা যে ঘূর্ণি-ঝড় তোলে, সে ঝড়ের ধুলো-জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে পারু পড়ায় বীতস্পৃহ হয়। হয়।

পারু নিজেই বেঁকে বসে।

পারু প্রতিজ্ঞা করে, 'লাঠালাঠি' করে আদায় করা বস্তুকে গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে না সে। পারুর আত্মমর্যাদাজ্ঞান তীব্র গভীর।

কিন্তু প্রবোধের পক্ষে মেয়ের সেই প্রতিজ্ঞা জানার কথা নয়। তাই প্রবোধ মায়ের প্রশ্নে অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'তোমার মেজবৌ যে বলে গো, আজকাল আর অত সকাল সকাল বিয়ে নেই! বরং একটু লেখাপড়া—'

মুক্তকেশী অবশ্য এতে বিচলিত হন না। মুক্তকেশী দৃপ্তগলায় বলেন, 'কী বললি লক্ষ্মীছাড়া বামুনের গরু! মেয়ের এখন বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে বসবি? তা বলবি বৈকি, তোর উপযুক্ত কথাই বলেছিস। চিরটাকাল তো হালকা বুদ্ধিতেই চললি।'

না, এখন আর 'বৌয়ের বুদ্ধিতে চললি' বললেন না বুদ্ধিমতি মুক্তকেশী। বললেন, হালকা বুদ্ধিতে চললি!

প্রবোধ অবশ্য প্রতিবাদ করে না।

মুক্তকেশী বলেন. ওসব কথা বাদ দে, কোমরে কসি গুঁজে লেগে যা। গলার কাঁটা উদ্ধার না হলে তো ছেলেদের বিয়ে দিতে পারবি না! এদিকে মেয়ে নিয়ে লোকে আমায় সাধাসাধি করছে। আমি থাকতে ছেলের বিয়ে দিবি, এই আমার সাধ। সুবোটার তো প্রথম দিকে শুধু মেয়ের পাল!'

কথাটা শেষ হবার আগেই গলার কাঁটা ঘর থেকে বিদায় নেয়, আর সুবর্ণলতা একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলে, 'হুকুম তো একটা করে বসলেন! কিন্তু ছেলেদের এক্ষুনি বিয়ে কি? পাসই করেছে, রোজগার তো করতে শেখে নি! কানুর তো পড়াও শেষ হয় নি!'

কানু ডাক্তারী পড়ছে. কাজেই তার পাস করে বেরোতে দেরি। মুক্তকেশী সেই কথার উল্লেখ করে ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেন, 'ছেলে ডাক্তার হয়ে বেরুলে তবে বিয়ে দেবে মেজবৌমা? তার থেকে বল না কেন, ছেলের এখনো চুল পাকে নি, বিয়ে দেব কি? ছেলেরা রোজগার না করলে বৌরা এসে তোমার সংসারে দুটি ভাত পাবে না?'

সুবর্ণলতা শান্ত গলায় বলে, 'ভাত কেন পাবে না! তবে ভাতটাই তো সব নয় মা!'

'আহা, হলো না হয় গহনা-কাপড়ই সব', মুক্তকেশী জিদের গলায় বলেন, 'সে তুমি ছেলের বিয়ের সময় বেহাইয়ের গলায় গামছা দিয়ে দশ বছরের মতন আদায় করে নেবে। ততদিনে তোমার ছেলে অবিশ্যিই উপায়ী হবে।'

সুবর্ণলতা আরো নম্র হয়, তবু দৃঢ়গলায় বলে, 'সে তো অনিশ্চিত, রোজগারপাতি না করলে—'

'দেখ মেজবৌমা, তক্কে তোমার সঙ্গে জিততে পারব না আমি, তবে গুরুজন হিসেবেই বলছি, বামুনের ছেলে, খেটে খেতে না পারে ভিক্ষে করে খাবে, তাতে লজ্জা নেই। বিয়ে একটা "সংস্কার", সেটা সময়ে দরকার। তবে সব আগে তোমার ওই তালগাছকে পার করো—'

সুবর্ণলতা উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'রোদ থেকে এসেছেন, ডাব আনি একটা—'

ডাবে ছোঁওয়া লাগে না, তাই মুক্তকেশীর আসার আশায় প্রায়শই ডাব মজুত থাকে। সুবর্ণলতারই ব্যবস্থা।

ডাব, গঙ্গাজল আর তসরের থান।

কাপড় ছেড়ে হাতেমুখে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ডাবটি খেয়ে ছেলের সংসারের

কল্যাণ করেন মুক্তকেশী।

আজ কিন্তু 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন।

বললেন, 'থাক্, থাক্ আজ—'

সুবর্ণলতা তবু 'থাকবে কেন' বলে চলে গেল।

আর সুবর্ণলতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা গলা নামালেন মুক্তকেশী। ফিসফিস করে কী যেন বললেন ছেলেকে, ঈষৎ চমকে উঠলো ছেলে, মুখে যেন বিপন্ন ভাবের ছায়া পড়লো তার, বারকয়েক মাথা নাড়লো 'আচ্ছা' এবং 'না' বাচক, তার পর সাবধান হয়ে সোজা হয়ে বসলো।

সুবর্ণলতার অঞ্চলপ্রান্তের আভাস দেখা গেছে।

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যেই যেন গলাটা আবার তুললেন মুক্তকেশী, বললেন, 'আজ আর বসবো না বেশিক্ষণ, "বুদো"র জন্যে একটা কনে দেখতে যাবার কথা আছে সুবোর, দেখি গে। বললাম একা না ভ্যাকা, বাপ-কাকা যাক, তা পেকা-পেভা দুজনেই ঘাড় নাড়লো। ছেলের বিদ্যেবুদ্ধি কম, তার বিয়ের কথা কইতে ওনাদের মান্যে আঘাত লাগবে। সুবো আমার ভালমানুষ—'

হঠাৎ ওঘর থেকে পারু এসে উদয় হয়, একটু তীক্ষ্ণহাসি হেসে বলে, 'ঠাকুমা বুঝি এবার ঘটকালি পেশা ধরেছ?'

মুক্তকেশী থতমত খান।

মুক্তকেশী অবাক হন।

কারণ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মুক্তকেশী, তবে সামলাতে তিনি জানেন। সামলে নিয়ে বলেন, 'ওগো অ মেজবৌমা, এ মেয়েকে আরো বিদ্যেবতী করতে চাও? এখুনি তো উকিল-ব্যারিস্টারের কান কাটতে পারে গো তোমার মেয়ে। কথার কী বাঁধুনি! আমি নয় ঠাকুমা, ঠাট্টার সম্পর্ক ঠাট্টা করেছে, তবে অন্য ক্ষেত্রে এরকম বোলচাল নিন্দের।'

'তোমার কাছে কোন্‌টাই বা নিন্দের নয় ঠাকুমা—', পারুল হেসে ওঠে, 'তোমাদের সবই বাবা অনাছিষ্টি! ইস্কুলে পড়লে বাচাল হয়, ইংরিজি শিখলে বিধবা হয়—'

'হয়, চোখের ওপর দেখছি লো। তোর বাবার নলিন কাকার নাতনী পান্তির অবস্থা দেখলি না? ঘটা করে মেয়েকে মেম রেখে ইংরিজি শেখানো হয়েছিলো, বিয়ের বছর ঘুরল না, মেয়ে বিধবা হল না!'

পারু ফট করে বলে, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই তো বড়দির জন্যে মেম রাখেন নি ঠাকুমা—'

বড়দি অর্থে মল্লিকা। যার সর্বস্ব গেছে।

মুক্তকেশী মুখ কালি করে বলেন, 'কুতর্ক করার বিদ্যেয় তুই যে দেখছি মা'র ওপরে উঠলি পারু! তোর বাপেরই জীবন অন্ধকার। যাই আজ উঠি।'

ডাব খেলেন না।

বললেন পেট ভার।

কিছু উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চাল, এক বোতল গাওয়া ঘি, পোয়াটাক সাগু, এক সের মিশ্রী, গোটাপাঁচেক টাকা, আর একখানা নতুন গামছা নিয়ে আবার পালকিতে চড়ে বসলেন মুক্তকেশী। ছেলের বাড়িতে এলেই এসব জোটে তাঁর। ডাবটাও পালকিতে তুলে দিল সুবর্ণলতা।

পালকি-বেয়ারাদের হাতে ছটা পয়সা দিতে যাচ্ছিলো প্রবোধ, মুক্তকেশী

ছোঁ মেরে পয়সাটা কেড়ে নিলেন ছেলের হাত থেকে, খরখর ক'রে বলে উঠলেন, 'রেট্ বাড়াসনে পেবো, বাপের পুণ্যে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছিস বলেই মা-লক্ষ্মীকে অবহেলা করিসনে। চার পয়সায় বরাবর যাচ্ছি-আসছি। দয়াদাক্ষিণ্য করে তুমি দু পয়সা বেশি দিলে অন্যের তাতে ক্ষেতি করবে, তা মনে বুঝো। একবার বেশি পেলে আর কমে মন উঠবে?'

এবারে বেয়ারা চারটে কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে এবং প্রবোধও মায়ের দিকে করুণ মিনতি নিয়ে তাকায়, কিন্তু মুক্তকেশী অনমনীয়া!

সদর্পে বলেন, 'দূর হ! দূর হয়ে যা পালকি নিয়ে! ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? বলি পালকির বেত তো ছিঁড়ে ওয়ার হয়ে গেছে, পড়ে গিয়ে সোয়ারির হাড়গোড় না চূর্ণ হয়, ইদিকে পয়সার লালসটি তো খুব আছে! যাবি, না যাবি না?'

ওরা হাতের গামছাটা ঘাড়ে চাপাতে চাপাতে ব্যাজার মুখে বলে, 'যিবো না কাঁই?'

'বেশ, ওই চার পয়সাতেই যাবি।'

বীরদর্পে গিয়ে পালকিতে ওঠেন মুক্তকেশী।

পালকি-বেয়ারাদের পরিচিত ধ্বনিটা শোনা যায় কাছ থেকে ক্রমশ দূরে। আরো দূরে গিয়ে যেন রুদ্ধ হৃদয়ের চাপা আর্তনাদের মত শুনতে লাগে।

মুক্তকেশী যতক্ষণ ছিলেন প্রবোধের প্রাণে যেন বল ছিল, মা চলে যেতেই মুখটা শুকিয়ে এল, কমে এল বুকেব বল।

তবু কর্তব্য করতেই হবে।

তাই সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে ইতস্তত করে বলে, 'মা তো একটা বার্তা দিয়ে গেলেন!'

সুবর্ণ অবশ্য এই 'বার্তা' সম্পর্কে বিশেষ উৎসুক হল না, শুধু মুখ তুলে তাকালো।

প্রবোধ "জয় মা কালী"র ভঙ্গীতে বলে ফেললো, 'তোমার বাবা যে ও বাড়িতে এক খবর পাঠিয়েছিলেন—'

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে।

তোমার বাবা!

খবর পাঠানো!

এ আবার কি অভিনব কথা?

সুবর্ণলতার যে একজন বাবা এখনো অবস্থান করছেন এই পৃথিবীতে, সে কথা কে মনে রেখেছে?

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে না। প্রবোধই আবার বলে, 'মানে এ বাড়ির ঠিকানা তো জানেন না। তোমারও একবগ্গা গোঁ, আমারও ইয়ে হয় না—বাপ বলে কথা! সে যাক, খবর পাঠিয়েছেন, খুব নাকি অসুখ, তোমাকে একবার দেখতে চান—'

তোমাকে একবার দেখতে চান!

সুবর্ণর বাবা সুবর্ণকে একবার দেখতে চান?

এটা কি সন্ধ্যাবেলা?

এই একটু আগেই না দুপুর ছিল?

তবে এখন কেন চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে?

সুবর্ণ সেই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসা পারিপার্শ্বিকের দিকে অসহায়ের মত তাকায়।

এ দৃষ্টি বুঝি সুবর্ণলতার চোখে একেবারে নতুন। প্রবোধও তাই অসহায়তা বোধ করে। অতএব তাড়াতাড়ি বলে, 'আরে বেশি ভয় পাবার কিছু নেই, মানে বয়স হয়েছে তো—মানে অসুখটা বেশি করেছে হঠাৎ, মানে আর কি—ইয়ে তোমার এখুনি একবার যাওয়া দরকার।'

সুবর্ণর চোখে জল নেই।

সুবর্ণর চোখ দুটো যেন ইস্পাতের।

সেই ইস্পাতের চোখ তুলে সুবর্ণ বলে, 'আবার দরকার কি আছে এখনো?'

'বিলক্ষণ! নেই মানে?' প্রবোধ যেন ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'এই কি মান-অভিমানের সময়? যতই হোক জন্মদাতা পিতা—'

'সে কথা হচ্ছে না—,' সুবর্ণ যেন কথাও কয় ইস্পাতের গলায়, 'বাবার মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি!'

বললো এই কথা সুবর্ণ!

কারণ সুবর্ণর সেই কথাটা মনে পড়লো। বহুবার মনে পড়া, আর ইদানীং ধূসর হয়ে যাওয়া, সেই কথাটা। সুবর্ণ সেদিন জলবিন্দুটি পর্যন্ত না খেয়ে চলে এসেছিল বাবার কাছ থেকে, বাবা বলেছিল, 'আচ্ছা, যেমন শাস্তি দিয়ে যাওয়া হলো, তেমন টের পাবে! এই বাপের মরা মুখ দেখতে আসতে হবে।'

বলেছিল, বলে সুবর্ণকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিল সুবর্ণর বাবা নবকুমার। আর একটাও কথা বলে নি।

সেই শেষ কথা!

সেই কথাটাই মনে পড়লো সুবর্ণর, তাই বলে ফেললো, 'মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি।'

প্রবোধ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'কী আশ্চর্য, তা কেন ভাবছো? মানুষের অসুখ করে না?'

সুবর্ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবোধ বলে, 'কানু কলেজ থেকে—'

'কেন, কানু কেন?' সুবর্ণলতা বলে, 'তুমি নিয়ে যেতে পারবে না?'

'আহা পারবো না কেন? তবে কথা হচ্ছে পারু একা থাকবে—'

'একা মানে?' সুবর্ণ সেই ঝকঝকে শুকনো চোখে চেয়ে বলে, 'পারু বকুল দুজনে নেই? মানু সুবল এরাও তো এসে যাবে এখুনি—'

'আহা ওরা আবার মানুষ! মানে—মা বলে গেলেন নেহাৎ খবরটা দিয়েছে, না গেলে ভালো দেখায় না—'

'থাক্, বেশী কথা ভালো লাগছে না, তুমি একখানা গাড়ি ডেকে দাও, আমি একাই যাবো—'

॥ ৫ ॥

'আমি নিজেই যাব!' এর চাইতে অসম্ভব কথা আর কি আছে?

সুবর্ণলতা পাগল তাই এমন একটা অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক কথা বলে বসেছিল। অস্বাভাবিক বৈকি। বিধবা বুড়ীরা কালীঘাট গঙ্গাঘাট করে বেড়ায়, সে আলাদা কথা। বলতে গেলে তারা বেওয়ারিশ। কমবয়সী বিধবারাও মাঝে মাঝে পথে বেরোবার ছাড়পত্র পায়, বুড়ীদের দলে মিশে যেতে পারলে।

'পথে' মানে অবশ্য তীর্থপথে।

অল্পবয়সে যারা সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে, সমাজের কাছে এটুকু কৃপা তারা পায়। অথবা সমাজের উপর এটুকু দাবি তারা রাখে। অবশ্য বুড়ীদের মধ্যে সপ্তরথী বেষ্টিত অবস্থায় তাদের খিদমদগারী করতে করতেই যাওয়া।

তা হোক—তবু রাজরাস্তায় পা ফেলবার সৌভাগ্য!

কিন্তু সধবারা?

নৈব নৈব চ!

তারা তো আর বেওয়ারিশ নয় যে, যা খুশি করতে চাইলেই করতে পারে? তবে আর মেয়েতে পুরুষেতে তফাৎ কি? কাছাকোঁচা দিয়ে কাপড়ই বা পরবে না কেন তবে?

তবুও যদি সুবর্ণ বাইরের জগৎ থেকে নজীর এনে এনে দেখাতে চায়, যদি বলে, 'ওরা মেয়ে নয়? এই বাংলা দেশের মেয়ে?' তারও উত্তর আছে।

যারা বেম্ম, যারা খ্রীষ্টান, যারা সনাতন ধর্মত্যাগী ইংগবঙ্গ, যারা বাঙালী হয়েও 'সাহেব', তাদের ঘরের মেয়েরাই যা নয় তাই করছে। তাদের মেয়েরাই ডাক্তার হচ্ছে, মাস্টার হচ্ছে, দেশসেবিকা হচ্ছে, সমাজ-সংস্কারিকা হচ্ছে, হটহট করে রাস্তায় বেরোচ্ছে, 'পিরিলি' করে শাড়ী পরছে, জুতো-মোজা পরছে। ছেলেদের মতন 'খেলাঘরে'র ছাতা হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

তাদের মত হতে চাও তুমি? সেটাই আদর্শ?

গেরস্তঘরের মেয়েরা সবাই যদি বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে চায়, তাহলে সমাজ বলে আর রইল কি?

লাখ লাখ মেয়ের মধ্যে দু-পাঁচটা মেয়ে কি করছে, সেটাই দেখতে হবে? বাকি মেয়েরা কোথায় রয়েছে সেটা দেখ?

এই যে প্রবোধের ওপাড়ার বন্ধু শশীশেখরদের বাড়ি? সুবর্ণ জানে না তাদের কথা?...এখনো তাদের বাড়ির মেয়েরা চন্দ্র-সূর্য কেমন তা জানে না, ভাদ্রবৌরা কখনো ভাসুরের সামনে বেরোয় না। শশীশেখরের দাদা যখন বৈঠকখানার দিক থেকে অন্দরের দিকে আসেন বা তিনতলা থেকে একতলায় নামেন, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পদক্ষেপ করেন না? ছোট একটা পেতলের ঘণ্টা থাকে না তাঁর হাতে?

কেন?

না, পাছে ভাদ্রবৌরা অনবহিত থাকে, পাছে অসতর্কতায় মুখ দেখা হয়ে যায়। তা ওরা না হয় একটু বেশী, কিন্তু প্রবোধের জানাশোনা আত্মীয় কুটুম্ব

কাদের বাড়িতে সুবর্ণর ইচ্ছানুযায়ী বেহায়াপনা চালু আছে?

সকল বাড়িতেই ধোপানী, গয়লানী, মেছুনী, তাঁতিনী, নাপিতানী। সব বাড়িতেই শাকওয়ালী, ঘুঁটেওয়ালী, চুড়িওয়ালী। অথচ সুবর্ণ নিজের বাঁড়তে দুম্ করে একটা জোয়ানমর্দ গোয়ালা ঠিক করে বসলো সেবার! যুক্তি কি? না দুধ ভাল দেবে! নিকুচি করেছে ভাল দুধের! পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছে তাকে প্রবোধ। পরিমলবাবুদের নজীর মানে নি।

নজীর দেওয়াই একটা রোগ সুবর্ণর।

আর নিজের গণ্ডীর নজীর ছেড়ে গণ্ডির বাইরের নজীরে নজর।

তর্ক উঠলেই গড় গড় করে আউড়ে যাবে—বিধুমুখী, চন্দ্রমুখী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সরোজিনী নাইডু, কামিনী রায়, জ্ঞানদানন্দিনী, লেডি অবলা বসু, আরও গাদাগুচ্ছির। মানবে না যে ওরা তোমার মত হিন্দু বাঙালীঘরের মেয়ে নয়। ঘরে বসে বসে এত খবর রাখেই বা কি করে কে জানে? মাঝে মাঝে তো তাজ্জব হয়ে যায় প্রবোধ। এই তো তার ঘরের মধ্যেই তো আছে চিরটাদিন, অথচ বাইরের খবর প্রবোধের থেকে বেশী রাখে। পাড়া বেড়াতেও যায় না, পাঁচটা সখীসামন্তও আসে না, অথচ—

আশ্চর্য!

মেয়েমানুষের এত জানা, এত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখা হচ্ছে অনর্থের মূল। ও থেকেই সন্তোষ নষ্ট, শান্তি নষ্ট, বাধ্যতা নষ্ট। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে দরকার কি বাপু? বিধাতাপুরুষ যখন গোঁফদাড়ি দিয়ে পাঠায় নি, তখন রাঁধোবাড়ো, খাওদাও, স্বামীপুত্তুরের সেবা কর, নিদেন না হয় হরিনাম কর কিংবা পরচর্চা কর। চুকে গেল ল্যাঠা। তা নয় লম্বা লম্বা বুলি, বড় বড় আস্বা!

তবে সেদিন সুবর্ণ এত কথা বলে নি। এসব ওর মতবাদ। যা মনে পড়ে প্রবোধ একটা তর্কাতর্কির মুখোমুখি হবার ভয় করছিল!...কিন্তু তর্ক সুবর্ণ করে নি সেদিন, বেশী কথাও বলে নি, শুধু বলেছিল, 'আমি নিজেই যাব।'

প্রবোধ ভুরু কোঁচকালো।

আবার সোজা করলো সে ভুরু।

তারপর বললো, 'সে তো আর সম্ভব কথা নয়। তোমার যখন এতই ব্যস্ততা, তখন আমাকেই যেতে হবে পেঁাছতে।'

'না!'

'না? না মানে?'

'মানে নিজেই যাব, সেই কথাই হচ্ছে। ঠিকানা বলে দিলে গাড়োয়ান ঠিকই নিয়ে যেতে পারবে।'

'ঠিকানা?' প্রবোধ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে, 'শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা আর জানলাম কবে? জন্মের মধ্যে কম্ম, সেই তো একবার দরজা পর্যন্ত আমি আবার ঠিকানা বলবো—'

সুবর্ণ উত্তাল অসহিষ্ণু চিত্তকে স্থির করে শান্তগলায় বলে, 'তোমায় বলে দিতে হবে না।'

প্রবোধ সুবর্ণর স্থিরতাকে ভয় করে।

প্রবোধ ভারী আবহাওয়াকে ভয় করে।

তাই প্রবোধ আবহাওয়াকে হাল্‌কা করে ফেলবার চেষ্টায় ছ্যাবলাগোছের

হাসি হেসে বলে, 'তবে বলবেটা কে? তুমি? সেই মান্ধাতার আমলের স্মৃতি উট্‌কে? মাথা খারাপ! সে কি এখনো মনে আছে তোমার? কি বলতে কি বলবে—'

'এত কথা আমার খারাপ লাগছে। তোমায় গাড়ি ডেকে দিতেও হবে না, রাস্তায় বেরিয়ে আমি নিজেই—'

হঠাৎ থেমে গেল সুবর্ণ, গলাটা কি শত্রুতা সাধলো?

প্রবোধ বুঝলো একবার যখন ধরেছে, ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে পরিস্থিতিটা গোলমেলে। তাই 'আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে' বলে বেরিয়ে পড়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এনে সশব্দ সমারোহে বলে, 'পারু, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে যা। ভাল করে দিবি, কেউ কড়া নাড়লে বারান্দা থেকে দেখে তবে—'

সুবর্ণ একখানা ফর্সা শাড়ি পরে নেমে এসেছিল ততক্ষণে, সুবর্ণর চোখ লালচে, মুখ লালচে, তবু সুবর্ণ দৃঢ়গলায় বলে, 'অত কথা হচ্ছে কেন? বলছি তো আমি নিজেই যাব।'

প্রবোধও অতএব দৃঢ় হয়, 'বললেই তো হল না? কলকাতার রাস্তা বলে কথা! তার ওপর মোছলমান গাড়োয়ান কোন্ পথে নিয়ে যেতে কোন্ পথে টেনে ছুট দেবে—'

সুবর্ণ সহসা ঘুরে দাঁড়ায়, সিঁড়ির দিকে এগোয়, বলে, 'ঠিক আছে যাব না।'

'আরে বাবা হলটা কি? বলছি তো নিয়ে যাচ্ছি—'

'না না না!'

সুবর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

'ধেত্তারি নিকুচি করেছে—,' প্রবোধ জেরবারের গলায় বলে, 'আমি শালা সবতাতেই চোরদায়ে ধরা পড়েছি। চুলোয় যাক, আমার কি?'

তারপর গট গট করে বেরিয়ে গাড়োয়ানটার হাতে একটা এক আনি দিয়ে বলে, 'দরকার লাগবে না বাবা, যা!'

দোতলায় উঠে এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলতে থাকে, 'বুঝলাম মন খারাপ, তবু সবেরই একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। মা-বাপ তো তোমার জ্যান্তে মরা, এখন যে "অসুখ" বলে খবর পাঠিয়েছে সেটাই আশ্চর্য!'

ঘরের মধ্যে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, দেখাও যায় না কোণের দিকে কোথায় বসে আছে।

নিজেরই তো ঘর, তবু কেন কে জানে হঠাৎ ঢুকে পড়বারও সাহস হয় না। বাইরে থেকেই আরো কিছুক্ষণ স্বগতোক্তি করে আস্তে আস্তে নীচের তলায় নেমে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকে।

'বাবা—'

অনেকক্ষণ পরে বকুল এসে ঘরে ঢোকে।

যেন খুব একটা বিচলিত দেখায় তাকে।

বলে ওঠে, 'বাবা, মা কোথায়?'

মা কোথায়!

এ আবার কেমন ভাষা!

প্রবোধ কাছা সামলাতে সামলাতে উঠে পড়ে, 'তার মানে?'

বকুল শুকনো গলায় বলে, 'কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিমপ্রবাহ বয়ে যায়, তবু মেয়ের সামনে "অবিচলিত" ভাব দেখাতে চেষ্টা করে প্রবোধ, 'ছাতে উঠে বসে আছে বোধ হয়।'

'না। ছাতে দেখে এসেছি।'

হ্যাঁ, সর্বত্রই দেখেছে ওরা।

ছাতে, স্নানের ঘরে, ঘুঁটে-কয়লার ঘরে, এমন কি ঝিয়ের বাসনমাজার গলিতে পর্যন্ত।

কোথাও নেই সুবর্ণলতা!

॥ ৬ ॥

নবকুমার বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন।

নবকুমার হয়তো আশা ছেড়েই পড়ে আছেন।

ওদের বাড়িতে খবর দেবার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন, আশা করছেন, দরজাটা বাতাসে নড়লেও চমকাচ্ছেন, আবার বারেবারেই হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলছেন, 'সে আর এসেছে!.. আসবে না কক্ষনো। আসবে না।'

এমনি অনেক যন্ত্রণাময় মুহূর্ত পার করে, অনেক হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে যখন নবকুমার প্রায় শেষ নিঃশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন সহসা শুনতে পেলেন, 'এসেছে!'

এসেছে সুবর্ণ!

নবকুমারের মেয়ে!

নবকুমারের জীবন থাকতে সে কোনোদিন এল না।

নবকুমারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, নবকুমার ক্ষীণকণ্ঠে কি যে বললেন, বোঝা গেল না।

তারপর নবকুমার আর একটু সচেষ্ট হলেন, আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে কথা বললেন, বোঝা গেল।

নবকুমার বললেন, 'সেই এলে শুধু সব যখন শেষ হয়ে গেল!'

সুবর্ণ ডুকরে কেঁদে উঠতে পারতো, কিন্তু সুবর্ণ তা করল না।

সুবর্ণ শুধু মাথাটা নিচু করলো।

সুবর্ণ কাঁপা কাঁপা ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলো।

নবকুমার বললেন, 'আমি আর বেশিদিন নেই সুবর্ণ, বুঝতে পারছি ডাক এসেছে।'

সুবর্ণ মাথা তুলে একবার তাকালো, আবার মাথাটা নিচু করলো।

নবকুমার আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'জানি ক্ষমা চাওয়ার কথা আমার মুখে আনা উচিত নয়, তবু এই শেষকালে তোর কাছে একবার ক্ষমা না চেয়ে মরতেও তো পারছি না!'

'বাবা!' সুবর্ণ রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ও কথা বলে আমায় শাস্তি দেবেন না

বাবা!'

'শাস্তি নয় রে সুবর্ণ, এ একেবারে সত্যিকার অপরাধীর কথা! যে অপরাধ আমি তোর কাছে করেছি—'

সুবর্ণ আরো কাছে সরে আসে, আরো রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তাই যদি হয়, তার শাস্তিও কম পান নি বাবা!'

'তা বটে!' নবকুমারের নিষ্প্রভ দুটি চোখ দিয়ে আর এক ঝলক জল গড়িয়ে পড়ে, সে কথা মিথ্যে নয়! এক-এক সময় মনে হতো, বুঝি বা লঘু পাপে গুরু দণ্ডই হয়েছে আমার! আবার যখন তোর জীবনটা দেখেছি, তখন মনে হয়েছে, নাঃ, এ দণ্ড আমার ন্যায্য পাওনা! তবে একটা কথা বলে যাই রে, যা করেছি, না বুঝে করেছি। বুঝে জেনে অত্যাচার করতে করি নি! কিন্তু সেই একজন তা বুঝল না কোনোদিন—'

নবকুমার থামলেন, জলের গ্লাসের দিকে তাকালেন।

সুবর্ণ জল দিতে গেল, দিতে পেল না, সাধনের বৌ এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি মুখের কাছে গেলাসটা ধরে বলে উঠলো, 'এই যে বাবা, জল খান।'

নবকুমার মুখটা কোঁচকালেন।

নবকুমার আধ ঢোক জল খেয়ে সরিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা করতে যদি পারিস তো—'

'বাবা, আপনি চুপ করুন। আমি সব বুঝতে পারছি। আপনার কষ্ট, আপনার দুঃখ, সব বুঝেছি।'

নবকুমার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা চাইলাম, সারা জীবনে তো পারি নি, এখন এই মরণকালে—তবু আমার নিজের জন্যে তোকে ডাকি নি সুবর্ণ, ডেকেছিলাম এইটা দিতে!'...হাতটা তোশকের তলায় ঢুকিয়ে একটু বুলিয়ে নিয়ে টেনে বার করলেন একটা ভারী খাম। বললেন, 'এইটা আগলে নিয়ে বসে আছি, তোকে দেব বলে!'

সুবর্ণ হাত বাড়ায় না।

সুবর্ণ কি এক সন্দেহে আরক্ত হয়ে ওঠে।

সুবর্ণ অস্ফুটে বলে, 'কী এ?'

নবকুমার বোধ করি বুঝতে পারেন। তাই তার সন্দেহভঞ্জন করেন। সামান্য একটু হাসির গলায় বলেন, 'ভয় নেই, দলিল নয়, দানপত্র নয়। শুধু চিঠি।'

'চিঠি!'

'হ্যাঁ'—নবকুমার কাঁপা গলায় বলেন, 'তোর মা'র চিঠি!'

মা'র চিঠি!

সুবর্ণর মা'র চিঠি!

কাকে লেখা?

সুবর্ণকে নয় তো!

হুঁ, তাই আবার হয়? হতে পারে? সুবর্ণর এত ভাগ্য?

কি জানি কি!

সুবর্ণ তাই নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। নবকুমার হাতের উল্টোপিঠে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন, 'চিরদিনের একবগ্‌গা মানুষ, কি ভেবে কি করে কেউ বোঝে না। কখনো কোনো বার্তা করে না। তোর ছোড়দা যাই ওদিকে

কাজ নিয়েছে, তাই জানতে পারি বেঁচে আছে। হঠাৎ একবার তার হাত দিয়েই দুটো চিঠি পাঠালো, একটা আমাকে লেখা, একটা তোকে লেখা—'

'বাবা, আপনার কষ্ট হচ্ছে, একসঙ্গে বেশি কথা বলবেন না।'

'না রে সুবর্ণ, আর আমার কোনো কষ্ট নেই, তুই ক্ষমা করিস আর নাই করিস, আমি যে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে পারলাম, এতেই মনটা বড় হালকা লাগছে। এবার শান্তিতে মরতে পারবো।...হ্যাঁ সেই চিঠি—'

হ্যাঁ, সেই চিঠির একখানা নবকুমারের, একখানা সুবর্ণর।

'একবগ্গা' সত্যবতীর নাকি কড়া নিষেধ ছিল তার জীবৎকালে যেন এ চিঠি খোলা না হয়। মৃত্যুসংবাদটা অবশ্যই পাবে নবকুমার, তখন সুবর্ণরটা সুবর্ণকে পাঠিয়ে দেবে, নিজেরটা খুলে পড়বে।

সে সংবাদ এসেছে—

না, শেষরক্ষা হয় নি।

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে নি। সুবর্ণ তীব্র তীক্ষ্ণ একটা ডাকের সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল। ডাক নয় আর্তনাদ! 'বাবা!'

শুধু ওই!

শুধু 'বাবা' বলে একটা তীব্র আর্তনাদ! তারপর স্তব্ধতা।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধতা!

পাশের ঘরে প্রবোধ তখন তার শালাজকে প্রশ্ন করছে, 'কী হয়েছিল বললেন?...কিছু হয় নি? আশ্চর্য তো! একেই বলে পুণ্যের শরীর! তবে আপনাদেরও বলি—যতই যেমন হোক 'মা' বলে কথা! মরে গেল, আপনারা একটা খবর দিলেন না! বলি চতুর্থীটাও তো করতে হতো আপনার ননদকে!'

হ্যাঁ, প্রবোধ এসে পড়েছে বৈকি। ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছে, সুবর্ণলতার নিরুদ্দেশ সংবাদে।

শালাজ মৃদুস্বরে বলে, 'কি বলবো বলুন? হাত-পা বাঁধা যে! কড়া হুকুম দেওয়া ছিল তাঁর মৃত্যু-খবর না পাওয়া পর্যন্ত যেন বাবার চিঠিটা খোলা না হয়, আর ঠাকুরঝির চিঠি ঠাকুরঝিকে দেওয়া না হয়। আর চতুর্থী করার কথা বলছেন? সেও তো হুকুম ছিল, তাঁর জন্যে কেউ যেন অশৌচ পালন না করে।'

প্রবোধ কৌতূহলী হয়ে বলে, 'সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বুঝি?'

'না না, তা তো কই শুনি নি। নাকি বলেছিলেন, বহুকাল সংসারকে ত্যাগ করে এসেছি, তার সুখ-দুঃখের কোন দায়ই নিই নি, এতকাল পরে মরে তাদের গলায় এত বড় একটা দুঃখের দায় দিতে যাব কেন?'

'তা ভাল!' প্রবোধ বলে, 'ওই মানুষটির সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধির জন্যেই দু-দুটো সংসার মজলো! এই তো শ্বশুরমশায়েরও তো "গঙ্গাপানে পা" দেখতে পাচ্ছি—'

সাধনের বৌ বলে, 'তা সেও ওই একই কারণ! যেই না খবর এল ওনার কাশীলাভ হয়েছে, শ্বশুরঠাকুর যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। বলতে গেলে সেই যে শুয়ে পড়েছিলেন, সেই শোয়াই এই শেষ শোয়া! কবরেজ তো বলেছে, বড় জোর আর দু-চারটে দিন!'

প্রবোধ কখনো শালাজ রসের আস্বাদ পায় নি, তাই প্রবোধ কথা থামাতে

চায় না, কথার পিঠে কথা গেঁথে গেঁথে চালিয়ে যায় আলাপ, আর সেই সূত্রেই জানতে পারে, রোগবালাই কিছুই ছিল না নবকুমারের, এখনো এই বয়সেও এতগুলি করে খেতে পারতেন, নিজে বাজারে না গিয়ে থাকতে পারতেন না, আর গিয়ে রাজ্যের শাক-পাতা কিনে এনে বলতেন, 'রাঁধো', আর সেইগুলো খেয়ে হজম করতেন। মেজাজটা অবিশ্যি তিরিক্ষি ছিল, তা তো বরাবরই ছিল। সুধীরবালা বিয়ে হয়ে পর্যন্তই তো দেখছে, সর্বদাই যেন মেজাজ 'টঙে' চড়ে বসে আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য, শক্তি ছিল। অথচ স্ত্রী মারা যেতেই একেবারে গুঁড়ো হয়ে পড়লেন।

প্রবোধ এসব শুনে-টুনে হেসে মন্তব্য করে, 'ভেতরে ভেতরে এখনো এত ছিল?'

সাধনের বৌ মৃদু হাসে।

প্রবোধ আবার বলে, 'তবে উচিত ছিল পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসা!'

বৌ মাথা নাড়ে।

'মাথা খুঁড়লেও আসতেন না। শুনেছি তো প্রকৃতির কথা। তবু নিজের ছেলের কাছেই শুনেছি। একেবারে অন্য ধরনের—'

'হুঁ, মেয়েটিও তাই হয়েছেন!' প্রবোধ আক্ষেপ করে বলে, 'আপনার কাছে বলেই বলছি—আপনার ননদও ঠিক তাই। একেবারে সৃষ্টিছাড়া! আমি শালা চিরকাল চোর হয়ে আছি মহারাণীর মেজাজের কাছে। অথচ এই তো আপনি—দিব্বি সোজাসুজি!'

'কী করে জানলেন?' শালাজ হাসে, 'জন্মে তো একবার দেখলেন?'

'তাতে কি? পাকা রাঁধুনীরা হাঁড়ির একটা ভাত দেখলেই বুঝতে পারে কেমন সেদ্ধ হয়েছে। যাক্, শ্বশুরমশাইয়ের অবস্থা তাহলে শেষাবস্থা?'

'তাই তো বললে কবরেজ। তা বয়েসও তো হয়েছে—'

প্রবোধ কথাটা লুফে নেয়। হেসে ওঠে।

'তা বটে! তবে কিনা রোগবালাই হল না, পত্নীশোকে প্রাণটা গেল, এটাই বা দুঃখের কথা! ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের পুত্রশোকে প্রাণ গিয়েছিল, আর কলিযুগে এই আমাদের শ্বশুরঠাকুরের পত্নীশোকে—' টেনে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ যেন ভারী একটা রসিকতা করেছে!

'ঠাকুরঝিকে কি রেখে যাবেন?'

ঠাকুরজামাইকে জামাইজনোচিত জলখাবারে আপ্যায়ন করে শালাজ প্রশ্ন করে।

প্রবোধ হাত উল্টে বলে, 'সে আপনার ঠাকুরঝির মর্জি! যদি বলেন "থাকবো", পৃথিবী উল্টে গেলেও রদ হবে না। যদি বলেন "থাকবো না", পায়ে মাথা খুঁড়লেও বদলাবে না—'

সুধীরবালা হাসে, 'আপনি তাহলে বেশ মজায় আছেন বলুন?'

'হুঁ, সে কথা আর বলতে! মজা বলে মজা! তবে আপনার কি মনে হয়? আজ রাত্তিরের মধ্যেই কিছু হয়ে-টয়ে যাবে?'

সুধীরবালা মাথা নাড়ে।

বলে, 'আজ-কালের মধ্যেই কিছু হবে বলে অবিশ্যি মনে হয় না। কেন, এক রাত্তিরও গিন্নীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বুঝি?'

'কী যে বলেন? এই বয়সে আবার অত—' প্রবোধ হ্যা-হ্যা করে হাসতে

থাকে, 'তা ছাড়া আপনার ঠাকুরঝিটি তেমনি কিনা! একটি পুলিশ সেপাই!'

প্রবোধেরও একটা দুঃখের দিক আছে বৈকি। প্রবোধ দেখে সংসারের সবাই দিব্যি সহজ স্বাভাবিক, শুধু বেচারা প্রবোধের বৌটাই সৃষ্টিছাড়া। আজীবন এই দুঃখেই জ্বলে মলো বেচারা।

এই তো একটা মেয়েমানুষ! সুবর্ণলতার মত অত রূপ না থাক, দিব্যি মেয়েলী লাবণ্য রয়েছে, মেয়েলী কথাবার্তা, প্রাণটা সহজ হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আর সুবর্ণ? তার দিকে যেতেই তো ভয় করছে! বাপ-বেটিতে কোনোকালেও মুখ দেখাদেখি নেই, অথচ মরছেন খবর শুনে দিশেহারা হয়ে একা ছুটে এলেন! কত বড় দুর্ভাবনা গলায় গেঁথে দিয়ে এলি তা ভাবলি না!

প্রবোধ যেন কেউ নয়!

প্রবোধকে যেন চিনতে পারছে না!

কে বলতে পারে নিয়ে যাওয়া যাবে, কি বাপের রোগশয্যে আঁকড়ে পড়ে থাকবে!

বিপদের ওপর বিপদ!

এই সময় আবার মাতৃশোক-সংবাদ!

মা'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, অথচ ভেতরে ভেতরে তো ভক্তির সমুদ্দুর ভরা ছিল প্রাণে।

তা কপালই বলবো।

একই সঙ্গে মাতৃপিতৃ-বিয়োগ!

মা মরেছে আজ দশ-বিশ দিন, খবর নেই বার্তা নেই। এখন একেবারে—

প্রবোধেরই গেরো!

গেরো কি সোজা? তিনি যতই বলে যান, তাঁর মরণে কেউ যেন 'অশৌচ' না নেয়, সমাজ তা মানবে? এখুনি তো প্রবোধকে মায়ের কাছে ছুটতে হবে—নিয়মকানুন জানতে। তারপর পুরুতবাড়ি!

বেঁচে থেকে কোনোকালে উপ্‌গার করলেন না শ্বশুর-শাশুড়ী, এখন মরে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছেন।

একেই বলে পূর্বজন্মের শত্রুতা।

প্রবোধের দিক থেকে এসব যুক্তি আছে বৈকি।

কিন্তু সুবর্ণ!

সুবর্ণ কোন্ যুক্তি দিয়ে ক্ষমা করবে তার মাকে?

মরে গিয়ে তবে সুবর্ণকে উদ্দিশ করে গেল মা? চিঠিখানা পড়ে উত্তর দেবার পথটা পর্যন্ত না থাকে?

কেন? কেন? কেন মা আজন্ম এভাবে শত্রুতা করল সুবর্ণর সঙ্গে?

ত্যাগই তো করেছিলে, মরে গেল তবু জানতে পেল না সুবর্ণ, এখন তবে আবার কেন একখানা চিঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে যাওয়া?

প্রবোধের ভয় অমূলক।

সুবর্ণ থাকতে চাইল না।

সুবর্ণ বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। বললো, 'এই শেষ দেখা দেখে গেলাম বাবা। শাপ দিয়েছিলে মরা মুখ দেখতে, সেটুকু থেকে যে অব্যাহতি পেলাম, সেই পরম ভাগ্যি।'

'আর আসবি না?'

সুবর্ণ তার সেই বড় বড় চোখ দুটো তুলে বললো, 'আর কী করবো বাবা? আর আসতে ইচ্ছে নেই। মনে জানবো একই দিনে মা-বাপ হারিয়েছে হতভাগী সুবর্ণ।'

অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

যেন সেই পরলোকগতার পিছু পিছু গিয়ে ফেটে পড়ে বলতে ইচ্ছে করছে —কেন? কেন? কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে সুবর্ণ যে এত বড় শাস্তি দিলে তাকে?

॥ ৭ ॥

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'মনে জানবো একই দিনে মা-বাপ হারালাম আমি!'

কিন্তু মা-বাপ কি ছিল সুবর্ণর? তাই হারানোর প্রশ্ন?

কবে ছিল?

কবে পেয়েছে সেই থাকার প্রমাণ?

তবে?

যে বস্তু ছিল না, তার আর হারাবার প্রশ্ন কোথায়?

তবু নির্বোধ সুবর্ণলতা অসীম নক্ষত্রে ভরা আকাশের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে একটি নতুন নক্ষত্রের সন্ধান করতে করতে সেই বলে-আসা কথাটাই আবার মনে মনে উচ্চারণ করে, 'একই দিনে মা-বাপ দুই-ই হারালাম আমি!'

কোনো এক নতুন নক্ষত্র কি শুনতে পাবে সে কথা? আর শুনতে পেয়ে হেসে উঠবে? বলবে, 'যা ছিল না তাই নিয়ে হারানোর দুঃখ ভোগ করতে বসলি তুই? ছি, ছি!'

সুবর্ণলতা সে হাসি সে কথা শুনতে পাবে না হয়তো। তাই সুবর্ণলতা ওই আকাশটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

এ বাড়িতে আকাশ আছে।

সুবর্ণলতার এই গোলাপী-রঙা দোতলায়। কারণ এ বাড়িতে আছে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। আছে দক্ষিণের বারান্দা। যে বারান্দায় বাতাসের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য, যে ছাদে অন্তহীন অন্ধকারের নিবিড় গভীর প্রগাঢ় প্রশান্তি।

ছাদেই তো মুক্তি!

এখানে—ঊর্ধ্বসীমায় স্থির হয়ে আছে সেই অসংখ্য নক্ষত্রের মালা-পরানো নির্মল আকাশ।

সুবর্ণলতার কি তবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয়? যদি না দেয় তো সুবর্ণ অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু সুবর্ণ অকৃতজ্ঞ নয়।

তাই সে যখন সেই অন্তহীন অন্ধকারের মাঝখানে উঠে এসে দাঁড়ায়, তার হৃদয়ের শান্ত ধন্যবাদ উঠে আসে একটি গভীর নিঃশ্বাসের অন্তরাল থেকে।

এখানে ছাদে উঠে আসতে পারে সুবর্ণলতা।

আর সেটা পারে বলেই দু'দণ্ডের জন্যেও অন্তত ভুলে থাকতে পারে—

সুবর্ণলতা নামের মানুষটা হচ্ছে একটা কর্মে উত্তাল আর শব্দে মুখর স্থূলে আর ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। ভুলে থাকতে পারে, সেই সংসার তার স্থূলতা আর ক্ষুদ্রতা নিয়ে অহরহ সুবর্ণলতাকে ডাক দিচ্ছে। তার দায় এড়াবার উপায় নেই সুবর্ণলতার।

তবু আজ বোধ হয় আর কেউ ডাক দিতে আসবে না।

আজ সুবর্ণলতাকে বোধ হয় কিছু কিঞ্চিৎ সমীহ করবে সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা।

ডাক দেবে না, অতএব সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে বসে মনে ভাবতে পারে, মা ছিল তার! রাজরাজেশ্বরী মা!

ছিল সুবর্ণর সমস্ত চেতনার মধ্যে, সমস্ত ব্যাকুলতার মধ্যে, সমস্ত অনুভবের মধ্যে। মূর্খ সুবর্ণলতা শুধু একটা মূঢ় অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে সেই মায়ের দিক থেকে।

নইলে একবার কি সবদিকের সব মান-অভিমান ধুলোয় বিকিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়া যেত না? বলা যেত না, 'মা, তোমায় একবার দেখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তাই চলে এলাম!'

সুবর্ণ তা করে নি।

সুবর্ণ তার অভিমানকেই বড় করেছে। সুবর্ণ ভেবেছে, 'মা তো কই একবারও ডাক দেন নি।'

সুবর্ণ ভেবেছে, 'স্বামীর কাছে হেঁট হব না আমি!'

তাই সুবর্ণর মা 'ছিল না'!

এখন সুবর্ণলতা সব মান-অভিমান ধুলোয় লুটিয়ে দিলেও আছড়ে পড়ে বলতে পারবে না সেই কথাটি।

'মা, তোমাকে একবার দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছিলাম আমি।'

কিন্তু অভিমান কি দূর হয়?

এখনো তো বাপের উপর একটা দুরন্ত অভিমানে পাথর হয়ে আছে সুবর্ণ! সেই পাথর যদি ফেটে পড়তো তো, হয়তো কপাল কুটে কুটে চীৎকার করে উঠতো, কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে ঠকাবে? কেন এমন করে নিষ্ঠুরতা করবে আমার সঙ্গে? কী ক্ষতি হতো যদি তোমার সুবর্ণলতার মায়ের চিঠিটা সুবর্ণলতাকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিতে?

যদি বলতে, 'সুবর্ণ রে, তোর মা বলছে, সে মরে না গেলে চিঠিটা না দিতে, কিন্তু আমি পারলাম না অত নিষ্ঠুর হতে, আমি দিয়ে গেলাম তোকে। এখন তুই বোঝ, খুলবি কি খুলবি না!

সুবর্ণ বুঝতো!

কিন্তু সুবর্ণর বাবা তা করেন নি!

আর সুবর্ণর মা তার চিঠির জবাব চায় না বলে বলে গেছে—'আমি মরলে তবে দিও সুবর্ণকে!'

কী দরকার ছিল এই মুষ্টিভিক্ষায়?

সারা শরীর তোলপাড়-করা একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সেই পাথরকে ভাঙতে চাইছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে বন্ধ রয়েছে সেই মুষ্টিভিক্ষার নমুনাটুকু।

বন্ধ খাম বন্ধই রয়েছে।

সুবর্ণলতা খুলবে না ও খাম, দেখবে না কী লেখা আছে ওতে।

নিরুচ্চার থাক্ সুবর্ণলতার নিষ্ঠুর মায়ের নিষ্ঠুরতার নমুনাটা।

মাকে বাদ দিয়েও যদি এত বড় জীবনটা কেটে গিয়ে থাকে সুবর্ণর তো বাকী জীবনটাও যাবে।

সুবর্ণলতা ভাবুক, যে বস্তু ছিল না, তার আবার হারানো কি? সুবর্ণলতার মা নেই, মা ছিল না।

কিন্তু সত্যই কি ছিল না?

কোনোদিনই না?

সুবর্ণলতার জীবনের নটা বছর একেবারে 'নয়' হয়ে যাবে?

সুবর্ণলতার সেই ন'বছরের জীবনের সমস্ত জীবনাকাশ জুড়ে নেই একখানি অনির্বাণ জ্যোতি? সেই জ্যোতির পরিমণ্ডলে ও কার মুখ?

সুবর্ণলতার মায়ের মুখ কি ভুলে গেছে সুবর্ণ?

সুবর্ণর জীবন-আকাশের সেই জ্যোতি চিরতরে মুছে গেছে? মুছেই যদি গেছে তো সুবর্ণলতা কোন্ আলোতে দেখতে পাচ্ছে ওই ফ্রক-পরা ছোট মেয়েটাকে?

যে মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরেই হাতের বইখাতা নামিয়ে রেখে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে এগিয়ে গেছে তার মায়ের কাছে দু হাত বাড়িয়ে?

'মা! মা! মা!'

মা অবশ্য হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, ইস্কুলের জামা-কাপড়—'

কিন্তু মায়ের চোখের কোণে প্রশ্রয়, মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসি।

আর শোনে কেউ তাঁর মিথ্যে নিষেধের সাজানো বুলি! জড়িয়ে না ধরে ছাড়ে?

অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকার। এই অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে বুঝি ঐ ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ।

কিন্তু ওই অতল অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি তেমন চলে না। শুধু শব্দ-তরঙ্গ পড়ে আছড়ে আছড়ে।

সেই তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সুবর্ণ।

শব্দ, শব্দ!

স্মৃতির কৌটোয় ভরা বুঝি স্তরে স্তরে? আজকের ধাক্কা লেগে তারা উঠে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে, নতুন করে ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রথম ভোরে যে শব্দটা সেই ছোট মেয়েটার ঘুমের শেষ রেশকে সচকিত করে ধাক্কা দিয়ে যেত, সে হচ্ছে হাড়-পাঁজরা বার করা ঘোড়ায় টানা ময়লা-গাড়ির ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ।

অবিশ্বাস্য একটা জঞ্জালের স্তূপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। আর শব্দ উঠছে ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ। সেই শব্দের সঙ্গে আর এক শব্দ, 'সুবর্ণ এবার উঠে পড়!' সুবর্ণ অবশ্যই এক কথায় উঠে পড়ত না, তখন একটু মৃদু ধমক। কিন্তু সেই ধমকের অন্তরালে যেন প্রশ্রয়ের মাধুর্য। সুবর্ণ উঠে পড়তো, আর শব্দ শুনতে পেতো মায়ের রান্নাঘরের বাসনপত্র নাড়ার শব্দ। সেই শব্দের মধ্যে মা মাখানো। দুপুরের নির্জনতায় আর একটা শব্দ উঠতো, 'ঠং ঠং ঠং'।

বাসনওলা চলেছে চড়া রোদ্দুরে, তার মাথার ওপর বাসনের ঝাঁকা, আর হাতে একটা কাঁসির সঙ্গে একটুকরো কাঠ। সেই কাঠটুকুতেই কাঁসির গা থেকে শব্দ উঠছে—'ঠং, ঠং, ঠং'!

সে শব্দ—

দুপুরের নির্জনতায় যেন একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যেত। মনটা হু-হু করে উঠতো। শেলেট পেনসিল রেখে মায়ের কাছে গিয়ে গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছে করতো।

মা বলতো, 'কি হল? লিখতে লিখতে উঠে এলি যে?'

মেয়েটা মায়ের গা ঘেঁষে বসে বলতো, 'এমনি।'

মা মেয়েটার ঝুমরো চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে স্নেহ-ভরা গলায় বলতো, 'এমনি মানে? এমনি কিছু হয় নাকি?'

মেয়েটা মায়ের গালে গাল ঘষে ঘষে বলতো, 'হয়, হয়! এই তো হলো!'

তখন যদি দুপুরের সেই নির্জনতা ভেদ করে আবার হাঁক উঠতো, 'ট্যাঁপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু--ল!'

অথবা হাঁক উঠতো--'চীনের সিঁদুর! চাই চীনে--র সিঁদুর--' কিছুই এসে যেত না মেয়েটার।

বুক গুরগুর করে উঠতো না, গা ছম্‌ছম্ করে উঠতো না। যেন সব ভয় জয়ের ওষুধ মজুত আছে ঐ মিষ্টি গন্ধেভরা গা-টার মধ্যে!

কিসের সেই মিষ্টি গন্ধ?

চুলের? শাড়ির? না শুধু মাতৃহৃদয়ের?

শব্দ উঠতো—

'বেলোয়ারি চুড়ি চাই, কাচের পুতুল খেলনা চাই! সাবান, তরলআলতা চাই!' শব্দ উঠতো, 'পাংখা বরো—ফ! পাংখা বরো—ফ!'

তখন আর ভয় নয়, আহ্লাদ।

আহ্লাদ, আগ্রহ, উৎসাহ।

শুনতে পেলেই জানালার কাছে ছুটে যেত মেয়েটা, তারপর সরে এসে উতলা গলায় বলতো, 'মা, মাগো!'

মা হেসে হেসে বলতো, 'ভারী যে আদর দেখছি! কী চাই শুনি?'

'কাচের পুতুল একটা—'

'আর পুতুল কি হবে রে? কত রয়েছে—'

মেয়েটা তীক্ষ্ন গলায় বলতো, 'বা রে, আমার বুঝি কাঁচ পুতুল আছে?'

অতএব কাঁচ পুতুল!

অথবা বরফ! পাংখা বরফ! তখন মা বলতো, 'দূর, দূর, ও বরফ বিচ্ছিরি জলে তৈরি হয়। ওসব কি খায় মানুষে?'

'খায় না তো বিক্রি করে কেন?' পরনে খাটো ফ্রক থাকলেও তর্কে খাটো ছিল না মেয়েটা। বলতো, 'খায় না তো বিক্রি করে কেন?'

মা পয়সা বার করতো আব বলতো, 'বিক্রি তো সাপের বিষও করে। খাবি তাই?'

বলতো, আবার পয়সা দিতো।

বলতো, 'শুধু আজ, আর নয় কিন্তু!'

তাই, তাই, তাতেই সই।

'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।' আর এক-দিনের কথা পরে ভাবা যাবে।

এক-একদিন আবার মা বকতো।

বলতো, 'কেবল কেবল পড়া ফেলে উঠে আসিস কেন বল্ তো? মন নেই কেন পড়ায়?'

মেয়েটা বলে ফেললেই পারতো ভরদুপুরে ওইরকম সব শব্দ শুনলে ভয় করে আমার। বললে অনেক কিছু সোজা হয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটা তা বলতো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

মা বলতো, 'যাও, হাতের লেখা করে ফেল গে।'

মেয়েটা আস্তে আস্তে চলে যেত।

আর সময় মিনিট গুনতো কখন রাত্তির আসবে। রাত্তিরে তো আর মা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলতে পারবে না, 'যাও পড় গে!'

রাত্তিরে মায়ের বুকের কাছে ঘেঁষটে শুয়ে গায়ের ওপর হাত রেখে পরম সুখময় একটু আবেশ নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া!

ছোট সেই মেয়েটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুবর্ণলতা। তার মায়ের কাছে বসে চুল বাঁধে, ভাত খায়, পড়া মুখস্থ করে। বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে যায়।

যায় দুর্গাপূজার প্রতিমা দেখতে। যেখানে যায় তার নামগুলো যেন ভেসে ভেসে উঠছে চালচিত্র-ঘেরা জগজ্জননী মূর্তির ধারে ধারে।

রাণী রাসমণির বাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, শ্যামবাজারের মিত্তির-বাড়ি।...কোথায় যেন নাগরদোলা চড়ে আসে, কোথায় যেন সঙের পুতুল দেখে।

তারপর ব্যথা-করা পা নিয়ে বাড়ি ফিরে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে, 'মা, মাগো, কতো ঠাকুর দেখেছি জানো? পাঁ-চ-খানা!'

মা হেসে বলতো, 'ঠাকুর তো দেখেছিস? নমস্কার করেছিস?'

'আহা রে নমস্কার করবো না? আমি যেন পাগল!'

মা ওর কপালের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বলতো, 'করেছিস তাহলে? নমস্কার করে কি বর চাইলি?'

'বর? এই যাঃ, কিছু চাই নি তো?'

মা হেসে ফেলতো।

'চাস নি? তা ভালোই করেছিস! না চাওয়াই ভালো। তবে এইটুকু চাইতে হয়, মা, আমার যেন বিদ্যে হয়!'

বিদ্যে!

বিদ্যে!

উঠতে বসতে মা ওই কথাই বলতো।

'বিদ্যেই হচ্ছে আসল, বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যে-সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা!...তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে। আর যে-সব মেয়ে-মানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদুষী হয়েছে?...কত গৌরব তাদের —কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।'

সুবর্ণলতার সর্বশরীরে প্রবল একটা আলোড়ন ওঠে।

সুবর্ণলতা ছাদে ধুলোর ওপর শুয়ে পড়ে মুখটা ঘষটে বলে, 'শেষরক্ষা করতে পারনি মা! শুধু তোমার দেওয়া সেই মন্ত্রের দাহে সারাজীবন জর্জরিত হয়েছে তোমার সুবর্ণ!'

অনেক চোখের জল ফেলে ফেলে দুঃসহ যন্ত্রণাটা স্তিমিত হয়ে আসে। সুবর্ণলতা আবার এখন তাই দেখতে পায়। শব্দের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে দৃশ্যের ঘাটে এসে ঠেক খায়।

তাই সুবর্ণলতা দেখতে পায়, সুবর্ণলতার মা রান্নাঘরে বসে রাঁধছে, মা ছাদে উঠে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে, মা ঝেড়ে ঝেড়ে বিছানা পাতছে!...মা মাটিতে আরশি রেখে চুল বাঁধছে!

ধবধবে মুখখানি ঘিরে একরাশ কালো পশমের মত চুলের রাশি! কপালে ঘষে-যাওয়া সিঁদুর-টিপের আভাস!

প্রাণভরা, বুকভরা, চোখভরা!

আশ্চর্য!

এতখানি মা ছিল সুবর্ণর, আর সুবর্ণ কিনা তুচ্ছ একটু অভিমান নিয়ে নিজেকে ঘিরে প্রাচীর তুলে রেখে বসেছিল!

ঠিক হয়েছে সুবর্ণ, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে! মা একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সুবর্ণকে, তাও আদেশ দিয়ে গেছে, 'আমি মরে গেলে তবে দিও।'

এ ছাড়া আর কি হবে তোর?

অভিমান আর আত্মধিক্কার এরা দুজন যেন ঠেলাঠেলি করে নিজের শিকড় পুঁততে চায়।

আর শেষ পর্যন্ত আত্মধিক্কারই বুঝি জয়ী হয়।

মা, মাগো, এই নির্মায়িক লোকটার পায়ে ধরেও কেন একবার দেখতে গেলাম না তোমায়? এখন যে আমার জীবনের সব গান থেমে গেল, সব আলো মুছে গেল!

টের পাই নি আমার জীবনের অন্তরালে তুমি ছিলে আলো হয়ে, গান হয়ে। যেন আমার একটা বিরাট ঐশ্বর্য নিজের লোহার সিন্দুকে ভরা ছিল। মনে হতো, ইচ্ছেমত ওটাকে খুলবো আমি। খুললেই দেখতে পাবো!

বুঝতে পারি নি, হঠাৎ একদিন দেখবো শূন্য হয়ে গেছে সে সিন্দুক!... কেবল অন্যের দোষই দেখেছি আমি, আর অভিমানে পাথর হয়েছি। নিজের দোষ দেখি নি। মা না হয় দূরে ছিল আমার, কিন্তু বাবা?

বাবাকে অপরাধী করে রেখে ত্যাগ করেছিলাম আমি। আজও ত্যাগ করে এলাম। জীবন্ত মানুষটার মুখের উপর বলে এলাম, 'মনে জানবো আমি মা-বাপ দুই-ই হারিয়েছি।'

আমি কি!

আমি কি গো!

শুধু কঠোর কঠিন!

সারাটা জীবন শুধু সেই কাঠিন্যের তপস্যাই করলাম! আমার ছেলে-মেয়েরা কি অনেকদিন পরে ভাবতে বসবে মায়ের কাছে এলেই কিসের সেই সৌরভ পেতাম? চুলের? না শুধু মাতৃ-হৃদয়ের?

কিন্তু সুবর্ণলতা কবে কখন সময় পেয়েছে সেই স্নেহ-সৌরভে কোমল হতে? সুবর্ণলতাকে যে অবিরাম যুদ্ধ করে আসতে হচ্ছে। সুবর্ণলতা যদি কোমল হতো, মুক্তকেশীর সংসার থেকে মুক্তি পেত কোনোদিন? পেত না। মুক্তকেশীর ছেলে গ্রাস করে রেখে দিত তাকে। তার ইচ্ছায় উঠতে বসতে হতো, তার চোখরাঙানিতে জড়সড় হয়ে যেতে হতো, আর তার লুব্ধ ইচ্ছার দাসীত্ব করতে করতে আত্মাকে বিকিয়ে দিতে হতো!

কিন্তু আজো কি আছে সেই আত্মা?

'বিকিয়ে যেতে দেব না' পণ করে যুদ্ধ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায় নি?

সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া আত্মাকে কি আবার গড়ে তুলতে পারা যায়?

চেষ্টায়, যত্নে, সাধনায়?

হয় না!

হতে পারে না!

সুবর্ণ বলে ওঠে, অসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হলে দেবীকেও চামুণ্ডা হতে হয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর, কড়ির ঝাঁপি হাতে লক্ষ্মীর সাধ্য নেই সে ভূমিকা পালনের।

সুবর্ণলতা কি তবে লড়াই থেকে অব্যাহতি নেবে এবার? তার সংসারকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দেবে?

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একান্তে বসে ধ্বংস-আত্মার ইতিহাস লিখবে বসে বসে? লিখে রাখবে?

লিখে রাখবে—শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয়, এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে? কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষসমাজের 'ইচ্ছের পুতুল' হয়ে বসে আছে।

'আগে আমি ওদের অবজ্ঞা করতাম—' সুবর্ণলতা ভাবে, যারা লড়াইয়ের পথ ধরে নি, নির্বিচারে বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। এখন আর অবজ্ঞা করি না তাদের। বুঝতে পারি, এদের লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই নিরুপায় হয়ে ঐ দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে। 'ওদের অনুভূতি নেই, ওরা ওতেই খুশি,'—এ কথা আমাদের ভাবা ভুল হয়েছে।

সত্তার বদলে শান্তি কিনেছে ওরা, আত্মার বদলে আশ্রয়। কারণ এ ছাড়া আর উপায় নেই ওদের!

সমাজ ওদের সহায় নয়, অভিভাবকরা ওদের অনুকূল নয়, প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের প্রতিপক্ষ! ওরা অন্ধকারের জীব!

খামে বন্ধ চিঠিটা একবার হাত নিয়ে অনুভব করলো সুবর্ণলতা। এই নিঃসীম অন্ধকারে বসে যদি পড়া যেত!

যদি দিনের আলোয় কি দীপের আলোয় এমন একটু নিঃসীম নির্জনতাও পেত সুবর্ণ, হয়তো খুলে ফেলতো রুদ্ধ কপাট। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখতো কোন কথা দিয়ে গেছে তাকে তার মা।

কিন্তু কোথায় সেই নির্জনতা?

চারিদিকে চোখ।

বিদ্রূপে অথবা কৌতুকে, কৌতূহলে অথবা অনুসন্ধিৎসায় যে চোখেরা সর্বদা প্রখর হয়ে আছে। কত বেশি চোখ পৃথিবীতে! সুবর্ণলতার এই

নিজের গোলাপী-রঙা দোতলাটাতেও এত বেশী লোক জমে উঠেছে? এত বেশী চোখ? অথচ এদের জন্যে অসহিষ্ণু হওয়া চলে না, এরা সুবর্ণলতার। এদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করেই চলতে হবে শেষ দিনটি পর্যন্ত। এদের বিয়ে দিতে হবে, সংসারী করে দিতে হবে, অসুখ করলে দেখতে হবে, আঁতুড়ে ঢুকলে আঁতুড় তুলতে হবে, আর এদের মন-মেজাজ বুঝে বুঝে কথা বলতে হবে। এদের অবহেলা করা চলবে না, এড়ানো যাবে না, তুচ্ছ করা যাবে না। তা করতে গেলে এরা তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে উঠে তার শোধ নেবে। কারণ সুবর্ণলতাই এদের শিখিয়েছে—সব মানুষই সমান। শিখিয়েছে—মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতার অধিকার আছে।

ওরা যদি শিক্ষার আলাদা একটা অর্থ বোঝে, নিশ্চয় সেটা ওদের দোষ নয়, দোষ সুবর্ণলতার শেখানোর।

নিজের হাতের তৈরি ড্রাগনের হাঁ থেকে পালাবে কি করে সুবর্ণ?

সুবর্ণ উপায় খোঁজে।

পালাবার, অর্থাৎ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চিরাচরিত পদ্ধতিগুলোয় আর রুচি নেই সুবর্ণর। অনেকবার চেষ্টা করেছে, যম তাকে ফেরত দিয়ে গেছে, একবার নয়, বার বার।

আহা, যদি অকারণ শুধু শুয়ে পড়ে থাকা যেত! কোনোদিকে তাকাতে হতো না, শুধু দিনে-রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকা!

মৃত্যুর পরে যেমন করে সংসারের দিকে মুখ ফিরোয় মানুষ তেমনি!

আজ এই ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতার মুহূর্তে সংসারটা যেন তার সমগ্র মূল্য হারিয়ে একটা মৃৎপিণ্ডের মত পড়ে থাকে। সুবর্ণলতা সেই মৃৎপিণ্ডটাকে ত্যাগ করবার উপায় খোঁজে। সুবর্ণলতা বুঝি ঐ মাটির বোঝার ভার আর বইতে পারবে না।

॥ ৮ ॥

'শুনেছ মা, তোমার ভাগ্নের বাড়ির খবর?'

জগু বাজার থেকে ফেরে একজোড়া ডাব হাতে ঝুলিয়ে, পিছন পিছন নিতাই কাঁধে ধামা নিয়ে।

ভারি জিনিস-টিনিসগুলো নিজেই বয়ে আনে জগু, হাল্কাগুলো নিতাইয়ের ধামায় দেয়। দেয় নেহাতই মাতৃভয়ে! ফুলকোঁচা দিয়ে ধুতি পরতে শিখেছে নিতাই, গায়ে টুইল শার্ট। খাওয়া-দাওয়া বাবুয়ানার শেষ নেই। এর ওপর যদি দেখা যায়, খালি হাত নাড়া দিয়ে বাজার থেকে ফিরছে নিতাই, আর জগু আসছে মোট বয়ে, রক্ষে রাখবে না মা।

অবশ্য মা'র চোখে পড়বার সুযোগ বড় একটা হয় না, কারণ বাজার থেকে যখনই বাড়ি ঢোকে জগু, চেঁচাতে চেঁচাতে আসে, 'বাজার-টাজার করা আর চলবে না, গলায় ছুরি-মারা দর হাঁকছে! ডবল পয়সা ভিন্ন একটা নারকোল দিতে চায় না, ডাবের জোড়া ছ পয়সা। আর মেছুনী মাগীগুলোর চ্যাটাং

চ্যাটাং বুলি শুনলে তো ইচ্ছে করে, ওরই ওই আঁশবঁটিটা তুলে দিই নাকটা উড়িয়ে......ভাবলাম নিতাই ছোঁড়াটাসুদ্ধু আমাদের সঙ্গে জুটে নিরিমিষ্যি গিলে গিলে মরে, আজ নিয়ে যাই পোয়াটাক কাটা পোনা, তা বলে কিনা চার আনা সের!...গলায় ছুরি দেওয়া আর কাকে বলে! একটা আধলা ছাড়ল না, পুরো আনিটা নিল। গলায় ছুরি আর কাকে বলে!'

এমনি বহুবিধ ধুয়ো নিয়ে বাড়ি ঢোকে।

সেই ধুয়োর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যান শ্যামাসুন্দরী। ইত্যবসরে জগু হাতের মালপত্র নামিয়ে ফেলে।

তারপর নিতাইকে নিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। ছেলেটা যে শ্যামা-সুন্দরীর হৃদয়মধ্যস্থিত বাৎসল্য রস আদায় করে ফেলেছে, এটা টের পেয়ে গেছে জগু, যতই কেন না সেটা চাপতে চেষ্টা করুন শ্যামাসুন্দরী। তাই জগু এখন নিশ্চিন্ত এবং সেই নিশ্চিন্ততার বশেই ছেলেটাকে শাসন করার ভান করে।

'হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলি যে? সংসারে একটা কাজে লাগতে পার না? কী একেবারে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৌত্তুর এসেছো তুমি? একেই বলে —কাজে কুঁড়ে আর ভোজনে দেঁড়ে!'

শ্যামাসুন্দরী এক-এক সময় বলে ওঠেন, 'থাম্ জগা, আর ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিস না। ওর উপকারের বদলে মাথাটাই খেলি ওর। গরীবের ছেলেকে লাটসাহেব করে তুললি—'

জগু আবার তখন অন্য মূর্তি ধরে।

বলে, 'লাটসাহেব হয়ে কেউ জন্মায় না। আর গরীবের ছেলে বলেই চোরদায়ে ধরা পড়ে না। লাটসাহেবী! লাটসাহেবীর কি দেখলে? একটা ফরসা জামাকাপড় পরে, তাই? বলি ভগবানের জীব নয় ছোঁড়া?'

প্রত্যহ প্রায় একই ধরনের কথাবার্তা, শুধু আজকেই ব্যতিক্রম ঘটলো। আজ জগু তার মা'র কাছে অন্য কথা পাড়ে।

বলে, 'শুনেছ তোমার ভাগ্নের বাড়ির কাণ্ড?'

ছেলের কথায় কান দেওয়া শ্যামাসুন্দরীর স্বভাব নয়, দেনও না, আপন মনে হাতের কাজ করতে থাকেন। জগু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বড়লোকের মেয়েরা যে দেখছি গরীবের ছেলের কথাটা কানেই গেল না! বেচারা বৌটা একসঙ্গে মা-বাপ হারালো, সেটা এমন তুচ্ছ কথা হলো?'

একসঙ্গে মা-বাপ হারালো!

বোবা বৌটা!

এ আবার কোন্ ধরনের খবর?

কাদের বৌ?

এবার আর ঔদাসীন্য দেখানো যায় না। মান খুইয়ে বলতেই হয় শ্যামা-সুন্দরীকে, 'হলোটা কী?'

'হলো না-টা কি তাই বল? মা গেল খবরটাও দিল না কেউ তারপর পিঠোপিঠ কদিন পরেই বাপ গেল, তখন খবর। নে এখন জোড়া চতুর্থী করে মর!'

শ্যামাসুন্দরীও ক্রুদ্ধ হন।

বলেন, 'কার বৌ, কি বৃত্তান্ত বলবি তো সে কথা?'

'কার বৌ আবার? শ্রীমান প্রবোধবাবুর বৌয়ের কথাই হচ্ছে। বেচারা মেজবৌমার কথা। বাপ বুঝি মরণকালে একবার দেখতে চেয়েছিল, তাই গিয়েছিলেন মেজবৌমা! তখন বলেছে, "মা তোর মরেছে, তবে অশৌচ নেওয়া নিষেধ।" দুদিন বাদে নিজেও পটল তুললো।'

শ্যামাসুন্দরী যদিও বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু কথায় সতেজ আছেন। তাই সহজেই বলেন, 'তোর মতন মুখ্যুর সঙ্গে কথা কওয়াও আহাম্মুকি! বলি খবরটা তুই পেলি কোথায়?'

'আরে বাবা, স্বয়ং তোমার ভাগ্নের কাছেই। আসছিল এখানেই, বাজারে দেখা। আসবে, এক্ষুনি আসবে। দু-দুটো চতুর্থী, ব্যাপার তো সোজা নয়, ঘটা পটা হবে। তাই আমার কাছে আসবে পরামর্শ করতে। এই জগা শর্মা না হলে যজ্ঞি সুশৃঙ্খলে উঠুক দেখি? হুঃ বাবা!'

শ্যামাসুন্দরী কিন্তু এ উৎসাহে যোগ দেন না। বলিরেখাঙ্কিত কপালে আরো রেখা পড়িয়ে বলেন, 'ঘটাপটাটা করছে কে?'

'কে আবার! তোমার ভাগ্নেই করছে। বললো, তোমার মেজবৌমার বড় ইচ্ছে—'

শ্যামাসুন্দরী অবাক গলায় বলেন, 'মেজবৌমার ইচ্ছে? মা-বাপের সঙ্গে তো কখনো—'

'ওই তো—এখন অনুতাপটি ধরেছে। সেই যে কথায় আছে না, "থাকতে দিলে না ভাত-কাপড়, মরলে করলো দানসাগর" তাই আর কি।'

শ্যামাসুন্দরী দৃঢ় গলায় বলেন, 'মেজবৌমা সে ধরনের মেয়ে নয়।'

জগু অবাক গলায় বলে, 'তাই নাকি? তবে যে পেবো বললে—'

কথা শেষ হয় না, স্বয়ং পেবোই ঢোকে দরজাটা ঠেলে।

বলে, 'এই যে মামী, তুমিও রয়েছ। পরামর্শ করতে এলাম। মায়ের তো শরীর খারাপ, এখন তুমিই ভরসা। দায়টা উদ্ধার করো তোমরা মায়ে-ছেলেয়। সোজা দায় তো নয়, শ্বশুরদায় শাশুড়ীদায়। মাতৃদায় পিতৃদায়ের অধিক।'

আপন রসিকতাশক্তির পুলকে টেনে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ হ্যা-হ্যা করে।

॥ ৯ ॥

অনেকগুলো বছর জেলের ভাত খেয়ে অবশেষে একদিন বাড়ি ফিরল অম্বিকা। কালো রংটা আরও একটু কালো হয়ে গেছে, পাকসিটে চেহারাটা যেন আরো পাকসিটে আর জীর্ণ হয়ে গেছে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় বিবর্ণ সাদাটে ছাপ। যেন পাকতে শুরু করে নি বটে, কিন্তু একসঙ্গে সবই পাকবে বলে নোটিশ দিয়েছে।

তবু মোটামুটি যেন তেমন কিছু বদল হয় নি। মনে করা যায় এতগুলো বছর পরে সেই অম্বিকাই ফিরে এল।

ফিরে এল অম্বিকা তার দাদা-বৌদির কাছে। বলতে গেলে সুবালার কাছেই।

সুবালার চেহারায় অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুবালার চুলগুলো

বেশ পেকেছে, ঠিক সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে, আর রংটা জ্বলে-পুড়ে গেছে। দারিদ্র্যকে যে কেন অনলের সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা অনুভব করা যাচ্ছে তাকে দেখে।

তথাপি সুবালার প্রকৃতিতে খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। সুবালা অম্বিকাকে দেখেই প্রথমে আহ্লাদে কেঁদে ফেললো। তারপর সুবালা শাশুড়ীর নাম করে কাঁদলো, কাঁদলো অম্বিকার বাড়িতে চোর পড়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে বলে, আর অভাবের জ্বালায় যে সেই চোর-অধ্যুষিত বাড়িটার ভাঙা পাঁচিল আর ভাঙা জানালা মেরামত করে রাখতে পারে নি সুবালারা, তা নিয়ে কাঁদলো এবং সর্বশেষে কাঁদলো অম্বিকাকে আর বিপদের পথে পা না বাড়াতে মাথার দিব্যি দিয়ে।

শেষ কথাটার শেষে অম্বিকা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'আর বিপদ কোথা? দেশ তো বেশ ঠান্ডা মেরে গেছে। "বিপদ" যারা বাধাচ্ছিল তাদের শায়েস্তা করা হয়েছে, এখন দেশের কেষ্ট-বিষ্টু নেতারা কথার জাল ফেলে ফেলে স্বাধীনতারূপ বোয়াল মাছটি টেনে তোলবার তাল করছেন। এর মধ্যে আর আমরা কোথায় পা বাড়াতে যাব? আমরা এখন দাবার আড্ডায় বসে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকি, বাঘা যতীনের আলোচনায় উদ্দীপ্ত হবো আর বসে বসে দিন গুনবো কবে কখন সেই "স্বাধীনতা" নামের রসালো ফলটি গাছ থেকে টপ করে খসে পড়ে।'

তা অম্বিকার যে একেবারেই পরিবর্তন হয় নি তা বলা যায় না। আগে অম্বিকা ব্যঙ্গের সুরে কথা জানত না, এখন সেটা শিখেছে।

কিন্তু সুবালা এসব প্রসঙ্গের ধারে-কাছে আসতে চায় না, কারণ সুবালা অত বোঝে না। হয়তো বা বুঝতে চায়ও না।

তাই সুবালা তাড়াতাড়ি বলে, 'যাক গে বাবা ওসব কথা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি? আমার কথা হচ্ছে—এবার তোমার বিয়ে দেব!'

হ্যাঁ, এই সংকল্পই স্থির করেছে এখন সুবালা, ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দেবে। বয়েস একটু বেশি হয়ে গেছে, তা যাক্, দোজবরে তেজবরে তো নয়? কত কত দোজবরে তেজবরে যে ওর ডবলবয়সী হয়েও বিয়ে করতে ছোটে!

মেয়ের অভাব হবে না।

বাংলা দেশে আর যে কিছুরই অভাব থাক না কেন, কনের অভাব নেই। আর সুবালার মতে বিয়ে না করে বুড়িয়ে যাওয়ার মত দুঃখের আর কিছু নেই।

সুবালা ইতিমধ্যে তার দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে কাজ সেরেছে। যদিও সংসারের অবস্থা সুবিধের নয়, কিন্তু সংসারের 'অবস্থা' বিয়ের প্রতিকূল হয়েছে কেন এ তর্ক করেছে সুবালা। আর শেষ অবধি তর্কে সে-ই জিতেছে। তাই এখনও বললো, 'বিয়ে দেব'। জানে—জিতবো।

কিন্তু অম্বিকা ছিটকে উঠলো, বললো, 'বিয়ে?'

অম্বিকা হেসে ফেলল।

কিন্তু আগের মত সেই হো হো হাসির প্রাণখোলা সুরটা যেন অনুপস্থিত রইল সে হাসিতে। এ হাসি কেমন একরকম নিরুত্তাপ হাসি।

তবু হাসি।

হেসেই উত্তর।

'বিয়ে! নাঃ, আপনি দেখছি চুলগুলো মিছিমিছিই পাকিয়েছেন, বয়েসে সামনে না হেঁটে পিছনে হাঁটছেন!'

সুবালা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে?'

অমূল্য এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিল বসে বসে। এবার বলে, 'মানে আর কি, অম্বিকার মতে তোমার শুধু চুলই পেকেছে, বুদ্ধি পাকে নি।'

'কেন? কাঁচা বুদ্ধির কি দেখলে শুনি?'

অম্বিকা হাসে, 'পুরোপুরিই দেখলাম। এখনো আপনার দ্যাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ!'

হ্যাঁ, এই রকম করেই বলে অম্বিকা।

হৈ-হৈ করে বলে ওঠে না, 'কাঁচা বুদ্ধি নয়? শুধু বিয়ের মতলবটি এ'টেই বসে আছেন, কই কনে রেডি করে রাখেন নি? টোপর চেলি ঠিক করে রাখেন নি? কে বলতে পারে আবার কখন শ্রীঘর থেকে ডাক পড়ে?'

আগেকার অম্বিকা হলে এই রকমই বলতো!

এখনকার অম্বিকা বলে, 'এখনো আপনার দ্যাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ?'

সুবালা ভাঙা দাঁতের হাস্যকর হাসি হেসে বলে, 'তা কখন আর শখ করবার সুবিধা পেলাম শুনি? তুমি তো বসে আছ শ্রীঘরে, এদিকে কত ঘটনাই ঘটে গেল, ঘটে চলেছে। তোমার চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝির তো বিয়ে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে!'

চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝি!

অম্বিকা অথই জলে পড়ে।

এতগুলো ছেলেমেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছিল অমূল্যর? তাছাড়া বিয়ের যোগ্যতা! ওর মধ্যে কোনটা মেয়ে, কোনটা বা ছেলে! হঠাৎ কারো নাম মনে পড়ছে না কেন? বড় বড় ছেলে দুটোর নাম রাসু আর বঙ্কু ছিল না? রাসবিহারী, বঙ্কুবিহারী, কিন্তু, তারপর? সারি সারি অনেকগুলো ছিল যে?

কী আশ্চর্য!

এমন স্মৃতিভ্রংশ হল অম্বিকার?

দাদার ছেলেমেয়েগুলোর নাম ভুলে গেল? ভুলে গেল কোন্‌টা কত বয়সের ছিল? মুখই বা মনে পড়ছে কই তেমন করে?

পড়ছে আস্তে আস্তে।

নামও...ভাবতে ভাবতে ভেসে উঠেছে, রাসু বঙ্কু টিঙ্কু কুলু নেড়ু টেঁপু...আরো কি কি যেন! একটা দল হিসেবেই তাদের দেখেছে অম্বিকা, খুব যেন আলাদা করে নয়।

দাদার ছেলেমেয়েরা!

এই অনুভবের মধ্যে ছিল তারা!

কিন্তু সেই বালখিল্যের দল এত লায়েক হয়ে উঠল এর মধ্যে?

উঠল।

তার মানে সময়ের সেই বিরাট অংশটা হারিয়ে ফেলেছে অম্বিকা তার জীবন থেকে। অম্বিকা বুড়ো হয়ে গেছে!

কিন্তু 'জীবনের ওপর কবে মোহ ছিল অম্বিকার? কবে ছিল লোভ? তাই হারিয়ে ফেলেছে বলে মনটা 'হায় হায়' করে উঠল?

হয়তো এমনিই হয়। শুধু অম্বিকার মত পাগলাদের নয়, সকলেরই!

যে মায়া-হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ, সেই হরিণটা যখন একটা 'দুয়ো' দিয়ে দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন মনটা এমনি 'হায় হায়' করে ওঠে। মনে হয়, এতগুলো দিন-রাত্রি হারিয়ে গেল! কি করলাম? কি বা পেলাম?

হ্যাঁ, সেটাই হাহাকারের স্বর।

'কী পেলাম! কী পেলাম!'

যেন কে কোথায় অঙ্গীকার করে রেখেছিল পাইয়ে দেবে অনেক কিছু।

যেন বলে রেখেছিল, 'তোমার ওই দিনরাত্রিগুলো আমার কারবারে ফেল, তার বিনিময়ে পাওনার পাহাড় জমবে তোমার।'

কেউ দিয়েছিল সেই আশ্বাস?

কেউ করেছিল সেই অঙ্গীকার?

কেউ এমন একখানা মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছিল, আমার এই দিনরাত্রিতে গড়া জীবনের?

জানি না।

দেখি নি তেমন কাউকে।

তবু ওই প্রাপ্তির ধারণাটা আছে বদ্ধমূল। নিশ্চিন্ত হয়ে আছি এই ভেবে যে আমার সোনার দিনগুলো বিকোচ্ছি বসে বসে, তার বদলে জমা হচ্ছে স্বর্গের সোনা। খানিকটা এগিয়ে গেলেই সেই স্বর্গীয় সোনার তালটাকে ধরে নেব খপ্ করে, ভরে নেব মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু সে 'সোনা'র আশ্বাস মায়া-হরিণের মতোই অনেক ছুটিয়ে মেরে অকস্মাৎ কখন একসময় দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে, 'পেলাম না, আমি আমার যথার্থ মূল্য পেলাম না। আমি ঠকে গেলাম। আমি কত দিলাম, কী বা পেলাম! যেন আমার মনিব আমায় সারা মাস খাটিয়ে নিয়ে মাসের শেষে মাইনে দিল না!'

আশ্চর্য!

কে বলেছে আমার এই জীবনটা ভারী এক দামী জিনিস? কে বলেছে আমার এই দিনরাত্রিগুলো সোনার দরের?

নিজেই নিজের দাম কষছি, মোটা অঙ্কের টিকিট মারছি তার গায়ে, ভেবে দেখছি না কেন তা করছি! করছি 'হায় হায়'! ভেবে দেখছি না আমি কেউ না, আমি এই নিখিল বিশ্বের অনাহত লীলার একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। বাড়তি কিছু পাওনা নেই আমার।

কেউ ভাবি না, কেউ ভাবে না।

অম্বিকাও তা ভাবল না।

অম্বিকা ভাবলো, 'এতগুলো "দিন" হারিয়ে ফেললাম!' ভাবলো, 'কী বা পেলাম তার বিনিময়ে?'

তাই কেমন যেন দিশেহারার মত বলে উঠলো, 'কাদের বিয়ে হয়ে গেল?'

'কেন রাসু, বক্কু, টেঁপি আর নিভার। নিভাটার অবিশ্যি একটু সকাল সকালই হয়ে গেল, ভাল পাত্তর পেয়ে যাওয়া গেল। আর দিতেই তো হবে।

চারটের হিল্লে হয়েছে, বাকি ছটার হয়ে গেলেই আমাদের ছুটি। তারপর বুড়ো-বুড়ী কাশীবাস করবো।

বাকি ছটার হয়ে গেলেই—

অম্বিকা ওই দুঃসাহসী আশার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর ভাবে, হয়তো সেই অসাধ্যসাধন করেই ফেলবে ওরা, হয়তো সত্যিই শেষ অবধি নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তীর্থবাস করতেও যাবে। আর সমস্ত কর্তব্য সমাধা করার যে একটা আত্মতৃপ্তি, সেটুকু রসিয়ে উপভোগ করবে।

অম্বিকা অন্তত তাই ভাবলো।

তাই অম্বিকা সহসা ওদের জীবনটাকে হিংসে করে বসলো।

অনেকদিন জেলের ভাত খেয়ে খেয়ে এ উন্নতিটুকু তা হলে হয়েছে অম্বিকার! অম্বিকা তার 'স্বপ্ন' থেকে স্খলিত হয়ে 'তুচ্ছ জীবনে'র দিকে তৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

অম্বিকা তাই কাঁচা-বুদ্ধি সুবালার কাঁচামি-টাকেই দীর্ঘ বিলম্বিত করে দেখতে চাইছে।

অতএব অম্বিকা বলে উঠেছে, 'আরে ব্যস, সব ব্যবস্থা কমপ্লিট? তা আমিও তো তাহলে দিব্যি একখানি "শ্বশুর" হয়ে বসে আছি! আমাকে নিয়ে তবে আবার ডাংগুলি খেলবার বাসনা কেন?'

সুবালা এ পরিহাসটুকুর অর্থ বোঝে।

সুবালা তাই হেসে উঠে বলে, 'তুমি যাতে আর ডাংগুলি খেলে বেড়াতে না পারো তার জন্যে। শক্ত শেকল এনে বাঁধতে হবে তোমায়। করছি তার যোগাড়।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

'এই তো অপরাধ। জীবনটা মিছিমিছি বিকিয়ে দিলে।'

অম্বিকা সুবালার এই আক্ষেপে 'অবোধ' বলে অনুকম্পার হাসি হাসলো না। অম্বিকা চমকে উঠল। অম্বিকা ভাবলো, 'আমি কি এই কথাই ভাবছিলাম না।'

তারপর অম্বিকা বললে, 'আপনি তো শেকল যোগাড়ে লাগবেন, বলি শেকল তো আর ভুঁইফোড় নয়? মা-বাপ থাকতে আর কে এই জেলখাটা আসামীকে মেয়ে দেবে শুনি?'

'শোনো কথা!' সুবালা গালে হাত দেয়। 'এ কী চুরি-জোচ্চুরি খুন-জখমের আসামী? লোকে যে তোমাদের এই "স্বদেশী জেলখাটা"দের পায়ে ফুলচন্দন দেয় গো!'

অম্বিকা এবার যেন পুরনো ধরনে হেসে ওঠে। বলে, 'পায়ে ফুলচন্দন দেয় বলেই যে হাতে মেয়ে দেবে, তার কোনো মানে নেই!'

'দেবে না?'

সুবালাই এবার অনুকম্পার হাসি হাসে, সুবালা যেন তার মূল্যবান দ্যাওরটির মূল্য সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হয়। বলে, 'আচ্ছা, দেয় কি না দেয় সে আমি বুঝবো! ব্যাটাছেলে বিয়ে করতে চাইলে আবার মেয়ের ভাবনা?'

এবার অম্বিকা অমূল্য দুজনেই হেসে ওঠে। অমূল্য বলে, 'আহা, এ আশ্বাস যদি কিছুদিন আগে পেতাম তো আর একবার 'চেয়ে' দেখতাম।'

'এখনও দেখ না।' সুবালা হাসে। তারপর গ্রামের কোন্ কোন্ ঘরে এমন কটা বুড়ো ঘরে গিন্নী থাকতেও দিব্যি আর একটা বিয়ে করে মজায় আছে, তার আলোচনা এসে পড়ে।

অম্বিকা নিথর হয়ে গিয়ে বলে, 'বল কি দাদা? দত্ত জ্যাঠামশাই?'

অমূল্য হাসে, সেই তো, সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে অসহ্য। গিয়েছিলেন ভাগ্নীর ছেলের জন্যে কনে দেখতে—'

'দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না, নাতির হাতে তুলে দিতে বুক ফাটলো—', সুবালা হেসে হেসে বলে, 'সম্পর্কটা অবিশ্যি খারাপ হল না। নাতবৌ হতো, বৌ হলো। তেরো আর তেষট্টি!'

অম্বিকা হাসে না, অম্বিকা হঠাৎ রূঢ়গলায় বলে ওঠে, 'লোকটাকে ধরে এক দিন হাটতলায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতে পারলে না কেউ?'

এরা চমকে উঠলো।

সুবালা আর অমূল্য।

অম্বিকার গলায় কখনো এমন রূঢ় স্বর শোনে নি এর আগে। তা যতই হোক, দত্ত জ্যাঠামশাই গুরুজন!

অম্বিকা সেটা বুঝতে পারলো।

অম্বিকা নিজেকে সামলে নিল, অপ্রতিভ গলায় বললো, 'জেলের ভাতের এই গুণ ধরেছে, রাগ চাপতে পারি না। অসভ্যতা দেখলেই মেজাজ আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। বাস্তবিক, এদের শাস্তি দেওয়া উচিত কিনা তোমরাই বল?'

'উচিত তো! কিন্তু শাস্তিটা দিচ্ছে কে?'

'আমি তুমি, এরা ওরা, সবাই।' অম্বিকা দৃঢ়গলায় বলে, 'কিছুদিন স্রেফ ধোলাই চালালেই এ ধরনের পাজীরা শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

সুবালা যেন অবাক হয়ে অম্বিকার মুখের দিকে তাকায়। বলে, 'ধোলাই মানে?'

অম্বিকা আর একবার অপ্রতিভ হয়। বলে, 'ওই তো! সঙ্গগুণের সুফল! যত সব চাষাড়ে কথার চাষের মধ্যে তো বাস ছিল। ধোলাই মানে ধরে ঠ্যাঙানো! দু-পাঁচজন মার-ধোর খাচ্ছে দেখলেই আর পাঁচজন সামলে যাবে।'

অমূল্য ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'তোর ওই "ধোলাই" তা হলে পাত্তরকে না দিয়ে পাত্রীর বাপকেই দেওয়া উচিত। তারা মেয়ে দেয় কেন?'

সুবালা বলে ওঠে, 'দেয়, ভাল ঘরে-বরে দিয়ে উঠতে পারে না বলে, নচেৎ টাকাকড়ির লোভে। এই তো তোমাদের দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারই তাই। মেয়ের বয়েস বেশি হয়ে গেছে, জাত যাবার ভয়ে কাতর বাপ হাতের সামনে একটা বড়লোক বুড়ো পেয়ে—'

'জাত! জাত যাবার ভয়! আশ্চর্য, এত অনাচারে জাত যাচ্ছে না, জাত যাবে শুধু মেয়েকে সাতসকালে বিয়ে না দিলে!' অম্বিকা বলে, 'এ পাপের ফল একদিন পাবেই সমাজ!—তা দত্তজেঠিমা কোথায়?'

'কোথায় আবার?' সুবালা বলে, 'ঘর-সংসার ছেড়ে যাবেন কোথায়? আছেন। প্রথম প্রথম খুব গালমন্দ করেছিলেন, সতীনটাকে ঝাঁটা মারতে যেতেন, ক্রমশঃ সয়ে গেছে। এখন তাকে রেঁধে ভাতও দিচ্ছেন। সেও মহা দুষ্টু মেয়ে! সংসারে কিছু করে না, কেবল সাজেগোজে আর কর্তার তামাক সাজে।'

'হুঁ। ওটাকেই আশ্রয় ভেবেছে। বুড়ো মরলে তখন? ছেলেরা কে কোথায়?'

'বড় তো রাগ করে বাপের সঙ্গে পৃথক অন্ন হয়ে গেছে। আর সবাই আছে।'

'তা যিনি পৃথক অন্ন হলেন, মাকে ভাইদের নিয়ে হতে পারলেন না?'

'কি যে বল, তার কি ক্ষমতা? বাপ তো তাকে তেজ্যপুত্তুর করেছেন। আসল কথা, পয়সাওলা লোকেদের সব দরজা খোলা, বুঝলে ঠাকুরপো? মরণ শুধু গরীবদের। পৃথিবী জুড়েই এই।'

অম্বিকা বলে, 'হয়তো এর শাস্তিও আসবে একদিন পৃথিবীতে। তবে আমার মতে, কবে কি হবে না ভেবে এখনই একটা বৌ বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

অমূল্য হাসে, 'আইনটা কে করবে শুনি?'

'করবো আমরা, তোমরা, সবাই। চিরদিন ধরে ভয়ঙ্কর একটা পাপ চলতে পারে না।'

সুবালার এসব কথায় অস্বস্তি।

সুবালা এবার প্রসঙ্গকে অন্য পথে পরিচালিত করে। সুবালা তার ছেলের বৌদের আর জামাইদের কথা তোলে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, বলে, 'আমার ভাগ্যে বাবা সবাই খুব ভালো জুটেছে—'

অম্বিকা হেসে ফেলে।

অম্বিকা বলে, 'আপনার ভাগ্যে "মন্দ" হবার জো কি? আপনি কি কাউকে ভালো ছাড়া মন্দ দেখবেন?'

সুবালা লজ্জিত গলায় বলে, 'আহা!' বলে, 'নাও বাপু, বল এখন কি খাবে? কতকাল বাড়ির রান্না খাও নি—'

বলে, তবে মনে মনে ভাবে, 'কিই বা জোটাতে পারবো! আহা, বেচারা এতদিন পরে এল! সজনেডাঁটাটা ভালবাসে, মৌরলা মাছটাও খুব ভালবাসতো। আর অড়র ডাল। দেখি যাই—'

সুবালা চলে যায় রান্নার যোগাড়ে, এরা দুই ভাই কথা বলে, গ্রামের কথা, পড়শীর কথা।

আর এর মাঝখানেই হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করে ওঠে অম্বিকা, 'তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির!'

'হ্যাঁ, তোমার সেই—ইয়ে, মেজবৌদি, তাঁর ছেলেমেয়েরা—আর শ্রীযুক্ত বাবু মেজদা?'

একটু ভয়ে-ভয়েই বলে।

মনকে প্রস্তুত করে দু-একটা দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে।

কিন্তু আশ্চর্য, শুনতে হলো না তা।

বরং ভালো খবর।

মেজদার আয়ের আরো উন্নতি হয়েছে, ছেলেরা ভাল ভাল পাস করেছে, নতুন বাড়ি করেছে নিজস্ব, আলাদা হয়ে চলে গেছে। মোটের মাথায় হতাশার খবর নয়।

অথচ আশ্চর্য, অম্বিকা যেন খুব একটা হতাশ হয়।

অম্বিকা যেন এসব খবর শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু কী শোনবার আশাতেই বা ছিল তবে সে? অমূল্যর শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে খুব একটা দুঃসংবাদ? কে জানে কি! তার মনের কথা সে-ই জানে। তবু—মনে হলো, অম্বিকা যেন ওই খুশির খবরগুলোয় খুশি হলো না।

তবু অম্বিকা নতুন বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল। বলল, 'যাবো তো কাল-পরশু কলকাতায়। একবার দেখা করে এলে তো হয়। অবশ্য চিনতে পারবেন কিনা জানি না।'

'শোনো কথা!' সুবালা হাসে, 'তোমায় পারবে না চিনতে? তোমাকে কত পছন্দ হয়েছিল তার। আমি তো ভাবছিলাম—'

হেসে চুপ করে যায় সুবালা।

'কি ভাবছিলেন?'

সুবালা মিটিমিটি হেসে বলে, 'ভাবছিলাম তোমাকে তারই জামাই করে দিই! মেয়েটা তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে—'

'আমাকে—জামাই—'

অম্বিকা এবার নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে ওঠে সেই আগের মত, 'চমৎকার! এটা ঠিক আপনার উপযুক্ত কথা হয়েছে। বাঃ! বাঃ! বাঃ! তাহলে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছিলেন না, কনে রেডি? কি যে হলাম আমি মেয়েটির? মামা?'

'আহা, মামা আবার কি?' সুবালা সতেজে বলে, 'কিচ্ছুই নয়। জানো না, মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। তুমি হচ্ছো পিসের ভাই—'

'ব্যস! ব্যস! শাস্ত্রবচনও মজুত!' অম্বিকা বলে, 'কিন্তু এত সব ছেলে-মেয়ের বিয়ে হল, তাঁর মেয়েরই বা হয় না কেন?'

সুবালা সন্দেহের গলায় বলে, 'তার কোন্ মেয়েটার কথা বলছো তুমি?'

'আহা, সেই তো সেই যে তোমার এখানে আসে নি। নবদ্বীপে না কোথায় যেন গিয়েছিল!'

আশ্চর্য যে এটা ভুলে যায় নি অম্বিকা।

কিন্তু সে কথা তুলে হাসে না সুবালা। হাসে অম্বিকার অজ্ঞানতায়।

'সেই মেয়ে? সেই মেয়ে এখনো বসে আছে, এই ভাবছো তুমি? হায় হায়! চাঁপা? তার কবে বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ মেয়ে চন্ননেরও হয়েছে। এ হচ্ছে, সেই পারুল! সব সময় যে ছোট্ট মেয়েটা চুপচাপ থাকতো—'

'পারুল! মানে সেই যে দোলাই গায়ে জড়িয়ে মাঠে-বাগানে ঘুরে বেড়াতো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো মনে পড়েছে বাপু! ওদের মত ফরসা না হলেও সেই মেয়েটাই তো সব চেয়ে সুচ্ছিরি মেজবৌয়ের—'

অম্বিকা আবার বলে, 'চমৎকার! দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে একটু ইতর-বিশেষ এই যা।'

'শোনো কথা, তার সঙ্গে কিসের তুলনা? আমি বাপু ওর কথাই ভাবছিলাম—'

'আপনার ভাবনার দড়িটা একটু খাটো করুন বৌদি, বড্ড লম্বা হয়ে যাচ্ছে!'

অম্বিকা আবার হাসতে থাকে হা-হা করে।

সুবালা একসময় অমূল্যকে চুপিচুপি বলে, 'ঠাকুরপো কিন্তু ঠিক

তেমনটিই আছে, একটুও বদলায় নি।'

অমূল্য আস্তে বলে, 'কে বললে বদলায় নি? বদলেছে বৈকি! অনেক বদলেছে!'

॥ ১০ ॥

তা বদলাবে এ আর বিচিত্র কি?

পৃথিবীর খেলাই তো তাই।

না যদি বদলাতো অম্বিকা, সেটাই হতো অস্বাভাবিক।

বদলায় না শুধু অল্পবুদ্ধিরা।

বুদ্ধির চাকার অভাবে ওরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুবালা তাদের দলের, তাই সুবালা সুখী। সুবালার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সুবালা যদি দুঃসহ কোনো শোক পায়, সুবালা কেঁদে বলবে, 'ভগবান নিয়েছেন—'

অতএব সুবালা সুখী হবে।

যারা কার্যকারণের বিচার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসে, যারা জগতের যত অনাচার অবিচার অত্যাচার, সব কিছুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রশ্ন তুলতে বসে, তারাই জানে না সুখের সন্ধান।

কিন্তু সন্ধান কি তারা রাখতেই চায়? সুখকে কি তারা আরাধনা করে?

সুখেতে যে তাদের ঘৃণা!

নইলে সুবর্ণলতা—

হ্যাঁ, নইলে সুবর্ণলতার তো উচিত ছিল তার স্বামীর সুবিবেচনা আর পত্নীপ্রেমের পরিচয়ে আহ্লাদে ডগমগ হওয়া।

স্ত্রীকে আকস্মিক আনন্দ দেবার রোমাঞ্চময় পরিকল্পনায় সে যে তার স্ত্রীর বাপের চতুর্থী উপলক্ষে মস্ত একটা যজ্ঞির আয়োজন করে ফেলেছে চুপিচুপি—এটা কি কম কথা নাকি? কম সুখের কথা?

কিন্তু সুবর্ণলতা হচ্ছে বিধাতার সেই অদ্ভুত সৃষ্টি, সুখে যার বিতৃষ্ণা, সুখে যার ঘৃণা।

তাই কর্মবীর জগু যখন অকস্মাৎ গোটা "তিনেক" মুটের মাথায় রাশীকৃত বাজার, ফলমূল, কলাপাতার বোঝা, মাটির খুরি-গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে তার পিস-তুতো ছোট ভাইয়ের বাড়িতে এসে ঢুকে হাঁক পাড়লো, 'কই রে, কে কোথায় আছিস? এসব কোথায় নামাবে দেখিয়ে দে—'

তখন সুবর্ণলতা পাথরের মত মুখে এসে দাঁড়িয়ে একটা ধাতব গলায় বলে ওঠে, 'এসব কি? এর মানে?'

দোভাষীর প্রয়োজন স্বীকার করে না।

গলা স্পষ্ট পরিষ্কার। শুধু মুখটা অন্য দিকে।

তবে জগুও অত নীতি-নিয়মের ধার ধারে না। তাই বলে ওঠে, 'এই মরেছে! এ যে সেই "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!"—বলি তোমার বাপের ছেরাদ্দ, আর তুমি আকাশ থেকে পড়ছো? চতুর্থীর

যোগাড়, দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভোজের রসদ, আর তোমার গিয়ে আত্মকুটুম্বও কোন্ না ষাট-সত্তরজন হবে। একা আমার পিসির ডালাপালাই তো—,' জগু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে কথা শেষ করে, 'তাদের একটু ভালোমন্দ খ্যাটের যোগাড়—'

হঠাৎ থেমে যায় জগু।

ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে তাকানো অশাস্ত্রীয় এটা জানা থাকলেও বোধ করি হঠাৎই তাকিয়ে ফেলেছিল সে। অথবা ভয়ঙ্কর একটা নীরবতা অনুভব করে তাকিয়েছিল কে জানে। তবে থেমে যাবার হেতুটা তাই। ওই মুখ!

মুখ দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় ওই বাজখাঁই লোকটার। তাড়াতাড়ি ডাক দেয়, 'পারু পারু, দেখ্ তোর মার শরীর-টরীর খারাপ হলো নাকি?'

মুটেগুলো এতক্ষণ অপেক্ষান্তে রাগ-ভরে নিজেরাই স্থান নির্বাচন করে জিনিসগুলো নামাতে শুরু করে, এবং সারাও করে আনে। ইতিমধ্যে পারু এসে দাঁড়ায়, সমস্ত দৃশ্যটার ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে সেও অবাক গলায় বলে, 'এসব কি বড় জ্যাঠা?'

এবার বিস্ময়-প্রশ্নের পালা জগুর।

'তোদের কথায় আর আমি কি উত্তর দেব রে পারু, আমিই যে তাজ্জব বনে যাচ্ছি! বলি তোদের বাবা কি আমার সঙ্গে ন্যাকরা করে এল? তোদের বাড়িতে কোনো কাজকর্ম নেই? দাদামশাই দিদিমা মরে নি তোদের? সব ভুল?'

পারু আস্তে বলে, 'ভুল নয়। তবে তার জন্যে এসব—' গলাটা একটু নামায়, আস্তে বলে, 'জানি একটা মরণকে উপলক্ষ করে মানুষ এমন ঘটা লাগায়, কিন্তু জানেনই তো মাকে! মা এসব একেবারেই ইয়ে করেন না। তা ছাড়া—'

পারুর কথা থেমে যায়।

সহসা পারুর মায়ের কণ্ঠ কথা কয়ে ওঠে, 'পারু' ভাসুরঠাকুরকে বল, যেন আমার অপরাধ না নেন। লোকে যা করে, আমার তার সঙ্গে মেলে না। আমি আমার জ্যান্ত মা-বাপকে কখনো এক ঘটি জল এগিয়ে দিই নি, আজ মরার পর আর তাঁদের ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে অপমান করতে পারব না। আমি—'

সহসা একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটে।

অন্তত পারুর তাই মনে হয়।

মায়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে কবে দেখেছে পারু? সে চোখে তো শুধু আগুনই দেখে এসেছে জ্ঞানাবধি।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ দেয় না পারুর মা, দ্রুতপায়ে চলে যায়। চলে যায় শুধু পারুকেই নয়, আরও একটা মানুষকে পাথর করে দিয়ে।

পাগল-ছাগল জগু আরও একবার শাস্ত্রীয়বিধি বিস্মৃত হয়ে ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলেছিল, এবং বলা বাহুল্য সে মুখে অবগুণ্ঠনের খুব একটা বাড়াবাড়ি ছিল না। কাজেই দেখায় অসম্পূর্ণতা ছিল না।

পাগল-ছাগল বলেই কি হঠাৎ এত আঘাত খেল জগু? নাকি এরকম একখানা ভয়ঙ্কর দুঃখ হতাশা গ্লানি ক্ষোভ বেদনা বিদ্রোহের সম্মিলিত ছবি সে জীবনে আর দেখে নি বলেই?

স্তব্ধ হয়ে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেই দ্রুতকণ্ঠে 'আমি এসব কিছু

জানি না পারু, আমি এত সব কিছু জানি না। আমায় তোর বাবা গুচ্ছির টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে এল—"তোমার বৌমার খুব ইচ্ছে", তাই আমি—' বলেই কোঁচার খুঁটে চোখ চেপে একরকম ছুটে বেরিয়ে যায় জগু বাড়ির সদর চৌকাঠ পার হয়ে। কে বলবে, তার দু চোখেও সহসা জলের ধারা ঠেলে আসে কেন?

মুটে কটা এতক্ষণ ঝাঁকা খালি করে ক্লান্তি অপনোদন করছিল, 'বাবু ভাগল্‌বা' দেখে তারাও ছুট দেয়। পারু তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পারু সহসা যেন আর এক জগতের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

জ্ঞানাবধি শুধু মা'র তীব্রতা আর রুক্ষতাই দেখে এসেছে পারু, মা'র জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনার দিকটা দেখে নি। আজ হঠাৎ মনে হলো তার, মা'র প্রতি তারা শুধু অবিচারই করে এসেছে।

কোনোদিন সেই 'অকারণ' তীব্রতার কারণ অন্বেষণ করবার কথা ভাবে নি।

একথা ঠিক, বাবাকেও তারা ভাই-বোনেরা কেউ একতিলও শ্রদ্ধা করে না, তবু কদাচ কখনো একটু করুণা করে, অনুকম্পা করে। কিন্তু মাকে?

মা'র জন্যে কিসের নৈবেদ্য রাখা আছে তাদের অন্তরে?

ভাবলো সে কথা পারু।

কারণ সহসা পারু তার মা'র একটা নির্জন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। যে ঘরের সন্ধান সে কখনো জানতো না, যে ঘরের দরজা কখনো খোলা দেখে নি।...অসতর্ক একটা বাতাসে একটিবার খুলে পড়েছে সে দরজা, তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পারুল।

ওই জনহীন শূন্যঘরটা এখানে ছিল চিরকাল?

অথচ ওরা—

'দিদি' বকুল এসে দাঁড়ালো, বললো, 'দাদা বলল্যো, তোকে যে কামিজটায় বোতাম বসিয়ে রাখতে বলেছিল, সেটা কোথায়?'

পারুল চোখে অন্ধকার দেখলো।

পারুলের গলা শুকিয়ে এল।

আস্তে বললো, 'বোতাম বসানো হয় নি, ভুলে গেছি!'

'ভুলে গেছিস? সর্বনাশ! কোথায় সেটা?'

'মা'র ঘরে প্যাঁটরার ওপর।'

'সেরেছে, দাদা তো সেখানেই বসে!'

বকুলেরও যেন হাত-পা ছেড়ে যায়।

হ্যাঁ, এমনি ভয়ই করে তারা দাদাদের।

অথবা ভয় করে আত্মসম্মান-হানির। জানে যে এতটুকু ত্রুটি পেলেই খিঁচিয়ে উঠবে তারা, ঘৃণা ধিক্কার আর শ্লেষ দিয়ে বলবে, 'এটুকুও পার নি? সারাদিন কি রাজকার্য কর? নভেল পড়া আর বাবার অন্নজল ধ্বংসানো ছাড়া আর কোনো মহৎ কর্ম তো করতে দেখি না।'

যেন অন্য অনেক 'মহৎ কর্মে'র দরজা চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। যেন দাদাদের জামায় বোতাম বসানো, কি ঘর গোছানো, তাদের জুতো ঝেড়ে রাখা, কি ফতুয়া গেঞ্জি সাবান কেচে রাখাই ভারী একটা মহৎ কর্ম!

ওরা কি ওদের মহৎ পুরুষজীবনের শুল্ক আদায় করে নেবার পদ্ধতিটা রপ্ত করে রাখছে এই মেয়ে দুটোর ওপর দিয়ে?

এ কথা ভাবে পারুল।

তবু প্রতিবাদ করবার কথা ওঠে না।

প্রতিবাদের সুর শুনলে খিঁচুনি বাড়বে বৈ তো কমবে না।

কিন্তু আজ পারুল সহসা কঠিন হলো।

বললো, 'অত ভয় পাবার কি আছে? বল্‌গে যা হয় নি, ভুলে গেছি।'

'ও বাবা, আমি পারবো না।'

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি—'

যাচ্ছিল, যাওয়া হল না। প্রবোধ এসে ঢুকলো বাইরে থেকে এক বোতল ক্যাওড়ার জল হাতে করে।

প্রবোধের মুখ রাগে থমথমে।

এসেই কড়াগলায় বলে ওঠে, 'জগুদাকে কে কি বলেছে?'

বলেছে!

বলবে আবার কে কি?

পারুল বকুল দুজনেই অবাক হয়ে তাকায়। প্রবোধ আরো চড়া গলায় বলে, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা বলা হয়েছে, বুড়োমন্দ একটা লোক চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যেত না। আমাকে বলে গেল, "আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি তোর বামুনভোজনের যজ্ঞিশালায় নেই"—শুধু শুধু এমন কথাটা বলবে এমন পরোপকারী মানুষটা? বলেছ, তোমরাই কেউ কিছু বলেছ। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ তো সবাই, গুরুলঘু জ্ঞান করতে জানো না, গুরুজনদের মান-অপমানের ধার ধারো না। উদ্ধত অবিনয়ী এক-একটি রত্ন তৈরী হয়েছ তো!'

বকুল এর বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাই বকুল হাঁ করে চেয়ে থাকে। তবে পারুলও উত্তর দেয় না কিছু। কারণ পারুল জানে, এসব কথার লক্ষ্যস্থল পারুল বকুল নয়, তাদের দাদারা।

এই স্বভাব বাবার, মুখোমুখি কিছু বলবার সাহস হয় না ছেলেদের, তাই এমন শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ!

ওরাও তাই শিখেছে।

'জবাব' দেয় না, ঠেস দিয়ে কথা বলে দেওয়ালকে শুনিয়ে।

ছেলে বলেই অবশ্য এতটা সাহস তাদের! মাকে (বোধ করি তুচ্ছ মেয়েমানুষ জাতটার একটা অংশ হিসেবে) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কটু-কাটব্য করে, আর বাপকে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি?

ওরা ওদের মা-বাপের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য কী দেখতে পাচ্ছে?

হয়তো শুধু 'মা-বাপ' এই হিসেবেই করতো ভয়-ভক্তি, যদি ওদের দৃষ্টিটা আচ্ছন্ন থাকতো অন্য অনেকের মত। কিন্তু তা হয় নি, সুবর্ণলতা অন্য পাঁচ জনের থেকে পৃথক করে মানুষ করতে চেয়েছিল তার সন্তানদের। তাদের 'খোলা চোখে' দেখতে শেখাবার চেষ্টা করেছিল, ওরা সে চেষ্টা সফল করেছে। ওরা শুধু 'মা-বাপ' বলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে এমন নির্বোধের ভূমিকা অভিনয়ে রাজী নয়।

না করুক, সমতলেও নেমে আসুক!

প্রবোধ অন্তত তা চায়।

প্রবোধের ইচ্ছে করে, ছেলেমেয়েরা তার মুখে মুখে চোটপাট জবাব করুক, সেও তার সমুচিত জবাব দেবার সুযোগ পাক। কিন্তু তা হয় না! ছেলেরা তো দূরের কথা, মেয়েরা পর্যন্ত যেন কেমন অবজ্ঞার চোখে তাকায়।

সে দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠবে না মাথার মধ্যে?

তাই এখনও আগুনজ্বালা কণ্ঠে চীৎকার করে প্রবোধ, 'কেউ কিছু বলে নি বললেই মানবো আমি? ওই অবোধ-অজ্ঞান মানুষটা কখনো মান-অভিমানের ধার ধারে না, সে হঠাৎ এতটা অভিমান করে—'

বাপের কণ্ঠ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভায়েরা এসে দাঁড়ালো, একটু থমকে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার? বাড়িতে ভোজটোজ নাকি? পারুর বিয়ে বুঝি?'

পারুর বিয়ে!

হতবাক প্রবোধ বলে, 'পারুর বিয়ে? তোমরা জানবে না সেটা?'

'বাঃ, এই তো জানছি। ভাঁড় খুরি এসে গেছে!'

বললো ভানু।

তার সেজকাকার ভঙ্গীতে।

প্রবোধ অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকালো! বললো, 'এইভাবে জানবে? বাঃ কেন, আর কোনো ঘটনা ঘটে নি সংসারে? তোমাদের মা'র চতুর্থীর বামুন-ভোজন—'

'তাই নাকি? ওঃ!'

ভানু ভুরু কোঁচকায়।

ভানুর সেই ভুরুতে ব্যঙ্গের হাসি ছায়া ফেলে।

প্রবোধ হঠাৎ সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তা এতে হাসবার কি হলো? হাসবার কি হলো? যে মানুষটা তোমাদের সংসারে প্রাণপাত করছে, তার একটা পাওনা নেই সংসারের কাছ থেকে?'

কি উত্তর ভানু দিত কে জানে!

সহসা কোন ঘর থেকে যেন বেরিয়ে এল তার মা। খুব শান্ত আর স্থির গলায় বললো, 'তোমাদের এই সংসার থেকে আমার যা প্রাপ্য পাওনা, সেটা তাহলে শোধ হচ্ছে? অনেক ধন্যবাদ যে শোধের কথাটা তবু মনে পড়েছে তোমার। কিন্তু ওতে আমার রুচি নেই, সেই কথাটাই জানিয়ে দিতে এলাম তোমায়। এসব আয়োজন করার দরকার নেই, করা হবে না।'

করা হবে না!

প্রবোধ যন্ত্রচালিতের মত বলে, 'আজ হবে না?'

'না। আজ না কোনদিনই না!'

এরপরও যদি রেগে না ওঠে প্রবোধ, কিসে আর তবে রেগে উঠবে?

অতএব রেগেই বলে, 'হবে না বললেই হলো? রাজ্যসুদ্ধ লোকজনকে নেমন্তন্ন করে এলাম—'

'নেমন্তন্ন করে এলে?' সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে তাকায়। কিন্তু প্রবোধ ভয় পায় না, প্রবোধ এমন স্তব্ধতা অনেক দেখেছে। তাই প্রবোধ বলে, 'এলাম তো! বিরাজ বলেছে, সে সকলের আগে আসবে—আর ও-বাড়ির সবাই একটু দেরি করবে, কারণ—'

'থাক, কারণ শুনতে চাই না। লোকজন আসে ভালই, তোমরা থাকবে। আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবো।'

'তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে?'

প্রবোধ আর পারে না, খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'বাপের ছেরাদ্দটা তাহলে আমিই করবো?'

হঠাৎ সুবর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। কাতর গলায় বলে, 'আমায় এবার তুমি ছুটি দাও। আর মন্দ কথা বলিও না আমায়। আর পারছি না আমি।'

চলে যাচ্ছিল দ্রুতপায়ে, ঠিক এই মহামুহূর্তে ঝি এসে খবর দেয়, 'বাবুর বোনের দেশ থেকে অম্বিকেবাবু না কে একজন এসেছে, খবর দিতে বললো।'

॥ ১১ ॥

তারপর? তারপর সুবর্ণলতা—

কিন্তু সুবর্ণলতা কী বা এমন মানুষ যে, তার প্রতিদিনকার দিনলিপি বাঁধানো খাতায় তোলা থাকবে, আর পর পর মেলে ধরে দেখতে পাওয়া যাবে! আ-বাঁধা একখানা খাতার ঝুরো ঝুরো পাতা থেকে সুবর্ণলতাকে দেখতে পাওয়া!

সুবর্ণলতা যখন নিজেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিল সেই ঝুরো খাতার প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো তখনই কি সবগুলোর সন্ধান মিলেছিল? কই আর?

শুধু ওর মাথা কুটে মরার দিনগুলোই—

হ্যাঁ, সাদাসিধে দিনগুলো সাদা কালিতে লেখার মত কখন যেন বাতাস লেগে মিলিয়ে গেছে, আর পৃষ্ঠাগুলোই ঝরে পড়েছে অদরকারী বলে, শুধু ওই মাথা কোটার মত দিনগুলোই গাঢ় কালিতে লেখা হয়ে—

কিন্তু মুশকিল এই—কিসে যে সুবর্ণলতা মাথা কোটে বোঝা শক্ত।

কারো সঙ্গে মেলে না।

নইলে একটা জেলখাটা আসামী, কবে কোন্ দিনের একটু আলাপের সূত্র ধরে সুবর্ণলতার সঙ্গে দেখা করবার আবদার নিয়ে ওর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ওর স্বামী-পুত্তুর তাকে দরজা থেকেই বিদায় দিয়েছিল বলে মাথা কোটে ও?

বলে, 'ভগবান, এ অপমানের মধ্যে আর কতদিন রাখবে আমায়! এবার ছুটি দাও, ছুটি দাও!'

অথচ সত্যের মুখ চাইলে বলতে হয়, আসলে অপদস্থ যদি কেউ হয়ে থাকে তো সে সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্রই হয়েছিল।

ওরা সাধারণ সংসারী মানুষ! অতএব একটা জেলখাটা আসামী সম্পর্কে সহসা হৃদয়দ্বার খুলে দিতে পারে না। তাই ঘরের দ্বার খুলে দেয় নি। ওরা জেরা করেছিল। বলেছিল, কি দরকার, কাকে চান, কতদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, সুবর্ণলতার সঙ্গে খুব কোন জরুরী প্রয়োজন যদি না থাকে, এত কষ্ট করে এতদূর আসবার মানে কি, ইত্যাদি ইত্যাদি!

বাড়ির কর্তা হিসাবে প্রবোধই করছিল প্রশ্ন, তবে ভানুও ছিল দাঁড়িয়ে। তা বাড়ির কর্তাকে বাড়ির নিরাপত্তা, পরিবারের সম্ভ্রম—এসব দেখতে হবে না? তাই দেখছিল প্রবোধ। সহসা দেখল সুবর্ণলতা অন্তঃপুরের সভ্যতার গণ্ডি

ভেঙে বাড়ির বাইরে সদর রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাবা যায়? দেখেছে কেউ কখনো এমন দৃশ্য?

ওটা ওর স্বামীর পক্ষে লজ্জার নয়? অপমানের নয়?

তার উপর কিনা, প্রবোধ যখন রক্তবর্ণ মুখে বলেছে, 'তুমি বেরিয়ে এলে যে? এর মানে? ভানু, তোর মাকে বল বাড়ির মধ্যে যেতে—'

তখন কিনা সুবর্ণলতা, তুমি স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত না করে বলে উঠলে, 'কী সর্বনাশ অম্বিকাঠাকুরপো, তুমি এখানে? পালাও, পালাও! এ যে ভূতের বাড়ি! মেজবৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? কী আশ্চর্য, কেউ তোমায় বলে দেয় নি সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! এটা তার প্রেতাত্মার বাসভূমি!'

এতে অপদস্থ হলো না তোমার স্বামী পুত্র?

পরে যদি তোমার ছেলে বলেই থাকে, 'বাবা, তুমি বৃথা রাগ করছো, মা তো বেশি কিছু করেন নি! যা চিরকালের স্বভাব, তাই শুধু করেছেন। অন্যাকে অপদস্থ করা, গুরুজনকে অপমান করা—এটাই তো প্রকৃতি ওঁর, এতেই তো আনন্দ!'—সেও কিছু অন্যায় বলে নি।

তার দৃষ্টিতে তো আজীবন ওইটাই দেখেছে সে।

আর সুবর্ণ, তুমি তো অম্বিকার সামনে শুধু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হও নি? আরও বলেছ। অম্বিকা যখন তৎসত্ত্বেও প্রেতাত্মাকেই হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তুমি শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে বলেছ, 'ছি ছি ভাই, প্রণাম করে আর পাপ বাড়িও না আমার, একেই তো পূর্বজন্মের কত মহাপাপে বাঙালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর আরও কত শত মহাপাপে এই মহাপুরুষদের ঘরে পড়েছি। আর কেন? প্রণাম বরং তোমাদেরই করা উচিত। তোমরা যারা নিজের সুখদুঃখ তুচ্ছ করে দেশের গ্লানি ঘোচাতে চেষ্টা করছ।'

কী এ? প্রবোধ যা বলেছে তাছাড়া আর কি?

নাটক ছাড়া আর কি?

পুরো নাটক!

কিন্তু এই ঘরগেরস্ত লোকদের সংসারটা থিয়েটারের স্টেজ নয়। অথচ সারাজীবনে তুমি তা বুঝলে না। এখনও বুড়ো বয়সেও না।

তোমার কথায় যখন অম্বিকা ম্লান হেসে বলেছিল, 'চেষ্টাই হয়েছে, কাজ আর কী হলো? সবটাই ব্যর্থতা!' তখন তুমি নাটুকে ভাষাতেই উত্তর দিলে, 'কেন ব্যর্থতা জান ঠাকুরপো? তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বল? এ অখদ্যে অবদ্যে মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না শুধু 'মানুষ' বলে স্বীকার করতে পারবে ততদিন তোমাদের মুক্তি নেই, মুক্তির আশা নেই। চাকরানীকে পাশে নিয়ে কি তোমরা রাজসিংহাসনে বসবে?'

বললে!

একবার ভাবলে না, তোমার স্বামী-পুত্রের মাথাটা কতখানি হেঁট হলো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তোমার ওই নাটক করায়।

অগত্যাই ওদের কঠোর হতে হয়েছে।

অগত্যাই ধমকে উঠে বলতে হয়েছে, 'পাগলামি করবার আর জায়গা পাও নি?' আর ওই পাগলামির দর্শককেও কটু গলায় বলতে হয়েছে, 'আপনিও

তো আচ্ছা মশাই, ভদ্রলোকের ঘরের মান ইজ্জত বোঝেন না! দেখছেন একটা মাথাখারাপ মানুষ ঘর থেকে ছিটকে এসেছে—'

এরপরেও অবশ্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

অন্তত অম্বিকার মত শান্ত সভ্য মার্জিতস্বভাব লোকে নিশ্চয় পারে না। মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল সে।

তবু সুবর্ণলতা তুমি হেসে বলে উঠেছিল, 'ঠিক হয়েছে! কেমন জব্দ? ভুতের বাড়ি আসার ফল পেলে?'

ভাবো নি এরপরও তোমাকে তোমার স্বামী-পুত্রের সামনে মুখ দেখাতে হবে, পিছনের ওই চৌকাঠ পার হয়েই আবার ঢুকতে হবে।

কিন্তু ঢুকতে হলেই বা কি!

সুবর্ণলতার শরীরে কি লজ্জা আছে? কতবারই তো বেরিয়ে পড়েছে সুবর্ণলতা বাড়ির বাইরে, আবার এসে ঢোকে নি?

ঢুকেছে। আবার ঢুকেছে, আবার দাপট করেছে। মরমে মরে গিয়ে চুপ হয়ে যায় নি। এদিনও তা গেল না। যখন প্রবোধ গর্জে উঠলো, আর ভানু উপযুক্ত ধিক্কার দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে শুধু ঘৃণার দৃষ্টিতে দগ্ধ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করলো, তখন কিনা সুবর্ণলতা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অনায়াসে বলে উঠলো, 'কী আশ্চর্যি। এতে তোমাদের মুখ পোড়ানো হলো কোথায়? মুখ উজ্জ্বলই হলো বরং। পাগল পাগলের মতই আচরণ করলো, চুকে গেল ল্যাঠা। তোমার কথার মান বজায় রাখলাম, আর বলছো কিনা মুখ পোড়ালাম?'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছিল সেদিন একা সুবর্ণলতার বড় ছেলেই নয়, মেজ-সেজও অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'চমৎকার!' মা'র শোক হয়েছে ভেবে আর মমতা আসে নি ওদের। ছোট ছেলে সুবলের কথাই শুধু বোঝা যায় না, সে বরাবরই মুখচোরা। সে যে কোথা থেকে তার এই চাপা স্বভাব পেয়েছে!

কিন্তু সুবর্ণলতার মেয়েরা?

যে মেয়ে দুটো এখনো পরের ঘরে যায় নি? পারুল আর বকুল?

তা ওদের কথাও বোঝা যায় নি।

মনে হচ্ছিল ওদের চোখে একটা দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছিল। যেন ওরা ঠিক করতে পারছিল না, মায়ের উপরে বরাবর যে ঘৃণা আর বিরক্তি পোষণ করে এসেছে, সেটাই আরো পুষ্ট করবে, না নতুন চিন্তা করবে?

বকুল ছেলেমানুষ।

এত সব ভাববার বয়স হয় নি তার।

কিন্তু তাই কি?

সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা ছেলেমানুষ থাকবার অবকাশ পেল কবে? জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তো ওরা শুধু ওদের মাকে বিশ্লেষণ করেছে, তার তিক্ততা অর্জন করেছে। তাই করতে করতেই বড় হয়ে উঠেছে।

ওরা অনেক কিছু জেনে বুঝে পরিপক্ক।

বাপকে ওরা ঘৃণা করে না, করে অবহেলা। কিন্তু মাকে তা পারে না। মাকে অবহেলাও করতে পারে না, অস্বীকারও করতে পারে না, তাই ঘৃণা করে।

শুধু আজই যেন ওদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে। অম্বিকার ফিরে চলে

যাওয়ার মধ্যে ওরা বুঝি সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটার দুঃসহ অসহায়তা টের পেয়ে গেছে। তাই দিশেহারা হয়ে ভাবছে, 'গৃহিণী' শব্দটা কি তাহলে একটা ছেলেভোলানো শব্দ? নাকি 'দাসী' শব্দেরই আর একটা পরিভাষা?

গৃহিণীর যদি তার গৃহের দরজায় এসে দাঁড়ানো একটা অতিথিকে 'এসো বসো' বলে ডাকবার অধিকারটুকুমাত্র না থাকে, তবে 'গৃহিণী' শব্দটা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কি? ওই ধোঁকায় ধোঁকায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়ে দাসত্ব করিয়ে নেওয়া!

সংসার করা মানে তা হলে শুধু সংসারের পরিচর্যা করা, আর কিছু না! আশ্চর্য, যেখানে এক কানাকড়াও অধিকার নেই, সেখানে কেন এই গালভরা নাম?

খুব স্পষ্ট করে মনে না পড়লেও মেজপিসীর বাড়ি গিয়ে থাকার কথাটা পারুলের কিছু কিছু মনে আছে বৈকি। মনে আছে অম্বিকাকাকার নাম, তাছাড়া ছেলেবেলায় কতবারই না শুনেছে সে নাম মায়ের মুখে। কত শ্রদ্ধার সঙ্গে, কত প্রীতির সঙ্গে, কত স্নেহের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে সে নাম। অথচ সেই মানুষটাকে 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সুবর্ণলতারই সামনে!

গৃহিণীর সম্ভ্রম দিয়ে সুবর্ণলতার ক্ষমতা হলো না তাকে ডেকে এনে ঘরে বসাবার!

পারুল দেখেছে সেই অক্ষমতা। হয়তো বকুলও দেখেছে। আর অনুভব করেছে, এ অক্ষমতা বুঝি একা সুবর্ণলতারই নয়।

তাই দৃষ্টিভঙ্গী পালটাচ্ছে ওদের।

কিন্তু সুবর্ণলতার বাপ-মায়ের সেই 'চতুর্থী শ্রাদ্ধের' কি হলো? খুব একটা সমারোহের আয়োজন করেছিল না তার স্বামী ওই উপলক্ষে। বলে বেড়াচ্ছিল, 'না বাবা, এ হলো গিয়ে "শ্বশুর-শাশুড়ীর দায়", পিতৃমাতৃদায়ের চতুর্গুণ!'

তা সেও একরকম ধাষ্টামো করেই হলো বৈকি। সহজ সাধারণ কিছু হলো না। হবে কোথা থেকে?

সহজে কিছু কি হতে দেয় সুবর্ণলতা? সব কিছুকেই তো বিকৃত করে ছাড়ে ও!

সুবর্ণলতা তাই বলে বসলো, 'আমি ওসব করবো না।'

'করবে না? ভুজ্যি উচ্ছুগ্যুও করবে না তুমি মা-বাপের?'

'না।'

না!

শব্দজগতের চরমতম কঠোর শব্দ।

নিষ্ঠুর, অমোঘ।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

অত সব আয়োজন তাহলে?

নষ্ট গেল?

আবার কি!

পুরোহিত এসে শুনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাছাড়া আর করবেন কি? প্রবোধ যদি বা বলেছিল—'ওর তো আবার জ্বর হয়ে গেছে রাত থেকে

—কাজ করা হবে কি? জ্বর গায়ে তো—' কিন্তু সুবর্ণলতা তো সে কথাকে দাঁড়াতে দেয় নি। বলে উঠেছিল, 'উনি ঠিক জানেন না ঠাকুরমশাই, জ্বর-টর কিছু হয় নি আমার—'

'জ্বর-টর হয় নি? তবে?'

'কিছু না। ইচ্ছে নেই সেটাই কথা!'

পুরোহিত একবার প্রবোধের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন শালগ্রামশিলাকে উঠিয়ে নিয়ে!

'এ বাহাদুরিটুকুও কি না দেখালে চলতো না?' হেরে যাওয়া গলায় বলেছিল প্রবোধ, 'ও-বাড়ির পুরুত উনি—'

সুবর্ণলতা চুপ করে তাকিয়ে ছিল।

প্রবোধ আবার বলেছিল,. 'চিরকালের গুরুবংশের ছেলে—'

'জানি,' সুবর্ণলতাও প্রায় তেমনি হেরে যাওয়া গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গুরুবংশের ছেলে, পুরোহিতের কাজ করছেন, তাতে শালগ্রাম তাঁর সঙ্গে, আর জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা কইতে ইচ্ছে হলো না।'

হলো না।

হলো না তখন সে ইচ্ছে!

অথচ নিজেই সুবর্ণলতা ঘণ্টাকয়েক পরে 'শরীর খারাপ লাগছে, বোধ হয় জ্বর আসছে—' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে।

মিছিমিছিই বলল বৈকি।

গা তো ঠাণ্ডা পাথর!

বললো কাদের? কেন, যত সব আত্মীয়-কুটুম্বদের! বাড়ি বাড়ি ঘুরে যাদের যাদের নেমন্তন্ন করে এসেছে প্রবোধ, তার স্ত্রীর মা-বাপ মরার উপলক্ষে।

তারা কি জানে, সুবর্ণলতা পিতৃ-কার্য করতে ইচ্ছে হয় নি বলে পুরোহিতকে বিদায় দিয়েছে, আর আত্মীয়দের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় নি বলে চাদর ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে?

তবে সুবর্ণলতার পড়ে থাকার জন্যে কি কিছু আটকেছিল?

কিছু না। কিছু না।

প্রবোধের গুষ্টির সবাই এল, ভোজ খেল, সুবর্ণলতার শুয়ে থাকার জন্যে হা-হুতাশ করলো, চলে গেল।

সুবর্ণলতাই শুধু চাদর মুড়ি দিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকলো।

কিন্তু সুবর্ণলতার মায়ের সেই চিঠিটা?

সেটার কি হলো?

সে চিঠি কি খুললো না সুবর্ণলতা? কবরের নীচে চিরঘুমন্ত করে রেখে দিল তার মায়ের অন্তিম বাণী?

এত অভিমান সুবর্ণলতার?

এত তেজ?

এত কাঠিন্য?

তা প্রথমটা তাই ছিল বটে। কতদিন যেন সেই খাম মুখবন্ধ হয়ে পড়ে রইল সুবর্ণলতার ট্রাঙ্কের নীচে কাপড়চোপড়ের তলায়।

কিন্তু সেই গভীর অন্তরাল থেকে সেই অবরুদ্ধবাণী অনুক্ষণ সুবর্ণলতার

সমগ্র চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলেছে, 'সুবর্ণ, তুমি কি পাগল? সুবর্ণ, এ তুমি কী করছো?' আর তারপর হতাশ হতাশ গলায় বলেছে, 'সুবর্ণ, তোমার এই অভিমানের মর্ম কে বুঝবে? কে দেবে তার মূল্য?'

অবশেষে একদিন এই ধাক্কা অসহ্য হলো। সুবর্ণ ট্রাঙ্কের তলা থেকে ওর মায়ের সেই অন্তিমবাণী টেনে বার করলো।

দিনটা ছিল একটা রবিবারের দুপুর। যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, তবু কেমন যেন ঠান্ডা-ঠান্ডা মেঘলা দুপুর। আকাশটা যেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কোনো রকমে 'দিনসই' করেই সন্ধ্যার কুলায় আশ্রয় নেবো নেবো করছে। বাড়ি থেকে কারো বেরোবার কথা নয়, তবু আকস্মিক একটা যোগাযোগে আশ্চর্য রকমের নির্জন ছিল বাড়িটা।

গিরিবালার সাবিত্রীব্রতের উদ্‌যাপন সেদিন। সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজন-ভোজনেরও ব্যবস্থা করেছিল সে, তাই ভাসুরের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিল ছেলেকে দিয়ে।

কবে যেন ব্রতটা ধরেছিল গিরিবালা?

সুবর্ণ ও বাড়িতে থাকতেই না?

উদ্‌যাপনের খবর মনে পড়েছিল বটে সুবর্ণর; কারণ ওই ব্রতটাকে উপলক্ষ করে অজস্রবারের মধ্যে আরো একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সুবর্ণকে।

মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'বড়বৌমার কথা বাদ দিই, ওর না হয় ক্ষ্যামতা নেই, কিন্তু তোমার সোয়ামীর পয়সা তো ওর সোয়ামীর চেয়ে কম নয় মেজ-বৌমা, "খরুচে বত্তটা"য় সেজবৌমা ব্রতী হলো, আর তুমি অক্ষমের মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে?"

হয়তো ইদানীং গিরিবালার স্বাধীনতাও ভাল লাগছিল না মুক্তকেশীর, তাই এক প্রতিপক্ষকে দিয়ে আর এক প্রতিপক্ষকে খর্ব কববার বাসনাতেই এ উস্কানি দিচ্ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণলতা তাঁর ইচ্ছে সফল করে নি, সে অম্লানবদনে বলেছিল, 'ও ধাষ্টামোতে আমার রুচি নেই।'

ধাষ্টামো!

সাবিত্রীব্রত ধাষ্টামো! মুক্তকেশী স্তম্ভিত দৃষ্টি ফেলে বোবা হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

গিরিবালাও মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, 'এ কথার মানে কি মেজদি?'

মেজদি আরো অম্লানবদনে বলেছিল, 'মানে খুব সোজা। যার সবটাই ফাঁকা তা নিয়ে আড়ম্বর করাটা ফাঁকি ছাড়া আর কি? অন্যকে ধোঁকা দেওয়া, আর নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, এই তো? সেটাই ধাষ্টামো!'

'স্বামীভক্তিটা তাহলে হাসির বস্তু?'

সুবর্ণলতা হেসে উঠে বলেছিল, 'ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্চয় হাসির। ফুল-চন্দন নিয়ে স্বামীর "পা" পুজো করতে বসেছি আমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই সে হাসি উথলে উঠছে আমার!'

'নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার কোরো না মেজদি, ভক্তি যার আছে—'

মেজদি এ ধিক্কারকে নস্যাৎ করে দিয়ে আরো হেসে বলেছিল, 'ভক্তি? ওই ভেবে মনকে চোখ ঠারা, এর মধ্যে ভক্তিও নেই, মুক্তিও নেই সেজবৌ। আছে শুধু শখ অহমিকা!'

সেই অকথ্য উক্তির পর বাড়িতে কোর্ট-কাছারি বসে গিয়েছিল। যে দাওর

ডেকে কথা আর কইত না ইদানীং, সেও এসে ডেকে বলেছিল, 'বিষটা নিজের মধ্যে থাকলেই তো ভাল ছিল মেজবৌ, অন্যের সরল মনে গরল ঢেলে দেবার দরকার কি? স্বামীকে সত্যবান হতে হবে তবে স্ত্রীরা সাবিত্রী হবে, নচেৎ নয়, এমন বিলিতি কথার চাষ আর নাই বা করলে বাড়িতে!'

আর প্রবোধ বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে গিয়েছিল, বলেছিল, 'হবে বিদেয় হতেই হবে আমায় এ বাড়ি থেকে। এভাবে আর—'

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'আহা এ সুমতি হবে তোমার? তাহলে পায়ে না হোক, মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার!'

অবশ্য বিষমন্ত্র দেওয়া সত্ত্বেও ব্রত নেওয়া বন্ধ থাকেনি গিরিবালার, এবং দেখা যাচ্ছে চোদ্দ বছর ধরে নিষ্ঠা সহকারে পতিপূজা করে এখন সগৌরবে ব্রত উদ্‌যাপন করতে বসেছে সে।

সুবর্ণলতা কি ওর সুখী হবার ক্ষমতাকে ঈর্ষা করবে?

না সুবর্ণলতা শুধু হাসবে?

তা এখন আর হেসে ওঠে নি সুবর্ণ, শুধু ছেলেটাকে বলেছিল, 'যেতে পারবো না বাবা সুশীল, মাকে বলিস মেজজেঠির শরীর ভাল নেই। আর সবাই যাবে।'

সেই উৎসবে যোগ দিতে চলে গেছে সুবর্ণর স্বামী, সন্তানেরা। অবশ্য পারুল বাদে। পারুলের থেকে বয়সে ছোট খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, পারুর হয় নি, এই অপরাধে প্রবোধ বলেছিল, 'ওর যাওয়ার দরকার নেই।'

পারু মনে মনে বলেছে, 'বাঁচলাম।'

কে জানে, হয়তো বাড়ির কোন্ কোণে একখানা বই নিয়ে পড়ে আছে পারুল, হয়তো বা তার কবিতার খাতাটা নিয়েও বসতে পারে, এই অকস্মাৎ পেয়ে যাওয়া একখণ্ড অবসরের সুযোগে। সুবর্ণ জানে, পারু তার নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটাবে না।

কিন্তু তখন কি ভেবেছিল সুবর্ণ, ওরা চলে গেলে মায়ের চিঠিখানা খুলবো আমি?

তা ভাবে নি।

শুধু অনেকটা কলকোলাহলের পর হঠাৎ বাড়িটা ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক একটা মন উচাটন ভাব হয়েছিল সুবর্ণর!

আর তখনই মনে হয়েছিল ওর, 'আমি কি সেজবৌয়ের সুখী হওয়ার ক্ষমতাকে হিংসে করছি?...তা নয়তো কেন আজই এত করে মনে আসছে সারাজীবন আমি কি করলাম!'

অবিশ্রান্ত একটা প্রাণপণ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনোখানে যেন কিছু চোখে পড়ে না। কোথাও যে একটু সুশীতল ছায়া আছে, কোনোখানে যে একবিন্দু তৃষ্ণার জল মিলেছিল, সে কথা যেন ভুলেই যাচ্ছে সুবর্ণ। সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে অবিরত সে শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, তবু এগিয়ে যাবার চেষ্টায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

নিজের উপর করুণায় আর মমতায় চোখে জল এসে গেল সুবর্ণর, ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো, আর তখনই মনে হলো, দেখব আজ আমি দেখব—ভগবান আমাকে শেষ কি উপহার পাঠিয়েছেন!

খাম ছিঁড়তে হাত কাঁপছিল সুবর্ণর, আর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। যেন ওটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত একটা কিছু ফুরিয়ে যাবে ওর।

কী সে?

পরম একটা আশা?

নাকি ওই খামটার মধ্যে ওর মা এখনও জীবন্ত রয়েছে, খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে?

তা তেমনি একটা কষ্টের মধ্যেই খামটা খুললো সুবর্ণলতা। আর তার পরই একটা জলের পর্দা যেন ঢেকে দিল সমস্ত বিশ্বচরাচর।...ঝাপ্সা হয়ে গেল কালো কালো অক্ষরের সারি, ঝাপ্সা হয়ে গেল বুঝি নিজের ওই কাগজ ধরা হাতখানাও। পর্দাটা পড়ে যাবার আগে শুধু একটা শব্দ ঝলসে উঠেছিল -সেই শব্দটাই বাজতে লাগলো মাথার মধ্যে।

"কল্যাণীয়াসু—

সুবর্ণ—"

কল্যাণীয়াসু...সুবর্ণ।

এ নাম তা হলে মনে রেখেছে সুবর্ণর মা?

আজো কেউ তা হলে সুবর্ণ নামে ডাকে তাকে?

না না, কোনোদিন ডাকে নি, কোনোদিনও আর ডাকবে না। শুধু নামটা মনে রেখেছিল, অথচ একদিনের জন্যে সেই মনে রাখার প্রমাণ দেয় নি সে।

জলের পর্দাটা মুছে ফেলবার কথা মনে পড়ে নি সুবর্ণর। যতক্ষণে বাতাসে শুকিয়ে গেল, বুঝিবা বেশিই শুকিয়ে গেল, ততক্ষণে ওই কল্যাণ সম্বোধনের পরবর্তী কথাগুলো চোখে পড়লো।

"কল্যাণীয়াসু—

সুবর্ণ,

বহুদিন পূর্বে মরিয়া যাওয়া কোনও লোক চিতার তল হইতে উঠিয়া আসিয়া কথা কহিতেছে দেখিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, বোধ হয় সেইরূপ বিস্ময় বোধ করিতেছ! আব নিশ্চয় ভাবিতেছ, 'কেন আর? কি দরকার ছিল?'

কথাটা সত্য, আমিও সে কথা ভাবিতেছি। শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া ভাবিতেছি। যেদিন তোমাকে ভাগ্যের কোলে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই এই পত্র লেখার কথা ভাবিয়াছি, এবং দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি। ভাবিয়াছি, কেন আর? আমি তো তাহার আর কোনো উপকারে লাগিব না! (জলের পর্দাটা আবার দুলে উঠেছে, সেই সঙ্গে সুবর্ণর ব্যাকুল আবেগ।...মা, মা, সেটাই তো পরম উপকার হতো! তোমার হাতের অক্ষর, তোমার স্নেহ-সম্বোধন, তোমার 'সুবর্ণ' নামে ডেকে ওঠা, হয়তো জীবনের গতি বদলে দিতো তোমার সুবর্ণর!) তথাপি বরাবর ইচ্ছা হইত তোমায় একটি পত্র দিই। তবু দেওয়া হয় নাই। কেন হয় নাই, সেটা এখন বুঝিতে পারি, দেওয়া হয় নাই কেবলমাত্র লজ্জায়। তোমার কাছে আমার অপরিসীম লজ্জা, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নাই। সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

জীবনের এই শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়া মনের সঙ্গে যে শেষ বোঝা-পড়া করিতেছি, তাহাতেই আজ এই সত্য নির্ধারণ করিতেছি, তোমাকে অমন করিয়া নিষ্ঠুর ভাগ্যের মুখে ফেলিয়া আসা আমার উচিত হয় নাই। হয়তো

তোমার জন্য আমার কিছু করবার ছিল!

তবু ভগবানের দয়ায় তুমি হয়তো ভালই আছো। তোমার ছোড়দার কাছে জানিয়াছিলাম তোমার কয়েকটি সন্তান হইয়াছে ও খাইয়া পরিয়া একরকম সুখেই আছো। তবু এমনই আশ্চর্য, চিরদিনই মনে হইয়াছে তুমি বোধ হয় সুখে নাই।...(মা মা, তুমি কি অন্তর্যামী? সত্যই দুঃখী, বড় দুঃখী, তোমার সুবর্ণ চিরদুঃখী!) এই অদ্ভুত চিন্তা বোধ করি মাতৃহৃদয়ের চিররহস্য—যদিও মাতৃহৃদয়ের গৌরব করা আমার শোভা পায় না!...কিন্তু সুবর্ণ, ভাবিতেছি তুমি কি আমার চিঠির ভাষা বুঝিতে পারিতেছ? জানি না তোমার জীবন কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছে, জানি না তুমি সে জীবনে শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগ পাইয়াছ কিনা! আজ তুমিও আমার অপরিচিত, আমিও তোমার অপরিচিত।

কিন্তু সত্যই কি তাই?

সত্যই কি আমরা অপরিচিত?

তবে কেন সর্বদাই মনে হয়, সুবর্ণ ভাঙিয়া পড়ে নাই, সুবর্ণ ভাঙিয়া পড়িতে পারে না। সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে। তোমার মধ্যে সে অঙ্কুর ছিল। যে কয়টি দিন তোমাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল।

তাই মনে হয়, তুমি হয়তো তোমার হৃদয়হীন মাকে কতকটা বুঝিতে পারো। হয়তো অবিরত ধিক্কার দিবার পরিবর্তে একবার একটু ভালবাসার মন নিয়ে চিন্তা করো!

একদা সংসারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া সংসার হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি জানো, তোমাকে উপলক্ষ করিয়াই সেই ঝড়ের সৃষ্টি। বেশি বিশদ করিয়া সেসব কথা লিখিতে চাহি না। তবে এই সুদীর্ঘকাল সংসার হইতে দূরে থাকিয়া অবিরত মানুষকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে এইটা বুঝিয়াছি এ সংসারে যাহাদের 'অন্যায়কারী' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়, তাহারা সকলেই হয়তো শাস্তির যোগ্য নয়। তাহারা যা কিছু করে, তার সবটাই দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া করে না। অধিকাংশই করে না বুঝিয়া। তাহাদের বুদ্ধিহীনতাই তাহাদের অঘটন ঘটাইবার কারণ। কাজেই তাহারা ক্রোধের যোগ্যও নয়। তাহারা বড় জোর বিরক্তির পাত্র, এবং করুণার পাত্র।

কিন্তু যখন এই বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে একটা জীবনমরণের প্রশ্নের সংঘর্ষ লাগে, তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিচার করা সহজ নয়। আর এও জানি, সেদিন আমার পক্ষে এ ছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না।...তোমার পিতা ও ভ্রাতারা আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, পত্রে কোন কাজ না হওয়ায়, কাশীতে আসিয়াও অনুরোধ উপরোধ ও তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর হাতে তুলিয়া লওয়া চলে না। সেই ফেলিয়া আসা সংসার-জীবনের সহিত আবার নিজেকে খাপ খাওয়ানোও অসম্ভব। তুমি জানো হয়তো, তোমার দাদামহাশয় তখন কাশীবাসী। তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন বহু কাশীবাসী পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি হিন্দু বিবাহের মূল তাৎপর্য কি, মূল লক্ষ্য কি, এ বন্ধন যথার্থই জন্ম-জন্মান্তরের কিনা। কিন্তু যখনই প্রশ্ন তুলিয়াছি, এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন,

পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটি ঘটনা মাত্র. অথচ নারীর পক্ষে চির-অলঙ্ঘ্য কেন, সদুত্তর পাই নাই। উপরন্তু এই প্রশ্নের অপরাধে অনেক স্নেহশীল পণ্ডিতের স্নেহ হারাইয়াছি। ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎ কালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ-দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লিখিয়া দেয় না।...স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই!

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের!

ইহাই সার কথা, ধৈর্য ব্যতিরেকে কোনো কাজই সফল হয় না। এই কথাটি বুঝিতে আমার সমগ্র জীবনটি লাগিযাছে. আর এই কথাই মনে হইয়াছে, একথা বলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে কান দিবে? তোমাকে বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে. সংকোচে কুণ্ঠায় নীরব থাকিয়াছি। তাছাড়া এই ভয়ও ছিল. হয়তো আমার পত্র তোমার সাংসারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করিবে। তাই ইহা আমার মৃত্যুর পর তোমার হাতে পৌঁছাইবার নির্দেশ দিয়াছি। হয়তো তখন তোমার এই সংসারত্যাগিনী মাকে তোমার স্বামীর সংসার একটু সদয়চিত্তে বিচার করিবে। হয়তো ভাবিবে উহাকে দিয়া আর কি ক্ষতির সম্ভাবনা?

তোমাকে এত কথা লিখিতেছি, কারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা বুঝি, তুমি এখন একটি বয়স্কা গৃহিণী। কিন্তু মা সুবর্ণ, তোকে যখন দেখিতে চেষ্টা করি, তখন একটি ক্ষুদ্র বালিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। পরনে ঘাগরা, মাথায় চুল বেণী করিয়া বাঁধা. হাতে বই-খাতা-স্লেট, একটি স্কুল-পথ-যাত্রিণী বালিকা!

তোর এই মূর্তিটি ভিন্ন আর কোনো মূর্তিই আমার মনে পড়ে না। এই মূর্তিই আমার সুবর্ণ! সেই যে তোকে তোর স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, সেই মূর্তিটিই মনের মধ্যে আঁকা আছে।

কিন্তু তেমন ইচ্ছা করিলে কি আমি তোমায় আর একবার দেখিতে পাইতাম না? আর তেমন ইচ্ছা হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলি, তোমার সেই মূর্তিটি ছাড়া আর কোনো মূর্তিই আমার দেখিতে ইচ্ছা ছিল না।...তোমাকে লইয়া আমার অনেক আশা ছিল, অনেক সাধ-স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সব আশাই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তবু ওই মূর্তিটা আর চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই।...তুমি হয়তো ভাবিতেছ এসব কথা এখন আর লিখিবার অর্থ কি? হয়তো কিছুই অর্থ নাই, তবু মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাই বুঝি কেহ তাহাকে যথার্থ করিয়া বুঝুক!...আমাকে কেহ বুঝিল না—এর বড়ো আক্ষেপ বোধ হয় আর কিছুই নাই। পুরুষমানুষের একটা কর্মজীবন আছে, সেখানে তাহার গুণ কর্ম রুচি প্রকৃতির বিচার আছে। সেখানেই তাহার জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা। মেয়েমানুষের তো সে জীবন নাই, তাই তাহার একান্ত ইচ্ছা হয়, আর কেহ না বুঝুক, তাহার সন্তান যেন তাহাকে বুঝে, যেন তাহার জন্য একটু শ্রদ্ধা রাখে, একটু মমতার নিঃশ্বাস ফেলে! সেইটুকুই তার জীবনের যথার্থ সার্থকতা। হয়তো মৃত্যুর পরেও এ ইচ্ছা মরে না, তাই এই পত্র।

হয়তো তুমি চিরদিনই তোমার মমতাহীন মাকে ধিক্কার দিয়াছ, কিন্তু মৃত্যুর পরও যদি সে ভাবের পরিবর্তন হয়, বুঝিবা আত্মা কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবে। তাই মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া এই পত্র লিখিবার বাসনা।

সুবর্ণ: তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না।

তোমার ছোড়দাদা মোগলসরাইতে কাজ করে, মাঝে মাঝে আসে। নিষেধ শোনে না। মনে হয় সে হয়তো আমাকে কিছুটা বোঝে, তাই কখনো তোমার দাদার মত মায়ের অপরাধের বিচার করিতে বসে না। এখানে আসিয়াই আমি যে মেয়ে-স্কুলটি গড়িয়াছিলাম, তাহার পরিসর এখন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার ছোড়দা স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে তাহার দেখাশুনা করে। মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর স্কুলটি টিঁকিয়া থাকিতেও পারে। প্রথম প্রথম বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে হইত। ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পিতামাতারা স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিতেছেন, এবং অনুধাবন করিতেছেন, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন আছে।

আশা হয় এইভাবেই 'কালে'র চেহারার পরিবর্তন হইবে। মানুষের বুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি সহজে যাহা করিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, 'প্রয়োজন' আর ঘটনা-প্রবাহই তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলে।

কেবলমাত্র পুঁথিপত্রে বা কাব্যে-গানে নহে, ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষমানুষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে—মেয়েমানুষও মানুষ! বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মদক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! এক পক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি নয়।

মহাকালই পুরুষজাতিকে এ শিক্ষা দিবে।

তবে এই কথাই বলি—এর জন্য মেয়েদেরও তপস্যা চাই। ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ক্ষমার তপস্যা।

মনে করিও না উপদেশ দিতে বসিয়াছি।

সময়ে যাহা দিই নাই, এখন এই অসময়ে আর তাহা দিতে বসিব না। শুধু নিজের সমগ্র জীবন দিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, সেই কথাটি কাহাকেও বলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব? আর কে-ই বা কান দিয়া শুনিবে? স্ত্রীলোকেরা তো আজও অজ্ঞতার অহঙ্কার ও 'মিথ্যা স্বর্গে'র মোহে তমসাচ্ছন্ন। তাহারা যেন বিচারবুদ্ধির ধার ধারিতেই চাহে না। ভাবনা হয় সহসা যেদিন তাহাদের চোখ ফুটিবে, যেদিন বুঝিতে শিখিবে ওই 'স্বর্গে'র স্বরূপ কি, সেদিন কি হইবে! বোধ করি সেদিনের পথনির্ণয় আরো শতগুণ কঠিন।

তবু এখানে বহু তীর্থবাসিনী ও নানান অবস্থার স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিয়া, এবং আপন জীবন পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা।

কিন্তু তেমন 'সম্ভব' কয়জনের পক্ষেই বা সম্ভব? প্রতিকূল সংসার তো প্রতিনিয়তই আঘাত হানিয়া হানিয়া সে পূর্ণতার শক্তিকে খর্ব করিতে বদ্ধ-পরিকর।...'মেয়েমানুষ মমতার বন্ধনে বন্দী',...'মায়ের বাড়া নিরুপায় প্রাণী আর নাই', এ তথ্য বুঝিয়া ফেলিয়াই না পুরুষের গড়া সমাজ এতো সুবিধা নেয়, এতো অত্যাচার করিতে সাহসী হয়! তবে এ বিশ্বাস রাখি, একদিন এ দিনের অবসান হইবেই। দেশের পরাধীনতা দূর হইবে, স্ত্রীজাতির পরাধীনতাও দূর হইবে।

শুধু আশা করিতে ইচ্ছা হয়, ভবিষ্যৎ কালের সেই আলোকোজ্জ্বল দিনের মেয়েরা আজকের এই অন্ধকার দিনের মেয়েদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটি

দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, আজকের দিনের মেয়েদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একবিন্দু অশ্রুবিসর্জন করিতেছে, আজ যাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করিল, তাহাদের দিকে একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

মা সুবর্ণ, এসব কথা না লিখিয়া যদি লিখিতাম—'সুবর্ণ, এযাবৎকাল প্রতিনিয়ত আমি তোমার জন্য কাঁদিয়াছি—' হয়তো তুমি আমার হৃদয়টা শীঘ্র বুঝিতে। কিন্তু সুবর্ণ, আমি তো শুধু আমার সুবর্ণর জন্যই কাঁদি নাই, দেশের সহস্র সহস্র সুবর্ণলতার জন্য কাঁদিয়াছি! তাই এই সব কথা।

তাছাড়া অবিরত শুষ্ক জ্ঞানের চর্চায় কাটাইতে কাটাইতে ভাষাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই মাঝে মাঝেই মনে হইতেছে, তুমি কি এত কথা বুঝিতে পারিতেছ! ন বছর বয়স হইতেই তো তোমার বিদ্যাশিক্ষায় ইতি হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তুমিও নিশ্চয়ই এসব কথা ভাবো, তুমিও কেবলমাত্র নিজের কথাই নয়, আরো সহস্র মেয়ের কথা চিন্তা করো।

অধিক আর কি লিখিব, আমার শতকোটি আশীর্বাদ গ্রহণ করো। তোমার পরিজনবর্গকেও জানাইও। আর যদি সম্ভব হয়, তোমার এই চিরনিষ্ঠুর মাকে —অন্তত তার মৃত্যুর পরও ক্ষমা করিও।

ইতি
তোমার নিত্য আঃ মা'

অনেকবার অনেক ঝলক জল গালের উপর গড়িয়ে পড়েছে, অনেকবার সে জল শুকিয়েছে, এখন শুধু গালটায় লোনাজল শুকিয়ে যাওয়ার একটা অস্বস্তির অনুভূতি।

নাকি শুধু গালেই নয়, অসার অনুভূতি দেহমনের সর্বত্র!

স্তব্ধ, মৃত্যুর মত স্তব্ধ!

যেন এ স্তব্ধতা আর ভাঙবে না কোনোদিন। এই স্তব্ধতার অন্তরালে বহে চলবে অন্তহীন একটা হাহাকার।

সুবর্ণর মা নিজেকে জানিয়ে গেল, সুবর্ণকে জেনে গেল না।

সুবর্ণর মা সন্দেহ করে গেল সুবর্ণ এত সব কথা নিয়ে ভাবে কিনা।

সুবর্ণর মা শুধু আশা করে গেল, হয়তো সুবর্ণ সহস্র মেয়ের কথা ভাবে! আর কিছু নয়। আর কিছু করার নেই।

॥ ১২ ॥

দেখলে পারুকে?'

সুবালা তার ভাঙা দাঁতের হাসি হেসে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সকৌতুকে বলে, 'বল শুনি কেমন লাগলো?'

অম্বিকা অবাক হয়।

অম্বিকা যেন আর এক জগৎ থেকে এসে পড়ে।

'পারু মানে? পারু কে?'

'পারু কে কিগো? মেজদার মেয়ে না? এই সুবালাসুন্দরীর ভাইঝি। তোমার সামনে বেরোয় নি বুঝি? না বেরোনোই সম্ভব, বড় হয়েছে তো! তা মেজবৌ কিছু বললো?'

অম্বিকা বিচিত্র একটু হেসে বলে, 'বললেন।'

সুবালা আশ্বস্ত গলায় বলে, 'যাক, তাহলে সেজদা আমার চিঠিটার মান রেখেছে। মেজদার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না তো, কি জানি পৌঁছয় না-পৌঁছয়, তাই সেজদার "কেয়ার অফে" মেজদাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম তোমার কথা উল্লেখ করে: তা এখন বল বাপু শুনি, কি সব কথা-টথা হলো? আমার তো ইচ্ছে—এ মাসেই লাগিয়ে দিই।'

অম্বিকা যেন একটু গম্ভীর হয়।

বলে ওঠে, 'কী মুশকিল! আপনি এসব কী যা-তা আরম্ভ করলেন! এ রকম চালালে কিন্তু ফের পালাবো!'

সুবালা শঙ্কিত হয়।

সুবালা বোঝে অবস্থাটা আশাপ্রদ নয়। মেজবৌ বোধ হয় তেমন আগ্রহ দেখায় নি। তা হতে পারে, মানুষটা তো আছে একটু উল্টো-পাল্টা! অম্বিকাকে যতই ভালবাসুক, মেয়ের সঙ্গে বয়সের তফাৎটা মনে গেঁথে রেখেছে। ঠাকুরপোর একটু অপমান বোধ হয়েছে তা হলে। বলতে কি একটু আশায় আশায়ই তো গেল তাড়াতাড়ি! বিয়ের মন হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছে সুবালা। ভাবে, যাক্‌গে—পারু না হোক গে, আমি তোড়জোড় করছি। কনের আবার অভাব? আবার ভাবে, তবে অত বয়সের মেয়ে সহসা পাওয়া যাবে না। মেজবৌ ডাকাবুকো· তাই মেয়েকে অতখানি বড় করছে বসে বসে।

কিন্তু সুবালা চট করে কিছু বলে না, আস্তে দ্যাওরের মন-মেজাজ বুঝতে বলে, 'শোনো কথা, আমি আবার কী চালালাম?'

'এইসব বাজে বাজে কথা? বিয়ে-টিয়ের কথা শুরু করলেই কিন্তু জেনে রাখবেন আমি হাওয়া!'

সুবালা ভয়ে ভয়ে বলে, 'মেজদা—বুঝি—'

'দোহাই বৌদি, আপনার ওই মেজদাটির নাম আমার সামনে করবেন না।' বসেছিল, উঠে পড়লো। পায়চারি করতে করতে বললো, 'আপনার ওই মেজদা আর মেজবৌদিকে পাশাপাশি দেখলেই মনে হয় যেন বিধাতার একটু নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গের জ্বলন্ত নমুনা!'

সুবালা অবাক গলায় বলে, 'কিসের নমুনা?'

'যাক গে, ও আপনাকে বোঝানো যাবে না। তবে আপনার পূজনীয়

মেজদার বাড়িতে ঢোকবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, এইটাই জেনে রাখুন।'

সুবালা হতভম্ব গলায় বলে, 'তবে যে বললে মেজবৌ কথা বলেছে—'

'হ্যাঁ, বলেছেন,' অম্বিকা একটা জ্বালাভরা গলায় বলে, 'রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলেছেন। আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমায় বৌদি!'

'তার মানে, মেজদা তোমায় অপমান করেছে! জেলখাটা আসামী বলে বাড়ি ঢুকতে দেয় নি।' আস্তে বলে সুবালা, 'বুঝতে পারছি আসল কথা—'

অম্বিকা সহসা স্থির হয়। সামনে সরে আসে। বলে, 'আসল কথা বোঝবার ক্ষমতা আপনার ইহজীবনেও হবে না বৌদি! আপনি এতই ভালো যে, এসব কথা আপনার মাথাতেই ঢুকবে না। শুধু বলে রাখি, যদি হঠাৎ কোনোদিন শোনেন আপনার মেজবৌদি পাগল হয়ে গেছেন, অবাক হবেন না। হয়তো শীগ্‌গিরই শুনতে হবে।...আশ্চর্য, আপনার ওই মেজদার মত একটি শয়তানের কোনো শাস্তি হয় না! না দেয় সমাজ, না দেন আপনাদের ওই ভগবান।...কিছু মনে করবেন না বৌদি, না বলে পারলাম না। বড় যন্ত্রণা হলো দেখে। ছেলেও তো দেখলাম ঠিক বাপের মতন!'

সরে গেল সামনে থেকে, পায়চারি করতে লাগলো। একটা জ্বালাভরা গলার আক্ষেপ শোনা গেল, 'এইভাবে জীবনের অপচয় ঘটে, এইভাবে এই হতভাগা দেশের কত মহৎ বস্তু ধ্বংস হয়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে একদিন সমাজকে।'

না, অম্বিকাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার সাধ আর মিটলো না সুবালার। অম্বিকা পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করতে বেরোলো। সুবালা বুঝতে পারছে, মুখে ও যতই বলুক 'এই ভারতবর্ষটাকে একবার দেখতে চাই, দেখতে চাই বাংলা দেশের মত হতভাগা দেশ আর কোথাও আছে কিনা', তবু বুঝতে পারছে সুবালা, সেসব দেখেশুনে ফিরে আর আসছে না। ছন্নছাড়া ভবঘুরেই হয়ে যাবে!

'ওর মা-বাপ থাকলে জীবনটাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতো না ও।'

অমূল্যর কাছে কেঁদে পড়ে বলেছিল সুবালা।

অমূল্যর চোখটাও লালচে হয়ে উঠেছিল।

ভারী ভারী গলায় বলেছিল, 'ওটা তোমার ভুল ধারণা! ওর মা থাকলে যে তোমার থেকে বেশি ভালবাসতে পারতো, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা তো নয়, মায়ার বাঁধন সবাইকে বাঁধতে পারে না! বুদ্ধদেবের কি মা-বাপ ছিল না? নদীয়ার নিমাইয়ের ছিল না মা, বৌ? আসলে এই জগতের অবিচার-অত্যাচার দুঃখ-দুর্দশা দেখে যাদের প্রাণ কাঁদে, তারা পাঁচজনের মতন খেয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পারে না। ঘরে তিষ্ঠোনো দায় হয় তাদের। মা-বাপও বেঁধে রাখতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রও বেঁধে রাখতে পারে না। তবু ভালই হল যে একটা পরের মেয়ে গলায় গেঁথে দেওয়া হয় নি ওর!'

'দেশ দেশ, স্বাধীন পরাধীন, এই সব করেই এইটি হলো ওর'—সুবালা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, 'এই গাঁয়েই জন্মালো, এই তোমাদের বংশেই বড় হলো, কোথা থেকে যে ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকলো, ভগবান জানেন।'

তাছাড়া আর কি বলবে সুবালা?

মানুষের জানার সীমানা ছাড়ালেই বলে 'ভগবান জানেন'। একা সুবালা

কেন, সবাই বলে। আর খুব যখন কষ্ট হয়, তখন ভগবানের বিচারের দোষ দেয়। সুবালাও দিল।

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছতে মুছতে ওই ছন্নছাড়ার যাত্রাকালে জোর করে সঙ্গে দিয়ে দিল একগাদা চিঁড়ের নাড়ু, তিলপাটালী-নারকেলের গজা! যা সব একদা অম্বিকার বড় প্রিয় ছিল।

অম্বিকা মুখে খুব উৎসাহ দেখায়। বলে, 'বাঃ বাঃ! চমৎকার! পথে পথে ঘুরবো, কোথায় কি জুটবে কে জানে, যেদিন কোথাও কিছু না জুটবে ওইগুলি বার করবো, আর আপনার জয়গান করতে করতে খাবো!'

'থাক্, আর আমার জয়গান করতে হবে না। আমার ওপর যে তোমার কত মায়া আছে তা বোঝাই গেছে।'

'বুঝে ফেলেছেন তো? বাঁচা গেল!' অম্বিকা হাসে। তারপর বলে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সব চেয়ে বড় ভক্ত বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন? এক সময় তিনি ঘুরছিলেন পথে পথে, হাতে এক কপর্দকও নেই, মনের জোর করে বললেন, "দেখি আমার চেষ্টা ছাড়াই খাদ্য আসে কিনা"! এসে গেল। আশ্চর্য উপায়ে এসে গেল! একটা মিষ্টির দোকানের দোকানী স্বপ্ন দেখলো অমুক জায়গার এক উপবাসী সাধু এসে বসে আছেন, খাওয়াগে যা তাকে চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয়। কাজেই ঠিক করেছি, তেমন অসুবিধেয় পড়লে সাধু বনে যাব!'

জোর করে টেনে টেনে হাসে।

সুবালা রেগে উঠে বলে, 'আহা, সাধু বনে যাবে! তুমিই না বল দেশের ওই গেরুয়াধারীরাই হচ্ছে সর্বনাশের গোড়া! ওরাই "জগৎ মিথ্যে" না কি বলে বলে দেশের লোকগুলোকে কুঁড়ের বাদশা করে রেখে দিয়েছে! সবাই পরকালের চিন্তাতেই ব্যস্ত, ইহকালের কথা ভাবে না!'

'বলি, বলবোও। তবে এক-একজনকে দেখলে ধারণা পাল্টে যায়। যাক্ আপনি মন খারাপ করবেন না। আমাদের ধর্মের দেশে "হরিবোল" বললেই অন্ন মেলে!'

'তাই তো, ভিক্ষে মেগেই যে খাবে তুমি,' সুবালা রেগে বলে, 'তাই ভিটে জমি সর্বস্ব বিক্কিরী করে দিলে!'

ওই, ওটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুশ্চিন্তার। যে মানুষ ভিটেমাটি বেচে চলে যায় সে কি আবার ফিরে আসে?

অথচ কটা টাকাই বা পেলো?

সুবালার যদি টাকা থাকতো, নিশ্চয় দিয়ে দিতো। বলতো, 'দেশ বেড়াবার জন্যে ভিটে বেচবে তুমি, আর তাই আমি দেখবো বসে বসে?...' কিন্তু ভগবান মেরেছেন সুবালাকে!

অমূল্য সঙ্গে গেল খানিকটা এগিয়ে দিতে।

সুবালাও এলো গরুর গাড়ির সঙ্গে যতটা যাওয়া যায়। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে লাগলো যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেকক্ষণ পরে যখন উড়ন্ত ধুলোও নিথর হয়ে গেল তখন ফিরে এল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনমনে বললো, 'বেটাছেলে, কোনো বন্ধন নেই, বিয়ে করবো না তো করবো না। ঘর ছেড়ে চলে যাবো তো চলে যাবো! ব্যস! নিন্দের কিছু নেই। পোড়া মেয়েমানুষের সকল পথ বন্ধ! আমাদের মেজবৌটা যদি বেটাছেলে হতো, সেও বোধ হয় এই রকম হতো। বিয়ে করতো না

সংসারে থাকতো না। মেয়েমানুষ, বন্দীজাত, খাঁচার মধ্যে ঝটপটানি সার!'

॥ ১৩ ॥

কিন্তু ঝটপটানি কি আছে আর?

সমস্ত ঝটপটানি থামিয়ে ফেলে একেবারে তো নিথর হয়ে গেছে সুবালার মেজবৌ। ও যেন এইবার সহসা পণ করেছে, এবার ও 'সাধারণ' হবে। যেমন সাধারণ তার আর তিনটে জা, তার ননদেরা, পাড়াপড়শী আরো সবাই।

অপ্রতিবাদে 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' মেনে নিয়ে করছে সংসার।

আর ইচ্ছা যদি প্রকাশই করে তো সেটা হবে 'সাধারণে'র ইচ্ছা। তাই সুবর্ণ তার স্বামীকে তাক লাগিয়ে দিয়ে একদিন ইচ্ছে প্রকাশ করলো, 'পারুলের জন্যে একটা পাত্র দেখো, এই শ্রাবণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর অঘ্রাণে ভানু-কানু দুজনের একসঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা—'

প্রবোধ অবাক হয়ে তাকায়।

তারপর বলে, 'ভূতের মুখে রামনাম! তোমার মুখে ছেলেমেয়ের কথা?'

সুবর্ণ হাসে, 'তা ভূতও তো পরকালের চিন্তা করে!'

তারপর হাসি রেখে বলে, 'না ঠাট্টা নয়, এবার তাড়াতাড়ি করা দরকার!'

সুবর্ণ কি ওর মা'র ওপর শোধ নিচ্ছে?

সুবর্ণ কি রাত্রির অন্ধকারে বিনিদ্র শয্যা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে উদ্দেশ করে বলে, 'ঠিক হচ্ছে তো? বল! একেই "পূর্ণতা" বলে? বেশ তাই হোক! শুধু আমার সারা জীবনের অন্তর ইতিহাসের কথা লিখব আমি বসে বসে।...লিখেছি কখনো কখনো, টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন।...আস্ত করে ভাল করে লিখবো। যারা আমার শুধু বাইরেটাই দেখেছে আর ধিক্কার দিয়েছে, আমার সেই স্মৃতি-কথার ভিতর দিয়েই তাদের—না, মুখের কথায় কখনো কাউকে কিছু বোঝাতে পারি নি আমি—আমার অভিমান, আমার আবেগ, আমার অসহিষ্ণুতা, আমার চেষ্টাকে পণ্ড করেছে। আমার খাতা-কলম এবার সহায় হোক আমার।'

কে জানে বলে কিনা, কি বলে আর না বলে।

'পাগল' মানুষটার কথা বাদ দাও। তবে দেখা গেল সুবর্ণলতার সেই গোলাপীরঙা দোতলার ছাতে বারে বারে তিনবার হোগলা ছাওয়া হল, সুবর্ণ-লতার বাড়ির কাছাকাছি ডাস্টবিনে কলাপাতা আর মাটির গেলাস খুরির সমারোহ লাগল এক এক ক্ষেপে দু-তিনদিন ধরে।

তারপর আদি অন্তকাল যা হয়ে আসছে তারই পুনরাভিনয় দেখা গেল ও-বাড়ির দরজায়।

কনকাঞ্জলির একথালা চালে আজীবনের ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করে দিয়ে মেয়ে বিদায় হলো আর এক সংসারের ভাত-কাপড়ে পুষ্ট হতে, আর জলের ধারা মাড়িয়ে এসে দুধে-আলতার পাথরে বৌ দাঁড়ালো এ সংসারের

অন্নজলে দাবি জানাতে।

দুটো দুশ্যেই অবশ্য শাঁখ বাজলো, উলু পড়লো, বরণডালা সাজানো হলো, শুধু ভিতরের সুরের পার্থক্যটুকু ধরা পড়লো সানাইয়ের সুরে। সানাইওলারা জানে কখন আবাহনের সুর বাজাতে হয়, আর কখন বিসর্জনের।

তা সুবর্ণলতা তো এবারে একটু ছুটি পেতে পারে? বৌরা সেকালের মত কচি মেয়ে নয়, ডাগর-ডোগর মেয়ে, তাই বৌরা ধুলো-পায়ে ঘরবসত করে দু মাস পরেই ঘুরে এসে শ্বশুরঘর করতে লেগেছে। পারুল চলে গেছে তার নতুন ঘরে, আর অবহেলিত বকুল কখন কোন্ ফাঁকে তার খেলাঘরের ধুলো ঝেড়ে নিঃশব্দে পারুলের জায়গায় ভর্তি হয়ে গেছে।

এখন সুবর্ণ না দেখলেও অনেক কাজ সুশৃঙ্খলে হয়ে যাচ্ছে। এখন বৌরা সব সময়েই বলছে, 'আপনি আবার কেন করতে এলেন মা, আমাদের বলুন না কি করতে হবে।'

অতএব সুবর্ণর তার খাতার পাতায় কলমের আঁকিবুকি কাটবার অবকাশ জুটেছে।

কিন্তু কোনখান থেকে শুরু হবে সেই স্মৃতিকথা? আর সেটা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসবে সুবর্ণলতার জীবনের সমাপ্তি-সমুদ্রে?...

প্রথম যেদিন মুক্তকেশীর শক্ত বেড়ার মধ্যে এসে পড়লো সুবর্ণ নামের একটা সর্বহারা বালিকা মেয়ে, সেই দিনটাই কি স্মৃতিকথার প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁই পাবে?

কিন্তু প্রতিটি দিনের ইতিহাস কি লেখা যায়? প্রতিটি অনুভূতির?

তাছাড়া—

মুক্তকেশী যে সেই ক্রন্দনাকুল মেয়েটার একটা "নড়া" ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'ঢের হয়েছে, আর ঠাট করে কাঁদতে হবে না, কান্না থামাও দিকি? মুখ-চোখের চেহারা হয়েছে দেখ না, মা তো তোমার মরে নি বাছা, এত ইয়ে কিসের?' এইটা দিয়েই শুরু করবে, না সেই যখন গিন্নীরা এদিক ওদিক সরে গেলে একটি প্রায় কাছাকাছি বয়সের বৌ পা টিপে টিপে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমি তোমার বড় জা হই, বুঝলে? তোমার শাশুড়ীর ভাসুরপো-বৌ। উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিল দেখছো, তার ওদিকটা আমাদের। আসতে দেয় না, এই বিয়ে-বাড়ির ছুতোয় আসার হুকুম মিলেছে। তা একটা পথ আছে'—বলে হদিস দিয়েছিল সিঁড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে কি ভাবে যোগাযোগ হতে পারে।

ছাদের সিঁড়ির সেই ঘুলঘুলি পর্যন্ত চোখ পোঁছত না তখন সুবর্ণর, তাই ঠিক তার নীচেটায় দুখানা ইঁট এনে পেতেছিল। তার উপর দাঁড়িয়ে চার চোখের মিলন হতো। সেই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আদানপ্রদান হতো শুধু হৃদয়ের নয়, রীতিমত সারালো বস্তুরও।

কুলের আচার, আমের মোরব্বা, মাথা তেঁতুল, কয়েৎবেল, ফুলুরি, রসবড়া অনেক কিছুই। বলা বাহুল্য নিজের ভাগের থেকে এবং প্রায়শই খেতে খেতে তুলে রাখা। সুপুরি মশলা পান পর্যন্ত।

সাবেকি বাড়ির সেই ভাঙা দেওয়ালের অন্তরালে যে বছরগুলো কাটিয়েছিল সুবর্ণ, তার মধ্যে মরুভূমিতে জলাশয়ের মত ছিল ওই সখীত্ব। আর একটু যখন বয়েস হয়েছে, তখন আদানপ্রদানের মাধ্যমটা আর কুলের আচারের

মধ্যেই সীমিত থাকে নি, ঘুলঘুলির মাঝখানের একখানা ইঁট ঠুকে ঠুকে সরিয়ে ফেলে পথটাকে প্রশস্ত করে নিয়ে সেই পথে পাচার হতো বই।

না, সুবর্ণর দিক থেকে কিছু দেবার ছিল না। ওর কাজ শুধু ফেরত দেওয়া!

যোগান দিত জয়াবতী।

মুক্তকেশীর ভাসুরপো-বৌ।

তার বর মুক্তকেশীর ছেলেদের মত নয়। সে সভ্য, মার্জিত, উদার। তার বর বৌকে বই এনে এনে পড়াতো, যাতে বৌয়ের চোখ-কান একটু ফোটে।

বলেছিল তাই জয়াবতী।

বলেছিল, 'দিনের বেলা সবাইয়ের সামনে তো পড়তে পারি না, লুকিয়ে রাত্তিরে। তুই বই পড়তে ভালবাসিস শুনে, ও তো আর একটা লাইব্রেরীতেই ভর্তি হয়ে গেছে। হেসে বলেছে, তোমাদের সেই ঘুলঘুলি-পথেই পাচার কোরো।'

জয়াবতীর বয়েস তখন তেরো-চৌদ্দ, জয়াবতীর বিয়ে হয়েছে তিন বছর, তাই বরের গল্প আছে তার। আর সেই গল্পেই তার উৎসাহ।

জয়াবতীর মুখে বরের গল্প শুনে শুনে স্পন্দিত হতো সুবর্ণ, আর ভাবতো, আশ্চর্য! এরা একই বাড়ির!

বিয়ের পর একটা বছর অবশ্য কড়াকড়িতে রাখা হয়েছিল সুবর্ণকে, বৌকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন মুক্তকেশী। বাপেরবাড়ির বালাই তো নেই, কাজেই ঘরবসতের প্রশ্নও নেই। নচেৎ একটা বছর তো সেখানেই থাকার কথা। কিন্তু এক বছর পরে যখন সুবর্ণ সেই 'পরম অধিকার' পেল?...'রাতের অধিকার'!

সুবর্ণ কি সেই পরম সৌভাগ্যকে পরম আনন্দে নিয়েছিল?

সে ইতিহাস কি লেখার?

লিখে প্রকাশ করবার?

কলম হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছে সুবর্ণ, তারপর আস্তে আস্তে কলম নামিয়ে রেখেছে।

তারপর জয়াবতীর কথা দিয়েই শুরু করেছে।

জয়াবতী বলতো, 'গোড়ায় গোড়ায় ভয় করে রে, তারপর সয়ে যায়। আর দেখ্ এ সংসারে ওই লোকটাই তো একমাত্র আপনার লোক, ওর জন্যেই তাই প্রাণটা পড়ে থাকে। দেখিস তোরও হবে।'

সুবর্ণ বলতো, 'আহা রে, তোমার বরটির মতন কিনা?'

সুবর্ণর সেই ছেলেমানুষ ভাসুরের উপর শ্রদ্ধা ছিল, ভালবাসা ছিল, সমীহ ছিল, জয়াবতীর সঙ্গে সখীত্বের সূত্রে ঠিক 'ভাসুর'ও ভাবতো না যেন, বান্ধবীর বর হিসেবেই ভাবতো!

সুবর্ণরা যতদিন সেই পুরানো বাড়িতে ছিল, জীবনের নীরেট দেওয়ালে এই একটা ঘুলঘুলি ছিল তার, কিন্তু সে ঘুলঘুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

ভাসুরপো আর দ্যাওরদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মামলাবাজি করে শেষ পর্যন্ত বাড়ির অংশের টাকা ধরে নিয়ে আলাদা বাড়ি ফাঁদলেন মুক্তকেশী।

জয়াবতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল সুবর্ণলতার।

অনেক অনেক দিন পরে আবার সে পথ খুলেছিল সুবর্ণলতা, কিন্তু তখন আর সেই আনন্দময়ী জয়াবতীর দেখা মেলে নি।

জয়াবতী তখন তার সাদা সিঁথিটার লজ্জায় মুখ তুলতো না, মুখ খুলতো না।

তবু আজীবন যোগসূত্র আছে। বাইরের না হোক হৃদয়ের।

তাই সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা শুরু হলো সেই 'ঘুলঘুলি' পথে আসা একমুঠো আলোর কাহিনী নিয়ে।

জয়াদি ঘুরে-ফিরে কেবল বরের কথা বলে। বর কি রকম দুষ্টুমি করে রাগায়, কেমন এক-এক সময় বৌয়েব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বৌকে বড়দেব বকুনি থেকে বাঁচায়, আবার জয়াদির বাপের বাড়ি যাবার কথা উঠলেই কেমন মুখভারী করে বেড়ায়, কথা বলে না, এই সব।

ওর সঙ্গে আমার কোনটাই মেলে না।

আমার 'বাপের বাড়ি' বলতে কিছু নেই। আর দোষ ঢাকা? বরং ঠিক উল্টো। মায়ের কাছে 'ভালো ছেলে' নাম নেবার তালে আমার বর কেবল আমার দোষ জাহির করে বেড়ায়। দেখে তো মা ওতেই সব থেকে সন্তুষ্ট হন।

তা বেশ, করো তাই।

মায়ের সুয়ো হও।

কিন্তু সেই মানুষই যখন আবার বৌকে আদর করতে আসে? রাগে সর্বশরীর জ্বলে যায় না? আদর! আদর না হাতি! ইচ্ছে হয় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে যাই! নয়তো চলে যাই ছাতে! ঠাণ্ডা হাওয়ায় পড়ে থাকি একলা!

উঃ, কী শান্তি, কী শান্তি!

আচ্ছা জয়াদির বরও কি এই রকম?

তাই কখনও হতে পারে? হলে জয়াদি অমন আহ্লাদে ভাসে কি করে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওর বর সভ্য ভদ্র ভালো।

হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো খাতার একটা পাতায় এইটুকু লেখা ছিল, সেই লেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল সুবর্ণ, কী বয়েস ছিল ওই মেয়েটার? অথচ সে কথা কেউ ভাবেনি। বরং শাশুড়ীর বান্ধবীরা এসে ফিসফিস করে কথা কয়েছেন, আর তারপর গালে হাত দিয়ে বলেছেন, 'ওমা তাই নাকি? বৌ তা হলে হুড়কো? তা ছেলের বিয়ে দিয়ে হলো ভাল তোমার!'

মেয়েরাই ছেলেদের শত্রু।

গৃহিণী মেয়েরা যদি এতটুকু সহানুভূতিশীল হতো, হতো এতটুকু মমতাময়ী, হয়তো সমাজের চেহারা এমন হতো না। তা হয় না, তারা ওই অত্যাচারী পুরুষসমাজের সাহায্যই করে। যে পুরুষেরা 'সমাজ-সৌধ' গঠনের কালে মেয়ে জাতটাকে ইঁট পাটকেল চুনসুরকি ছাড়া কিছু ভাবে না। হ্যাঁ, গাঁথুনির কাজে যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেই ভাবেই ব্যবহার।

বেওয়ারিশ বিধবা মেয়েগুলোর দায়দায়িত্ব কে নেয়, তাদের ভাত-কাপড়ের ভার! মারো তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে, মিটে যাক সমস্যা!

দেশে মেয়ের সংখ্যা বেশী, পুরুষের সংখ্যা কম। করুক এক-একটা পুরুষ গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে, ঘুচুক সমস্যা। হয়তো এই দেশেই আবার কালে-ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে বদলে যাবে পালা, তখন হয়তো ওই সমাজ-

পতিরাই নির্দেশ দেবে...সব মেয়ে দ্রৌপদী হও সেটাই মহাপুণ্য।

একদা বাল্যবিবাহের প্রয়োজন ছিল, তাই মেয়ের বাপের কাছে প্রলোভন বিছোনো ছিল, কন্যাদান করে নাকি তারা পৃথিবীদানের ফল পাবে, পাবে গৌরীদানের।...বিপরীত চোদ্দপুরুষ নরকস্থ!

অর্থসমস্যা আর অন্নসমস্যার চাপে কন্যাদানের পুণ্যলাভের স্পৃহা মুছে আসছে সমাজের। অতএব এখন আর চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হচ্ছে না। হয়তো বা এমন দিন আসবে যেদিন এই সমাজই বলবে, 'বাল্যবিবাহ কদাচার, বাল্যবিবাহ মহাপাপ।'

কোথায় কোন্ দেশে নাকি খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে মেয়ে জন্মালেই তাকে মেরে ফেলে, পাছে তারা দেশে মানুষ বাড়ায়। আবার এদেশে বাঁজা হওয়া এক মস্ত অপরাধ, 'শতপুত্রের জননী' হতে উৎসাহ দেওয়া হয় মেয়েদের। কে জানে আবার পালাবদল হলে এই দেশেই বলবে কিনা 'বহুপুত্রবতীকে ফাঁসিতে লটকাও!'

মেয়েদের নিয়েই যত ভাঙচুর।

অথচ এমন কথার কৌশল চতুর পুরুষজাতটার যে, মেয়েগুলো ভাববে, 'এই ঠিক ধর্ম! এতেই আমার ইহ-পরকালের উন্নতি'!

পতি পরম গুরু!

স্বামীর বাড়া দেবতা নেই!

ধোঁকাবাজি! ধাপ্পাবাজি!

কিন্তু কতকাল আর চলবে এসব? চোখ কি ফুটবে না মেয়েমানুষের?

কে জানে, হয়তো ফুটবে না! অথবা ফুটলে ওই চতুর জাতটা নতুন আর এক চালের আশ্রয় নেবে। হয়তো 'দেহিপদপল্লবমুদারমে'র বাণী শুনিয়ে শুনিয়েই মেয়েদের ওই ঘানিগাছেই ঘুরিয়ে নেবে!

বোকা, বোকা, নীরেট বোকা এই জাতটা, তাই টের পায় না, অহরহ তাকে নিয়ে কী ভাঙচুর চলছে!

ভাবছে, আহা আমি কী মূল্যবান। আমায় ভালবাসছে, আমায় পূজো করছে, আমায় সাজাচ্ছে।

আমার দেহটা যে ওর সোনা মজুতের সিন্দুক তা ভাবি না, আমার সাজসজ্জা যে ওর ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন তা খেয়াল করি না, আমি গহনা-কাপড়ে লুব্ধ হই, ভালবাসার প্রকাশে মোহিত হই। ছি ছি! সাধে বলছি একের নম্বরের বোকা!

॥ ১৪ ॥

গিরি তাঁতিনী এসেছে তাঁতের শাড়ির বোঁচকা নিয়ে। 'ভালো ভালো সিমলে ফরাসডাঙার শাড়ি নিয়ে গেরস্তর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো কাজ গিরির। উত্তর কলকাতা থেকে মধ্য কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র তার অবাধ গতি। সকলের অন্তঃপুরের খবর তার জানা।

দর্জিপাড়ার অনেক বাড়িতেই তার যাতায়াত। মুক্তকেশীর সংসারেও শাড়ি যুগিয়ে এসেছে বরাবর—বিয়েথাওয়ায়, পুজোয়। গিরি যে বাজারের থেকে দাম বেশি নেয় সে কথা সকলের জানা, মুক্তকেশী তো মুখের উপরেই বলেন, 'গলায় ছুরি দিচ্ছিস যে গিরি? কাপড়খানা বড্ড পছন্দ হয়েছে বুঝেই বুঝি মোচড় দিচ্ছিস!' তবু সেই বেশি দামেই নেনও। কারণ আরও এক কারণে সর্বত্রই গিরির প্রশ্রয় আছে।

আরও একটা ব্যবসা আছে গিরির।

সেটা হচ্ছে ঘটকীগিরি!

কাপড় যোগানোর সূত্রে গিরি বহু সংসারের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখে বলেই কাজটা তার পক্ষে সহজ।

তবে ইদানীং যেন সে ব্যবসায় কিছু কিঞ্চিৎ ঢিমে পড়েছে।

ঘটকী দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করতে কেউ আর তেমন গা করে না। সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, নিজেরাই চেনাজানার সূত্র ধরে কিংবা কাজকর্মের বাড়িতে দেখাশোনার সুযোগ ধরে বিয়ের সম্বন্ধ গড়ে ফেলে, কারণ ঘটকীরা নাকি মিছে কথা কয়।

শোনো কথা!

মিছে কথা নইলে বিয়ে হয়?

হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত, কানাকে পদ্মলোচন, 'অদ্যোভক্ষ্য'কে শাঁসালো, আর আবলুশ কাঠকে চাঁপাফুল বলতে না পারলে আবার ঘটকালির মাহাত্ম্য কি?

কথায় বলে 'লাখ কথা' নইলে বিয়ে হয় না। তা সেই লাখ কথায় দশ-বিশ হাজার অন্তত মিছে কথা থাকবে না? যা সত্যি তাই যদি বলে, তা হলে ঘটক বিদায়টা কি মুখ দেখে দেবে লোকে? কিন্তু লোকে যেন আর বুঝছে না সে কথা! কাজেই গিরির দ্বিতীয় ব্যবসা কিছু ঢিমে!

ঢিমে পড়েছে, তবু শাড়ির বস্তা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে দোক্তার কৌটো খুলতে খুলতে গিরি বলে, 'সেজবৌদিদি ছেলের বিয়ে দেবে না নাকি গো? তোমার বড় খোকার বয়েসে যে সেজবাবু দু ছেলের বাপ হয়েছিল গো!'

নামে নামে মিল আছে বলে গিরিবালার সঙ্গে গিরি তাঁতিনীর যেন রঙ্গরস বেশি।

তাছাড়া ইচ্ছেমত দু-পাঁচখানা শাড়ি কিনে ফেলার ক্ষমতা গিরিবালার যেমন আছে, ছোটবৌ বিন্দুর তেমন নেই, তাই গিরিবালার ঘরের সামনেই তাঁতিনী গিরির পা ছড়িয়ে বসার জায়গা।

বিন্দু যে এক-আধখানা নেয় না তা নয়, তবে সেও তো সেই 'বাকিতে'।

গিরিবালার অনেকটাই নগদ।

অতএব গিরি তাঁতিনীর রসের কথা এখানেই ঢেউ তোলে বেশি।

সেজবাবুর অতীত ইতিহাস তোলার সঙ্গে এমন একটি মুখভঙ্গী করে গিরি, যা নাকি নিতান্তই অর্থবহ।

গিরিবালাও তেমনি একটি অর্থবহ কটাক্ষ করে বলে, 'ওতে তো আর পয়সা লাগে না লো, হলেই হলো। একালে দিনকাল খারাপ, বৌ এসে কি খাবে সেটা আগে চিন্তা করতে হবে।'

'ত হবে বৈকি!' গিরি একটিপ্ দোক্তা মুখে ফেলে বলে, 'বৌয়ের শাউড়ী যখন সব্বস্ব গ্রাস করে রেখেছে! তা তুমি বুঝি মেজবৌদিদির পাঠশালে পড়েছ? তিনিও তো ওই কথা বলে বলে এই অবধি ছেলে দুটোর বে তুলে রেখেছিল। কী সুমতি হলো, জোড়া বেটার বে দিল।'

গিরিবালা সহাস্যে বলে, 'ঘটকী বিদেয় মোটা পেয়েছো তো?'

গিরির ঘটকালিতে অবশ্য বিয়ে হয়নি, তবু বিয়ের বখশিশ বাবদ বেশ কিছু বাগিয়েছে গিরি, তাই সেও সহাস্যে বলে, 'তা হক কথা বলবো বাপু, মেজগিন্নীর হাতখানি দরাজ আছে।'

গিরিবালা সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে ওঠে, 'তা বোঁচকার গিঁট খোলো! দেখি কি এনেছ! নতুন ধরনের কিছু আছে?'

গিরি কবে নতুন ছাড়া পুরনো মাল এনে ঢুকেছে গো—', বলে সগর্ব ভঙ্গীতে বোঁচকা খোলে গিরি।

মুক্তকেশীর আমলে মোটা তাঁতের শাড়ির চাহিদাই বেশি ছিল, এখন সিমলে শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার চাহিদা।

কিন্তু মুক্তকেশী?

তিনি গত হয়েছেন? তাই তাঁর আমলও বিগত?

না, দেহগত হিসাবে গত হননি অবশ্য মুক্তকেশী, তবে তাঁর আমলটা যে একেবারেই গত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাস্তি।

গিরি ঢুকেই একবার চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'বুড়ী কোথায়?'

গিরিবালা ভ্রূভঙ্গীর সাহায্যে উত্তর দিয়েছিল, 'আছেন নিজের কোটরে।'

বোঁচকার গিঁট খোলে গিরি, কিন্তু আবরণ উন্মোচন সহজে করে না। তাতে সস্তা হয়ে যেতে হয়।

হাই তুলে বলে, 'এক ঘটি জল খাওয়াও দিকি আগে। রোদে এসে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠে দালানের কুঁজো থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দেয়।

গিরি এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে আঁচল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'বড়মানুষ হয়ে সেজবৌদিদি কেপ্পন হয়ে গেছে। আমাকে জল দিয়ে পান দিতে হয় তা আর মনে নেই!'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি মেয়েকে ডেকে পানের আদেশ দেয়, গিরি ধীরে-সুস্থে বোঁচকা খোলে।

নয়নমনোহর শাড়ির গোছা—কল্কাপাড়, তাবিজপাড়, রেলপাড়, এলোকেশী পাড়, সিঁথের সিঁদুরপাড়, পতিসোহাগপাড়, বসন্তবাহারপাড়।

সাদা ছাড়া রঙিনের দিকেও আছে—কালাপানি, বৌপাগলা, ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠী। শুধু লাল আর কালো সুতোর টানাপোড়েনেই নানান বর্ণের বাহার।

দাম বেশি দিয়েও এসব শাড়ি নিতে হয়। দোকান থেকে কেনা মানেই তো পুরুষের পছন্দর ওপর নির্ভর, আর সে পছন্দ যে কেমন তা তো মেয়েমানুষেরা হাড়ে হাড়ে জানে। তার ওপর ফেরা-ঘোরার কথা বললেই মারমুখী হয়ে ওঠেন বাবুরা। তা ছাড়া গিরি বাকিতে দেয় বলে লুকিয়েও কেনা যায় এক-আধখানা। এসব কি কম সুবিধে? পরমুখাপেক্ষী জাতের জ্বালা যে কত দিকে!

তা গিরি এসব খুব বোঝে, তাই জায়গা বুঝে মোচড় দেয়, জায়গা বুঝে উদারতা দেখায়।

ও খদ্দেরের কাছে অনায়াসে বলে, 'ও কাপড়ের দাম তোমায় দিতে হবে না দিদিমণি, আমি তোমায় এমনি দিলাম।' বলে, 'বৌদিদির ফরসা রঙে জেল্লা যা খুলবে, এ কাপড় তোমায় একখানা না পরাতে পেলে আমার জেবনই মিথ্যে। দামের কথা ভেবো না বৌদিদি, তোমার শাউড়ীকে বোলো, গিরি আমায় অমনি দিয়ে গেছে।'...এইভাবেই গছায় সে।

গিরিবালা প্রসন্নমুখে বলে, 'কাপড় তো বেশ এনেছো, এখন দর করো দিকি?'

'দর! তোমার সঙ্গে আবার দরাদরি কি গো সেজবৌদিদি, আজ নতুন হলে নাকি?'

'না না ঠাকুরঝি, তুমি আমায় একটু আশ্বাস দাও। পছন্দ করতে ভরসা পাই।'

'শোনো কথা! তোমার আবার নির্ভরসা!' গিরি অবহেলায় বলে, 'বড়মানুষের গিন্নী, ট্যাকার গোছা ফেলো, কাপড়ের গোছা পছন্দ করো! সাতহাতি আট-হাতি সব রকমই আছে, খুকীদের জন্যে নাও দিকি দু-পাঁচখানা। কই গো খুকীরা—'

গিরিবালা তথাপি কাপড় নাড়তে নাড়তে দাম জিজ্ঞেস করে, এবং জবাব পাবার পর অপ্রসন্ন গলায় বলে, 'দেবে না তাই বল! দেবার ইচ্ছে থাকলে এমন দর হাঁকতে না! বলি ও বাড়ির তিন-তিনটে বিয়েতে তো বিস্তর লাভ করেছ। সে হল বড়মানুষের ব্যাপার, এই গরিবের সঙ্গে একটু দয়া-ধর্ম করে কাজ করো না!'

গিরি দরাজ গলায় বলে, 'তা মিথ্যে বলবো না, অনেক কাপড়-চোপড় নিয়েছে মেজবৌদিদি, তবে মানুষটার প্রাণে যেন সুখ নেই!'

গিরিবালা ভিতরের কথার আশায় গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলে, 'ওমা যাঁর এত সুখ সম্পত্তি, তাঁর আবার সুখের অভাব!'

গিরি বলে, 'তা একো একো মানুষের অকারণ দুঃখ ডেকে আনা রোগ যে। মেজবৌদিদির তো সে রোগ আছেই। তাছাড়া মনে হলো বৌরা সুবিধের হয়নি—'

গিরিবালা যেন জানে না, কথা সৃষ্টি করার এই লীলাই গিরি তাঁতিনীর পদ্ধতি, অথবা কারো ঘরে বৌ 'সুবিধে'র না হওয়াটা যেন অসম্ভব ঘটনা, তাই যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'ওমা সে কি কথা! তবে যে শুনলাম খুব ভালো বৌ হয়েছে!'

'ওগো দেখতেই ভালো। ওপর ভালো, ভেতর কালো। তা নইলে ঘরণী গিন্নী দস্যি মাগী এক্ষুণি বৌদের হাতে সংসার ছেড়ে দেয়!'

'ওমা বল কি? তাই বুঝি?'

'তাই তো—', গিরি দুই হাত উল্টে বলে, 'তবে আর বলছি কি! মাগী নাকি এখন রাতদিন খাতা-কলম নিয়ে সেরেস্তার মতন নেখা নিখছে।'

'তা এসব কথা বললে কে তোমাকে?'

'কে আর! মেজদাদাবাবুই রাস্তায় এল সঙ্গে সঙ্গে, নানান দুঃখের গাথা গাইল। বৌরা শ্বশুর বলে তেমন মান্যিমান করছে না, শাউড়ীকে দেখে না, আরো একটা মেয়ে ডাগর হয়ে উঠলো, এই সব!'

কথা ক্রমশই গভীর হয়ে আসে, গিরিবালা ইত্যবসরে খানতিনেক শাড়ি পছন্দ করে ফেলে এবং বাকির প্রশ্নও ওঠে না। তবে ও-বাড়ির মেজবৌদিদির কাছেও যে ধারে কারবার করতে হয় না, সেই হুলটুকু ফুটিয়ে বোঁচকা গোটায় গিরি।

এই সময় ঘর থেকে মুক্তকেশীর ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'গিরি এসেছিস নাকি? অ গিরি!...সেই থেকে গলা পাচ্ছি মনে হচ্ছে, এদিকপানে উঁকিও দিচ্ছিস না দেখছি!'

'ওই হলো জ্বালা'—গিরি খাদের গলায় বিরক্তিটা প্রকাশ করে গলা তোলে, 'এই যাই গো খুড়ি, এখানে সেজবৌদিদি কাপড় কিনলো পাঁচখানা, তাই—'

'পাঁচখানা! পাঁচখানা কাপড় কিনলো সেজবৌমা! তা কিনবে বৈকি! সোয়ামীর পয়সা হয়েছে—'

'মরণ বুড়ী!' বলে গিরি ও-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আর তৎক্ষণাৎ তার কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়, 'কী সব্বোনাশ, এ কী হাল হয়েছে তোমার খুড়ি! এ্যাঁ, এ যে মড়িপোড়ার ঘাটে যাবার চ্যাহারা! বলি কবরেজ বদ্যি দেখাচ্ছে বেটা বেটার বৌ?'

এই।

এই হচ্ছে গিরির নিজস্ব ভঙ্গী। আর তাই সবাই গিরিকে ভয় করে।

গিরি যে অন্তঃপুরের বার্তা রাখে। তার বাড়া ভয়ঙ্কর আর কি আছে?

মুক্তকেশীর ছেলে, ছেলের বৌরা যে দেখছে না, এ খবর রটিয়ে বেড়াবে না সে? তাই গিরিবালাও তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর ঘরে এসে ঢোকে।

মুক্তকেশী নীচু গলায় কিছু একটা বলছিলেন, বৌকে ঢুকতে দেখে বেজার মুখে চুপ করেন। শুধু চোখের ইশারায় কি যেন বুঝিয়ে বিদায় সম্ভাষণ করেন।

তা গিরি তাঁতিনী ইশারার মান রাখে।

পরদিনই এ বাড়িতে এসে হাজির হয়।

এবং সাড়ম্বরে ঘোষণা করে, 'কাপড় গছাতে আসিনি গো মেজবৌদিদি, এসেছি একটা বাত্রা নিয়ে।'

সুবর্ণলতা বেরিয়ে আসে, প্রশ্ন করে না, শুধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

গিরি বলে ওঠে, 'বলি বুড়ী শাউড়ীর খবর নাওনি কতদিন?'

' সুবর্ণ অবাক গলায় বলে, 'কেন? ইনি তো মাঝে মাঝেই—'

'হ্যাঁ, তা শুনলাম।' গিরি টিপে টিপে বলে, 'মেজদাদাবাবু পেরায় পেরায় যায়! তবে বেটাছেলের চোখ কি তেমন টের পায়! বুড়ীর তো দেখলাম শেষ অবস্থা।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি, রক্ত অতিসার।' গিরি যেন যুদ্ধজয়ের ভঙ্গী নেয়, 'ও আর বেশিদিন নয়। আর মরতে তো একদিন হবে গো! চেরকাল কি থাকবে? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, কোন্ না চার কুড়ি পেরিয়েছে। তা আমায় মিনতি করে বললে, মেজবৌমাকে একবার আসতে বলিস গিরি, আর আসবার সময় লুকিয়ে পাকা দেখে দুটো কাশীর প্যায়রা আনতে বলিস।'

'পেয়ারা!' সুবর্ণ বলে, 'রক্ত-অতিসার বললে না?'

'আরে বাবা, হলো তো বয়েই গেল। বলি খাওয়ায় সাবধান করে শাউড়ীকে আরো বাঁচিয়ে রাখতে সাধ! না তাই পারবে? মহাপ্রাণীর খেতে ইচ্ছে হয়েছে, দেওয়াই দরকার। বাঁচবার হলে ওতেই বেঁচে থাকবে।'

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকায়।

সুবর্ণ ভাবে, এরা কত সহজে সমস্যার সমাধান করে ফেলতে সক্ষম! রাখে কেষ্ট আর মারে কেষ্টর ভথ্যে এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

সুবর্ণর ভাবার অবসরে গিরি আর একবার বলে, 'তা প্যায়রা নে যাও আর না যাও, যেও একবার! বুড়ী "মেজবৌমা মেজবৌমা" করে হামলাচ্ছে!'

'যাবো, কালই যাবো।'

গিরি হৃষ্টচিত্তে বলে, 'অবিশ্যি আজই একটা কিছু ঘটে যাবে তা বলছি না। তবে এযাত্রা যে আর উঠবে না বুড়ী, তা মালুম হচ্ছে।'

গিরি চলে যায়, সুবর্ণ কেমন অপরাধীর মত বসে থাকে। বাস্তবিক, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বহুদিন যাওয়া হয়নি বটে। সেই কতদিন যেন আগে নিজেই এসেছিলেন মুক্তকেশী, সেই শেষ দেখা।

মেজবৌমাকে দেখতে চেয়েছেন মুক্তকেশী আর সে খবর জানিয়েছেন। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে!

মুক্তকেশী সুবর্ণলতার প্রতিপক্ষ।

মুক্তকেশী সুবর্ণলতাকে বহুবিধ যন্ত্রণার স্বাদ যুগিয়ে এসেছেন চিরদিন, তবু মুক্তকেশী সুবর্ণকে দেখতে চেয়েছেন শুনে যেন মনটা বিষণ্ণ বেদনাবিধুর হয়ে উঠলো।

হয়তো ব্যাপারটা হাস্যকর, তবু নির্ভেজাল।

শত্রু যদি শক্তিমান হয়, তার জন্যেও বুঝি মনের কোনোখানে একটা বড় ঠাঁই থাকে। রাবণের মৃত্যুকালে রামের মনস্তত্ত্ব এ সাক্ষ্য দেয়।

বহুকাল হলো এ বাড়িতে আসেনি সুবর্ণ।

আগে মাঝে মাঝে ভাসুরঝি-দ্যাওরঝিদের বিয়ে উপলক্ষে আসা হতো, ইদানীং যেন বিয়ের হুল্লোড়টাও কমে গেছে। তাই আর হয় না।

কিন্তু এসে যে মুক্তকেশীকে সত্যিই একেবারে মৃত্যুশয্যায় দেখতে হবে একথা কে ভেবেছিল? সংবাদদাত্রী তো আশ্বাস দিয়েছিলো—'আজ-কালই আর কিছু হচ্ছে না!'

কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রেই নাকি অকস্মাৎ কেমন বিকল হয়ে গেছেন মুক্তকেশী। মুখ দিয়ে ফেনা কাটছিল, গোঁ গোঁ শব্দ শুনে মল্লিকা তাড়াতাড়ি সবাইকে ডেকেছে। রাত্রে তার হেপাজতেই তো থাকেন মুক্তকেশী।

ডাক শুনে সবাই এসেছে, ছেলেরা শত-সহস্রবার 'মা মা' ডাক দিয়েছে, মুক্তকেশী শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছেন, সাড়া দিতে পারেননি। সকাল হয়েছে, দুপুর গড়ালো, একই অবস্থা। কবরেজ এসে দরাজ গলায় সুবোধকে বলে গেছেন, 'আর কি, এবার কোমরে গামছা বাঁধুন।'

সুবর্ণ এসব জানতো না, সুবর্ণ এমনিই এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে গলিটুকু হেঁটে আসতেই হাঁপাচ্ছিল সুবর্ণ। এসে বসতেই বিরাজ চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, 'ওমা এ কী, তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন মেজবৌ?'

সুবর্ণলতা হাঁপ ছেড়ে ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মা কেমন আছেন?'

'আর থাকাথাকি—', বিরাজ আবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, 'কবরেজ তো বলে গেল রাত কাটে কিনা!'

'তা আমাদের ওখানে তো একটা খবরও—'

হঠাৎ গলাটা বুজে এল সুবর্ণর।

চুপ করে গেল।

ঘরে যারা ছিল তারা কি একবার ভাবল না, 'মাছের মায়ের পুত্রশোক!' অথবা 'মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে—'

তা ভাবলে অসঙ্গতও হবে না।

তবে মুখে কেউ কিছু বলে না।

বিরাজই আবার বলে, 'দিত খবর, আমায় তো দিয়েছে! কিন্তু মার না হয় যাবার বয়েস, চার ছেলের কাঁধে চড়ে চলে যাবেন, বলি তোমারও যে যাবার দাখিল চেহারা! অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, অসুখ আর কি!'

বলে সুবর্ণ এগিয়ে যায় মুক্তকেশীর দিকে। খুব ধীরে বলে, 'মা আমায় ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

এই সময় হেমাঙ্গিনী এসে ঢুকলেন থরথর করতে করতে, চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মুক্ত চললি? আমায় ফেলে রেখে চলে যাবি?'

মুক্তকেশী ফ্যালফেলিয়ে তাকালেন।

হেমাঙ্গিনীর কান্নায় উপস্থিত সকলেরও যেন কান্না উথলে এল।

এসময় শ্যামাসুন্দরীও এলেন একটি পিতলের ঘটি হাতে। খুব কাছে এসে বললেন, 'চন্নামেত্তর খাও ঠাকুরঝি। মা কালীর চন্নামেত্তর।'

বোঝা গেল সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে, শুধু প্রবোধচন্দ্র বাদে।

সুবর্ণলতা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।

বোধ করি মনকে মানাতে চেষ্টা করে, এ অবহেলা তার প্রাপ্য পাওনা।

* * *

মুক্তকেশীর ভিতরের জ্ঞান লুপ্ত হয়নি। চোখের ইশারায় বোঝালেন বুঝতে পেরেছেন, হাঁ করবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

সুবর্ণ আর একবার কাছে ঝুঁকে বললো, 'মা, আমায় কেন ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে আবার দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চেয়ে রইলেন সুবর্ণলতার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুললেন, সুবর্ণলতার মাথা অবধি উঠল না হাতটা, স্খলিত হয়ে পড়ে গেল তারই কোলের ওপর...চোখটা বুজে গেল।

উনআশী বছরের তীক্ষ্ম তীব্র খোলা চোখ দুটো চিরদিনের জন্যে ছুটি পেলো।

কিন্তু ছুটি নেবার আগে কোন্ কথা জানিয়ে গেল তারা?

আশীর্বাদ! ক্ষমাপ্রার্থনা!

॥ ১৫ ॥

'বৃষোৎসর্গ!' সুবোধচন্দ্র হাসলেন, 'অত বড় ফর্দ করে বসবেন না ভটচায মশাই। তেমন রেস্তওলা যজমান যে আপনার আমি নই, সে কথা আপনিও ভালই জানেন। আমার ওই ষোড়শ পর্যন্তই, ব্যস।'

ভটচায ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, 'বহু প্রাচীন হয়েছিলেন তিনি, চারকুড়ির কাছে বয়েস হয়েছিল, তাই বলা। তাছাড়া তুমি তেমন উপায়ী না হলেও তাঁর আরও তিনি ছেলে রয়েছে রোজগারী, নাতিরাও সব কৃতী হয়ে উঠেছে—'

সুবোধচন্দ্র বাধা দিলেন, 'ওর সবই আমি জানি ভটচায মশাই, তবু আমার যা ক্ষমতা, আমি সেই মতই চলবো।'

'তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রাদ্ধাধিকারী—'

'সে নিয়মকানুন তো সবই পালন করছি—'

'তা জানি, তোমার নিষ্ঠাকাষ্ঠা সবই শুনলাম তোমার কন্যার কাছে। এযুগে এতটা আবার সবাই পারে না।'

'ওকথা থাক্ ভটচায মশাই, আপনি ওই একটা ষোড়শের ফর্দ দিন।'

'একটা?' ভটচায আহত গলায় বলে ওঠেন, 'চার ভাই চারটে ষোড়শও করবে না? আর নাতিরা এক-একটা ভুজ্যি—'

'আমি আমার কথাই বলছি ভটচায মশাই, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন তাই আশ্চর্য!'

ভটচায তবু নাছোড়বান্দা গলায় বলেন, 'জানি তোমাদের হাঁড়ি ভিন্ন, তৎসত্ত্বেও মাতৃশ্রাদ্ধের সময় একত্র হয়ে করাই শাস্ত্রীয় বিধি। যার যা সাধ্য, তুমি বড় তোমার হাতে তুলে দেবে, তুমি সৌষ্ঠব করে—'

সুবোধচন্দ্র এবার হেসে ওঠেন।

হেসেই বলেন, 'শাস্ত্রীয় বিধিটাই জানেন ভটচায মশাই, আর একথা জানেন না, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"! কেন আর বৃথা সময় নষ্ট করছেন? আমার ফর্দটা ঠিক করে দিন, সময় থাকতে—'

ভটচায বিদায় নিলে সুবল এসে দাঁড়ায়।

বলে, 'জ্যাঠামশাই, মা একটা কথা বলছেন।'

'মা!'

সুবোধচন্দ্র একটু নড়েচড়ে বসলেন। সুবলের মার আবার বক্তব্য কি!

'ঘাটকামান' না হওয়া পর্যন্ত প্রবোধকে আর সুবর্ণলতাকে এ বাড়িতেই থাকতে হয়েছে, পাড়া-প্রতিবেশী জ্ঞাতিগোত্রের এই নির্দেশ।

তাই বকুলকে নিয়ে এ বাড়িতেই রয়েছে সুবর্ণ, ছেলেরা যাওয়া-আসা করছে। এদিকে তো চাঁপা এসেই গেছে, চন্নন পারুল ওরাও আসবে শ্রাদ্ধের দিন।

সে যাক্, ওসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুবোধ নেই। সুবর্ণ যে রয়েছে এ বাড়িতে, তাও ঠিকমত জানে কিনা সন্দেহ। কাজেই "মা আপনাকে একটা কথা বলবেন" শুনে সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'কি কথা!'

সুবল মাঝখানে শিখণ্ডিস্বরূপ থাকলেও সুবর্ণলতার কণ্ঠটাই স্পষ্ট শোনা গেল, 'মার চার ছেলে বর্তমান, নাতিরাও অনেকেই কৃতী হয়ে উঠেছে, মার তো বৃষোৎসর্গ হওয়াই উচিত।'

সুবোধচন্দ্র অবশ্য তাঁদের বাড়ির মেজবৌকে কোনদিনই লজ্জাশীলা মনে করেন না, কাজেই এই স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে খুব একটা অবাক হন না। তবে বোধ করি একটু বিচলিত হন। গম্ভীর গলায় আস্তে বলেন, 'উচিত সে কথা জানি মেজবৌমা, কিন্তু ক্ষমতা বুঝে কথা। আমার ক্ষমতা কম।'

এবারে সুবলের মাধ্যমেই কথা হয়, 'মা বলছেন, তা হোক আপনি এগোন, আপনার পেছনে সবাই আছে।'

'আমার পিছনে—', সুবোধচন্দ্রের গলাটা যেন কাঁপা-কাঁপা আর ভাঙা-ভাঙা শোনায়, 'আমার পিছনে কেউ নেই সুবল, শুধু সামনে ভগবান আছেন, এইটুকু তোর মাকে বলে দে বাবা। গতকাল এসব আলোচনা হয়ে গেছে, আমার তিন ভাই-ই সাফ জবাব দিয়ে গেছে, তিরিশ টাকা করে দেবে, তার বেশি দিতে পারবে না। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। কাজেই ও নিয়ে আর—তোর মাকে বাড়ির মধ্যে যেতে বল সুবল।'

এটা অবশ্যই বাক্যে যবনিকা পাতের ইশারা।

তত্রাচ সুবর্ণলতা যবনিকা পাত করতে দেয় না।

হয়তো প্রবোধের এই নীচতার খবরে এখনো নতুন করে বিস্ময়বোধ করে, তাই কথা বলতে একটু সময় যায়, আর বলে যখন তখন গলার স্বরটা প্রায় বুজে আসার মত লাগে, তবু বলে, 'সুবল, বল—জ্যাঠামশাই, মার একটা মিনতি রাখতেই হবে।'

মিনতি!

রাখতেই হবে!

সুবোধচন্দ্র বিব্রত বোধ করেন।

চিরকেলে পাগলা মানুষটা কি-না-কি আবদার করে বসে!

কে জানে কি সঙ্কল্প নিয়ে এমন তোড়জোড় করে তাঁর দরবারে এসে হাজির হয়েছে! মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য এসব চিন্তা খেলে যায়। পরমুহূর্তে সুবোধের কণ্ঠ থেকে প্রায় হাসির সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'রাখতেই হবে! তোর মা'র যে এটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেবার মত ইচ্ছে রে সুবল! কি বল্, শুনি?'

'মা নিজেই বলছেন—'

বলে সুবল সরে দাঁড়ায়।

গুণ্ঠনবতী সুবর্ণলতা তার পাশ দিয়ে এসে দাঁড়ায়, আর ছেলেকে এবং ভাসুরকে প্রায় তাজ্জব করে দিয়ে মৃদু চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'সুবল, তুই একটু অন্যত্র যা তো বাবা—'

সুবল তুই অন্যত্র যা!

তার মানে ভাসুরের সঙ্গে একা নির্জনে কথা বলতে চায়!

এর চাইতে অসম্ভব অসমসাহসিকতা আর কি হতে পারে?

সুবোধচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কি যেন বলতে যান। সুবল চলে যায় আস্তে আস্তে, আর সুবর্ণ এগিয়ে এসে ভাসুরের পায়ের কাছে কিছু জিনিস ফেলে দিয়ে মৃদু দৃঢ়স্বরে বলে, 'এগুলো নিতে হবে আপনাকে এই মিনতি। আপনার নিজের বলে মনে করে বেচে দিয়ে ইচ্ছেমত ভাবে খরচ করে মা'র কাজ করুন।'

সুবোধ যেন সাপের ছোবল খেয়েছেন।

সুবোধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'এ তো মিনতি নয় মেজবৌমা, হুকুম। কিন্তু সে হুকুম পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই মা। তুমি আমায় মাপ কর।'

গলার মোটা হেলে হার!

হাতের চুড়ির গোছা!

সুবর্ণ সেই বস্তুগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বলে, 'এ তো শুনেছি স্ত্রীধন, এতে নাকি স্বামী-পুত্তুরের কোনো দাবি থাকে না। তবে আপত্তি কিসের?'

সুবোধ এবার আরো ভারী গলায় বলেন, 'এ তুমি কি বলছো মেজবৌমা! তোমার গায়ের গয়না বেচে মাতৃশ্রাদ্ধ করবো আমি? গরীব বলে কি—'

মেজবৌমা মৃদুস্বরে বলে, 'মায়ের কাজে ত্রুটি থেকে যাবে, আর মায়ের বৌরা গায়ে সোনাদানা চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে, এটাও তো অনিয়ম!'

অনিয়ম!

সুবোধচন্দ্র যেন একটু চমকান, তারপর একটু হেসে বলেন, 'অনিয়ম তো জগৎ জুড়ে মা, চন্দ্র-সূর্যের নিয়মটা আছে বলেই আজো পৃথিবীটা টিকে আছে। কিন্তু সেকথা থাক, তুমি এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও মা। তুমি যে দিতে এসেছিলে, এতেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হয়ে গেছে।'

'তাঁর হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও তো তৃপ্তি শান্তি হওয়া চাই। আপনার পায়ে পড়ছি, এটুকু আপনাকে করতেই হবে। মনে করুন এ টাকা আপনার, তা হলেই তো সব চিন্তা মুছে যাবে। মার কুপুত্র ছেলেরা টাকা হাতে থাকতেও "নেই" বলেছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও তো দরকার। আমি যাচ্ছি, এ আর আপনি অমত করবেন না। যদি অমত করেন, যদি না নেন, তাহলে বুঝবো আমি "পতিত" তাই—', গলার স্বরটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সুবর্ণর। 'আমি যাই' বলে নীচু হয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে একটি প্রণাম রেখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় সুবর্ণ, সুবোধকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে।

সুবোধ হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

সুবোধ এখন এই সোনার তালগুলোকে নিয়ে কি করবেন?

তা শেষ পর্যন্ত সেগুলো নিলেন সুবোধচন্দ্র।

সুবর্ণলতার ওই 'রুদ্ধকণ্ঠ' হয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে তিনি একটা পরম সত্য উপলব্ধি করলেন যেন।

সেই সত্য সব দ্বিধা মুছে দিল বুঝি।

সমারোহ করেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হলো মুক্তকেশীর।

কে জানে তাঁর আত্মা সত্যই পরিতৃপ্ত হলো কিনা! তবু সুবোধ মনে করলেন 'হলো'। সুবোধের মুখে রইল সেই পরিতৃপ্তির ছাপ।

যদিও আড়ালে আবডালে সবাই বলাবলি করতে লাগলো, সুবোধ কি রকম 'ভেতর চাপা'! এই যে খরচটি করলো, টাকা তোলা ছিল বলেই তো! অথচ কেউ বুঝতে পেরেছে?

সে কথা প্রবোধ এসেও মহোৎসাহে বলে, 'দেখলে তো? চিরকাল দেখিয়ে এসেছেন যেন হাতে কিছু নেই!'

সুবর্ণ একবার স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশ তো, হাতের টাকা তো মন্দ কাজে ব্যয় করেন নি, সদ্ব্যয়ই করেছেন! তা তোমার তো হাতে টাকার অভাব নেই, তুমি একটা সৎকাজ কর না? তোমার মায়ের একটা ইচ্ছে পালন কর না? অনেক কাঙালী খাওয়াও না? মার খুব ইচ্ছে ছিল।'

প্রবোধ সচকিত হয়ে বলে 'এ ইচ্ছে আবার কখন তোমার কানে ধরে বলতে গেলেন মা? তুমি যখন গিয়ে পড়েছিলে, তখন তো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল।'

ক্ষীণ একটু হাসলো সুবর্ণ।

বহুকাল পরে হাসলো।

বললো, 'না, এ ইচ্ছে প্রকাশ তখন করেন নি। যখন পুরোদস্তুর বাক্য-স্রোত ছিল, এ তখনকার কথা। তোমাদের ওখানের জগন্নাথ ঘোষের মা যখন মারা গেলেন, তখন কাঙালী খেয়েছিল মনে আছে? দেখে মা বলেছিলেন, আমি যখন মরবো, আমার ছেলেরা কি এমন করে কাঙালী ভোজন করাবে!'

'ওঃ, এই কথা!' প্রবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। বলে, 'জ্যান্ত থাকতে জন্মভোর অমন কত কথা বলে মানুষ! সে-সব ইচ্ছে পালন করতে গেলেই হয়েছে আর কি!'

'তা বেশ। ধরো যদি আমারই ইচ্ছে হয়ে থাকে!'

প্রবোধ বিশ্বাস করে সেকথা। এটাই ঠিক কথা। তাই বলে, 'তোমার তো চিরদিনই এই রকম সব আজগুবী ইচ্ছে! শ্রাদ্ধ হয়ে গেল সেখানে, এখন কাঙালী ভোজন হবে এখানে। ওসব ফ্যাচাং তুলো না। অত বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।'

'তবে থাক্।' সুবর্ণ বলে, 'দরকার যখন নেই, ভালই হলো, তোমার ছেলেদের সুবিধে হলো। ভবিষ্যতে তাদেরও আর মেলাই বাজে খরচ করতে হবে না। মনে জানবে মা-বাপের শ্রাদ্ধর বেশি বাড়াবাড়ির দরকার নেই।'

প্রবোধ এ ব্যঙ্গে জ্বলে উঠে বলে, 'ওঃ, ঠাট্টা! ভারী একেবারে! আমার মা'র মরণকালের ইচ্ছে নিয়ে আমি কাতর হলাম না, উনি হচ্ছেন! বলি শাশুড়ীর ওপর ভক্তি উথলে উঠলো যে! এ ভক্তি ছিল কোথায়? চিরটা কাল তো মানুষটাকে হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ।'

সুবর্ণ এ অপমানে রেগে ওঠে না, বরং হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'সত্যি বটে।

স্মরণশক্তিটা আমার বড় কম। মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করলে।'

তারপর উঠে গেল।

সেই ওর ছাতের ঘরের কোটরে গিয়ে বসলো খাতাখানা নিয়ে।

কিন্তু খাতাখানা কি শুধু সুবর্ণর অপচয়ের হিসেবের খাতা?

সুবর্ণলতার জীবনের খাতাখানার মতই?

নইলে সুবর্ণর সেই খাতাখানার পাতা উল্টোলেই এই সব কথা চোখে পড়ে কেন?...

...'মেয়েমানুষ হয়েও এমন বায়না কেন তোমার সুবর্ণ, তুমি সৎ হবে, সুন্দর হবে, মহৎ হবে! ভুলে যাও কেন, মেয়েমানুষ হচ্ছে একটা হাত-পা-বাঁধা প্রাণী! মানুষ নয়, প্রাণী! হাত-পায়ের বাঁধনটা যদি ছিঁড়তে যায় সে তো হাত-পা-গুলো কেটে বাদ দিয়ে দিয়ে ছিঁড়তে হবে সে বাঁধন!'...

কেন লেখা থাকে...'তবু বাঁধন ছেঁড়ার সাধনটা চালিয়ে যেতে হবে তাকে। কারণ তার বিধাতা ভারী কৌতুকপ্রিয়। তাই ওই হাত-পা-বাঁধা প্রাণীমাত্র-গুলোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকেন বুদ্ধি, চেতনা, আত্মা।'

॥ ১৬ ॥

বহুদিন পরে মামাশ্বশুর-বাড়িতে বেড়াতে এল সুবর্ণ।

বড় ছেলে ভানু সম্প্রতি একটা গাড়ি কিনেছে, বড়বৌ বললো, 'আপনার ছেলে আসুন না মা, তখন বরং যাবেন—'

সুবর্ণ তবু ভাড়াটে গাড়ি করেই গেল। বললো, 'ও বাড়িতে বরাবর ভাড়াটে গাড়ি করেই গেছি বৌমা, জুড়িগাড়ি থাক।'

বৌ বিড়বিড় করে বললো, 'যত্ন-আদর না নিলে আর কে দেবে?'

সুবর্ণ গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

শ্যামাসুন্দরী সমাদর করে ডাকলেন, 'এসো মা, এসো।'

বয়েস কম হয় নি, মুক্তকেশীর থেকে কম হলেও তাঁর দাদার স্ত্রী। তবু শক্ত আছেন দিব্যি। এখনো নিজে রেঁধে খাচ্ছেন, হেঁটে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন!

অনেকদিন দেখে নি সুবর্ণ, দেখে আশ্চর্য হলো।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল, হয়তো দু অর্থে।

শ্যামাসুন্দরী কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'ছেলেপুলেরা কেমন আছে? চাঁপা, চন্নন, পারুল সব ভাল আছে তো? সেই যা তোমার শাশুড়ীর কাজের সময় সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলো!'

এটা ওটা উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ একসময় বলে বসে সুবর্ণ, 'ভাসুরঠাকুর বাড়ি আছেন?'

'কে? জগা?' শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'থাকবেন না তো যাবে আর কোথায়? এখন তো সর্বক্ষণ বাড়িতেই স্থিতি।...আমার কানের মাথা খেতে যে বাড়ির মধ্যে এক ছাপাখানা খুলে বসে আছেন!'

সুবর্ণলতা এ খবরে অবাক হয় না।

সুবর্ণলতা যেন এ খবর জানে।

শুধু সুবর্ণলতার মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখায়।

বলে, 'বেশ চলছে ছাপাখানা? ভাল ছাপা হয়?'

'জানিনে বাছা—', শ্যামাসুন্দরী অগ্রাহ্যভরে বলেন, 'রাতদিন শব্দ তো হচ্ছে। বলে নাকি খুব লাভ হচ্ছে। বলে, বয়েসকালে এ বুদ্ধি হলে লাল হয়ে যেতাম।...সাতজন্মে তো রোজগারের চেষ্টা দেখি নি। ওই ফোঁটা কাটতো আর মালা ঘুরাতো। তছাড়া পাড়ার লোকের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, রোগ, শোক, দুর্গোৎসব এইসব নিয়েই ছিল, হঠাৎ এই খেয়াল। মাথায় ঢুকিয়েছে ওই নিতাই। নিজের আখের গোছাতেই বোধ হয় এ প্ররোচনা দিয়েছে। বলে, বাড়িখানা থেকে কিছু উসুল করি...তা তোমার সঙ্গের ওই ঝিয়ের হাতে আবার অত সব কি বৌমা?'

সুবর্ণ কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'কিছু না, চারটি ফল, আপনি একটু মুখে দেবেন, ভাসুরঠাকুর একটু—ইয়ে, আপনাকে আজ একটা কথা বলতে এসেছি মামীমা—'

শ্যামাসুন্দরী সুবর্ণর কুণ্ঠিত ভাব দেখে আশ্চর্য হন। বলেন, 'কি গো বাছা?'

'বলছিলাম কি—ইয়ে—'

থেমে যায় সুবর্ণ।

শ্যামাসুন্দরী সমধিক অবাক হন। সুবর্ণলতার এমন কুণ্ঠিত মূর্তি! ও তো সদাই সপ্রতিভ। তা ছাড়া কুণ্ঠার মধ্যে কেমন যেন প্রার্থী ভাব! টাকা ধার চাওয়ার ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায়। কিন্তু সুবর্ণলতার ক্ষেত্রে তো সে আশঙ্কা ওঠে না।

তবে?

শ্যামাসুন্দরীর প্রশ্নমুখর দৃষ্টির সামনে একটু অপ্রতিভ হাসি হাসে সুবর্ণ। তারপর আঁচলের তলা থেকে একখানা মলাট বাঁধানো মোটা খাতা বার করে বলে ফেলে, 'ভাসুরঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনেছিলাম, তাই একটু শখ হয়েছে, সেই ইয়েতেই আসা। আমি তো আর নিজে মুখে বলতে পারবো না, আপনি যদি বলে দেন!'

শ্যামাসুন্দরী বার্ধক্যের চোখে কৌতূহল ফুটিয়ে বলেন, 'কি জন্যে কি বলবো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না বৌমা!'

সুবর্ণলতা মৃদু হাসে, 'বুঝতে পারবেনও না। তাহলে বলি শুনুন, ছেলেবেলা থেকে আমার একটু লেখার শখ আছে, জীবনভোর সকলের অসাক্ষাতে একটু-আধটু লিখেছি, এই পদ্যটদ্য আর কি। এদানীং গল্পটল্পর ধরনেও কিছু লেখা হয়েছে, তবে ছাপাবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। ভাসুর-ঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনে অবধি মনে উদয় হয়েছে, একখানা বই মতো করে যদি ছাপানো যায়। যা খরচা লাগে আমি দেব, শুধু আগে কেউ যেন জানতে না পারে। একেবারে বই হলে জানবে দেখবে। তা আপনি একটু বলে দেখুন না মামীমা, যদি একটু দেখেন এখন ভাসুরঠাকুর!'

প্রৌঢ় সুবর্ণলতার চোখে যেন ভাবাকুল অবোধ কিশোরীর দৃষ্টি।

যে সুবর্ণলতা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতো—সে সুবর্ণলতা কি আজও মরে

নি? কোথাও কোনখানে এতটুকু প্রাণ আহরণ করে বেঁচে আছে?...কোথায় আছে সেই অফুরন্ত অগ্নি, যা আজীবন বরফজল নিক্ষেপেও নিভে যায় না?

শ্যামাসুন্দরী তবুও বিস্মিত প্রশ্ন করেন, 'বই ছাপা হবে? কোথায় সেই বই?'

সুবর্ণ মৃদু হেসে বলে, 'বই তো পরে। ছাপা হবে এই খাতাটা। এইটা না হয় নিয়ে যান ভাসুরঠাকুরের কাছে, উনি ঠিক বুঝতে পারবেন।'

খাতাখানা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে শ্যামাসুন্দরী হতভম্ব গলায় বলেন, 'এসব লেখা তুমি লিখেছ? এই খাতা-ভর্তি?'

'ওই তো পাগলামি—', হাসে সুবর্ণ।

'নিজের মন থেকে? না কিছু দেখে?'

সুবর্ণলতা ছেলেমানুষের মত শব্দ করে হেসে ওঠে, 'নাঃ, দেখে লিখবো কি? তা হলে আর নিজের লেখা হলো কোথায়?'

শ্যামাসুন্দরীর বিস্ময় ভাঙে না, 'তা হ্যাঁগো মেজবৌমা, এত কথা তোমার মনে মাথায় এলো কি করে?'

সুবর্ণলতার মুখে আসে, মনে মাথায় আসে, তা লিখতে পারলে এ রকম সহস্রখান খাতাতেও কুলোতো না মামীমা। তবে বলে না সে কথা।

শ্যামাসুন্দরী উঠে যান।

কিছুক্ষণ পরে প্রেসমালিক জগন্নাথচন্দ্র এসে অদূরে দাঁড়ান।

চেহারা প্রায় একই রকম আছে, তেমনি আঁটসাঁট খাটমুগুরে গড়ন, তেমনি হস্তেলের মত রং, বদলের মধ্যে কিছু চুল পেকেছে।

আগের মতই পরনে একটা লাল ছালটি, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা।

তার মানে এই বেশেই ছাপাখানায় বসেন তিনি।

এসে দাঁড়িয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলেন, 'মা, জিজ্ঞেস করো তো বৌমাকে, এ হাতের লেখা কার?'

ইশারায় উত্তর পেয়ে শ্যামাসুন্দরী মহোৎসাহে বলেন, 'বললাম তো সবই বৌমার লেখা!'

'চমৎকার হাতের লেখা তো!'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে খাতার পৃষ্ঠাগুলো উল্টোতে উল্টোতে জগু বলেন, 'মেয়েছেলেদের হাতের লেখা এমন পাকা! সচরাচর দেখা যায় না। কিসে থেকে নকল করেছেন?'

শ্যামাসুন্দরী বলে ওঠেন, 'এই দেখো ভূতুড়ে কথা! বললাম যে, এ সমস্ত বৌমা নিজের মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে! বই-লিখিয়েরা যেমন লেখে আর কি!'

'বল কি? এই গদ্য-পদ্য সব?'

'সব।' এখন আবার শ্যামাসুন্দরী জ্ঞানদাত্রী।

জগন্নাথ মহোৎসাহে বলেন, 'তুমি যে তাজ্জব করে দিলে মা! এতকাল দেখছি, কই এসব তো শুনি নি!'

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'শুনবি কোথা থেকে! মেজবৌমা তো নিজের গুণ জাহির করে বেড়ানো মেয়ে নয়? তোর ছাপাখানার বার্তা শুনে সাধ হয়েছে, বলছে যা খরচা পড়বে দেবে, তুই শুধু দেখেশুনে—'

'খরচের কথা আসছে কোথা থেকে? খরচের কথা!' জগু হৈ-হৈ করে ওঠেন, 'আমার প্রেসে আবার খরচ কি? রেখে দিয়ে যান বৌমা, কালই প্রেসে চাড়িয়ে দেব। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি বৌমার গুণ দেখে। নাঃ, পিসির সংসারে এই মেজবৌমাটি এসেছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ভগবান দিয়েছেনও তাই ঢেলে মেপে! মনের গুণেই ধন। বহু ভাগ্যে এমন লক্ষ্মী পেয়েছিল পেবো।'

॥ ১৭ ॥

কানায় কানায় পূর্ণ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলো সুবর্ণলতা।

ভাবতে লাগলো ভগবানের উপর অবিশ্বাস এসে গেলেই বুঝি তিনি এইভাবে আপন করুণা প্রকাশ করেন।

মানুষের উপর প্রত্যাশা হারালেই ভগবানের উপর আসে অবিশ্বাস। তবু কোথাও বুঝি কিছু একটু আশা ছিল, তাই দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে সেই আশার দরজায় একটুকু করাঘাত করতে গিয়েছিল সুবর্ণলতা, রুদ্ধ কপাট খোলে কিনা দেখতে। দেখলো দু'হাট হয়ে খুলে গেল। ভিতরের মালিক সহাস্য অভ্যর্থনায় বললো, 'এসো এসো! বোসো, জল খাও।'

হ্যাঁ, সেই কথাই মনে হয়েছিল সুবর্ণলতার।

একথা সেকথার পর আবার মামীমার মাধ্যমে ছাপার খরচার কথাটা তুলেছিল সুবর্ণ, সুবর্ণলতার জগু-বট্‌ঠাকুর সে প্রস্তাব তুড়ি দিয়ে ওড়ালেন। বললেন, 'দূর! কাগজের আবার দাম! বস্তা বস্তা কাগজ কেনা আছে আমার। এই তো এখনই তো দু হাজার বর্ণপরিচয় ছাপা হচ্ছে। বৌমা বই লিখেছেন, এটা কি কম আহ্লাদের কথা! ছেপে বার করে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবো লোককে। কী গুণবতী বৌ আমাদের! বুকটা দশ হাত হয়ে উঠবে।'

শুনে তখন সহসা ভূমিকম্পের মতো প্রবল একটা বাষ্পোচ্ছ্বাসে সুবর্ণ-লতার সমস্ত শরীর দুলে উঠেছিল। জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে এসে সুবর্ণলতা এই প্রথম শুনলো সে গুণবতী! শুনলো তার কোনো গুণ নিয়ে কেউ গৌরব করতে পারে!

অথচ এই গুণই—

হ্যাঁ, এই গুণই দোষ হয়েছে চিরকাল!

আজীবনই তো একটু-আধটু লেখার সাধ ছিল। কিন্তু সে সাধ মেটাতে অনেক দাম দিতে হয়েছে। কত সংগোপনে, কত সাবধানে, হয়তো রাত্রে যখন ওদিকে তাসের আড্ডা জমজমাট, অথচ এদিকে ছেলেরা ঘুমিয়েছে, তখন বসেছে একটু খাতা-কলম নিয়ে, প্রবোধ কোনো কারণে ঘরে এসে পড়ে দেখে ফেললো, ব্যস, শুরু হলো ব্যংগ তিরস্কার।

আর তার জের চলতে লাগলো বেশ কিছুকাল। যে সংসারে মেয়েমানুষ

'বিদ্যেবতী' হয়ে উঠে কলম নাড়ে, তাদের যে লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য এ কথাও ওঠে। তাছাড়া কলম ধরা হাত যে আর হাতাবেড়ি ধরতে চাইবে না, তাতে আর সন্দেহ কি!

অনেক সময় অনেক কটূক্তি হজম করেছে সুবর্ণলতা তার 'খাতা' নিয়ে। আর এখনই কি হয় না? কটূক্তি না হোক বক্রোক্তি!

কানে আসে বৈকি।

আর সে উক্তি আজকাল অনেক সময়ই আসে ছেলেদের ঘর থেকে। সুবর্ণলতার রক্তে-মাংসে গঠিত ছেলেদের!

'ব্যাপারটা কি? কোনো "থিসিস্‌টিসিস্‌" লেখা হচ্ছে নাকি?...মা কি রান্নাঘরটা একদম ছেড়ে দিলেন নাকি রে বকুল? দেখতেই পাওয়া যায় না!—সুবল, তুই তো অনেক জানিস, মহাভারত লিখতে বেদব্যাসের কতদিন লেগেছিল জানিস সে খবর?'

অথবা প্রবোধের আক্ষেপ-উক্তি শোনা যায়, 'কী রান্না-বান্না হচ্ছে আজকাল? বকুল, এ মাছের তরকারি রেঁধেছে কে? তুই বুঝি? মুখে করা যাচ্ছে না যে—'

জানে বকুল নয়, ছেলের বৌরা রেঁধেছে। তত্রাচ ওইভাবেই বলে। বোধ করি সেই চিরাচরিত মেয়েলী প্রথাটাই বজায় রাখে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়।

আবার এ আক্ষেপও করে ওঠে, 'হবেই তো! বাড়ির গিন্নী যদি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে খাতা-কলম নিয়ে পড়ে থাকে, হবেই নষ্ট-অপচয়, অবিলি, বে-বন্দোবস্ত!'

সুবর্ণর কানে আসে।

কিন্তু সুবর্ণ কানে নেয় না। সব কিছু কানে নেওয়া থেকে বিরত হয়েছে সুবর্ণ, অভিমানশূন্য হবার সাধনা করছে।

অতএব জবাব দেয় না।

সুবর্ণলতা তার সংসারের সব প্রশ্নের 'জবাব' তৈরী করছে বসে শেষ আদালতে পেশ করার জন্যে। হয়তো সেই 'জবাবী বিবৃতি'র মধ্য থেকে সেই সংসার সুবর্ণলতাকে বুঝতে পারবে।

আর সেই বোঝা বুঝতে পারলেই বুঝতে পারবে নিজের ভুল, নিজের বোকামি, নিজের নির্লজ্জতা।

সুবর্ণলতার 'স্মৃতিকথা' সুবর্ণলতার জবানবন্দী।

সেই জবানবন্দীকে মুক্তি দিতে পারছে সুবর্ণলতা, মুক্তি দিতে পারছে খাতার কারাগার থেকে আলোভরা রাজরাস্তায়।

ঈশ্বরের করুণা নেমে এসেছে মানুষের মধ্য দিয়ে।

আজীবনের কল্পনা সফল হতে চললো এবার, আজীবনের স্বপ্ন সফল। এ যেন একটা অলৌকিক কাহিনী। যে কাহিনীতে মন্ত্রবলের মহিমা কীর্তিত হয়। নইলে চিরকালের বাউণ্ডুলে জগু-বট্‌ঠাকুরের হঠাৎ ছাপাখানা খোলার শখ হবে কেন?

ভগবানই সুবর্ণলতার জন্যে—

পৃথিবীটাকে হঠাৎ ভারি সুন্দর লাগে সুবর্ণর, ভারি উজ্জ্বল। খুশি-ঝলমলে সকালের আলোয় এই বিবর্ণ হয়ে আসা গোলাপী-রঙা বাড়িটা যেন

সোনালী হয়ে ওঠে। নিজের সংসারটাকেও যেন হঠাৎ ভাল লেগে যায়।

এই তো, এই সমস্তই তো সুবর্ণলতার নিজের সৃষ্টি, এদের উপর কি বীতশ্রদ্ধ হওয়া যায়? এদের উপর বিরূপ হওয়া সাজে?

এরা যে সুবর্ণলতাকে ভালবাসে না, সে ধারণাটা ভুল ধারণা সুবর্ণলতার। বাসে বৈকি, শুধু ওদের নিজেদের ধরনে বাসে। তা তাই বাসুক। সুবর্ণলতাও চেষ্টা করবে ওদের বুঝতে।

হয়তো জীবনের এই শেষপ্রান্তে এসে জীবনের মানে খুঁজে পাবে সুবর্ণ, আর তার মধ্যেই খুঁজে পাবে জীবনের পূর্ণতা।

ক্রমশই যেন প্রত্যাশার দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে থাকে নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়।

শুধুই বা ওই জবানবন্দী কেন?

আরও তো লিখেছে সুবর্ণলতা, যা শিল্প, যা সৃষ্টি।

যেখানে সুবর্ণলতা একক, যেখানে তার ওপর কোনো ওপরওয়ালা নেই। যেখানে থাকবে সুবর্ণলতার অস্তিত্বের সম্মান। যেখানে সে বিধাতা।

আঃ, এ কল্পনায় কী অপূর্ব মাদকতা!

এ যেন কিশোরী মেয়ের প্রথম প্রেমে পড়ার অনুভূতি। অনুক্ষণ মনের মধ্যে মোহময় এক সুর গুঞ্জরণ করে। সে সুর রাত্রির তন্দ্রার মধ্যেও আনা-গোনা করে।

নিত্য নূতন বই লেখা হচ্ছে, নিত্য নিত্য বই ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে সে সব, অবাক হয়ে যাচ্ছে সবাই সুবর্ণলতার মহিমা দেখে, আর ভাবছে 'তাই তো'!

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কী হাস্যকর ছেলেমানুষিই করে এসেছে এতদিন সুবর্ণ!

এই তুচ্ছ সংসারের বিরূপতা আর প্রসন্নতার মধ্যে নিজের মূল্য খুঁজে এসেছে! হিসেব কষেছে লাভ আর ক্ষতির!

অথচ সুবর্ণলতার নিজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে রাজার ঐশ্বর্য!

সুবর্ণলতার ওই হলুদ পাঁচফোড়নের সংসারখানা নিক্ না যার খুশি, নিয়ে বরং রেহাই দিক সুবর্ণলতাকে। সুবর্ণলতার জন্যে থাক্ এক অনির্বচনীয় মাধুর্যলোক।

কী আনন্দ!

কী অনাস্বাদিত সুখস্বাদ!

সুবর্ণলতার জীবনখাতার এই অধ্যায়খানি যেন জ্যোতির কণা দিয়ে লেখা।

সুবর্ণলতা রান্নাঘরে এসে বলে, 'ও বড়বৌমা, বল বাছা কী কুটনো হবে? কুটি বসে।'

বড়বৌমা শাশুড়ীর এই আলো-ঝলসানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়। তবে প্রকাশ করে না সে বিস্ময়। নরম গলায় বলে, 'আমি আবার কি বলবো? আপনার যা ইচ্ছে—'

'বাঃ, তা কেন? তুমি রাঁধবে—তোমার মনের মত রান্নাটি হওয়াই তো ভাল।' বলে বঁটিটা টেনে নেয় সুবর্ণ।

আবার হয়তো বা একথাও বলে, 'তোমরা তো রোজই খেটে সারা হচ্ছ বৌমা, আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কি রান্না হবে বল, আমি রাঁধি।'

. বৌরা বলে, 'আপনার শরীর খারাপ—'

সুবর্ণ মিষ্টি হাসি হাসে, 'খারাপ আবার কি বাপু? খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরছি ফিরছি! তোমাদের শাশুড়ী চালাক মেয়ে, বুঝলে? কাজের বেলাতেই তার শরীর খারাপ!'

ওরা অবাক হয়।

ওরা শাশুড়ীর এমন মধুর মূর্তি দেখে নি এসে পর্যন্ত। ওরা ভাবে ব্যাপারটা কি?

সুবর্ণ ওদের বিস্ময়টা ধরতে পারে না, সুবর্ণ আর এক জগৎ থেকে আহরণ করা আলোর কণিকা মুঠো মুঠো ছড়ায়।

'ভানু মাছের মুড়ো দিয়ে ছোলার ডাল ভালবাসে, তাই বরং হোক আজ। কানুটা বড়া দিয়ে মোচার ঘণ্টর ভক্ত, হয় নি অনেকদিন, দুটো ডাল ভিজোও তো মেজবৌমা!...ওগো আজ মোচা এনো তো।'

বাজার করার ভার প্রবোধের!

এই মহান্ কর্মভার অবশ্য সে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। ছেলেরা চক্ষুলজ্জার দায়ে কখনো কখনো বলে বটে, 'আমাদের বললেই পারেন! নিজে এত কষ্ট করার কি দরকার!' তবে সে কথা গায়ে মাখে না প্রবোধ।

কিন্তু সেই বাজার-বেলায় সুবর্ণলতা তাকে ডেকে হেঁকে বিশেষ কোনো জিনিস আনতে হুকুম দিয়েছে, এ ঘটনা প্রায় অভূতপূর্ব! অন্তত বহুকালের মধ্যে মনে পড়ে না।

বোধ করি ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছোট, তখন তাদের প্রয়োজনে বিস্কুট কি লজেন্স, বার্লি কি মেলিন্স ফুড্ ইত্যাদির অর্ডার দিতে এসেছে বেরোবার মুখে। কিন্তু মুখের রেখায় ওই যে আহ্লাদের জ্যোতি!

এ বস্তু কি দেখা গিয়েছে কোনোদিন?

দেখা যেত—ওই আলোর আভা দেখা যেত কখনো কখনো সুবর্ণর মুখে, কিন্তু সে আভা আগুন হয়ে প্রবোধের গাত্রদাহ ঘটাতো।

স্বদেশী হুজুগের সময় যখনই কোনো বিদ্ঘুটে খবর বেরোতো, তখনই সুবর্ণর মুখে আলো জ্বলতো। আলো জ্বলতো যখন নতুন কোনো বই হাতে পেত—আলো জ্বলতো যখন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে একত্রে বসিয়ে 'পাঠশালা পাঠশালা' খেলা ফেঁদে তারস্বরে তাদের দিয়ে পদ্য মুখস্থ করাতো—আলো জ্বলতো যদি কেউ কোনখান থেকে বেড়িয়ে বা তীর্থ করে এসে গল্প জুড়তো।

তা ছাড়া আর এক ধরনের আলো আর আবেগ ফুটে উঠেছিল সুবর্ণলতার মুখে, ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধের সময়। সে এক ধরন। যেন সুবর্ণলতারই জীবন-মরণ নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে! দেশের রাজা বৃটিশ, অথচ সুবর্ণর ইচ্ছে জার্মানরা জিতুক। তাই তর্ক, উত্তেজনা, রাগারাগি। মেয়েমানুষ, তাও রোজ খবরের কাগজ না হলে ভাত হজম হবে না!

তা সে প্রকৃতিটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে।

এই তো ইদানীং আবার যে 'স্বরাজ-স্বরাজ' হুজুগ উঠেছে, তাতে তো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বরং যেন অগ্রাহ্য। বলে, 'অহিংসা করে শত্রু তাড়ানো যাবে এ আমার বিশ্বাস হয় না।'...বলে, 'দেশসুদ্ধ লোক বসে বসে চরকা কাটলে "স্বরাজ" আসবে? তাহলে আর পৃথিবীতে আদি-অন্তকাল এত

অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো না।' উত্তেজিত হয়ে তর্কটা করে না, শুধু বলে।

শক্তি-সামর্থ্যটা কমে গেছে, ঝিমিয়ে গেছে।

তাই মুখের সেই ঔজ্জ্বল্যটাও বিদায় নিয়েছিল। বিশেষ করে সেই অদেখা মায়ের, আর চকিতে দেখা বাপের মৃত্যুশোকের পর থেকে তো—

হঠাৎ যেন সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটার খোলস ছেড়ে আবার 'নতুন' হয়ে ওঠার মত দেখাচ্ছে সুবর্ণকে।

কেন?

মাথার দোষ-টোষ হচ্ছে না তো?

পাগলরাই তো কখনো হাসে কখনো কাঁদে।

তা যাক, এখন যখন হাসছে, তাতেই কৃতার্থ হওয়া ভালো।

কৃতার্থই হয় প্রবোধ।

বিগলিত গলায় বলে, 'মোচা? মোচা আনা মানেই তোমার খাটুনি গো, ও কি আর বৌমারা বাগিয়ে কুটতে-ফুটতে পারবেন?'

সুবর্ণ বলে, 'শোনো কথা! সব করছে ওরা। কিসে হারছে? তবে আমারই ইচ্ছে হয়েছে, রান্নাবান্না ভুলে যাব শেষটা?'

কৃতার্থমন্য প্রবোধ ভাবতে ভাবতে বাজার ছোটে, 'আহা, এমন দিনটি কি চিরদিন থাকে না?'

এই জীবনটাই তো কাম্য!

গিন্নী ফাইফরমাস করবে, এটা আনো ওটা আনো বলবে, কর্তা সেইসব বরাতি বস্তু এনে সাতবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবে, বাহবা নেবে, গিন্নী গুছিয়ে-গাছিয়ে রাঁধবে বাড়বে, বেলা গড়িয়ে পরিপাটী করে খাওয়া-দাওয়া হবে, আর অবসরকালে কর্তা-গিন্নী পানের বাটা নিয়ে বসে ছেলে বৌ বেয়াই বেয়ানের নিন্দাবাদ করবে, এযুগের ফ্যাশান নিয়ে সমালোচনা করবে—এই তো এই বয়সের সংসারের ছবি! প্রবোধের সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবরা তো এই ধরনের সুখেই নিমগ্ন।

প্রবোধের ভাগ্যেই ব্যতিক্রম। এই সামান্য সাধারণ সুখটুকুও ইহজীবনে জুটলো না।

গিন্নী যেন সিংহবাহিনী।

তাসের আড্ডাটা যাই আছে প্রবোধের, তাই টি'কে আছে বেচারা।

তা এতদিনে কি ভগবান মুখ তুলে চাইছেন?

'পাগল-ছাগল' হয়ে সহজ হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ?

নাকি এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে?

তা সে যে কারণে যাই হোক, সুবর্ণ যে সহজ প্রসন্নমুখে ডেকে বলেছে, 'ওগো বাজার যাচ্ছ, মোচা এনো তো'—এই পরম সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বাজারে যায় প্রবোধ, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ-তরকারি এনে জড়ো করে।

সুবর্ণ তখন হয়তো অনুমান করতে চেষ্টা করছে, তার ওই খাতাটা ছাপতে কতদিন লাগতে পারে, কতদিন লাগা সম্ভব! ধারণা অবশ্য নেই কিছুই, তবু কতই আর হবে? বড় জোর মাস দুই, কমও হতে পারে। তারপর—

আচ্ছা, জগু-বট্‌ঠাকুর আমার নামটা জানেন তো? কে জানে! কিন্তু জানবেনই বা কোথা থেকে? কবে আর কে আমার নাম উচ্চারণ করেছে ও'র সামনে?

তাহলে?
বিনা নামেই বই ছাপা হবে?
নাকি মামীমার কাছ থেকে জেনে নেবেন উনি?
তা মামীমাই কি ঠিক জানেন?
'মেজবৌমা' ডাকটাতেই তো অভ্যস্ত।
হঠাৎ নিজ মনে হেসে ওঠে সুবর্ণলতা।
কী আশ্চর্য! খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তো তার নাম রয়েছে। যে হাতের লেখার প্রশংসা করেছেন জগু-বট্‌ঠাকুর, সেই হাতের লেখাটিকে আরো সুছাঁদ সুন্দর করে ধরে ধরে নামটি লেখে নি একবার সুবর্ণ?
হ্যাঁ, পরম যত্নে পরম সোহাগে কলমটিকে ধরে ধরে লিখে রেখেছিল সুবর্ণ—শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী।
সেই লেখা চোখ এড়িয়ে যাবে?
এড়িয়ে যাবে না।
চোখ এড়িয়ে যাবে না।
নামতা মুখস্থ করার মত বার বার মনে মনে এই কথা উচ্চারণ করতে থাকে সুবর্ণ, চোখ এড়িয়ে যাবে না। বইয়ের উপর লেখা থাকবে শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!
সুবর্ণলতার মা জেনে গেল না এ খবর!
এত আনন্দের মধ্যেও সেই বিষণ্ণ বিষাদের সুর যেন একটা অস্পষ্ট মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রাখে।
মা থাকতে এই পরম আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলে, মাকে অন্তত একখণ্ড বই পার্শেল করে পাঠিয়ে দিত সুবর্ণ। এ বাড়ির কাউকে দিয়ে নয় অবশ্য, মামীমাকে দিয়ে ওই জগু বট্‌ঠাকুরকে বলেই করিয়ে দিতো কাজটা।
মা প্রথমটায় পার্শেল পেয়ে হকচকিয়ে যেত, ভাবতো, কী এ? তারপর বাঁধন খুলে দেখতো। দেখতো! দেখতো বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!
তারপর?
তারপর কি মা'র চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তো না?
সুবর্ণলতার মনটা যেন ইহলোক পরলোকের প্রাচীর ভেঙে দিতে চায়। যেন তার সেই অদেখা বইটা সেই ভাঙা প্রাচীরের ওধারে নিয়ে গিয়ে ধরে দিতে চায়! সুবর্ণ দেখতে পায়, সুবর্ণর মা সুবর্ণর স্মৃতিকথা পড়ছেন।
পড়ার পর?
শুধুই কি সেই দু ফোঁটা আনন্দাশ্রুই ঝরে পড়ে শুকিয়ে যাবে? সেই শুকনো রেখার উপর দিয়ে ঝরণাধারার মত ঝড়ে পড়বে না আরো অজস্র ফোঁটা? দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে কাঁটাবনের উপর দিয়ে রক্তাক্ত হতে হতে জীবনে এতটা পথ পার হয়ে এসেছে সুবর্ণ!
মা বুঝতে পারছেন সুবর্ণ অসার নয়।
কোন্ কোন্ অংশটা পড়তে পড়তে মা বিচলিত হতেন, আর কোন্ কোন্ অংশটা পড়ে বিগলিত, ভাবতে চেষ্টা করে সুবর্ণ।
নিজের হাতের সেই লেখাগুলো যেন 'দৃশ্য' হয়ে ভেসে ওঠে।
পর পর নয়, এলোমেলো।

যেন দৃশ্যগুলো হুড়োহুড়ি করে সামনে আসতে চায়। যেন এক প্যাকেট তাসকে কে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেক বয়সের অনেকগুলো সুবর্ণ ছড়িয়ে পড়ে সেই অসংখ্য দৃশ্যের মধ্যে। মাথায় খাটো, পায়ে মল, একগলা-ঘোমটা বালিকা সুবর্ণ, হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়া সদ্য কিশোরী সুবর্ণ, নতুন মা হয়ে ওঠা আবেশবিহ্বল সুবর্ণ, তারপর—

আচ্ছা, ওই ঘোমটা দেওয়া ছোট মাপের সুবর্ণর ঘোমটাটা হঠাৎ খুলে গেল যে!

কি বলছে ও?

কী বলছে, সে কথা শুনতে পাচ্ছে সুবর্ণলতা!

'তাড়িয়ে দিলে? তোমরা আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিলে? আমাকে নিয়ে যেতে দিলে না? কেন? কেন? কী করেছি আমি তোমাদের, তাই এত কষ্ট দেবে আমাকে...কে বলেছিল আমাকে তোমাদের বৌ করতে? শুধু শুধু ঠকিয়ে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে...চলে যাব, আমি তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাব—তোমাদের মতন নিষ্ঠুরদের বাড়িতে থাকলে মরে যাব আমি।'

সুবর্ণলতা অন্য আর এক গলার উচ্চ নিনাদও শুনতে পাচ্ছে, ওর নিজের কলমের অক্ষরগুলোই যেন সশব্দ হয়ে ফেটে পড়ছে, 'ওমা, আমি কোথায় যাব! এ কী কালকেউটের ছানা ঘরে আনলাম গো আমি! চলে যাবি? দেখ্ না একবার চলে গিয়ে! খুন্তি নেই আমার? পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতে জানি না?..."বাপকে তাড়িয়ে দিলে!" দেব না তো কি, ওই বাপের সঙ্গে নাচতে নাচতে যেতে দেব তোকে?...সইমা আমার পূর্বজন্মের শত্রু ছিল, তাই তোকে আমার গলায় গছিয়ে পরকাল খেয়েছে আমার। আর ওমুখো হতে দিচ্ছি না তোকে...ইহজীবনে কেমন আর বাপের বাড়ির নাম মুখে আনিস, দেখবো! বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তোর যদি না ঘোচাই তো আমি মুক্তবামনী নই! বাপ চলে যাচ্ছে বলে ঘোমটা খুলে রাস্তায় ছুটে আসা বার করছি।'

সেই ঘোমটা খোলা বালিকা সুবর্ণকে টেনেহিঁচড়ে ঘরে এনে পুরে শেকল তুলে দিয়ে গেল ওরা, বলে গেল, 'মুখ থেকে আর টু শব্দ বার করবি না!'

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় যেন নিথর হয়ে গেল।...তবু তখনো সত্যি বিশ্বাস হয় নি তার, সেই নিষ্ঠুরতার কারাগারেই চিরদিনের মত থাকতে হবে তাকে।...মনে করছিল, কোনমতে একবার এদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সব সোজা হয়ে যাবে।

তাই পালাবার মতলবই ভেঁজেছিল বসে বসে!

রাস্তা চেনে না? তাতে কি? রাস্তায় বেরোলেই রাস্তা চেনা যায়। রাস্তায় লোককে জিজ্ঞেস করলেই হবে।...সুবর্ণদের বাড়িটা রাস্তার লোক যদি না চেনে তো সুবর্ণ তার ইস্কুলটার নাম করবে। ইস্কুলটাকে নিশ্চয়ই সবাই চেনে, বেথুন ইস্কুলে তো নামকরা জায়গা।...হে ঠাকুর, একবার সুবর্ণকে সুযোগ দাও পালিয়ে যাবার!...সুবর্ণ রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে একবার ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছে যাক। তারপর আর বাড়ি চেনা আটকায় কে?...রোজ যেমন করে চলে যেতো তেমনি করেই চলে যাবে।

চলে গিয়ে?

'চলে গিয়ে বাবাকে বলবে, 'দেখলে তো বাবা, তুমি আনতে পারলে না, আমি নিজে নিজেই চলে এলাম!' আর মাকে বলবে, মা! মা কোথায়? এরা তো কেবলই বলে তার মা চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে মা? এতদিনেও আসে নি? ঠিক আছে, সুবর্ণ গিয়ে পড়ে দেখবে কেমন না আসে মা? দাদার বিয়ে হবে, কত মজা, আর কত কাজ মা'র, কোথায় গিয়ে বসে থাকবে শুনি?......

ইস্ ভগবান, একবার এদের বাড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি হরে নাও, সুবর্ণকে পালাতে দাও। কে জানে সুবর্ণর দাদার বিয়ের সময়েও হয়তো যেতে দেবে না এরা সুবর্ণকে।

আচ্ছা, ইস্কুলের মেয়েরা যদি জিজ্ঞেস করে, 'এতদিন আসিস নি কেন?' যদি সুবর্ণর মাথায় সিঁদুর দেখে হেসে উঠে বলে, 'এ মা, তোর বিয়ে হয়ে গেছে!' কী উত্তর দেব?

বলব কি—আমার ঠাকুমা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে?...নাঃ, সে কথা শুনলে ওরা আরো হাসবে!...তার চাইতে সিঁদুরটা আচ্ছা করে মুছে নেব রাস্তায় বেরিয়ে। রাস্তার কলে ধুয়ে ঘষে সাদা করে ফেলবো। ও-বাড়ির দিদি- জয়াবতীদিদি, ওকেই শুধু বলে যাব আমি চলে যাচ্ছি! ও আমায় যা ভালবাসে, ঠিক মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে! ওর শ্বশুরবাড়ি এমন বিচ্ছিরি নয়, ও কত বাপের বাড়ি যায়!

'পালাবো পালাবো' এই ছিল ধ্যান-জ্ঞান।

কিন্তু পালাতে পারে নি সুবর্ণ। জীবনভোর পারল না।...দেখেছে পালানোটাকে যত সোজা ভেবেছিল তত কঠিন।

একদণ্ডের জন্যে পাহারা সরায় না এরা।

ক্রমশই তাই বেথুন ইস্কুল, ঠনঠনে কালীতলা, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, আঠারোহাত কালীর মন্দির, সব কিছুই ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে...স্পষ্ট আর প্রখর হয়ে উঠছে সিঁথির ওই সিঁদুরটা। ওটাকে ঘষে ঘষে মুছে ফেলার কথা যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।...সেই তার নিজের জীবনে- সত্যিকার জীবনে যে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, সেটা যেন স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে।

সুবর্ণর বই খাতা স্লেট পেন্সিল সব যে তাদের কুলুঙ্গিটার মধ্যে পড়ে রইল, সেকথা তো কেউ ভাবলো না? সামনেই যে সুবর্ণর হাফ-ইয়ারলি এক-জামিন, সে কথা মা'রও তো কই মনে পড়ল না?

সুবর্ণর সমস্ত প্রাণটা যেন ওই কুলুঙ্গিটার উপর আছড়ে পড়তে যায়।

এতদিন না পড়ে পড়ে সুবর্ণ যে সব ভুলে যাচ্ছে!

ভগবান, সুবর্ণ তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে এত কষ্ট দিচ্ছ তাকে? রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কি তোমাকে নমস্কার করে নি? রোজ ইস্কুলে গিয়ে 'প্রার্থনা' করে নি...রাত্তিরে শুতে যাবার সময় কি বলে নি 'ঠাকুর, বিদ্যে দিও, বুদ্ধি দিও, সুমতি দিও'!

যা যা শিখিয়েছিল মা, সবই তো করেছে সুবর্ণ, তবে কেন এত শাস্তি দিচ্ছ সুবর্ণকে?

কেন? কেন? কেন?

ওই 'কেন'র ঝড় থেকে বালিকা সুবর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে, তার খোলস থেকে যুবতী জন্ম নিচ্ছে, তবু সেই 'কেন'টাই ধূসর হয়ে যাচ্ছে না। সে যেন আরো

তীব্র হয়ে উঠছে।

আমি কি এত পাজী হতে চাই?...আমি কি গুরুজনদের মুখের উপর চোপা করতে ভালবাসি? আমি কি বুঝতে পারি না, আমি চোপা করি বলেই আমার ওপর আক্রোশ করেই ওর আমাকে আরো বেশি বেশি কষ্ট দেয়?

কিন্তু কি করবো?

এত নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না এত অসভ্যতা। আমার ওই বর, ও কেন এত বিচ্ছিরি! এর থেকে ও যদি খুব কালো আর কুচ্ছিত দেখতে হতো, তাও আমার ছিল ভালো। কিন্তু তা হয়নি। ওর বাইরের চেহারাটা দিব্যি সুন্দর, অথচ মনের ভেতরটা কালো কুচ্ছিত বিচ্ছিরি। ...ও মিছিমিছি করে আমাকে বলেছিল, লুকিয়ে আমাকে আমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে। সেই কথা বিশ্বাস করে ওকে ভালবেসেছিলাম আমি, ভক্তি করেছিলাম, ওর সব কথা রেখেছিলাম। -খারাপ বিচ্ছিরি সব কথা!—কিন্তু ওর কথা ও রাখে নি। রোজ ভুলিয়ে ভুলিয়ে শেষ অবধি একদিন হ্যা-হ্যা করে হেসে বলেছিল, 'ও বাবা, একবার গিয়ে পড়লে কি আর তুমি আসতে চাইবে! নির্ঘাত সেখানে থেকে যাবে। এমন পরীর মতন বৌটি আমি হারাতে চাই না বাবা!

কত দিব্যি গাললাম যে আবার ফিরে আসবো, তবু বিশ্বাস করল না।

ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালবাসে, বলে তো তাই সব সময়, কিন্তু ভগবান, আমার অপরাধ নিও না, আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই আমার।

তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়?

...আজ আবার সেই হলো!

আজ আবার ওরা ছোড়দাকে তাড়িয়ে দিল।

আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না।

দাদার বিয়েতে নাকি ঘটা করে নি বাবা, মা চলে গেল বলে নমো নমো করে সেরেছে। দাদার মেয়ের 'মুখেভাতে' একটু ঘটা করবে। তাই ছোড়দা আমায় নিতে এসেছিল। বাবা নাকি অনেক মিনতি করে চিঠি লিখে দিয়েছিল ওর হাতে। ওরা সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে, ছোড়দাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বলেছে, 'ছেলের বিয়ে শুনলাম না, নাতনীর ভাত! এমন উনচুটে বাড়িতে আমাদের ঘরের বৌ যাবে না।'

ছোড়দা নাকি ভয় করে নি, ছোড়দা নাকি এ বাড়ির সেজ ছেলের মুখের ওপর চোটপাট শুনিয়ে দিয়ে গেছে। নাকি বলেছে, 'আপনাদের মত লোকের জেল হওয়া উচিত।'

এ বাড়ির সেজ ছেলে সেই অপমান সহ্য করবে?

উল্টো অপমান করবে না? করবে না গালমন্দ?

তবু তো এ বাড়ির মেজ ছেলে তখন বাড়ি ছিল না, থাকলে ছোড়দার কপালে আরো কি ঘটতো কে জানে!

বাড়ি ফিরে শুনে তো অদৃশ্য লোকটাকেই এই মারে তো সেই মারে! বলে,

কি, শুধু চলে যেতে বললি? ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারলি না শালাকে?'

আমি যখন রাগে ঘেন্নায় কথা বলি নি ওর সঙ্গে, তখন হ্যা-হ্যা করে হেসে বললো, 'শালাকে শালা বলবো না তো বেয়াই বলবো?' হ্যাঁ, আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমার ভাইদের মান আছে, আমার ভাইদের মান নেই?'

সেই শুনে এমনি হাসি হেসেছিল ও, আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সবাইকে ডেকে বলেছিল, 'আরে শুনেছ, শালাকে নাকি সম্মান করা উচিত ছিল আমার! পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া উচিত ছিল!'

ঠিক আছে, ভগবান যখন আমাকে এই নিষ্ঠুর আর অসভ্যদের কাছেই রেখে দিয়েছে, তখন তাই থাকবো। আর যেতে চাইব না এ বাড়ির বাইরে। ভুলে যাব আমারও মা ছিল, বাপ ছিল, ভাই ছিল, বাড়ি ছিল। ওদের বাড়ি থেকে বেরোবো একেবারে নিমতলাঘাটের উদ্দেশে।

তাই—তাই হোক।

মরেই দেখিয়ে দেব, আটকে রাখবে বললেই আটকে রাখা যায় না!

কিন্তু শুধু কি এইসব কথাই লিখেছে সুবর্ণ তার স্মৃতিকথায়?

সুবর্ণ যেন ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া খাতাখানার পাতাগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।...

সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে, সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বই, তার সঙ্গে মিষ্টি একটু কথা। মানুষটাকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু কথা। হাসি-হাসি গলার ঝঙ্কার।

'এই নে, বইটা আর তোকে ফেরত দিতে হবে না! তুই পদ্য পড়তে ভালবাসিস শুনে তোর ভাসুর তো মোহিত। বলেছে, এটা তুমি উপহার দিও বন্ধুকে।'

পৃথিবীতে এই মানুষও আছে ভগবান!

তবে তোমার উপর রাগ করে কি করবো?

'আমার ভাগ্য!' এ ছাড়া বলার কিছু নেই।

কিন্তু কী বই দিল জয়াদি?

এ কী জিনিস!

মানুষ এমন লিখতে পারে?

এ যে চেঁচিয়ে পড়বার, লোককে ডেকে শোনাবার!

এ কি সেই কবির কথা? না আমার কথা?

এ যে আমি মনে মনে পড়ে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না গো—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান।
না জানি কেমনে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

এর কোন্ লাইনটাকে বেশি ভাল বলবো আমি, কোন্ লাইনটাকে নয়?

'জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,

ওরে উথলি উঠিছে বারি।
প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর—'

এ পদ্য আমি সবটা মুখস্থ করবো।

আমি ওদের সংসারের জ্বালায় আর কষ্টবোধ করবো না। ওরা যা চায় তাই করে দিয়ে নিজের মনে এই বই নিয়ে বসবো। আরো যে সব পদ্য আছে, সব শিখে ফেলবো।

জয়াদি দেবী, তাই এই স্বর্গের স্বাদ এনে দিল আমায়। জয়াদির স্বামী দেবতা, তাই তাঁর মনে পড়েছে আমি পদ্য ভালবাসি। ভগবান, ও'দের বাঁচিয়ে রাখো, সুখে রাখো।

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর—'

এর সব কথা আমার, সব কথা আমার জন্যে লেখা!

'কেন রে বিধাতা পাষাণে হেন
চারিদিকে তাঁর বাঁধন কেন?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন...
সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন—'

উঃ, কী চমৎকার, কী অপূর্ব! আমি কি করবো!

'স্বর্গ' বলে কি সত্যিই কোন রাজ্যপাট আছে? সত্যিই মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মেঘেরও ওপরে সেই জগৎ, সেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, অভাব নেই, নিরাশ নেই, খলতা-কপটতা নেই, এক কথায় বলতে গেলে এই পৃথিবীর ধুলো-ময়লার কোন কিছুই নেই!

নাকি ওটা শুধুই কবিকল্পনা? আমাদের এই মনের মধ্যেই স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল! এই মনের 'অনুভব'ই পৃথিবীর ধুলোমাটি থেকে অনেক উঁচুতে, মনের যত মেঘ তারও ওপরে উঠে গিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছয়?

কে জানে কি! আমার তো মনে হয়, শেষের কথাটাই বুঝি ঠিক। আর উঁচুদরের কবিরা পারেন সেই অনুভবের উঁচু স্বর্গে নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে পৌঁছলে মনেই পড়ে না পৃথিবীতে দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, ধুলো-ময়লা আছে।

শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ!

চোখে জল এসে যাওয়া অন্য এক রকমের আনন্দ!

কিন্তু মানুষকে কেন নিয়ে যেতে পারেন না কবিরা? পারেন না বলেই না সেই আনন্দের দেশ থেকে হঠাৎ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়তে হয়!

অন্তত সেদিনের সেই সংসারবুদ্ধিহীনা বালিকা সুবর্ণলতা তাই পড়েছিল। সেই আছাড় খাওয়ার দুঃখে তার বিশ্বাসের মূল যেন আলগা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের ওপর বিশ্বাস, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস, ভগবানের ওপর বিশ্বাস। সব বিশ্বাস বুঝি শিথিল হয়ে গেল।

সুবর্ণর স্বামী রূঢ় রুক্ষ, সুবর্ণ জানে সে কথা, কিন্তু সে যে এত বেশী নীরেট নির্বোধ, এত বেশি ক্রূর, সে কথা বুঝি জানতো না তখনো।

জানলো, আছাড় খেয়ে জানলো।

এই বহুদূরে এসে সেই সংসারবুদ্ধিহীন আবেগপ্রবণ মেয়েটার দিকে

তাকিয়ে করুণা হয় সুবর্ণর, ওর আশাভঙ্গের আর বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখে চোখে জল আসে। মেয়েটা যে একদার 'আমি', ভেবে ভেবেও মনে আনতে পারে না।

কিন্তু ওই 'আমি'টার মত এত ভয়ঙ্কর পরিবর্তনশীল আর কি আছে? 'আমি'তে 'আমি'তে কী অমিল!

তবু তাকে আমরা 'আমি'ই বলি—

অবোধ সুবর্ণও ভেবেছিল, এই আনন্দের স্বাদ ওকেও বোঝাই। আমার স্বামীকে। তখনো তার ওপর আশা সুবর্ণর!

আশা করেছিল ওরও হয়তো মনের দরজা খুলে যাবে! তাই বলেছিল, 'তোমার খালি "শুয়ে পড়া যাক, শুয়ে পড়া যাক।" বোসো তো একটু, শোনো। কী চমৎকার!'

হ্যাঁ, প্রদীপটা উস্কে দিয়েছিল, সুবর্ণ তার সামনে ঝুঁকে পড়ে পড়েছিল—

> 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
> আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।'

ও সেই সুবর্ণকে থামিয়ে দিলো, বেজার গলায় বললো, 'জগৎসুদ্ধ সবাই এসে কোলাকুলি করছে? তাই এত ভাল লাগছে? বাঃ বাঃ, বেড়ে চিন্তাটি তো! শত শত মানুষ এসে প্রাণে পড়ছে? তোফা! এমন রসের কবিতাটি লিখেছেন কোন্ মহাজন?'

সুবর্ণ বলল, 'আঃ, থামো না! শেষ অবধি শুনলে বুঝবে—'

আবার পড়তে শুরু করে। পড়ছে,—হঠাৎ ও ফস করে বইটা কেড়ে নিল, বলে উঠলো, 'তোফা তোফা! এ যে দেখছি রসের সাগর! কি বললে, "এসেছে সখাসখি, বসেছে চোখাচোখি"? আর যেন কি, "দাঁড়িয়ে মুখোমুখি"? বলি এসব মাল আমদানি হচ্ছে কোথা থেকে?'...ব্যঙ্গের সুর গেল, ধমক দিয়ে উঠলো, 'কোথা থেকে এল এ বই?'

চোখে জল এসে গেল মেয়েটার, সেটা দেখতে দেবে না, তাই কথার উত্তর দেয় না।

ও বইটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর সাপের মত হিসহিসিয়ে বলে উঠলো, 'এই যে প্রমাণ-পত্তর তো হাতেই। "প্রাণাধিকা ভগিনী শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবীকে স্নেহোপহার—", বলি এই প্রাণাধিক ভ্রাতাটি কে? কোথা থেকে জোটানো হয়েছে এটিকে?'

লেখাটা যে মেয়েমানুষের হাতের, তা কি ও বুঝতে পারে নি! নিশ্চয় পেরেছিল! সত্যি বেটাছেলে ভাবলে বইটাকে কি আস্ত রাখতো? কুচি কুচি করে ছিঁড়তো, পা দিয়ে মাড়াতো! এ শুধু সুবর্ণকে চারটি বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কথা বলে নেবে বলেই ছল করে—

চোখ দিয়ে খুব জল আসছিল, তবু সুবর্ণ জোর করে চোখটা শুকনো রেখেছিল, শক্ত গলায় বলেছিল, 'দেখতে পাচ্ছো না মেয়েমানুষের হাতের লেখা? ও-বাড়ির জয়াদি দিয়েছেন!'

ওর মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো, 'ও-বাড়ির জয়াদি মানে? জয়াদিটি কে?'

'জানো না, তোমাদের নতুনদার বৌ! জয়াবতী দেবী।'

'বটে! নতুনদার বৌ! বলি তিনি কি আসা-যাওয়া করছেন নাকি? আশ্চর্য বেহায়া মানুষ তো! এদিকে জোর তলবে মামলা চলছে, আর ওদিকে তিনি প্রাণাধিকা ভগিনীকে স্নেহ-উপহার ঘুষ দিতে আসছেন!'

আমি সুবর্ণলতা দেবী রেগে গিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'মামলা ওরা করে নি, তোমরাই করেছ। জানতে বাকি নেই আমার! আর "ভালবাসা" জিনিসটা জানো না বলেই ঘুষ বলতে ইচ্ছে করছে তোমার!'

'ভালবাসা! ওঃ!' বইখানা পাকিয়ে মোচড় দিতে দিতে বললো, 'তুমি যে জিনিসটা খুব জানো তা আর আমারও জানতে বাকি নেই। যারা আমাদের শত্রুপক্ষ, উনি ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে মেয়ে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে ভালবাসা জমাতে! মাকে বলে দিতে হচ্ছে, ও-বাড়ি থেকে লোকের আসা বন্ধ করছি!'

বলে বইটা নিয়ে নিল ও।

বললো, 'যাক, আর কাব্যিতে দরকার নেই! এমনিতেই তো সংসারে মন নেই! এসো দিকি এখন—'

বলে প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিল ও।

কিন্তু শুধু কি ঘরটাই অন্ধকার করে দিল?

ন বছর বয়সে এদের বাড়িতে এসেছিলাম, আর এই তেরো বছর পার করতে চললাম, অনবরত শুনছি 'সংসারে মন নেই'! শাশুড়ী বলেন, তাঁর ছেলে বলেন। দ্যাওররাও তো বলতে ছাড়ে না। কি জানি 'সংসারে মন' কাকে বলে! কাজকম্ম সবই তো করি। আমার গায়ে জোর বেশি বলে তো বেশি বেশিই করি। আর কি করতে হয়! আমার ওই বড়জায়ের মত—সব সময়ে রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে থাকতে পারি না, এই দোষ। তা আর কি করবো!

ও আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু দিদিরই কি সত্যি ভাল লাগে? ওর ইচ্ছে করে না, দোতলায় উঠে আসে, নিজের ঘরে এসে বসে, মেয়েকে দেখে?

করে ইচ্ছে। বুঝতে পারি।

তবু দিদি সুখ্যাতির আশায় ওইরকম রাতদিন নিচের তলায় পড়ে থাকে। কি না লোকে বলবে, 'কী লক্ষ্মী বৌ! সংসারে কী মন?'

আচ্ছা, কী লাভ তাতে?

ওই সব স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর লোকেদের মুখের একটু সুখ্যাতি পেয়ে লাভ কি? আর চিরকালই কি ওরা সুখ্যাতি করে? দিনের পর দিন 'ভাল' হয়ে হয়ে আর খেটে খেটে যে সুনামটুকু হয়, তা তো একদণ্ডেই মুছে যায়। দেখিনি কি? এত কন্না করে দিদি, একদিন দ্বাদশীতে ভোরবেলা উঠে এসে শাশুড়ীকে তেল মাখিয়ে দিতে দেরী করে ফেলেছিল বলে কী লাঞ্ছনাই খেলো! দ্বাদশীতে নাকি নিজে হাতে তেল মাখতে নেই। জানি না, এইসব 'এই করতে নেই' আর 'ওই করতে নেই'-এর মালা কে গেঁথেছিল বসে বসে!

মাও বলতেন বটে 'করতে নেই'।

সে আর কি 'বেলা অবধি ঘুমোতে নেই', 'ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই', 'বড়দের সামনে বেশি কথা বলতে নেই', 'গরীব মানুষকে তুচ্ছ করতে নেই', 'ভিখিরিদের তাড়িয়ে দিতে নেই'—এইসব! মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিতেন মা সেসব।

তার তো তবু মানে আছে।

আর এদের বাড়িতে?

এদের বাড়িতে যে কী অনাছিষ্টি সব কথা! মানে নেই! শুধু করতে নেই সেটাই জানা!

আর বৌ-মানুষদের যে কত-ই নেই!

বৌ-মানুষের তেষ্টা পেতে নেই, খিদে পেতে নেই, ঘুম পেতে নেই, আবার হাসিও পেতে নেই! 'লক্ষ্মী বৌ' নাম নিতে হলে কথাও বলতে নেই! এত সাধনার শেষ মূল্য অথচ শেষ পর্যন্ত ওই। একদিন একটু দোষ করে ফেললেই সেই ছুতোয় চিরদিনের সব নম্বর কাটা।

কী লাভ তবে ওই বৃথা কষ্টে?

আর ওই ভাল হওয়াটা তো মিথ্যে বানানো, বলতে গেলে একরকম ছলনা। হ্যাঁ, ছলনাই। আমি যত ভাল নই, ততটা 'ভাল' দেখানো মানেই তো ছলনা। তবে তা দেখাবো কেন আমাকে?

ওসব মিথ্যে আমার ভাল লাগে না।

দিদি অবিশ্যি সত্যিই ভাল মেয়ে। তবু আরো দেখাতো চেষ্টা করে। তাই সেদিন শাশুড়ীর পায়ে ধরে আবার তেল মাখাবার অধিকার অর্জন করে নিয়েছিল।

ওই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ঘটা দেখলে আমার হাসি পায়। দিদি কেঁদে মরছে দেখে হেসে মরছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন!

যেদিন সেই স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম?

যেদিন নিশ্চিত জেনেছিলাম, আমার স্বামীর সঙ্গে কোনোদিনই মনের মিল হবে না আমার? সেদিন কি হাসতে পেরেছিলাম? ওর বোকামি দেখে, ওর নীরেট্য দেখে? পারি নি। রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছিলাম।

অবশ্য জীবনের এই দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে জেনেছি, 'মনের মিল' শব্দটা একটা হাস্যকর অর্থহীন শব্দ।

ও হয় না।

মনের মিল হয় না, মনের মত হয় না!

নিজের রক্তে-মাংসে গড়া, নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় গড়া সন্তান—তাই কি মনের মত হয়?

হয় না, হয় নি। আমার ছেলেমেয়েরা?

ওরা আমার অচেনা।

শুধু আমার শেষের দিকের তিনটে ছেলেমেয়ে, পারুল, বকুল আর সুবল, যাদের দিকে আমি কোনদিন ভাল করে তাকাই নি, যাদের 'গড়বার' জন্যে বৃথা চেষ্টা করতে যাই নি, তারাই যেন মাঝে মাঝে আশার আলো দেখায়। মনে হয় ওই দর্জিপাড়ার গলিতে বোধ হয় ওদের শেকড় বসে নি, ওরা স্বতন্ত্র। ওরা নিজের মনে ভাবতে জানে।

তবু ওদের সঙ্গেই কি আমার পরিচয় আছে?

ওরা কি আমার অন্তরঙ্গ?

নাঃ, বরং মনে হয়, ওরা আমাকে এড়ায়, হয়তো বা—হয়তো বা আমাকে ঘেন্না করে।

আর ভয় তো করেই, আমাকে নয়, আমার আচরণকে। ওরা হয়তো

আমাকে বুঝতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারতো। কিন্তু তা করে নি।

ওরা অনেক দূরের।

তবু ওরা যে ওদের দাদা-দিদির মতন নয়, সেইটুকু আমার সান্ত্বনা আমার সুখ।

পারুর মুখে আমি মাঝে মাঝেই আর এক জগতের আলো দেখছি, পারু লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে এ আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু পারুর জন্যে আমার দুঃখ হয়, পারুর জন্য আমার ভাবনা হয়। বড় বেশি অভিমানী ও। ওর ওই অভিমানের মূল্য কি এই সংসার দেবে? বুঝবে ওর স্বার্থ-বুদ্ধিহীন কবিমনের মূল্য?

হয়তো আমার মতই যন্ত্রণা পাবে ও। অভিমানের জবালাতেই আমি জীর্ণ হলাম!

তবু আমি চিরদিনই প্রতিবাদ করেছি, চেঁচামেচি করেছি, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

ও তা করবে না।

ও ওর মায়ের মত অসভ্য হবে না, রূঢ় হবে না, সকলের অপ্রিয় হবে না! কারণ ও শান্ত, ও মৃদু, ও সভ্য। ও শুধু অভিমানীই নয়, আত্মাভিমানী। ও ওর প্রাপ্য পাওনা না পেলে নীরবে সে দাবি ত্যাগ করবে, ও অন্যায় দেখলে নিঃশব্দে নিজেকে নির্লিপ্ত করে নেবে। ও অপরকে 'ভালো' করে তোলবার বৃথা চেষ্টা করবে না।

জানি না পারুকে যার হাতে তুলে দিয়েছি, সে পারুকে বুঝতে চেষ্টা করছে কিনা। ওকে বোঝা শক্ত। নিজের সম্পর্কে ওর ধারণা খুব উঁচু। ও আমার এই শেষদিকের অবহেলার মেয়ে। চাঁপা-চন্নরের মত অত রূপও নেই, বিদুষী হবার সুযোগও পায় নি, তবু নিজেকে ও 'তুচ্ছ' ভাবতে পারে না। ওর এই মনের 'দায়' কে পোহাবে? হয়তো সেই দায় ওকে নিজেকেই পোহাতে হবে। আর সেই ভার পোহাতে পোহাতেই ওর সব সুখ-শান্তি যাবে। নিজেকে বইবার কষ্ট যে কী, সে তো আমি জানি! 'পারুকে আমরা রীতিমত সুপাত্রের হাতে দিতে পেরেছি'—এই আমার স্বামীর গর্ব। আরও দু জামাইয়ের থেকে অনেক বিদ্বান আর রোজগারী পারুর বর।

বিদ্বান আর রোজগারী, কুলীন আর বনেদী ঘর, এই তো 'সুপাত্রে'র হিসেব, এই দেখেই তো বিয়ে দেওয়া। কে কবে দেখতে যায়, তার রুচি কি, চিন্তা কি, জীবনের লক্ষ্য কি?

দেখতে যায় না বলেই এত অমিল!

তলায় তলায় এত কান্না!

শুধু যে মেয়েমানুষই কাঁদে তাও তো নয়। পুরুষেও কাঁদে বৈকি। তার অন্তরাত্মা কাঁদে।

সবাই তো সমান নয়, কেউ হয়তো ছোট সুখ, ছোট স্বস্তি, ছোট গণ্ডি—এইতেই পরম সন্তুষ্ট, কারো বা অনেক আশা নিয়ে ছুটোছুটি।

দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

শুধু ভাগ্যদেবী যখন দুটো দু প্রকৃতির মানুষকে এক ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মজা দেখেন তখনই অশেষ কষ্ট।

আমার স্বামীকে স্বামী পেয়ে সুখী হবার মত মেয়েই কি জগতে ছিল

না!'

অথচ তারা হয়তো উদার, হৃদয়বান, পণ্ডিত স্বামীর হাতে পড়ে সে স্বামীকে অতিষ্ঠ করে মারছে।

বিরাজের কথাই ধরি না।

বিরাজ তো তার ভাইদের মতই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত, পরশ্রীকাতর আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অথচ তার স্বামী কত ভাল, কত উদার, কত ভদ্র!

বিরাজ মৃতবৎসা।

ডাক্তারে বলেছে এটা বিরাজেরই দেহের ত্রুটি, তবু বিরাজ স্বামীকেই দোষ দেয়, স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে। বিরাজকে নিয়ে ঠাকুরজামাই চিরদিন দগ্ধাচ্ছে।

প্রকৃতির পার্থক্য! এর বাড়া দুঃখ নেই।

তাই মনে হয়, হয়তো পারুর কপালেও দুঃখ আছে।

কিন্তু বকুল?

বকুল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির।

বকুল নিজের তুচ্ছতার লজ্জাতেই সদা কুণ্ঠিত। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ও যেন নিজের জন্মানোর অপরাধেই মরমে মরে আছে। ও যে ওর মায়ের বুড়ো বয়সের মেয়ে, ও যে অনাকাঙ্ক্ষিত, ও অবহেলার, ও যে অবান্তর, এই দুঃখময় সত্যটি বুঝে ফেলে সংসারের কাছে ওর না আছে দাবি, না আছে আশা! তাই এতটুকু পেলেই যেন বর্তে যায়। পারুর ঠিক উল্টো।

পারুও মুখ ফুটে কোনদিনই কিছু চায় না, কিন্তু পারুর মুখের ভাবে ফুটে ওঠে, ওর প্রাপ্য ছিল অনেক, খেলোমি করার রুচি নেই বলেই ও তা নিয়ে কথা বলে না।

আশ্চর্য! একই রক্তমাংসে তৈরি হয়ে, একই ঘরে মানুষ হয়ে, এমন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি কি করে হয়?

কোথা থেকে আসে নিজস্ব চিন্তা ভাব ইচ্ছে পছন্দ?

অথচ দুই বোনে মতান্তরও নেই কখনো। বেচারী বকুলের যা কিছু কথা সবই তো তার সেজদির সঙ্গে। আবার পারুলের যা কিছু স্নেহ-মমতা, তা বকুলের ওপর।

মা-বাপের কাছে কোনদিন আশ্রয় পায় নি ওরা, বড় ভাইবোনের কাছে পায় নি প্রশ্রয়, তাই ওরা যেন নিজেদের একটা 'কোটর' তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

সে কোটর থেকে চলে যেতে হয়েছে পারুকে, বকুল একাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে তার মধ্যে।

তবে পারুর মত নিজের মধ্যেই নিজে মগ্ন নয় বকুল, সকলের সুখবিধানের জন্যে যেন সদা তৎপর।

সংসার জায়গাটা যে নিষ্ঠুর, তা জেনে-বুঝেও ও যেন সংসারের ওপর মমতাময়ী। ওর মধ্যে বিধাতা একটি হৃদয় ভরে দিয়েছেন, ছোটবেলা থেকে তার প্রকাশ বোঝা গেছে। ভীতু-ভীতু নীরব প্রকাশ।

ওকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে হয় আমার। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের লজ্জায় পারি না। যদি ও অবাক হয়, যদি ও আড়ষ্ট হয়?

আর সুবল?

সুবলকে ঘিরে পাথরের পাঁচিল!

সুবলের মধ্যে 'বস্তু' আছে, সুবলের মধ্যে হৃদয় আছে, কিন্তু সুবল যেন সেই 'থাকাটুকু' ধরা পড়ে যাবার ভয়ে একটা পাথরের দুর্গ গড়ে তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে চায়।

হয়তো—

এদের বাড়িতে 'হৃদয়' জিনিসটার চাষ নেই বলেই সেটাকে নিয়ে এত সঙ্কোচ আমার ছোট ছেলের।

কিন্তু সুবল কি এই পৃথিবীর ঝড়-ঝাপটা সয়ে বেশিদিন টিকবে? দুর্বল স্বাস্থ্য ক্ষীণজীবী এই ছেলেটার দিকে তাকাই আর ভয়ে বুক কাঁপে আমার। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করবো সে উপায় আমার হাতে নেই।

যদি বলি 'সুবল, তোর মুখটা লাল-লাল দেখাচ্ছে কেন. জ্বর হয় নি তো? দেখি—'

সুবল মুখটা আরো লাল করে বলবে, 'আঃ, দেখবার কি আছে? শুধু শুধু জ্বর হতে যাবে কেন?'

যদি বলি, 'বড্ড কাশছিস সুবল, গায়ে একটা মোটা জামা দে!'

সুবল গায়ে পরা পাতলা কামিজটাও খুলে ফেলে শুধু গেঞ্জি পরে বসে থাকবে।

রোগা বলে সুবলের জন্যে একটু বেশি দুধের বরাদ্দ করেছিলাম, তদবধি দুধ একেবারে ত্যাগ করেছে সে। সেবার ভানুকে দিয়ে একবোতল টনিক আনিয়েছিলাম. বোতলটার মুখ পর্যন্ত না খুলে যেমনকে তেমন লেপের চালিতে তুলে রেখে দিল সুবল. বললো, 'থাক্, দামী জিনিস উঁচু জায়গায় তোলা থাক।'

অদ্ভুত এই অকারণ অভিমানের সংগে লড়াই করতে পারি, এমন অস্ত্র আমার হাতে নেই।

আমার বড়জা হলে পারতো হয়তো।

হাউ হাউ করে কাঁদতো, মাথার দিব্যি দিতো, নিজে 'না খেয়ে মরবো'— বলে ভয় দেখাতো। সেই সহজ কৌশলের কাছে প্রতিপক্ষ হার মানতো।

কিন্তু আমি তো আমার বড় জায়ের মত হতে পারলাম না কোনদিন।

সহজ আর সস্তা।

তা যদি পারতাম, তাহলে জয়াদির ভালবাসার উপহার সেই বইটাকে চিরকালের জন্যে হারাতাম না। চেয়ে-চিন্তে, কেঁদে-কেটে, যেভাবেই হোক আদায় করে নিতাম। কিন্তু আমি তা পারি নি। সেই যে ও কেড়ে নিল, কোথায় লুকিয়ে রাখলো. আমি আর তার কথা উচ্চারণও করলাম না। বুক ফেটে যেতে লাগলো, তবু শক্ত হয়ে থাকলাম। পাছে ও বুঝতে পারে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আমার বইটার জন্যে, তাই সহজভাবে কথা কইতে লাগলাম। কাজেই ও বাঁচলো।

বইটাই চিরতরে গেল!

চিরটাদিন এই জেদেই অনেক কিছু হারিয়েছি আমি। অনেক অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছি। ও আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি অগ্রাহ্য করেছি। অন্তত অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়েছি।

ভেবেছি গ্রাহ্য করলেই তো ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো! আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ও কি আমার মনোভাব বুঝতে পারে নি?

ভেবেছে, তাই আরো হিংস্র হয়েছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেওছি।

ওর বেশি অসুখ করলে আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেবা করেছি, আমার কোনো অসুখ করলে ও ছটফটিয়ে বেড়িয়েছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ও আমাকে, আর আমি ওকে ছোবল দেবার চেষ্টা করে ফিরেছি।

অদ্ভুত এই সম্পর্ক, অদ্ভুত এই জীবন!

দর্জিপাড়ার সেই বাড়িতে আর তিন-তিন জোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, জানি না তাদের ভিতরের রহস্য কি?

বাইরে থেকে দেখে তো মনে হতো, ওদের স্ত্রীরা স্বামীদের একান্ত বশীভূত ক্রীতদাসের মত। স্বামীদের ভয়ে তটস্থ, তাদের কথার প্রতিবাদ করবার কথা ভাবতেও পারে না।

আমার ভাসুর অবশ্য এদের মত নয়, সরল মানুষ, মায়ামমতাওলা মানুষ, কিন্তু দিদির প্রকৃতিই যে ভয় করে মরা! ও জানে শ্বশুরবাড়ির বেড়াল কুকুরটাকে পর্যন্ত ভয় করে চলতে হয়। স্বামীকেও করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু এদের? সেজ আর ছোটর?

এদের মধ্যে সম্পর্ক যেন প্রভু-ভৃত্যের।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, বাইরে থেকে যা দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই কি সত্যি? আমার স্বামীকেও তো বাইরে থেকে দেখে লোকে বলে স্ত্রীর 'দাসানুদাস', বলে 'কেনা গোলাম', বলে 'বশংবদ'!

গিরিবালা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করলো, গিরিবালা স্বামীর সঙ্গে একত্রে গুরুদীক্ষা নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরোলো। গিরিবালা সেই যাত্রাকালে মেজভাসুরের বাড়ি বেড়াতে এসে গল্প করে গেল কাশীতে কদিন থাকবে, কদিন বা বৃন্দাবনে, মথুরায়।

গিরিবালার মুখে সৌভাগ্যের গর্ব ঝলসাচ্ছিল।

আমি মূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিলাম সেই মুখের দিকে। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, এ কী করে সম্ভব! আমার সেজ দ্যাওরকে তো আমি জানি!

চরিত্রদোষের জন্যে খারাপ অসুখ হয়েছিল ওর। এ কথা লুকোছাপা করেও লুকোনা থাকে নি! তাছাড়াও মানুষের শরীরে যত অসৎ বৃত্তি থাকা সম্ভব, যত নীচতা, যত ক্রূরতা, তার কোন্‌টা নেই ওর মধ্যে?

তবু গিরিবালা আহ্লাদে ডগমগ করছে, লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে সৌভাগ্যকে ভোগ করছে।

একে কি 'সত্যি' বলবো?

না এ শুধু মনকে চোখ ঠারা?

কে জানে মন-ঠকানো, না লোক-ঠকানো!

বিন্দু আবার আর এক ধরনের।

ওর রাতদিন কেবল হা-হুতাশ আর আক্ষেপ। ও প্রতিপন্ন করতে চায়, জগতের সেরা দুঃখী ও।...যেমন করতে চায় আমার বড়মেয়ে আর মেজমেয়ে চাপা আর চন্নন!

কিন্তু সত্যিই কি ওরা আমার মেয়ে?

ওই চাঁপা আর চন্নন?

আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় নিতান্তই দৈব-দুর্ঘটনায় ওরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে কিছুদিনের জন্যে আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের থেকে বুঝি আমার ননদরা আমার অনেক বেশি নিকট।

কিন্তু তার জন্যে আর আক্ষেপ নেই আমার, আক্ষেপ শুধু এই পোড়া বাংলা দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ের জন্যে। আজও যারা চোখে ঠুলি এঁটে অন্ধ নিয়মের দাসত্ব করে চলেছে।

আজও যারা জানে, তারা শুধু 'মানুষ' নয়, 'মেয়েমানুষ'।

কিন্তু সুবর্ণলতার স্মৃতিকথায় স্থানকালের ধারাবাহিকতা নেই কেন? অতীতে আর বর্তমানে এমন ঘেঁষাঘেঁষি কেন?

অনেক 'সুবর্ণলতা' একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে বলে? যে যখন পারছে কথা কয়ে উঠছে?...তাই সূত্র নেই?

গোড়ার দিকের পাতাগুলো তবু ভরাট ভরাট, তারপর সবই যেন খাপছাড়া ভাঙাচোরা।

হঠাৎ লিখে রেখেছে, 'মানুষের ওপর শ্রদ্ধা হারাবো কেন? জগু বট-ঠাকুরকে তো দেখেছি, দেখেছি বড় ননদাইকে, দেখলাম অম্বিকা ঠাকুরপোকে।' আবার তার পরের পাতায় এ কোন্ জনের কথা?

বাবাকে...অপমান করে চলে এলাম।...বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কি করবো? এ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না আমার।...

'নিকটজনদের দুঃখের কারণ হবো'—এই হয়তো আমার বিধিলিপি।

আমার নিষ্ঠুরতাই দেখতে পাবে সবাই, আমার ফেটে যাওয়া বুকটা কেউ দেখবে না! শুধু জানবে সুবর্ণ কঠোর, সুবর্ণ কঠিন।

জানুক। তাই জানুক।...

ভেবেছিলাম এই অপমানিত জীবনটার শেষ করে দিয়ে এ জন্মের দেনা শোধ করে চলে যাব।

হল না।

ভগবানও আমাকে অপমান করে মজা দেখলেন, যমও আমাকে ঠাট্টা করে গেল। দেখি তবে এর শেষ কোথায়? নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারদিকে, দেখতে পাচ্ছি শুধু আমি একা নয়, সমস্ত মেয়ে-মানুষ জাতটাই একটা অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না।

কারণ?

কারণ তারা রোজগার করে না, অপরের ভাত খায়। হ্যাঁ, এই একমাত্র কারণ।

আর স্বার্থপর পুরুষজাত সেই অবস্থাকেই কায়েমী রাখতে মেয়েমানুষকে

শিক্ষার সুযোগ দেয় না, চোখ-কান ফুটতে দেয় না। দেবে কেন? বিনি-মাইনের এমন একটা দিনরাতের চাকরানী পাওয়া যাচ্ছে এমন সুযোগ ছাড়ে কখনো?

পা বেঁধে রেখে বলবো, 'ছি ছি, হাঁটতে পারে না'! চোখ বেঁধে রেখে বলবো, 'রাম রাম, দেখতে পায় না'! আর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বলবো, 'ঠুঁটো ঠুঁটো'! এ কী কম মজা?

চিরদিন এইরকমই তো করে আসছে পুরুষসমাজ আর সমাজপতিরা।

'মেয়েমানুষ পরচর্চা করে, মেয়েমানুষ কোঁদল করে, আর মেয়েমানুষ ভাত সেদ্ধ করে' এই হল তোমাদের ভাষায় মেয়েমানুষের বিবরণ। ভেবে দেখ না, আর কোন্ মহৎ কাজ করতে দিয়েছ তোমরা মেয়েমানুষকে?

দেবে না, দিতে পারবে না।

দুবেলা দুমুঠো ভাতের বদলে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি করতে পারার অধিকার, এ কি সোজা সুখ? ওই দুমুঠোর বিনিময়ে সেই মানুষটার দেহ থেকে, মন থেকে, আত্মা থেকে, সব কিছু থেকে খাজনা আদায় করা যাচ্ছে —তার ওপর উপরি পাওনা নিজের নীচতা আর ক্ষুদ্রতা বিস্তার করবার একটা অবারিত ক্ষেত্র।

মেয়েমানুষ যে পুরুষের 'পায়ের বেড়ি' 'গলগ্রহ' 'পিঠের বোঝা', উঠতে বসতে এসব কথা শোনাবার সুখ কোথায় পাবে পুরুষ, মেয়েমানুষ যদি লেখা-পড়া শিখে ফেলে নিজের অন্নসংস্থান করতে সক্ষম হয়?

তাই পাঁকের ভরা পূর্ণ আছে।

মুখ্যু মুখ্যু, বুঝবে না ওই পাঁকে নিজেরাও ডুবছে।

তবু—

বুঝতে একদিন হবেই।

তীব্রদৃষ্টি তীক্ষ্ণকণ্ঠ এক জ্বলন্তদৃষ্টি মেয়ে যেন আঙুল তুলে বলছে, 'এই মেয়েমানুষদের অভিসম্পাত একদিন লাগবে তোমাদের। সেদিন বুঝতে পারবে চিরদিন কারুর চোখ বেঁধে রাখা যায় না। "পতি পরম গুরু"র মন্তর চিরদিন আর চলবে না।'

আরো কত কি যেন বলছে সেই মেয়ে, আগুনঝরা চোখে, রূঢ়কঠিন গলায়, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অত্যাচার অবিচার এর মাপ হয় না।'

কিন্তু দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হচ্ছে। সে অগ্নিমূর্তি মেয়ের এ আবার কোন্ রূপ!

উদাস বিহ্বল স্বপ্নাচ্ছন্ন!

কী বলছে ও?

অদ্ভুত অসম্ভব।

ও না তিন-তিনটে ছেলেমেয়ের মা?

ও কি ভুলে গেছে তাদের কথা? তাই ওই মেঘলা দুপুরে হাতের বইখানা মুড়ে রেখে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ভাবছে, প্রেম, প্রেম! কি জানি কেমন সেই জিনিস, কেমন স্বাদ? সে কি শুধুই নাটক-নভেলের জিনিস? মানুষের জীবনে তার ঠাঁই নেই? প্রেম-ভালবাসা সবই মিথ্যে, অসার?

আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক, আমি কাউকে ভালবাসি।

জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা, তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না—প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার।

যে প্রেমের মধ্যে কবিরা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পান, যে প্রেমকে নিয়ে জগতের এত কাব্য গান নাটক...

একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?

॥ ১৮ ॥

বড় ইচ্ছে হচ্ছিল সুবর্ণর, আর একবার জগু-বট্‌ঠাকুরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। নিজের চোখে একবার দেখে কেমন করে ছাপা হয়। কমন করেই বা সেই ছাপা কাগজগুলো মলাট বাঁধাই হয়ে বই আকারে বেরিয়ে আসে আঁট-সাঁট হয়ে।

বই বাঁধাইয়ের কাজও নাকি বাড়িতেই হয় ওঁর, বাড়িতে দপ্তরী বসিয়ে। ঘুঁটে-কয়লা রেখে নিচের তলায় যে ঘরখানাকে বাতিলের দরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটাই জগুর দপ্তরীখানা।

সবই সেদিন মামীশাশুড়ীর কাছে শুনে এসেছে সুবর্ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। কোন কিছু খুঁটিয়ে তো দূরস্থান, জিজ্ঞেস করাই স্বভাব নয় সুবর্ণর, তাই আশ্চর্যই হয়েছিলেন বোধ হয় শ্যামাসুন্দরী, তবু বলেও ছিলেন গুছিয়ে গুছিয়ে কোন্‌খানে কী হয়!

সুবর্ণর প্রাণটা যেন সর্বদাই শতবাহু বাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় সেই জায়গাগুলোয়। কি পরম বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটছে এখন সেই চিরকালের পরিচিত জীর্ণ বাড়িখানার ভাঙা নোনাধরা বালিখসা দেওয়ালের অন্তরালে। টানবেই তো সেই অলৌকিক স্বর্গলোক সুবর্ণকে তার সহস্র আকর্ষণ দিয়ে।

তাছাড়া শুধুই যে কেবলমাত্র একবার দেখবার বাসনাতেই তাও ঠিক নয়, কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে ওই 'স্মৃতিকথা'র খাঁজে খাঁজে আরও দু-চার পাতা 'কথা' গুঁজে দিয়ে আসে।

সুখস্মৃতিও আছে বৈকি কিছু কিছু। লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা।

যেবার সেই প্রথম থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সুবর্ণ প্রবোধের সঙ্গে—

হ্যাঁ, তেমন অঘটনও ঘটেছিল একবার। সেই যেবার সুরাজ এসে কতদিন যেন ছিল বাপের বাড়ি সেবার। বিরাজ বেড়াতে এসে ধরে পড়লো, 'থিয়েটার দেখাও দাদা মেজদা! সেজদি সেই কোথায় না কোথায় পড়ে থাকে—'

মেজদাকে ধরার উদ্দেশ্য, মেজবৌদির কলকাঠি নাড়ার গুণে ঘটবেই ব্যাপারটা। নচেৎ আর কে এই 'খরচে'র আবদার বহন করবে?

সুবোধের তো সংসার টানতে টানতেই সব যাচ্ছে, সেজদাটি কিপটের রাজা, ছোড়দা তো নিজেই রাতদিন নিজেকে 'গরীব' বলে বাজিয়ে বাজিয়ে সংসার থেকে সব কিছু সুখ-সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে। অতএব মেজদা! কর্তব্য-

পরায়ণা আর চক্ষুলজ্জাবতী মেজবৌদি যার কর্ণধার।

'বিরাজের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল, যাত্রা থিয়েটার এসব তারা দেখে, বলা বাহুল্য বৌদেরও দেখায়। কিন্তু কথাটা তো তা নয়। বাপের বাড়িতে এলাম, ভাইয়েরা আদর করলো, এসব দেখানোর সঙ্গে একটা মহৎ সুখ নেই! 'যা করছো তোমরাই করছো', এমন দৈন্য ভাবটা তো গৌরবের নয়।

তা বোনের সে আবদার রেখেছিল প্রবোধ, নিয়ে গিয়েছিল দুই বোনকে আর তার সঙ্গে বৌগুলোকেও। এমন কি উমাশশীও তার হাঁড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্পন্দিত হয়েছিল। দুপুরবেলাই রান্নাবান্না সেরে নিয়েছিল সে—লুচি আলুরদম বেগুনভাজা করে। সুরাজ রাবড়ী আর রসগোল্লা আনিয়েছিল।

অতএব ব্যাপারটায় যেন একটা উৎসবের সমারোহ লেগেছিল।

আর সেদিন যেন প্রবোধকে একটু সভ্য আর ভদ্র মনে হয়েছিল সুবর্ণর। হয়েছিল ভদ্র সেদিন প্রবোধ।

কেন?

কে জানে!

কে জানে সুবর্ণরই ভাগ্যে, না প্রবোধেরই ভাগ্যে! মোট কথা প্রভাস যখন ওদের বেরোবার প্রাক্কালে বলে উঠেছিল, 'থিয়েটার দেখতে যাওয়া হচ্ছে না থিয়েটার করতে যাওয়া হচ্ছে'? এবং প্রকাশ তাতে 'দোয়ার' দিয়ে আর একটু ব্যাখ্যানা করেছিল, 'যা বললে সেজদা মাইরি, থিয়েটারউলিদের বেহদ্দ হয়ে বেরুচ্ছেন দেখছি বিবিরা—' তখন প্রবোধই ভদ্রকথা বলেছিল। বলেছিল, 'যা মুখে আসে বললেই হল নাকি রে পেকা? গুরু-লঘু জ্ঞান নেই তোদের? এ বা কি, আরো কত সেজে আসে মেয়েরা! আর কত বেহায়াপনাই করে! দোতলার জালগুলো তো কেটে 'ওয়ার' করে দিয়েছে ছুঁড়ীরা। এ বাড়ির বৌ-ঝির মতন সভ্য তুই কটা পাবি?'

সুবর্ণ বিগলিত হয়েছিল সেদিন সেই মহান কথা শুনে। বিনিময়ে তার খাটো ঘোমটার ফাঁক থেকে একটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিল ওই সহসা ভদ্র হয়ে ওঠা স্বামীর চোখে চোখে। আর সেদিনই যেন প্রথম মনে পড়েছিল সুবর্ণর, তার স্বামীর রূপ আছে।

রূপ ছিল প্রবোধের, বয়সের তুলনায় এখনও আছে। আর আছে এবং ছিল সাজসজ্জার শৌখিনতা। ঢিলেহাতা গিলেকরা পাঞ্জাবি পরেছিল সেদিন প্রবোধ, পরেছিল চুনট-করা ফরাসডাঙা ধুতি, কানে আতরমাখা তুলো, মাথায় পরিপাটী টেরি। যদিও পুরুষমানুষের এত সাজ হাসির চোখেই দেখতো সুবর্ণ, তবু সেদিন যখন সুরাজ বলেছিল, 'বাবাঃ, মেজদার কী বাহার গো, যেন বিয়ে করতে যাচ্ছে!' আর তার মেজদা হেসে বলে উঠেছিল, 'থাম্ তো পোড়ারমুখী, ভারি ফক্কড় হয়েছিস', তখন সত্যি বলতে বেশ ভালই লেগেছিল সুবর্ণর সেই হাসিটুকু।

হয়তো প্রবোধের সেদিন মেজাজ শরীফ ছিল, ওই নারীবাহিনীতে দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ ছিল না বলে, আর কোনো 'লোভী চক্ষু' তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তিটির ওপর দৃষ্টি দিচ্ছিল না, অতএব—

তাছাড়া নিজে খরচখরচা করে গাড়িভাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে এদের, এর মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদের সুখও ছিল। তাই সেদিন উদার হয়েছিল প্রবোধ,

সভ্য হয়েছিল. সুন্দর সেদিনের স্মৃতিকথা পরিচ্ছন্ন করে মাজা একটি গ্লাসে এক গ্লাস জলের মত স্নিগ্ধ শীতল।

তা সেই জলের কথাটাও না হয় থাকুক সুবর্ণর আগুনের অক্ষরের পাশে পাশে। নইলে হয়তো বিধাতার কাছে অকৃতজ্ঞতা হবে। একটি সন্ধ্যাও তো তিনি সুধায় ভরে দিয়েছিলেন!

মূল বইটা ছিল 'বিল্বমঙ্গল', তার আগে কি যেন একটা হাসির নাটক ছিল ছোট্ট একটুখানি। নাম মনে নেই, কিন্তু পাঁচ ননদ-ভাজে মিলে যে হাসতে হাসতে গড়িয়েছিল তা মনে আছে।

তারপর 'বিল্বমঙ্গল'! প্রেম আর ভক্তির যুগপৎ আবেগে গড়া সেই নাটক অশ্রুর মালা ঝরিয়েছিল চোখ দিয়ে। হাসি ও অশ্রুতে গড়া সেই সন্ধ্যাটির প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রতিটি শব্দও যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা কায়দা শিখেছিল বিরাজ, থিয়েটারে আসতে কৌটো ভর্তি-ভর্তি পান সেজে আনতে হয়। পান খাবে মুঠো মুঠো, আর 'ড্রপসিন' পড়ার অবকাশকালে লেমনেড খাবে, কুলপি খাবে, ঠোঙা ঠোঙা খাবার খাবে, তবে না থিয়েটার দেখা?

তা করেছিল এসব প্রবোধ।

একদিনের রাজা হয়ে মেজাজটাই রাজসই হয়ে গিয়েছিল তার।

নিচে থেকে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল শালপাতার ঠোঙাভর্তি হিঙের কচুরি, আলুর দম, খাস্তা গজা আর অমৃতি এবং পাঁচ বোতল লেমনেড।

উমাশশী বার বার বলেছিল, 'ওমা, বাড়িতে যে ছিষ্টি রেঁধেবেড়ে রেখে আসা হয়েছে গো—এখন এইসব এত খাওয়া!'

বিরাজ বলেছিল, 'ভয় নেই গো বড়গিন্নী, সে সবও উঠবে। ফুর্তির চোটে পেটে ডবল খিদে।'

আশ্চর্য, সুবর্ণরও সেদিন ওই নেহাৎ মোটা কৌতুকের কথাগুলোও দিব্যি উপভোগ্য মনে হয়েছিল, খেয়েছিল। সকলের সঙ্গে, আর কখনো যা করে নি তাই করেছিল, মুঠোভর্তি পান খেয়েছিল।

প্রথমে খেতে চায় নি, সুরাজই জোর করেছিল, 'খাও না বাবা একটা, জাত যাবে না।' কেয়া খয়ের, জৈত্রি-জায়ফল, অনেক কিছু দিয়ে নবাবী পান বানিয়ে এনেছে বিরাজবালা—

'তবে দাও তোমাদের নবাবী পান একটা, দেখি খেয়ে বেগম বনে যাই কি না—', বলে হেসে একটা পান নিয়েছিল সুবর্ণ। তার পরই কেমন ভাল লেগে গেল, পর পর খেয়ে নিল অনেকগুলো। তারপর ঝাঁক ঝাঁক লেমনেড্। তার স্বাদটা কি লেগে আছে গলায়?

থিয়েটারের সেই ঝিটার ভাঙা কাঁসরের মত গলার স্বরটা যেন হঠাৎ সেই দূর অতীত থেকে এসে আছড়ে পড়ল—'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবুর বাড়ি গো' —'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবুর পেবোবাবুর বাড়ি গো'!

অভ্যাসবশত প্রথমে দাদার নামটা বলে ফেলে শেষে আবার নিজের নামটাও গুঁজে দিতে সাধ হয়েছিল প্রবোধের।

....

থিয়েটার দেখা হলো, খাওয়া-দাওয়া হলো, শেষ অবধি আবার ঘোড়ার গাড়িতে উঠে ও হাতে হাতে একটা 'অবাক জলপানে'র খিলি গুঁজে দিয়ে গাড়ির

মাথায় উঠে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসলো প্রবোধ, নেহাৎই উমাশশী গাড়িতে আসীন বলে। তবু বিরাজ যখন বলে উঠলো, 'যাই বল বাপু, মেজদার সঙ্গে বেরিয়ে সুখ আছে', তখন বড়ভাজের উপস্থিতি ভুলে বলেই ফেলল প্রবোধ, 'সুখ না দিয়ে রক্ষে আছে? মহারাণীর মেজাজ তা হলে সপ্তমে উঠবে না?'

থিয়েটার কি আর কখনো দেখে নি তারপর সুবর্ণ?

দেখেছে বৈকি। দেখে নি বললে পাতক। কিন্তু সে আস্বাদ আর আসে নি, দেখেছে মানে 'দেখিয়েছে'। যখন ননদরা এসেছে, গেছে, অথবা কাউকে আদর জানানোর প্রয়োজন পড়েছে, থিয়েটার 'দেখানো' হয়েছে। আর কে সেই দায় নেবে সুবর্ণ ছাড়া?

অতএব মাঝে মাঝে নিজেকেও যেতে হয়েছে তাদের সঙ্গে।

একবার তো 'প্রহ্লাদ চরিত' দেখাতে মুক্তকেশী এবং তস্য সখী হেমাঙ্গিনীকে নিয়েও যেতে হয়েছিল। আর সঙ্গে ছিল সুশীলা। এবং প্রবোধ।

মা, মাসী, দিদির সঙ্গে বৌকে নিয়েছিল প্রবোধ। এ বেহায়াপনাটুকু করেছিল সে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে অতক্ষণের জন্যে রেখে যেতে যেন মন সায় দেয় না। তাস খেলতে খেলতে তবু এক-আধবার ছুতো করে উঠে এসে দেখে যাওয়া যায়, এতে তো সে উপায়ও নেই। অতএব চক্ষুলজ্জার দায়মুক্ত হওয়াই শ্রেয়।

পাঁচজনকে অবশ্য শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে হয়েছে, 'মা তো জানেই না কোথায় বসতে হয়, কখন উঠে আসতে হয়। মেজবৌ তবু ওতে পোক্ত।'

সুবর্ণ অবশ্য এই একা সুযোগ নেওয়ার পক্ষপাতী নয়, কিন্তু ইদানীং সেজবাবু ছোটবাবু তাঁদের বৌদের হ্যাংলার মত অপরের পয়সায় থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় মানের হানি বোধ করছিলেন, তাই নানা অজুহাত দেখিয়েছেন তাঁরা। আর উমাশশীর তো 'সংসারের অসুবিধে' ভাবলেই মাথায় আকাশ ভাঙে।

তাই ইদানীং যা যাওয়া হয়েছে, যেন কর্তব্য করতে। সেই প্রথম দিনের উচ্ছল আনন্দ অনুপস্থিত থেকেছে। সেদিনটি আছে সোনার অক্ষরে লেখা।...

কারণ—কারণ সে সন্ধ্যার রাত্রিটাও হয়েছিল বড় সুন্দর। সুরাজ বলেছিল, 'আজ রাতটা আমরা ননদ-ভাজে গল্প করে কাটাবো ঠিক করেছি মেজদা, তোমার ঘরেই আমাদের স্থিতি। তুমি বাপু কেটে পড়। শুয়ে পড়গে ও-ঘরে।'

আর আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রবোধ জ্বলে ওঠে নি, কটু কিছু বলে ওঠে নি এবং কলে-কৌশলে শেষ অবধি সুবর্ণকে কবলিত করবার চেষ্টা করে নি। এবং একটা হাই তুলে বলেছিল, 'গল্প করে রাত জাগবি কি বল? এতক্ষণ থিয়েটার দেখে এসে? আমার তো ঘুমে শরীর ভেঙে আসছে!'

আর তারপর হঠাৎ একটু হেসে উঠে বলেছিল, 'আর যা নাটক দেখে এলাম বাবা, মনে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের ওপর এতটা আসক্তি না রেখে ভগবান-টগবানের কথাই ভাবা উচিত।'

'ওরে বাস্, একেবারে কা তব কান্তা কস্তে পুত্র!' অনুচ্চ হাসি হেসে বলে উঠেছিল সুবর্ণ, আর প্রবোধ অলক্ষ্যে তার পিঠে একটা চিমটি কেটে সত্যিই চলে গিয়েছিল শয়নকক্ষের দুরন্ত আকর্ষণ ত্যাগ করে।...

কী মুক্তি!

কী মুক্তির আস্বাদ!

সুবর্ণর বিবাহিত জীবনের মধ্যে সে মুক্তির স্বাদ আর কবে এসেছে তার আগে অথবা পরে?

কবে এমন স্বেচ্ছায় দাবি ত্যাগ করে ঘুমোতে চলে গেছে প্রবোধ? কাজের বাড়িটাড়িতে অসুবিধেয় পড়ে ঘরের অকুলান হলে গজরেছে, ছুতো করে এসে আগে-ভাগে শুয়ে থেকেছে।

যারা গল্প করে রাত কাটাবে বলে আহ্লাদ জানিয়েছিল, তারা তো তখুনি গড়াগড়ি। সুবর্ণ ঘুমোয় নি সে রাতে। এই মধুর অবকাশটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল। আর অদ্ভুত একটা কাজ করে বসেছিল সে সেই রাতে।

সেই প্রথম।

হ্যাঁ, সেই প্রথম একটা পদ্য লিখে ফেলেছিল সুবর্ণ।

এখন অবশ্য সে পদ্য ভাবলে হাসি পায়, তবু সেই তো প্রথম। পুরনো পচা একখানা খাতার হলদে হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠায় আজও আছে সেটা। ছিঁড়ে ফেলে দিতে মায়া হয়েছে......

এবং আশ্চর্য, আজও মুখস্থ আছে সেটা!

কালটা তো আগের, ভাষাও অতএব তদ্রূপ। কিন্তু সেদিন সেই কবিতা লিখে ফেলে কী অপূর্ব পুলকস্বাদে ভরে গিয়েছিল মন! মনে হয়েছিল কবিদের মতই তো হয়েছে ঠিক! ওঁরাও কি এই রকমেরই লেখেন না!

অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশেতে থাকি,
পৃথিবীর পানে কি গো মেলে থাকে আঁখি?
দেখিলে দেখিতে পাবে তারই দিকে চেয়ে
জাগিয়া কাটায় এক পৃথিবীর মেয়ে।
পিঞ্জরের পাখীসম বন্দী তার প্রাণ,
ঊর্ধ্ব আকাশেতে যেন কি করে সন্ধান!
কিন্তু হায় কাটে সুর, ভেঙে যায় মন,
রুদ্ধ করি দিতে হয় মুক্ত বাতায়ন।
নিষ্ঠুরা পৃথিবী আর প্রভাত নিষ্ঠুর।
নিশীথের সব স্বপ্ন করে দেয় চুর।
জেগে ওঠে শত চক্ষু, আসে দুঃখ গ্লানি,
নীরবে ঘোরাতে হয় নিত্যকার ঘানি।

তা এই সেকেলে ভাষার পদ্যকে আর একালের খাতায় স্থান দেবার বাসনা নেই, কিন্তু সেই দিনটাকে ঠাঁই দিতে ইচ্ছে করে।

জীবনের প্রথম পদ্য লেখার দিন।

সেই দিনটির পুলক-স্বাদ নিয়ে খানিকটা লিখে ফেলে।

আর একবার মামীশাশুড়ীর বাড়ি যাবার সংকল্প স্থির করেছিলো সুবর্ণ, তবু হচ্ছেও না যেন।

কারুরই কিছু মনে করবার কথা নয়, মা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে, এতে আর এখন অবাক হয় না সুবর্ণর

ছেলেমেয়েরা। মুক্তকেশীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধকার্যের ব্যাপারে ওটা হঠাৎ কেমন চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সুবর্ণলতার কেন মনে হচ্ছে ওরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ভাববে, হঠাৎ মামীশাশুড়ীর ওপর এত ভক্তির হেতু? এই তো সেদিন গেলেন!

যাই যাই করেও তাই দিন গড়ায়।

॥ ১৯ ॥

কিন্তু সুবর্ণলতার স্মৃতির পৃষ্ঠায় 'কবিতা লেখার দিনে'র স্মৃতি আর কই? তার পাতায় পাতায় খাঁচার পাখীর ডানা ঝটপটানির শব্দটাই তো প্রখর।

তবে তাকে তার সেই স্মৃতির জানলা থেকে—কবিতা পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। কে জানে কোথা থেকে সংগ্রহ করে, আর কেমন করেই বা পায় ছাড়পত্র, তবু দেখা যায়, যে বাড়িতে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক আর নূতন পঞ্জিকা ছাড়া আর কোনো বই আসত না, সে বাড়িতে কোণের দিকের একটা ঘরে খাটের তলায়, দেয়াল-আলমারিতে, জানলা-দরজার মাথার তাকে তাকে থাকে-থাকে জমে ওঠে বই, কাগজ, পত্রপত্রিকা।

হয়তো ঘরের প্রকৃত মালিক শাসন করে করে 'এলে' গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নইলে কিশোরী সুবর্ণলতার স্মৃতির ইতিহাসে তার বই কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, পুড়িয়ে দেওয়া, সব কিছুর নজিরই তো আছে। শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েছে। অথবা হয়তো দেখেছে, এতেই পাখীটা ঝটপটায় কম।

আরও পাখী তো আছে এ-বাড়ির খাঁচায়, কই তারা তো এমন করে না! বরং তারা আড়ালে বলাবলি করে, 'ধন্যি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা, এত অপমানের পরও আবার সেই কাজ। আমরা হলে বোধ হয় জীবনে আর ও বস্তু আঙুলের আগা দিয়েও ছুঁতাম না। আর মেজবাবুরও হচ্ছে মুখেই মর্দানি! বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরো!'

সুবর্ণলতা তার 'আড়ালে'র কথা টের পায় না। সুবর্ণলতা তার আপন আবেগ আর অনুভূতির পরিমণ্ডলে বিরাজ করে। তাকে বেহায়া বল বেহায়া, অবোধ বল অবোধ।

তা হয়তো এক হিসেবে অবোধই।

নইলে উমাশশীদের কাছেও এক এক সময় ছুটে যায় সে এক-একটা নতুন অনুভূতির আবেগ নিয়ে। হয়তো শীতের দুপুরে উমাশশী রোদে বসে বড়ি দিচ্ছে, গিরিবালা পশমের রং মিলিয়ে 'খুঞেপোষ' বুনছে আর বিন্দু রোদেই একটু গড়িয়ে নেবে বলে মাদুর বিছোচ্ছে, সুবর্ণ সেখানে যেন আছড়ে এসে পড়ে। উত্তেজিত আরক্ত মুখ আরো লালচে করে বলে, 'দিদি, জীবনভোর শুধু বড়িই দিলে, জানলে না এ জগতের কোথায় কি আছে! শোনো, শোনো একবার, পুরুষ কবি কেমন করে ফুটিয়ে তুলেছেন মেয়েমনের কষ্ট-দুঃখ!' বলে,

কিন্তু চেয়ে দেখে না, ওরা "জগতের কোথায় কি আছে" জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে, না পরস্পর কৌতুকদৃষ্টির বিনিময় করছে। কৌতুক তো করেই তারা সুবর্ণকে নিয়ে। ওটি যে একদিকে যেমন তেজী অহঙ্কারী আস্‌পদ্দাবাজ, আর একদিকে তেমনি বদ্ধ পাগল। হাসবে না ওকে নিয়ে?

ওরা সুবর্ণর ওই ছেলেদের পড়া মুখস্থর মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পদ্য পড়া দেখলে হাসে। বদ্ধ পাগলটা অবশ্য ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে—

'বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল্‌!
পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—'

আবেগে থরথর করে গলা, চোখ দিয়ে অসতর্কে কখন জল গড়িয়ে পড়ে। আর ভাবে, পদ্য না বুঝুক প্রাণ-নিংড়ানো ওই মর্মকথাটুকু তো ওদের মর্মে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।...বেচারীরা চোখ বুঝে দিন কাটাচ্ছে, হঠাৎ হয়তো এতেই চোখ ফুটে যাবে। বুঝতে পারবে 'এই প্রাণপাত করে সংসার করা, ওই ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে থাকা' সব বৃথা, এখানে আমাদের কেউ 'আপন' ভাবে না। এখানে সবাই আমরা—

'ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ্‌ করে সবে করে না স্নেহ।'

আর এও বুঝুক, জগতে এমন হৃদয়বান মহৎ পুরুষও আছেন, যিনি নিরুপায় মেয়েমানুষের এই যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাকে ব্যক্ত করবার ভাষা যোগান। আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি করে জানলেন রবি ঠাকুর—

'এখানে মিছে কাঁদা
দেওয়ালে পেয়ে বাধা,
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।'

কি করে টের পেলেন—

'সবার মাঝে আমি
ফিরি একেলা,
কেমন করে কাটে
সারাটি বেলা,
ইঁটের পরে ইঁট,
মাঝে মানুষ-কীট,
নাহিক ভালবাসা
নাহিক খেলা।'

এমন স্পষ্ট করে বলাও বুঝতে পারবে না চিরবন্দিনী উমাশশী? বুঝতে পেরে ভাববে না—'আমাদের এই যে অবস্থা, তা তো কই আগে জানতাম না! কি অন্ধই ছিলাম!'

ওদের চোখ খুলতে বসে সুবর্ণ, আর হঠাৎ একসময় নিজেরই চোখ খুলে যায় ওর। গিরিবালা সহসা শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'গলাটাকে একটু খাটো করো মেজদি, নিচে যেন কার চটির শব্দ পেলাম, ছোট্‌ঠাকুরপো এলেন বোধ হয়।'

আর সেই বলে ওঠার ঢিল খেয়ে চমকে তাকিয়ে উঠে দেখে সুবর্ণ, উমা-শশীর ইত্যবসরে দুকুলো বড়ি দেওয়া হয়ে গেছে, আর বিন্দু ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে।

'মর, চটির শব্দে কান খাড়া করেই মর তোমরা। জেলখানাই সুখের সাগর

তোমাদের—', বলে রাগ করে উঠে যায় সুবর্ণ, আর নিজের ঘরে বসে বইটা মুড়ে রেখে মৃদু আবেগে বলে, 'কোথায় আছিস তুই কোথায় মাগো, কেমনে ভুলিয়া আছিস হাঁ গো—'

ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ে বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে।

এমন ঘটনা কতদিনই ঘটে।

প্রবোধ প্রায়ই ভারী থমথমে অন্য জগতে হারিয়ে-যাওয়া-মন স্ত্রীকে কাছে পায়।

কাজেই দোষ দেওয়া যায় না তাকে যদি সে বলে, 'এই এক রবি ঠাকুর হয়েছেন দেশের মাথাটা খাবার জন্যে! মেয়েমানুষগুলো যাবে এবার উচ্ছন্নে। সেই যে বলে না—

"পদ্ম গেল পটল গেল গুগ্‌লি হল আঁখি,
আর শালিক গেল ফিঙে গেল আরশোলা হল পাখী!"

'হেম বাঁড়ুয্যে, ঈশ্বর গুপ্ত তো ছার—তোমার মতে বোধ হয় তোমার ওই রবি ঠাকুর মাইকেলের চেয়েও বড় কবি!'

সুবর্ণ মাথা তুলে ওই বিদ্রূপমাখা মুখের দিকে তাকায়, আর তারপর হিন্দুনারীর ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তোমাদের মত মুখ্যুদের কাছে আমি কিছুই বলতে চাই না।'

কিন্তু এসব কবেকার কথা?

খাঁচার পাখীর এই ডানা ঝটপটানির কাহিনী!

এসব তো সুবর্ণলতার বহু পুরনো কথা।

যেসব কথা খাতায় লিখে গেলে মূল্যহীন, বিবর্ণ, একঘেয়ে। তাই খাতায় তোলা হয় না, শুধু স্মৃতির ঘরের চাবিটা খুললেই একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় অনেকে হুড়মুড়িয়ে একাকার হয়ে।

কিন্তু খাঁচার পাখীর ডানা ঝটপটানোর বাইরের বৃহৎ পৃথিবী তো স্থির হয়ে থাকে না।

খাঁচার পাখী আকাশের দিকে চোখ মেলে আর্তনাদ করে, পাখীর মালিক খাঁচার শিক শক্ত করতে চেষ্টা করে, বৃহৎ পৃথিবী তাকে উপহাস করে এগিয়ে যায়, আকাশকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলবার দুঃসাহসে হাত বাড়ায়...কবিরা শিল্পীরা নিঃশব্দে আপন মনে অচলায়তন ভাঙার কাজ করে চলে, বিচারকের মন সশব্দ প্রতিবাদ তোলে, শিকলদেবীর পূজার বেদীতে শাবল-গাইতির ঘা পড়ে, তার মধ্যে দিয়ে সমাজ-মন অবিরাম ভাঙা-গড়ার পথে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে।

তাই সহসা একদিন সচকিত হয়ে দেখা যায় কখন কোন্ ফাঁকে অবরোধের বজ্রমুষ্টি যেন শিথিল হয়ে এসেছে, অবগুণ্ঠন হ্রস্ব হয়ে গেছে, রাজরাস্তাটা যে একা পুরুষের কেনা জায়গা নয়, সেটা ওই স্বল্পাবগুণ্ঠিতারা যে বুঝে ফেলেছে, ওদের চোখে-মুখে আচারে-আচরণে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আর কতকগুলো দুঃসাহসী মেয়ে ইতিমধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই রাস্তায়। তারা পিকেটিং করছে, মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। আসমুদ্রহিমাচল একটি নামে স্পন্দিত হচ্ছে, একটি কণ্ঠের ডাকে ছুটে আসছে।

সে নাম 'গান্ধীজী'।

সে ডাক 'একলা চল রে'।

কবির ভাষা প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে।

দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক!

দর্জিপাড়ার গলিও বুঝি আর চোখে ঠুলি এ'টে থাকছে না। সেখানেও নাকি ছেলেরা বলছে 'বিলিতি সাবান মাখা হবে না আর' এবং বিন্দু আর গিরিবালা নাকি বিলিতি নুন আর চিনি বাতিল করে 'কর্কচ' আর 'দোলো' খাচ্ছে, এবং বাজার থেকে বিলিতি কুমড়ো বিলিতি আমড়া আর বিলিতি বেগুন আনা নিষেধ করে দিয়েছে।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত নিরক্ষর সবাই এক কথা কইছে, কেউ আর এখন বলছে না 'রাজত্বটা বৃটিশের'। সবাই বুঝে ফেলেছে ওরা অন্যায় করে দখল করে আছে, অতএব ন্যায়ের দখল নিতে হবে। সবাই জেনে গেছে মহাত্মা গান্ধী 'স্বরাজ এনে দেবেন।'

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'—এ হয়তো তাদেরই রক্তে ভেজা মাটির ফসল। তারা বীজ পুঁতে রেখে গেছে। এখন এসেছে আর এক মালী তাতে জল দিতে।

ফল?

খাবে দেশের লোক। খেলো বলে।

সদ্য ফল যে হাতে হাতেই মিলবে। যারা পুলিসের গুঁতো খাচ্ছে, বুটের ঠোক্কর খাচ্ছে, জেলের ভাত খাচ্ছে, তারা কষ্টের শেষের পুরস্কার খাবে সেই ফল।

কিন্তু সুবর্ণলতার মনের মধ্যে কেন তেমন সাড়া নেই? যে সুবর্ণলতা স্বদেশীর নামে টগবগিয়ে ফুটতো, সে কেন স্বরাজের ব্যাপারে এমন মিইয়ে আছে?

দেশে যখন নিত্য-নতুন ঢেউ আসছে, যখন কূলভাঙা প্লাবন আসছে, প্রবোধের তো তখন সর্বদা সশঙ্কিত অবস্থা। আর বুঝি রাখা যাবে না ওকে গৃহ-কোটরে। হঠাৎ কোনদিন শুনবে, মেয়ে দুটোকে নিয়ে পিকেটিং করতে বেরিয়ে গেছে সুবর্ণলতা লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু কই? তেমন উন্মাদনা কই?

কানু যেদিন একটা চরকা কিনে বললো, 'মা, বাজে গাল-গল্পে দিন না কাটিয়ে এবার প্রতিটি মিনিট সুতো কাটতে হবে, এই চরকা-কাটা সুতোয় কাপড় বুনিয়ে পরতে হবে সবাইকে', সেদিন তো কই সুবর্ণ ওই নতুন জিনিসটার ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল না? বলল না, 'তোকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করি কানু, আমার মনের মত কাজ করলি তুই!'

না, সে কথা বলল না সুবর্ণ, শুধু একটু হেসে বললো, 'গাল-গল্প আবার কে করছে রে এত?'

'আহা গাল-গল্প না হোক, নাটক-নভেল পাঠ! একই কথা! মোট কথা সময়ের অপচয়। আর অপচয় করা চলবে না।'

'চলবে না বুঝি?' আরও একটু হেসেছিল সুবর্ণ, 'তবে চরকাটাই চালা। তোদেরই এখন সামনে সময়। আমার তো এখন সময়ের সম্বল সব পেছনে ফেলে চলে আসা জীবন।'

'চমৎকার! কত কত আশী-নব্বুই বছরের বুড়ো-বুড়ী চরকা কাটছে তা জানো? রাস্তায়-চল-মানুষ পর্যন্ত তকলি কাটতে কাটতে চলেছে।'

'তা চলতেই পারে। যখন যা ফ্যাশান ওঠে!'

'ফ্যাশান! একে ফ্যাশান বলছো তুমি?'

কানু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এমন কি কানুর বাবাও।

সুবর্ণর মুখে এ কথা অভাবনীয় বৈকি।

সাধে কি প্রবোধ এই অদ্ভুত 'উল্টো-পাল্টা'-কে নিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরলো চিরদিন?

কানু মাকে অনেক ধিক্কার দিয়েছিল।

বলেছিল, 'স্বরাজ অমনি আসবে না। তার জন্য ক্লেশ চাই, দুঃখ চাই।'

মুক্তকেশীর নাতি, প্রবোধের বংশধর বলেছিল এ কথা উত্তেজিত গলায়।

অতএব বলতেই হবে দেশের মজা নদীতে বান ডেকেছিল। তথাপি সুবর্ণ উত্তেজিত হয় নি। সুবর্ণ আবার হেসে উঠে বলেছিল, 'তা তোর এই সুতো কাটার মধ্যে ক্লেশই বা কই? দুঃখই বা কই? আর গেরস্তঘরের মেয়েমানুষের অবসরই বা কই?'

কানু আরও জ্বলেছিল।

আর একবার নাটক-নভেলের খোঁটা দিয়েছিল, সুবর্ণলতার দু-দুটো বড় হয়ে ওঠা মেয়ে কি রাজকার্য করে তার হিসেব চেয়েছিল। হ্যাঁ, দুটো মেয়ের কথাই তুলেছিল কানু—তখনো পারুর ঘরবসত হয় নি, আর কানুর বিয়ে হয় নি।

কানুর বিয়ে লাগলো ওই চরকার ঢেউটা একটু কমলে। অনেকের বাড়িতেই তখন আধভাঙা চরকাটা ছাতের সিঁড়িতে কি চিলেকোঠায় আশ্রয় পেয়েছে। শুধু কারুর দেওয়ালে চরকা-কাটা-রত গৃহিণীর বা বধূর ফটোটি ঝুলছে উজ্জ্বল মহিমায়।

তা সে যাই হোক—পারুল-বকুলের কথা তুলেও মাকে নোয়াতে পারে নি কানু। সুবর্ণ বলেছিল, 'সে ওদের নিজের থেকে ইচ্ছে হয়, প্রেরণা আসে করবে ওরা। আমি হুকুম দিতে যাব কেন? বিশেষ করে আমার যাতে বিশ্বাস আসছে না।'

তা হলেই বল উল্টোপাল্টা কিনা?

দু-পাঁচটা ছেলে ঘরে বসে দুটো হাতবোমা বানিয়ে আর পুলিস মেরে দুর্ধর্ষ বৃটিশের গোলা-বারুদের শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলবে এ বিশ্বাস তোমার ছিল, আর এতে তোমার বিশ্বাস নেই?

তা কানুর রাগের মানে অবশ্যই আছে।

সুবর্ণর ভুল।

কোনোটাই নিরর্থক নয়। কোনো প্রাপ্তিই হঠাৎ আসে না। কাজ চলে নানা চিন্তায় নানা হাতে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তো পরমকে পাওয়া যায়।

কিন্তু একবগ্গা সুবর্ণ বলে, 'পরমকে পেতে হলে চরম মূল্য দিতে হয়।'

অথচ ওই চরমটা যে কি সেকথা বলে না। হয়তো সে ধারণাও ওর নেই। শুধু একটি 'বড় কথা বলনেওয়ালা ভাবের ফানুস' বৈ তো নয়।

তবে মোটের মাথায় দেখা গিয়েছে সুবর্ণ এতখানি সুবর্ণ-সুযোগেও রাজ-পথে নামে নি। রাজপথের কলকোলাহলের দিকে দর্শকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে শুধু।

তবে বিদেশী জিনিস বর্জন!

সে তো বহুকাল আগে থেকেই হয়ে আসছে। ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় মেনেই নিয়েছে সবাই সুবর্ণলতার এই জবরদস্তি। হয়তো বা রাগারাগি কেলেঙ্কারির ভয়েই। ঘরে পরে কাউকেই তো রেয়াৎ করে না সুবর্ণ!

এ পাড়ায় বাড়ি করবার সময় থেকেই পাশের বাড়ির পরিমলবাবুদের সঙ্গে ভাব। পরিমলবাবুর স্ত্রী সর্বদা আগবাড়িয়ে এসে নতুন-আসা পড়শীদের সুবিধে-অসুবিধে দেখেছেন। বলতে গেলে আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছেন। তবু একদিন পরিমলবাবুর স্ত্রী যখন বেড়াতে এসে বলেছিলেন, 'দেশী দেশলাই দেখেছ বকুলের মা? দেখে আর হেসে বাঁচি না। জ্বলবার আগেই নিভছে। একটা উনুন জ্বালাতে একটা দেশলাই লাগবে। বিলিতির সঙ্গে আর পাল্লা দিতে হয় না বাবা কিছুর।'

তখন সুবর্ণ ফস্ করে বিলিতি দেশলাই কাঠির মত জ্বলে উঠে বলেছিল 'এসব গল্প আমার কাছে করবেন না দিদি, আমার শুনতে খারাপ লাগে।'

পরিমলবাবুর স্ত্রী মানুষ ভাল, তবে মাটির মানুষ তো নয়! অতএব হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছেদ।

অনেকদিন লেগেছিল মনের সেই মালিন্য ঘুচতে। বোধ করি ছেলেমেয়ে-দের কারো বিয়ে উপলক্ষেই আবার আসা-যাওয়ার পথে পুনর্মিলন। তাছাড়া পরিমলবাবুর ছেলে সুনির্মল তো কোনোদিনই ওসব মনোমালিন্যের ধার ধারে নি। ঘরের ছেলের মত এসেছে, বসেছে, খেয়েছে।

সেই আসা-যাওয়ার অন্তরালে—

কিন্তু সেকথা থাক।

॥ ২০ ॥

সুবর্ণর অগাধ সমুদ্রের এক অঞ্জলি জল, অগাধ স্মৃতিকথার একমুঠো কথা এবার আলোর মুখ দেখবে। তাই সুবর্ণলতা মর্মরিত হচ্ছে। তাই সুবর্ণ তাকিয়ে দেখছে না তার অন্তঃপুরে লোকাচারবিধির সমস্ত অনুশাসনগুলি নির্ভুল পালিত হচ্ছে কিনা।

এখন সুবর্ণ অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তার সেই প্রথম কবিতার দিনটির কাহিনীখানি অক্ষরের বন্ধনে বন্দী করে নিয়ে একবার মামীশাশুড়ীর বাড়ি যাবার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছিল।...

তাই ছেলেকে ডেকে বলছিল, 'সুবল, একখানা গাড়ি ডেকে এনে দিতে পারবে?'

তা এই রকমই কথা সুবর্ণর।

'সুবল, একটা গাড়ি ডেকে এনে দে' না বলে 'এনে দিতে পারবে'?

মা-ছেলের সহজ সম্বন্ধের ধারার মধ্যে যেন দূরত্বের পাথর পড়ে আছে চাঁই চাঁই, তাই জলটা বয়ে যায় ঘোরাপথে।

কে জানে এই পাথরটা কার রাখা?

মায়ের না ছেলের?

সুবলও তো বলল না, 'কী আশ্চর্য, পারব না কেন? যাবে কোথায়? চল পৌঁছে দিচ্ছি গিয়ে।'

সুবল শুধু যান্ত্রিক গলায় উচ্চারণ করলো, 'কখন দরকার?'

সুবর্ণলতা আহত দৃষ্টিতে তাকায়।

সুবর্ণলতা যেন বড় অপমান বোধ করে।

সুবর্ণলতা তো জানে, ওর এই ছোট ছেলেটার ভিতরে হৃদয় আছে। তবে সুবর্ণলতার বেলায় কেন সে হৃদয়ের এতটা কার্পণ্য? যেন চেষ্টা করে হৃদয়টাকে শক্ত মুঠোয় আটকে রাখে সুবর্ণলতার ছোট ছেলে। কিছুতেই যাতে না অসতর্কে একটু স্খলিত হয়ে পড়ে।

আশ্চর্য!

'মা' বলে কতদিন ডাকে নি সুবল?

ইচ্ছে করে না এই কাঠিন্যের সামনে এসে কোনো আবেদন করতে। তবু একআধ-সময় উপায়ও তো থাকে না। একা একটা ভাড়াটে গাড়ি করে এবাড়ি-ওবাড়ি করার সাহসটাই তো অসমসাহসিকতা। তবু সে সাহস দেখায় সুবর্ণ, দুটো শ্বশুরবাড়ি একাই যাওয়া-আসা করে। তাই বলে পথে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি ধরে নিয়ে যাওয়া তো চলে না? সেটা যেন সাহস নয়, অসভ্যতা। অন্তত সুবর্ণর মাপকাঠিতে।

সুবল না হোক, অন্য ছেলেরা এই নিয়ে শোনাতে ছাড়ে না। বলে, 'আর গাড়ি ডেকে দেওয়ার "ফার্স" কেন বাবা? বেশ তো স্বাধীন হয়েছ, যাও না, বেরিয়ে পড়ে ডেকে নাও গে না একখানা।'

বলে আরো বৌদের কাছে তীক্ষ্ণ হুল খেয়ে।

বৌদের একা এক পা বেরোবার হুকুম নেই, অথচ শাশুড়ী দিব্বি—

তা সুবল কিছু শোনাল না। শুধু বললো, 'কখন দরকার?'

সুবর্ণও অতএব সেই যান্ত্রিক গলাতেই উত্তর দেয়, 'এখনই দরকার। তা নইলে বলতে আসবো কেন? ঝি আসে নি এখনো—'

কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে ওঠে সুবর্ণর।

নিচে ও কার গলা?

জগু বটঠাকুরের না?

কেন?

এমন অসময়ে কেন উনি?

তবে কি বলতে এসেছেন ও বই উনি ছাপতে পারবেন না?

পড়ে কি বিরক্ত হয়েছেন?

অবাক হয়েছেন সুবর্ণর নির্লজ্জতায়?

কিন্তু সেই নির্লজ্জতার বিস্ময়ে অমন গলা ছেড়ে বাদ-বিতণ্ডা করবেন? কার সঙ্গে করছেন?

একটা হিন্দুস্থানীর গলা না?
গাড়োয়ান? পয়সা নিয়ে কচকচি করছেন?
আর বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না।

ছাপাখানার মালিক জগন্নাথচন্দ্রের হেঁড়ে গলা আকাশে ওঠে, 'সুবল, কই রে সুবল! এই যে বৌমা, তুমিই এসে গেছ। তোমার বই এনে দিলাম। পাঁচশ' কপি ছাপিয়েছি, বুঝেছ? প্রথম বই, বিয়ের পদ্যর মত বিলোবে তো চাট্টি! বেশি থাকাই ভাল। মুটে ব্যাটা কি কম শয়তান! ওই কখানা বই এপাড়া-ওপাড়া করতে কিনা ছ পয়সা চায়। চার পয়সার বেশি হওয়া উচিত? বল তো বৌমা? রাগ করে দু'আনিটাই ছুঁড়ে দিলাম। বলি, "নে ব্যাটা, পান খেগে যা"।'

এই বাক্যস্রোতের মাঝখানে বকুল এসে নীরবে জ্যাঠাকে প্রণাম করে, তাদের জগু জ্যাঠামশাইয়ের এমন অসময়ে আবির্ভাবের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। সঙ্গে ওগুলোই বা কি?

তা জগু কাউকে বেশিক্ষণ অন্ধকারে ফেলে রাখেন না। সহর্ষে বলেন, 'এই যে তোমাদের মা'র বই হয়ে গেছে। নাও এখন বন্ধুবান্ধবকে বিলোও। সার্থক মা তোমাদের, লোকের কাছে বলতে কইতে মুখ উজ্জ্বল। ছাপাখানার লোকেরা তো শুনে তাজ্জব।'

বলা বাহুল্য, বকুল এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে না।
মা'র বই! সেটা আবার কি জিনিস!
তাই অবাক হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকায়।
বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সুবর্ণও।
বই ছাপা হয়ে গেছে!
ছাপা এত শীগ্‌গির হয়!

নতুন পরিচ্ছেদটা আর দেওয়া গেল না তাহলে? না যাক্। কিন্তু কোথায় বই? ওই ঝুড়িটায়? যে ঝুড়িটা সিঁড়ির তলায় বসানো রয়েছে?

পুরনো খবরের কাগজে মোড়া দড়িবাঁধা স্তূপীকৃত কতকগুলো প্যাকেট-ভর্তি মস্ত ঝুড়িটা জগন্নাথচন্দ্র এবার টেনে সামনে নিয়ে আসেন।

একটা অপ্রত্যাশিত স্তব্ধতায় আবহাওয়াটা যেন নিথর হয়ে গেছে।

মোটাবুদ্ধি জগন্নাথও যেন টের পান, কোথায় একটা সুর কেটে গেছে। ভাদ্রবৌ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পুলক প্রকাশ করবে না সত্যি, তবু ভাবে-ভঙ্গীতে তো বোঝা যাবে!

যেদিন সুবর্ণ খাতাখানা নিয়ে ছাপার কথা বলতে গিয়েছিল, সেদিনও কিছু আর ভাদ্রবৌয়ের রীতি পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। আহ্লাদের একটি প্রতিমূর্তি দেখিয়েছিল মানুষটাকে।

আর এখন?
যেন হঠাৎ সাপে কেটেছে।

ঘোমটা তো দীর্ঘ নয় ও-বাড়ির বৌদের মত, মুখ দেখতেই পাওয়া যায়।

অপ্রতিভের মত এদিক-ওদিক তাকান জগন্নাথ, তারপর শুকনো-শুকনো গলায় বলেন, 'বাবা বাড়ি নেই?'

বকুল আস্তে বলে, 'না, পাশের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন।'

অন্যদিন হলে নির্ঘাত জগন্নাথ সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে বলে উঠতেন, 'গেছে তো জানি। চিরকেলে নেশা। কথায় আছে, তাস দাবা পাশা, তিন সর্বনাশা। আর ভায়া আমার ওই তিনটিতেই ডুবে আছেন।'

কিন্তু আজ আর জগন্নাথের বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, 'আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি, আমি এখন যাচ্ছি।' চটিটা পায়ে গলান।

আর এতক্ষণে সুবর্ণ মাথায় ঘোমটা টানে। আঁচলটা গলায় দিয়ে আস্তে পায়ের কাছে একটি প্রণাম করে।

'থাক্ থাক্, হয়েছে হয়েছে—', বলে চলে যান জগু।

আর পথে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান—আর কিছু নয়, অতি আহ্লাদ। কথাতেই আছে, 'অল্প সুখে হাস্যমুখে নানা কথা কয়, বেশি সুখে চোখে জল—চুপ করে রয়'।

আর বকুলটা?

ও বেচারা হক্‌চকিয়ে গেছে আর কি!

বোঝাই যাচ্ছে বাড়িতে কিছু জানান নি বৌমা।

আহ্লাদে নিশ্চিন্ততায় এবার জোরে জোরে পা ফেলেন জগু, 'ওঃ, প্রবোধচন্দ্র এসে চোখ কপালে তুলবেন! সাতপুরুষে কেউ কখনো বই লেখে নি, লিখল কিনা ঘরের বৌ!'

মাকে গিয়ে বলতে হবে, 'বুঝলে মা, আহ্লাদে তোমার মেজবৌমার আর মুখ দিয়ে কথা সরে না!'

তা প্রবোধচন্দ্রের প্রথমটা চোখ কপালে উঠেছিল বৈকি।

তারপরই বাড়িতে উঠলো হাসির হুল্লোড়।

ছেলেরা বোধ করি এমন হৈ-চৈ করে হাসাহাসি করে নি বহুকাল। 'বাবা' বলে ডেকে কথাই বা কয় কবে?

'বাবা, মা'র বই! জগু জ্যাঠামশাইয়ের ছাপাখানার মাল! দেখো দেখো! উঃ!'

প্রবোধ আকাশ থেকে পড়ে, 'মা'র বই! তার মানে?'

'তার মানে? হচ্ছে, আমরা তো কেউ কখনো মা'র কিছু করলাম না, তাই মা নিজেই হাল ধরেছিলেন, চুপি চুপি জগু জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি গিয়ে ছাপতে দিয়ে এসেছিলেন। সেই "বই" ছেপে এসেছে।'

প্রবোধ মেয়েদের মত গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, 'বলিস কি রে ভানু, এ যে সত্যি সেই কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ! তোদের গর্ভধারিণীর একেবারে গ্রন্থকার হবার বাসনা!'

'হুঁ।' ভানু হেসে ফর ফর করে বইয়ের পাতাগুলো উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আহা, গ্রন্থই বটে। গ্রন্থের নমুনাটি লোককে দেখাবার মত!'

তা হাসাটা নেহাৎ অপরাধ নয় ভানুর, 'সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা'র নমুনা দেখলে কে-ই বা না হেসে থাকতে পারতো!

মোটাবুদ্ধি জগন্নাথচন্দ্র 'পয়সায় দুখানা বর্ণপরিচয়ে'র কাগজে বই ছেপে দিয়েছেন সুবর্ণলতার, ভাঙা টাইপ আর পুরু কালি দিয়ে। অবশ্য সেটা ঠিক জগুর দোষ নয়, জগুর ছাপাখানার দোষ। অথবা সুবর্ণলতার ভাগ্যেরই দোষ।

বই দেখে পর্যন্ত বুঝি সুবর্ণ তার ভাগ্যের স্বরূপটা স্পষ্ট করে দেখতে

পেয়েছে। নাঃ, আর কোনো সংশয় নেই, আর কারো দোষ নেই, সবটাই সুবর্ণলতার ভাগ্যের দোষ!

শুধুই কাগজ? শুধুই মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ?

মুদ্রাকরের প্রমাদ নেই?

যা নাকি ছুরির মত বুকে এসে বিঁধছে!

রসিয়ে রসিয়ে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল, আর একবার পড়া হতে থাকে বাপের সামনে, 'শুনুন বাবা, শুনে যান। এই অপূর্ব প্রেস, আর এই অপূর্ব প্রুফরীডার নিয়ে ব্যবসা চালান জগু জ্যাঠামশাই। নাম-ধাম কিছু নেই বইয়ের, বই ছাপা হয়েছে নাম হয়নি। প্রথমেই শুনুন শুনুন, ভূমিকা—"আমি একটি নিপুরায় রঙ্গনাড়ি, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অন্বপুরির মেজবৌ! আমার--" '

প্রবোধ হঠাৎ প্রায় ধমকে ওঠে, ও আবার কি রকম পড়া হচ্ছে? কী ভাষা ওসব?'

'বাংলা ভাষাই। যা লেখা আছে তাই পড়ছি। আরো নমুনা আছে দেখুন না।' কৌতুকের হাসিতে চঞ্চল দ্রুতকণ্ঠে পড়তে থাকে ভানু, 'আমার মন আচে বুদ্দি আচে, মস্তিষ্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্মাকে শীকার করে না। আমি যে—'

খুক খুক করে একটা হাসির শব্দ শোনা যায়। বৌয়েরা হাসছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। ভানুর ভঙ্গীতেও যে হাসির খোরাক!

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

কোথায় ছিল সুবর্ণলতা, অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মস্ত বড় ছেলের ওপর।

ব্যাঘ্রীর মতই একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় সুবর্ণলতার গলা থেকে! বইখানা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করছে।

বহুকাল আগের মত আবার একদিন ছাদে আগুন জ্বললো। সুবর্ণলতার গোলাপী রঙের বাড়ির ছাদে। না যত উদ্‌ভ্রান্তই হোক সে, তদ্দণ্ডেই বাড়ির যেখানে-সেখানে আগুন জেলে একটা অগ্নিকাণ্ড করে বসে নি।

ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে জ্বালিয়েছে আগুন, অনেক সময় নিয়ে।

'পয়সায় দুখানা বর্ণপরিচয়'-এর কাগজে ছাপা, তেমনি মলাটেই বাঁধাই, পাঁচশোখানা বই পুড়ে ছাই হতে এতক্ষণ লাগলো? না, সেগুলো বেশী সময় নেয় নি। সময় নিয়ে আর চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া উদ্গিরণ করে যেগুলো পুড়লো, সেগুলো হচ্ছে অনেক কালের হলদে হয়ে যাওয়া পাতা, আর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কালিতে লেখা অনেকগুলো খাতা! সদ্য কেনা নতুন চকচকে মলাটের খাতা! খাতার রাশি!

ধ্বংস হয়ে গেল আজীবনের সঞ্চয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালবাসার ধনগুলি। সুবর্ণলতার আর কোনো খাতা রইল না।

যে খাতাগুলি দীর্ঘকালের সঙ্গী ছিল, তিলে তিলে ভরে উঠেছিল বহু সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্বলে! লোকচক্ষুর অন্তরালে কত সাবধানেই লেখা আর তাদের রাখা! এক-একখানি খাতা সংগ্রহের পিছনেই ছিল কত আগ্রহ, কত ব্যাকুলতা, কত চেষ্টা, আর কত রোমাঞ্চময় গোপনতার ইতিহাস!

. হাতে পয়সার অভাব তার কখনই ছিল না একথা সত্যি, উমাশশীর মত বিন্দুর মত দুঃখময় 'শূন্যহাতে'র অভিজ্ঞতা কদাচ না, প্রবোধের ভালবাসার প্রকাশই ছিল 'খরচ কোরো' বলে কিছু টাকাপয়সা হাতে গুঁজে দেওয়া। কিন্তু দেওয়াটা লোকের চোখের আড়ালে হলেও, সেই 'খরচ'টা তো আড়াল দিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না? সুবর্ণ তো আর নিজে দোকানে যাবে না?

কাউকে দিয়ে আনানো?

তা সদর রাস্তার পথ ধরে যে বেরোবে আর ঢুকবে সে মশা-মাছি হয়ে করবে না সেই কাজটা? প্রথমবার যখন সুবর্ণ অবোধ ছিল, অতএব অসকর্ত'ও ছিল, দুলোকে আনতে দিয়েছিল মলাট-বাঁধানো খাতা একখানা। সহস্র 'কথা'র জনক হলো সেই খাতা!

'কেন, কি দরকার, এমন দামী আর শৌখিন খাতা কোন্ কাজে লাগবে, পয়সা থাকলে ধোপা-গয়লার হিসেবও তাহলে চার আনা ছ আনার খাতায় ওঠে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ।

গোপনতা সে ভালবাসে না। কিন্তু এমন উদ্ঘাটিত হতেও ভাল লাগে না। তাই ঘরের জানলা থেকে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে খাতার পয়সা এবং তার ঘুড়ি-লাট্টুর পয়সা চালান করে করে মাঝে মাঝে খাতা আনাতো। বাঁধানো রুলটানা খাতা।

লোকচক্ষুর অগোচরে আনিয়েছে তাদের মালিক, লোকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিয়েছে। লালন করেছে হৃদয়রস দিয়ে, পুষ্ট করেছে জীবন-বেদনার আবেগ দিয়ে।

কতদিন কত নিভৃত ক্ষণে ভালবাসার হাতে হাত বুলিয়েছে তাদের গায়ে ভালবাসার চোখে তাকিয়েছে। যেন তারা শুধু প্রাণতুল্য কোনো বস্তুই নয়, প্রাণাধিক কোনো জীবন্ত প্রিয়জন।

সেই তাদের অহঙ্কার হলো, আলোর মুখ দেখতে চাইল তারা।

অন্ধকারের জীব তোরা, কিনা আলোর মুখ দেখবার বাসনা? অতএব পেতে হলো সেই দুঃসহ স্পর্ধার শাস্তি!

সেই ভালবাসার হাতই তাদের গায়ে আগুন লাগালো, সেই ভালবাসার চোখই নিষ্পলক বসে বসে দেখল তাদের ভস্ম হয়ে যাওয়া!

ছাতের সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সুবর্ণ, ভেবেছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী না থাকে।

কিন্তু সিঁড়ির দরজাটায় ছিটকিনি আলগা ছিল, দরজাটা ধরে টানতেই খুলে গিয়েছিল। তাই রয়ে গেল একজন সাক্ষী।

হঠাৎ স্তব্ধ দুপুরে কাগজ-পোড়া-গন্ধে আশঙ্কিত হয়ে এঘর-ওঘর দেখে ছুটে ছাতে উঠে এসেছিল সে।

দরজাটা টেনে খুলেছিল, আর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ওখানটায় চিলেকোঠার দেওয়ালের ছায়া পড়েছিল, তাই এই প্রচণ্ড রোদের মাঝখানেও সুবর্ণর মুখে আগুনের আভার ঝলক দেখা যাচ্ছিল। সেই আভায় চিরপরিচিত মুখটা যেন অদ্ভুত একটা অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে স্থির হয়ে ছিল।

কিন্তু ওই অপরিচিত মুখটার প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় ও কিসের ইতিহাস

আঁকা?

জীবনব্যাপী দুঃসহ সংগ্রামের?

না পরাজিত সৈনিকের হতাশার, ব্যর্থতার, আত্মধিক্কারের?

কে জানে কি!

যে দেখেছিল, তার কি ওই রেখার ভাষা পড়বার ক্ষমতা ছিল?

হয় তো ছিল না। তাই মুহূর্তকাল বিহ্বল বিচলিত দৃষ্টি মেলে দেখেই ভয় পাওয়ার মত ছুটে পালিয়ে এসেছিল সিঁড়ি বেয়ে।

তারপর?

তারপর সেই হত্যাকাণ্ডের দর্শক এক নতুন চেতনার অথৈ সমুদ্রে হাতড়ে বেড়িয়েছে সেই রেখার ভাষার পাঠোদ্ধারের আশায়।

অজ্ঞাতে কখন তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে, মনে মনে উচ্চারণ করেছে সে, 'চিরদিন তোমাকে ভুল বুঝে এসেছি আমরা, তাই অবিচার করেছি।'

তারপর? তারপর এল এক নতুন ঢেউ।

॥ ২১ ॥

ঢেউটা আনলেন জয়াবতী।

সুবর্ণলতার সঙ্গে যাঁর চিরকালের সখীত্ব বন্ধন।

নিত্য দেখা হয় তা নয়, চিঠিপত্রের সেতু রচনা করেই যে হৃদয়ের আদানপ্রদান বজায় তাও নয়, অথচ আছে সেই বন্ধন অটুট অক্ষয়। সেই শৈশবের মতই নির্মল, উজ্জ্বল, স্নেহ আর সম্ভ্রমের সীমারেখায় সুন্দর।

জয়াবতী এখানে কদাচিৎই আসেন।

যদিও বাপের বাড়িতেই থাকেন অধিকাংশ সময় এবং সে বাড়িটা বড়লোকের বাড়ি, কাজেই তাঁর গতিবিধির উপর যেমন কোনো নিয়ন্ত্রণাদেশের চাপ নেই, তেমনি আসা-যাওয়ার অসুবিধেও নেই, তথাপি যোগাযোগ রাখার কৃতিত্বটা বরং সুবর্ণলতাকেই দিতে হয়। অনেককাল দেখা না হলে সুবর্ণই গিয়ে পড়ে এক একদিন জয়াবতীর বাপের বাড়ি।

প্রবোধ এতে মান-অভিমানের প্রশ্ন তুললেও সুবর্ণ সেটা গ্রাহ্য করে না। সুবর্ণ সে প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'ও এসে হবেটা কি? আমার এই নিরবচ্ছিন্ন সংসারের মধ্যে নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গল্প করবার সময় পায়? এই এটা, এই সেটা, চোদ্দবার উঠছি আর ছুটছি। তার থেকে আমি যে সংসারের দায় থেকে খানিক ছুটি নিয়ে চলে গিয়ে বসি, সেটা অনেক স্বস্তির। ওর তো ওখানে কোন কাজের দায় নেই!...তোমার যদি গাড়িভাড়ার পয়সাটা গায়ে লাগে তো বল, মান-সম্মানের কথা তুলতে এসো না।'

কুটুমবাড়ি?

তাতে কি?

আপন-পর নির্ধারণের বাঁধা সড়ক ধরে কোনোদিনই চলতে পারে না সুবর্ণ, কাজেই ওকথা বলে লাভ নেই। সামান্য একটা অনুষ্ঠানের সূত্রে মুক্তকেশীর

সংসার-পরিজনের পোষা বিড়ালটি পর্যন্ত সুবর্ণর 'আপন', আর ওর বাইরে দুনিয়ার আর কেউ 'আপন' হতে পারবে না, এ নিয়মে বিশ্বাসী নয় সুবর্ণ।

কাজেই 'মন কেমন' করলে সুবর্ণই গিয়েছে প্রবোধের খুঁৎখুঁতোমি উপেক্ষা করে।

কিন্তু ইদানীং বহুকাল বুঝি যায় নি।

তাই জয়াবতীই এলেন একদিন।

উকিল ভাই কোর্টে যাবার সময় গাড়ি করে এনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ফেরার সময় নিয়ে যাবেন!

সুবর্ণর দাদাও উকিল, আর তাঁরও নাকি গাড়ি আছে। সুবর্ণলতার ছেলেরও গাড়ি আছে। কিন্তু থাক্ সে কথা। জয়াবতী এলেন, একটা ঢেউ নিয়ে এলেন। সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

জয়াবতীরা কয়েকজনে দল বেঁধে বদরিকাশ্রম যাচ্ছেন, সুবর্ণলতাও চলুক না! বাইরের কেউ নয়, জয়াবতীর দুই বোন, একজন ভাজ আর একটি ননদ। তা সে তো সুবর্ণরও ননদ।

সঙ্গে যাবে বাড়ির এক পুরানো সরকার, আর ওখানকার পাণ্ডা। অতএব দলটা ভালোই।

আর জয়াবতীরও খুব ইচ্ছে হচ্ছে, সুবর্ণ চলুক।

সুবর্ণলতার জ্বরের মত যাচ্ছে কাঁদন, সুবর্ণলতা শুয়েছিল। উঠে বসলো, বললো, 'হ্যাঁ যাবো।'

জয়াবতী হাসলেন, 'দাঁড়া বাপু! আগে বরের মত নে, তবে দলিলে সই কর। যাব বললেই তো হবে না!'

সুবর্ণ সংক্ষেপে বলে, 'হবে। তুমি আমার ব্যবস্থা কর। আর কি কি সঙ্গে নিতে হবে, কত কি লাগবে সেটাও—'

মেজ ঠাকুরপো আবার এতদিনের বিরহে চোখে অন্ধকার দেখবে না তো?' জয়াবতী হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ির কিছু নেই, ভেবে-চিন্তে বললেই হবে, এখনো মাসখানেক সময় হাতে আছে।'

সুবর্ণলতা বলে, 'ভেবে-চিন্তেই বলছি। ভেবে-ভেবেই মরছিলাম, কোথায় পালাই, তুমি ভগবান হয়ে এলে!'

জয়াবতী ভগবান হয়ে এলেন সুবর্ণকে দুদিনের জন্যে কোথাও পালাবার জায়গা খুঁজে দিতে। কিন্তু সুবর্ণর ভাগ্যের ভগবান? দুঃসাহসী সুবর্ণ যাকে জিজ্ঞেস না করেই দলিলে সই করে বসলো? সে কি চুপ করে থাকবে?

নাকি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলবে, 'তা বেশ তো! এমন একটা সুযোগ যখন এসেছে, যাও না! যাও নি তো কখনো কোথাও!'

তা বললে হয়তো মহত্ত্ব হতো, কিন্তু অত মহৎ হওয়া সবাইয়ের কুষ্ঠীতে লেখে না। বাড়ি ফিরে খবরটা শুনে উত্তাল হলো প্রবোধ, 'ঢেউটি আনলেন কে? ঢেউটি? ও-বাড়ির গিন্নী? তা তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন, চিরটা-কালই তো মনসার মন্দিরে ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে এসেছেন তিনি! বলে দিও, "যাওয়া সম্ভব হবে না"।'

সুবর্ণ শান্ত গলায় বলে, 'বলে দিয়েছি যাব।'

'বলে দিয়েছ? একেবারে কথা দেওয়া হয়ে গেছে?' প্রবোধ ক্ষুব্ধ ক্রোধের

গলায় বলে, "আমি একটা বুড়ো যে আছি বাড়িতে, তা বুঝি মনেই পড়ল না? বলতে পারলে না "না জিজ্ঞেস করে কি করে বলবো।"?'

সুবর্ণ অনেকদিন পরে আবার আজ একটু হাসলো, বললো, 'তা আমিও তো বুড়ো হয়েছি গো! নিজের ব্যাপারে একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে চলবে না. এটাও তো দেখতে খারাপ!'

একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে!

প্রবোধ যেন মাথায় লাঠি খায়।

'একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে? কোন্ কাজটা না তোমার ইচ্ছেয় হচ্ছে?'

সুবর্ণ আবারও হাসে, 'তাই বুঝি? তা হলে তো গোল মিটেই গেল। সবই হচ্ছে, এটাও হবে।'

'না, না, হবে-টবে না।'

প্রবোধ যেন ফুঁ দিয়ে তুলোর ফুলকি ওড়ায়।

'এই শরীর খারাপ, নিত্য জ্বরের মতন, এখন চলবেন মরণবাঁচনের তীর্থে! তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে!'

'তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে না সত্যি', সুবর্ণ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'আমি তো পালিয়ে যেতে পারি?'

সহজ কথার পথ অনেকদিন রুদ্ধ ছিল, হঠাৎ একবার এক অলৌকিক মন্ত্রে খুলে গিয়েছিল সেই বন্ধ দরজা। শ্যামাসুন্দরী দেবীর ছেলে জগন্নাথ চাটুয্যের নিচের তলার একটা স্যাঁতসেতে ঘরে প্রাণ পাচ্ছিল সেই মন্ত্র, তারপরে ভেস্তে গেল সব, মন্ত্র গেল হারিয়ে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। শুধু আবরণ একটা থাকলো। জ্বরভাব। নিত্যই যদি জ্বরভাব হয় মানুষটার, সহজ ভাব আর আসবে কোথা থেকে?

আজ আবার অনেকদিন পরে হেসে কথা বললো সুবর্ণ, 'আমি তো পালিয়ে যেতে পারি?'

কিন্তু প্রবোধ কি এই ছেলেভোলানো কথায় ভুলবে? প্রবোধ হাঁ-হাঁ করে উঠবে না? বলবে না, 'মেজাজ খারাপ করে দিও না মেজবৌ, ওই সব ছাই-ভস্ম কথা বলে। আমি বলে দিচ্ছি—এই শরীর নিয়ে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না তোমার। ভানু কাল কোর্টে নতুন গিন্নীর দাদার কাছে খবরটা দিয়ে আসবে।'

'তা হয় না—' সুবর্ণ বলে, 'কথা দিয়েছি। শরীর বরং পাহাড়ে হাওয়ায় ভালই হবে।'

'ভাল হবে? বললেই হলো?' প্রবোধ দু'পাক ঘুরে হঠাৎ বসে ওঠে, 'যাব বলছো মানে? বড়বৌমার ছেলেপুলে হবে না?'

সুবর্ণ শ্রান্ত গলায় বলে, 'সে হবে, ওর মা'র কাছে হবে। ও নিয়ে তুমি পুরুষমানুষ মাথা ঘামাচ্ছো কেন?'

'আমি মাথা ঘামাব না? আমি বাড়ির কেউ নই? হঠাৎ জামার হাতটা একবার চোখে ঘষে প্রবোধ, তারপর ভাঙা গলায় বলে, 'বৌমা বাপের বাড়ি চলে যাবে, আর আমি আমার কাজকর্ম ফেলে তোমার ওই ধাড়ি আইবুড়ো মেয়েকে আগলাবো?'

সুবর্ণর ইচ্ছে হয় চাদরটা মুখ অবধি টেনে পাশ ফিরে শোয়, তবু সে ইচ্ছে দমন করে আস্তে বলে, 'আগ্লাবার কথা উঠছে কেন? ছোট বৌমা তা কোথাও

যাচ্ছে না? দুজনে থাকবে—'

'থাকবে! হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে প্রবোধ, 'থাকবে কি উড়বে তা ভগবানই জানে! তোমার রাগের ভয়ে বলি না কিছু, বোবাকালা সেজে বসে থাকি। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি, তোমার এই ছোট মেয়েটির ভাবভঙ্গী ভাল নয়। পরিমলবাবুর ছেলেটার সঙ্গে তো যখন-তখন গুজগুজ! কেন? ওর সঙ্গে এত কিসের কথা? আমি বলে দিচ্ছি মেজবৌ, তুমি যদি তীর্থ করতে উধাও হও, এসে মেয়েকে ঘরে দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ! হয়তো—'

সুবর্ণ উঠে বসে, সুবর্ণ প্রবোধের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় একটু, তারপর তেমনি স্থির গলায় বলে, 'তা যদি দেখি, সে সাহস যদি দেখাতে পারে ও, বুঝবো আমার রক্তমাংস একেবারে বৃথা হয় নি। একটা সন্তানও মাতৃঋণ শোধ করেছে।'

শুয়ে পড়ে আবার।

প্রবোধ সহসা একটা যেন চড় খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর ভাবে, বৃথা দোষ দিচ্ছি, মাথাটা খারাপই! ছটফটিয়ে বেড়ায় খানিক, তারপর আবার ঘুরে আসে। আর আবারও নির্লজ্জের মত বলে ওঠে, 'রাগের মাথায় বলে তো দিলে একটা কথা, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে তবে তো পরের কথায় নাচা—'

হয়তো ঠিক এমনভাবে কথা বলার ইচ্ছে তার ছিল না, তবু অভ্যাসের বশে এ ছাড়া আর কিছু আসে না মুখে।

সুবর্ণ এবার সত্যিই পাশ ফিরে শোয়।

শুধু তার আগে আরো একবার উঠে বসে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তোমার কাছে হাতজোড় করে কটা দিন ছুটি চাইছি, সেটুকু দাও তুমি আমাকে। সব চাকরিরই তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা হয়, তোমার সংসারে এই ছত্রিশ বছর দাসত্ব করছি আমি, দুটো মাসও কি ছুটি পাওনা হয় নি আমার!'

॥ ২২ ॥

অভিমানী পারুল স্বেচ্ছায় স্বর্গের টিকিট ত্যাগ করেছিল। একদা তার আর বকুলের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়ে যখন সংসারে ঝড় উঠেছিল, তখন পারুল বেঁকে বসেছিল, বলেছিল, 'এত অপমানের দানে রুচি নেই আমার'।

অথচ ওই 'স্কুল' নামক জায়গাটা সত্যিই তার আজন্মের স্বপ্ন-স্বর্গ ছিল। সামনে-পিছনে আশেপাশে যে বাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হতো, সকালের দিকে সেই বাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা একটা কাজই ছিল পারুলের।

সেই সব বাড়ির যে সব মেয়েরা স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপত্র পেয়েছে তারা কেমন করে বেণী ঝুলিয়ে বইখাতা বুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাদের দেখবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত ছিল না তার।

আর যাদের যাদের বাড়ির দরজায় সেই একটি খড়খড়ি আঁটা টানা লম্বা গাড়ি এসে দাঁড়াতো, পোশাকপরা চালক বিশেষ একটি সুরে হাঁক দিত, এবং

একটু বড় বয়সের মেয়েরা খোঁপাবাঁধা ঘাড়টা একটু হেঁট করে তাড়াতাড়ি বেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠতো!

তাদের দিকে ছিল বুঝি বুভুক্ষার দৃষ্টি, ঈর্ষার দৃষ্টি!

'জগতের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ।'

নিমন্ত্রণ নেই শুধু পারুলদের!

যেহেতু তারা ভারি একটা পুণ্যময় সনাতন বাড়ির মেয়ে। তাই পারুল শুধু তাদের জানলার খড়খড়ি তুলে সেই নিমন্ত্রণ-যাত্রার দৃশ্য দেখবে।

বড় হওয়া অবধি বারান্দায় দাঁড়ানোয় শাসনদৃষ্টি পড়েছিল, তাই ভরসা ওই 'পাখী' দেওয়া জানলা! পারুল বকুলের মা চেয়েছিল ওই টিকিট তাদের জন্যে যোগাড় করে দিতে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয় নি।

ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের ধুলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল অভিমানিনী পারুল। পারুল বলেছিল, 'আমার দরকার নেই।'

বকুলের অভিমান অত দুর্জয় নয়।

বকুল অবজ্ঞা আর অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া টিকিটখানা পেয়েই ধন্যবোধ করেছিল।

তা হয়তো ওইটুকুও জুটতো না, যদি বকুলের সামনের লাইনে তার দিদি না থাকতো।

সেজদি!

দুজনের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ, সুবর্ণর যুদ্ধ-ভীত স্বামী মাঝামাঝি রফা করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'বকুল যায় যাক, পারুল আবার যাবে কি?'

আর তার বিশ্বান বিজ্ঞ ছেলেরা বলেছিল, 'বিদুষী হয়ে হবেটা কি? কলাপাতে না এগোতেই তো গ্রন্থ লিখছে!'

অতএব পারুল সেই রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। আর এক কড়া স্কুলে ভর্তি হয়ে চলে গিয়েছিল সেখানের বোর্ডিঙে!

নিঃশব্দচারিণী নিঃসঙ্গ বকুল তার স্বর্গে যাওয়া-আসা করছিল।

কিন্তু সেই আসা-যাওয়ার পথের দিকে যদি কেউ চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি চোখোচোখি হওয়া মাত্র আনন্দে ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই চোখ, বকুল কি করবে?

বকুল বড় জোর বলতে পারে, 'রোজ রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাক যে? কলেজ নেই তোমার?'

সে তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, 'স্কুল বসবার পরে কলেজের টাইম, এই একটা মস্ত সুবিধে!'

বকুল যদি লাল-লাল মুখে বলে, 'বাঃ, তাই বলে তুমি রোজ রোজ—'

সে সপ্রতিভ গলায় বলে ওঠে, 'থাকি তা কি? তোর কি ধারণা তোকে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি?'

আর কি বলতে পারে বকুল?

আর কিভাবে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে?

ওর সঙ্গে কথা কইতে যাওয়াতেও যে ভয়! ওর চোখের তারায় যেন অজস্র কথার জোনাকি, ওর কথার ভঙ্গীতে যেন অসীম রহস্যালোকের ইশারা!

তবু ওর বেশি নয়।

যেন উদ্‌ঘাটিত হতে রাজী নয় কেউই।

যা বলবে কৌতুকের আবরণে।

কিন্তু বলবে অনেক ছলে, আর দেখা করবে অনেক কৌশলে।

তবু সে কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে অপরের চোখে।

অন্তত বকুলের বাপের চিরসন্ধানী সন্দেহের চোখে। আর সে ওই নুড়ির মধ্যেই পর্বত দেখছে, চারাগাছের মধ্যেই মহীরুহ।

অতএব সর্বনাশের ভয়ে আতঙ্কিত হচ্ছে।

কিন্তু শাসন দিয়ে সর্বনাশকে ঠেকানো যায়? বালির বাঁধ দিয়ে সমুদ্রকে? তথাকথিত সেই সর্বনাশ তো এসে যাচ্ছে নিজের বেগে। বন্যার জল যেমন মাঠ-পথ গ্রাস করে ফেলে বাড়ির উঠানে এসে ঢোকে।

সব দিকেই উঁকি মারছে সে, যখন-তখনই সমাজে সংসারের গণ্ডিভাঙার ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে!

আর মজা এই, সেই ভাঙনে যেন কারুর লজ্জা নেই, বরং গর্ব আছে। পরিমলবাবুর ভগ্নী যে বাড়িতে ওস্তাদ রেখে কালোয়াতি গান শিখছে, সেটা যেন পরিমলবাবুর গর্বের বিষয়, সামনের বাড়ির যোগেনবাবুর নতুন জামাই যে বিলেতফেরত, সেটা যেন যোগেনবাবুর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক, ভানুর কোন মামাতো শালার ভায়রাভাই যে বৌ নিয়ে বিলেত গেছে, সেটা যেন রাজ্যসুদ্ধ লোককে বলে বেড়াবার মত প্রসঙ্গ, আর বিরাজের দ্যাওরঝি যে শুধু একটা পাস করেই ক্ষান্ত হয় নি, একটার পর দুটো, এবং দুটোর পর তিনটে পাস করে ফেলে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসলো, এটা রীতিমত একটা বুক ফুলিয়ে বলবার মতো খবর। এ খবর যেন বিরাজের সনাতন বনেদী শ্বশুরবাড়িকে একটি গৌরবময় উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে।

মেয়েদের ঘোমটা খুলেছিল ওদের কবেই! যবে থেকে জুড়িগাড়ি বাতিল করে মোটরগাড়ি কিনেছে, তবে থেকেই ওরা খোলা গাড়িতে মুখ খুলে বসে হাওয়া খেতে শুরু করেছে। তবু সেটা যেন অনেকটা শুধু 'পয়সা থাকা'র চিহ্ন। আর এটা হচ্ছে প্রগতিশীলতার চিহ্ন।

যদিও খবরটা বিরাজ নিন্দাচ্ছলেই শুনিয়ে গেল, কারণ জা-দ্যাওরের নিন্দে করে হাল্কা হবার জন্যেই মাঝে মাঝে মেজদার বাড়ি বেড়াতে আসে বিরাজ, অতএব সুরটা নিন্দের মতোই শোনালো, তবু তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রইল ওই প্রগতির গর্বটুকু, তা প্রচ্ছন্ন থাকলেও ধরা পড়তে দেরি হলো না।

কিন্তু প্রগতি যে ক্রমশই আপন বাহু প্রসারিত করছে, বিস্তার করছে আপন দেহ। নইলে কানুর শালী মাস্টারনী হয়ে বসে?

পাস অবশ্য করেছে সে মাত্র দুটো, কিন্তু তাতে মাস্টারনী হওয়াটা বাধা-প্রাপ্ত হয় নি। নিচু ক্লাসেও তো আছে ছেলে-মেয়ে, তাদেরই পড়াবে।

তা উঁচু ক্লাস নিচু ক্লাসটা তো কথা নয়, কথাটা হচ্ছে—কানুর পিসতুতো শালী নিত্য দুবেলা পিরিলি করে শাড়ি পরে, কাঁধে ব্রোচ এঁটে, আর পায়ে জুতো-মোজা চড়িয়ে একা রাস্তায় যাওয়া-আসা করছে।

আর পিসশ্বশুর-বাড়ির এই প্রগতিতে কানু নিন্দায় পঞ্চমুখ না হয়ে গৌরবে মহিমান্বিত হচ্ছে। কথায় কথায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই গৌরব।

কিন্তু এসব কি সমাজে এই নতুন এল?

আসে নি এর আগে?

তা একেবারে আসে নি বললে ভুল হবে।

এসেছে।

এসেছে আলোকপ্রাপ্তদের ঘরে ; এসেছে ধনীর ঘরে।

কিন্তু সেটাই তো সমাজের মাপকাঠি নয়? মাপকাঠি হচ্ছে মধ্যবিত্ত সমাজ।

যারা সংস্কারের খুঁটিটা শেষ পর্যন্ত আটকে থাকে।

ভাঙনের ঢেউটা যখন তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে সেই খুঁটি উপড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনই নিশ্চিত বলা চলে—এসেছে নতুন, এসেছে পরিবর্তন।

অতএব ধরতেই হবে যে এসেছে পরিবর্তন, এসেছে প্রগতি। আর প্রথমেই নাশ করছে ভয় আর লজ্জা।

নচেৎ ভানুও একদিন বড় মুখ আর বড় গলা করে তার এক বড়লোক বন্ধুর ভাইঝির জলপানি পাওয়ার গল্প করে?

এণ্ট্রেন্স পাস করে জলপানি পেয়েছে বন্ধুর ভাইঝি, সেই উপলক্ষে ভোজ দিচ্ছে বন্ধু, সেই গৌরবের সংবাদটুকু পরিবেশন করে ভানু তার নিজের ছোট বোনকে একহাত নেয়।

স্বাভাবিক ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'তার বয়স কত জানিস? মাত্র পনেরো! আর তুমি ধাড়ি মেয়ে থার্ডক্লাসে ঘষটাচ্ছো। লজ্জা করে না!'

বকুল আনন্দোজ্জ্বল মুখেই দাদার বন্ধুর ভাইঝির গুণকীর্তন শুনছিল, হঠাৎ এই মন্তব্যে উজ্জ্বল চোখে জল এসে গেল তার। আর হঠাৎ আহত হওয়ার দরুনই বোধ হয় সামলাতে না পেরে বড় ভাইয়ের মুখের উপর বলে বসে, 'নিজেই তো বললে তোমার বন্ধু ভাইঝির জন্যে চল্লিশ টাকা খরচ করে তিন-তিনজন মাস্টার রেখেছিলেন—'

তা ভানু অবশ্য বোনের এই উচিতবাক্যে চৈতন্যলাভ করে না।

জগতে কেই বা করে?

উচিতবাক্যের মত অসহনীয় আর কি আছে?

ভানুও তাই অসহনীয় ক্রোধে বলে ওঠে, 'মাস্টার? তোমার জন্যে যদি চারশো টাকা খরচ করেও মাস্টার পোষা হয়, কিছু হবে না, বুঝলে? ওসব আলাদা ব্রেন। তোমার জন্যে মাস্টার রাখলে তুমি আর একটু ঔদ্ধত্য শিখবে, আর একটু অসভ্যতা। হুঁ!'

বকুল আর কিছু বলে না, বোধ করি অশ্রুজল গোপন করবার চেষ্টাতেই তৎপর হয়। বলে বকুলের মা, যে এতক্ষণ নিঃশব্দে একটা লেপের ওয়াড় সেলাই করছিল দালানের ওপ্রান্তে বসে।

হয়তো বেছে বেছে এইখানটাতেই এসে বন্ধুর ভাইঝির গৌরবগাথা শোনা-নোর উদ্দেশ্য ছিল ভানুর। মাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে না করলেও মাকে শোনানোর ইচ্ছেটা প্রবল। মেয়েদের 'পড়া পড়া' করে কত কাণ্ডই করেছেন, বলি, এইরকম মেয়ে তোমার? ঐ মেয়ে ক্লাসে একবারও ফার্স্ট ভিন্ন সেকেণ্ড হয় নি, আর এখনও এই দেখ!

তা যতক্ষণ সেসব বলেছিল ভানু বোনকে এবং বৌকে উপলক্ষ করে ততক্ষণ কিছুই বলে নি সুবর্ণলতা। মনে হচ্ছিল না শুনতে পাচ্ছে, হঠাৎ এখন কথা করে উঠলো। বললো, 'ও-ঘরে গিয়ে গল্প কর গে তোমরা, আমার বড্ড মাথার

যন্ত্রণা হচ্ছে, কথা ভালো লাগছে না।'

মাথার যন্ত্রণা?

যে মানুষ ছুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করছে, তার কিনা কথার শব্দে মাথার যন্ত্রণা?

ভানু বোধ করি এই অসহ্য অপমানে পাথর হয়ে গিয়েই কোনো উত্তর দিতে পারে না, শুধু 'ওঃ' বলে গটগট করে উঠে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুর বৌও।

শুধু বকুলই বসে থাকে ঘাড় হেঁট করে।

হয়তো অন্য কিছুই নয়, তাকে উপলক্ষ করে দাদার এই যে অপমানটা ঘটলো, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই ভাবতে থাকে দিশেহারা হয়ে।

সুবর্ণ হাতের কাজটা ঠেলে রেখে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'সুনির্মলকে একবার ডেকে দিতে পারবি?'

সুনির্মল!

তাকে ডেকে দেবার আদেশ বকুলকে?

এ আবার কোন্ রহস্য!

আর বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সুনির্মলের সম্পর্ক কি? এ যে অবোধ্য!

শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে মা'র দিকে তাকায় বকুল। সুবর্ণ সেইদিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, 'একটা মাস্টারের জন্যে বলবো ওকে।'

মাস্টার!

বকুলের জন্য মাস্টার!

ধরণী দ্বিধা হচ্ছো না কেন?

ছেলের সঙ্গে হার-জিতের খেলায় মা কি এবার বকুলকে হাতিয়ার করবেন? হে ঈশ্বর, দুর্মতি কেন হচ্ছে মা'র? অথচ দাদার থেকে মাও কিছু কম ভীতিকর নয়। তবু ভয় জয় করে বলে ফেলে বকুল, 'না না, ওসবে দরকার নেই মা—'

'দরকার আছে কি নেই সে কথা আমি বুঝবো। তুই ডেকে দিবি।'

হাতের কাজটা আবার হাতে তুলে নেয় সুবর্ণ।

॥ ২৩ ॥

তা তো হলো।

কিন্তু সুবর্ণর সেই কেদারবদরী যাবার কি হলো? এটা কি তার ফিরে আসার পরের কাহিনী?

দূর, যাওয়াই হলো না তার ফিরে আসা!

সুবর্ণলতার ভাগ্যই যে বাদী, তা তার তীর্থ হবে কোথা থেকে?

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যাত্রা করে, দু'ঘণ্টা পরেই আবার ফিরে আসতে হলো সেই বাড়িতে।

কথা ছিল যারা যারা যাবে, জয়াবতীর বাপের বাড়িতে এসে একত্র হবে, সেখান থেকেই রওনা। সুবর্ণও তাই গিয়েছিল। জয়াবতীর মা'র কাছেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। তীর্থযাত্রার

প্রাক্কালে একবার খাওয়াবেন সবাইকে এই তাঁর বাসনা।

অনেক রাগের আর অনেক নিষেধের পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল সুবর্ণ, মনের মধ্যে অপরিসীম একটা ক্লান্তি ছাড়া আর যেন কিছুই ছিল না। তবু এদের বাড়িতে এসে পেঁাছে যেন বদলে গেল মন।

যাত্রাপথের সঙ্গীরা সবাই আগ্রহে আর উৎসাহে, আনন্দে আর ব্যাকুলতায় যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। তার ছোঁয়াচ লাগল সুবর্ণর মনে।

নিজেকে যেন দেখতে পেল অনন্ত আকাশের নিচে, বিরাট মহানের সামনে, অফুরন্ত প্রকৃতির কোলে।

চির-অজানা পৃথিবীর মুখোমুখি হবে সুবর্ণ, চিরকালের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষে পাবে!

আনন্দে চোখে জল আসছিল সুবর্ণর।

তা চোখ মুছছিল সবাই।

আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলছিল, 'বাবা বদরীবিশালের কী কৃপা! আমার মত এই অধমকেও করুণা করেছেন—'

সুবর্ণ চোখ মুছছিল না, সুবর্ণর চোখের জল চোখের মধ্যেই টলমল করছিল। সুবর্ণ ওদের গোছগাছ দেখছিল।

যখন তাড়াহুড়ো করে খেতে বসতে যাচ্ছে—তখন—তখন এল সেই ভয়ঙ্কর খবর।

সমস্ত পরিবেশটার ওপর যেন বজ্রাঘাত হলো। কপালে করাঘাত করলো সবাই!

সুবর্ণলতার স্বামীর কলেরা হয়েছে।

কলেরা!

দলের মধ্যে একজন মাত্র সধবা যাচ্ছিল, তারও এই! তা যাওয়া ে, আর হতে পারে না তার এযাত্রা!

কিন্তু রোগটা হলো কখন? এত বড় একটা মারাত্মক রোগ! এই ঘণ্টা তিনেক তো এসেছে সুবর্ণ বাড়ি থেকে!

তাতে কি, এ তো 'তাঁড়ঘড়ি' রোগ!

তা ছাড়া সূচনা তো দেখেই এসেছিল সুবর্ণ। যে খবর দিতে এসেছিল, সে বললো সেকথা।

দেখে এসেছিল!

সূচনাটা দেখেই এসেছিল?

সুবর্ণর দিকে ধিক্কারের দৃষ্টিতে তাকায় সবাই, দেখে এসেছে, তবু চলে এসেছে! তা ছাড়া বলেও নি একবার কাউকে?

ধন্যি মেয়েমানুষের প্রাণ তো!

পাছে যাওয়া বন্ধ হয়, তাই স্বামীকে যমের মুখে ফেলে রেখে চলে এসে মুখে তালা-চাবি এঁটে বসে আছে!

বিস্ময়ের সাগরে কূল পায় না কেউ!

জয়াবতীর দাদা শুধু বিস্মিতই হন না, বিরক্তও হন! বলেন, 'রোগের সূচনা দেখেও তুমি কি করে চলে এলে সুবর্ণ?'

সুবর্ণ মৃদু গলায় বলে, 'বুঝতে পারি নি, ভাবলাম বদ্‌হজম মত হয়েছে—'

তথাপি জয়াবতীর দাদা অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'সেই ভেবে নিশ্চিন্দি হয়ে চলে এলে তুমি? না না, এ ভারী লজ্জার কথা! এক্ষেত্রে তো তোমার আর তীর্থে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এখন শীগগির চল, গাড়ি বার করছে।'

তথাপি নির্লজ্জ আর হৃদয়হীন সুবর্ণ বলেছিল, 'ভগবানের নাম করে বেরিয়েছি, আমি আর ফিরবো না দাদা! ছেলেরা তো রয়েছে, বৌমারা রয়েছে—'

এবার একযোগে সবাই ছি-ছিক্কার করে ওঠে, এ কী অনাসৃষ্টি কথা! ছেলে-বৌ রয়েছে বলে তুমি স্বামীর কলেরা শুনেও যাবে না? কলেরা রুগীর সেবাটাই বা করবে কে?...

ভগবান?

আর স্বামীর আগে তোমার ভগবান?

জয়াবতী মৃদুস্বরে বলেন, 'বুঝতে পারছি তোর ভাগ্যে নেই। যা এখন তাড়াতাড়ি, দাদা রাগ করছেন। চল যাই তোর সঙ্গে, দেখে আসি একবার—'

যাত্রা স্থগিতের কথা কেউ তোলে না।

অন্য সকলের পক্ষেই এই যাত্রাটা—অলঙ্ঘ্য অপরিহার্য অমোঘ, শুধু সুবর্ণলতার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না!

কই একথা তো কেউ বলল না, 'সুবর্ণ, তোকে ফেলে কি করে যাব, আজ নাই গেলাম, দেখি তোর ভাগ্যে কি লিখেছে ভগবান!'

না, তা কেউ বলল না।

বরং সুবর্ণ যে স্বামীর এই আসন্ন মৃত্যুর খবর শুনেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো না, বরং কথা কাটলো, তীর্থের লোভটিকে আঁকড়ে রইলো, এতে ধিক্কারই দিল।

'ছেলেরা আছে, ডাক্তার-কবরেজ দেখাবে, সেরে যাবে—' এ একটা কথা?

বলি কোন্ প্রাণে হিমালয় ভাঙবে তুমি? তাছাড়া আর সকলেই বা কোন্ স্বস্তিতে সঙ্গে নেবে তোমাকে? যে জায়গায় যাচ্ছ সেখানে তো খবর আনা-গোনার পথও নেই! তবে?

তার মানে তুমি বিধবা হয়েও শাড়ি চুড়ি পরে ঘুরবে সবাইয়ের সঙ্গে, সব কিছু ছোঁবে নাড়বে!

হলেই হলো! আহ্লাদ?

দাদা আর একবার অসহিষ্ণু গলায় প্রায় ধমক দিয়ে গেলেন, 'কি হলো? সুবর্ণ, তুমি কি আমায় দোষের ভাগী করতে চাও? বেশ তো—এদের তো এখনো যাত্রার ঘণ্টাতিনেক দেরি রয়েছে, গিয়ে দেখো কি অবস্থা—'

'অবস্থা আমার জানা হয়ে গেছে দাদা—,' বলে আস্তে গিয়ে গাড়িতে ওঠে সুবর্ণ! জয়াবতীকে সঙ্গে আসতে দেয় না।

কেন, এই শুভযাত্রার মুখে একটা কলেরা রোগীকে দেখতে যাবে কেন জয়াবতী? তাছাড়া বিপদের ভয়ও তো আছে। শুধু একা নিজেরই নয়, অন্য পাঁচজনেরও।

গাড়িতে ওঠবার সময়ও জয়াবতী আর একবার মৃদু প্রশ্ন করেন, 'ভেদবমি তুই দেখে এসেছিলি?'

সুবর্ণ ওঁর চোখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখে বলেছিল, 'এসে-ছিলুম!'

জয়াবতী কপালে হাত ঠেকান।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কে জানে রোগীরও এতক্ষণে নাড়ী ছেড়ে গেছে কিনা?

সুবর্ণ চলে যাওয়ার পর অবিরত সুবর্ণর সমালোচনাই চলতে থাকে এবং একবাক্যে স্থির হয় এরকম হৃদয়হীন আর আক্কেলহীন মেয়েমানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

খবর দিতে এসেছিল সুবর্ণর ঝি। সে বার বার কপালে হাত ঠেকাচ্ছিল আর বলছিল, 'হে মা কালী, গিয়ে যেন বাবুকে ভাল দেখি—'

তবে তার বলার ধরনে মনে হয়েছিল, গিয়ে ভাল তো দূরস্থান, বাবুকে জ্যান্ত দেখার আশাও সে করছে না!

সুবর্ণর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করলো সে অনেকবার, বাবুর রোগের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলো বারকয়েক এবং শেষ অবধি বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমি মা পথেই নেমে পড়বো। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, মা ওলাবিবি বুঝবেন সেটা।'

তথাপি সুবর্ণ নির্বাক নিস্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভাঙলো বাড়ি এসে দোতলায় উঠে।

যেখানে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছিল প্রবোধ, আর বকুল বাদে অন্য মেয়ে-ছেলেরা দরজার বাইরে আশেপাশে ঘুরছিল।

ডাক্তারের নিষেধে ঘরে ঢোকে নি কেউ, অপেক্ষা করছিল কখন সুবর্ণলতা এসে পড়ে, কলেরা রুগী বলে ভয় খেলে যার চলবে না, ভয় খাওয়াটা যার পক্ষে ঘোরতর নিন্দনীয়।

গাড়ি থেকে নামা দেখেই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কেউ কিছু বলল না শুধু দেখল মা উঠে গেল নীরবে।

হ্যাঁ, একেবারে নীরবে।

ঘরে ঢুকে রোগীর মুখোমুখি দাঁড়ালো সুবর্ণ, নীরবতা ভাঙলো, স্থির গলায় প্রশ্ন করলো, 'ক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছিলে?'

হ্যাঁ, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কথাটা বলেছিল সুবর্ণ সেই মরণোন্মুখ লোকটার মুখের উপর। যার জন্যে তার নিজের পেটের মেয়ে চাঁপা বলেছিল, 'বুঝতে পারি না মাকে, মানুষ না কষাই! আমাদের ভাগ্যে বাবা এযাত্রা বেঁচে উঠলেন তাই, যদি সত্যিই একটা কিছু ঘটে যেত? ওই মুখ তুমি আবার লোকসমাজে দেখাতে কি করে?'

'তুমি' দিয়ে বললেও আড়ালেই বলেছিল অবশ্য, চন্নন ছিল শ্রোতা। চন্নন বেশি কথা বলে না, সে শুধু মুচকি হেসে বলেছিল, 'মা'র আবার মুখ দেখা-নোর ভয়!'

বাপের অসুখ শুনে ছুটে এসেছিল তারা, আর অনেকদিন পরে আসা হয়েছে বলেই দু-চারদিন থেকে গিয়েছিল। থেকে গিয়েছিল অবিশ্যি ঠিক বাবার সেবার্থে নয়, দুই বোন এক হয়েছে বলেই। 'রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না'। এই তো পারুলের সঙ্গে কি হলো দেখা? সে তো সেই কোন্ বিদেশে।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের অসুখের কারণ সম্পর্কে এই নির্লজ্জ সন্দেহ কি একা সুবর্ণলতারই হয়েছিল? সুবর্ণলতার প্রখর-বুদ্ধি ছেলেদের হয় নি?

হয়েছিল লোক, তাছাড়া প্রমাণপত্রই তো ছিল তাদের হাতে। কিন্তু তবু তারা এত নিষ্ঠুর হতে পারে নি, এত নির্লজ্জ! তাই তারা প্রবোধের যে যেখানে আছে তাদের 'তাড়ঘাড়' খবর দিয়ে বসেছিল। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিল—'খবর দেওয়া উচিত তাই জানালাম, তবে রোগটা ছোঁয়াচে, সেই বুঝে—'

তা সেই 'বুঝ'টা সুবোধ আর উমাশশী বাদে আর সকলেই বুঝেছিল, বুঝেছিল বিরাজের বাড়ির সবাই, বুঝেছিল প্রবোধের জামাইরা, তবে মেয়েরা বোঝে নি, আর বোঝে নি জগু।

শ্যামাসুন্দরীও অবশ্য একটু অবুঝ হচ্ছিলেন, জগু নিবৃত্ত করে এলেন মাকে, হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি, শিবের অসাধ্য ব্যাধি, তুমি আশী বছরের বুড়ী সে দৃশ্য দেখতে পারবে?'

'দেখতে পারবো'—একথা আর কে বলতে পারে? অতএব জগু একাই কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হয়েছিলেন।

এসে দেখেন বিচারসভা বসে গেছে।

রুগী আছে শুধু বকুলের হেফাজতে, সুবর্ণলতাকে ঘিরে বাকি সবাই।

না, কটু কথা বলছে না কেউ কিছু, শুধু এইটুকু বলছে, 'পারলে তুমি এ কথা বলতে? কি করে পারলে? "হৃদয়" বলে বস্তুটা কি সত্যিই নেই তোমার?'

শ্রান্ত সুবর্ণলতা একবার শুধু বলেছে, 'তাই দেখছি, সত্যিই নেই। এত দিনে টের পেলাম সে কথা।'

উমাশশী কাঠ হয়ে বসেছিল, সুবোধচন্দ্র বললেন, 'তুমি এখন যাবে, না থাকবে? আমার তো আবার—'

অফিসের দেরির কথাটা আর মুখ ফুটে বলেন না। পেন্সন হয়ে যাবার পর ধরাধরি করে চাকরির মেয়াদ আরো দু বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও যেন সূক্ষ্ম একটু লজ্জা আছে সেটার জন্য। তাই পারতপক্ষে 'অফিসের বেলা' কথাটা উচ্চারণ করেন না সুবোধচন্দ্র। যেন ওটা এলে-বেলে, ওটা অন্যের কাছে অবজ্ঞার ব্যাপার।

উমাশশী চকিত হয়।

উমাশশী যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়।

কলেরাকে ভয় করছে না উমাশশী, ভয় তার এই পরিস্থিতিটাকে, ভয় তার মেজজাকে। চিরটা দিন যাকে বুঝতে পারল না সে। সেই দুর্বোধ্যকে চিরদিনই ভয় তার। নইলে ইচ্ছে কি আর করে না মাঝে মাঝে আসে, দু'দণ্ড মেজবৌয়ের এই সাজানো-গোছানো চকচকে সংসারটায় এসে বসে! লক্ষ্মী ওথলানো সংসার দেখতেও তো ভাল লাগে।

কিন্তু কি জানি কেন স্বস্তি পায় না।

মনে হয় তার পিঠোপিঠি ওই জাটি যেন সহস্র যোজন দূরে বসে কথা বলছে তার সঙ্গে।

অথচ বলে তো সবই।

ছেলেমেয়েদের খবর কি? নাতিরা কে কোন্ ক্লাসে পড়ছে? মেয়েদের আর কার কি ছেলেমেয়ে হলো? সবই জিজ্ঞেস করে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায় মাখায়, সঙ্গে মিষ্টি বেঁধে দেয়, তবু কে জানে কোথায় ওই দূরত্বটা?

গিরিবালা, বিন্দু, ওরা তো বড়জাকে একেবারেই পোঁছে না, এক ভিটেয় বাস করেও প্রায় কথা বন্ধই। নেহাৎ উমাশশী সেই 'মরুভূমিটা' সহ্য করতে পারে না বলেই যেচে যেচে দুটো কথা কইতে যায়। তবু ওদের সঙ্গেও যেন নেই এতটা ব্যবধান, ওরা কাছাকাছি না হলেও—কাছেরই মানুষ। তাই উমাশশী এখানে বসেই ভাবছিল, রোগটা ছোঁয়াচে বলে আসতে পারলো না বটে, খবরটার জন্যে হাঁ করে আছে ওরা, গিয়েই জানাতে হবে ভয়ের কারণটা নেই আর, রোগী সামলেছে একটু।

কদিন কথা নেই, এ একটা বরং সুযোগ এল।

তাই তাড়াতাড়ি বললো, 'না, আমি চলেই যাই তোমার সঙ্গে। থাকা মানেই তো আবার পোঁছনোর জন্যে ছেলেদের ব্যস্ত করা! চাঁপা-চন্নন এসে গেছে, মেজবৌ এসে গেছে, আর ভাবনা করি না। উঃ, ভগবানের কী অনন্ত দয়া যে মেজবৌ রওনা দেয় নি!'

আজকাল একটু উন্নতি হয়েছে উমাশশীর, ঘোমটা দিয়ে হলেও সকলের সামনে বরের সঙ্গে কথা কয়। সেই সকলরা যে সকলেই তার কনিষ্ঠ, এতদিনে যেন সে খেয়াল হয়েছে উমাশশীর।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে বসে উমাশশী। সুবর্ণকে একটু বলে গেলে ভাল হতো, কিন্তু পরিস্থিতিটা যে বড় গোলমেলে। এসেই তো শুনেছে চাঁপার মুখে, কী কথা বলেছে সুবর্ণ তার স্বামীকে!

হতে অবিশ্যি পারে। মেজ ঠাকুরপো চিরদিনই তো ওই রকম বৌ-পাগলা, বৌকে একবেলার জন্যে চোখের আড় করতে পারে না। সেই বৌ একেবারে বদরিকাশ্রম যাবার বায়না করে বসেছে দেখেই করে বসেছে এই কেলেঙ্কারি কাণ্ড। জানে তো বারণ শোনবার মেয়ে নয় মেজবৌ!

তবু সত্যিও যদি তাই-ই হয়, বড় বড় ছেলে, ছেলের বৌদের সামনে মানুষটাকে এমন হেয় করবি তুই? তা ছাড়া যে কারণেই হোক, বলতে গেলে প্রায় তো মরতেই বসেছে! নাড়ী ছাড়বার যোগাড়। তাকে এমন লাঞ্ছনা!

ছি ছি, এ কি নির্মায়িকতা?

গাড়িতে উঠে বসে ঘোমটাটা একটু খাটো করে সেই কথাই বলে ফেলে উমাশশী।

সুবোধের দিকে জানলাটা খোলা ছিল, সুবোধ সেই জানলার বাইরে তাকিয়েছিলেন, হঠাৎ সচকিত হয়ে বলেন, 'কার নির্মায়িকতার কথা বললে?'

'মেজবৌয়ের কথাই বলছি—'

হঠাৎ সুবোধ স্বভাব-বহির্ভূত তীব্র হন। সুবোধের প্রৌঢ় চোখে যেন দপ করে একটা আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে, বলে ওঠেন, 'মেজবৌমার কথা? মেজবৌমার নির্মায়িকতার কথা? মেয়েমানুষ হয়েও তুমি শুধু ওই দিকটাই দেখতে পেলে বড়বৌ? পেবো লক্ষ্মীছাড়ার নিষ্ঠুরতা তোমার চোখে পড়ল না? অবস্থার গতিকে আমি তোমায় কখনো কোনো তীর্থ-ধর্ম করাতে পারি নি, আমার বলা শোভা পায় না, তবু পেবোর "অবস্থা" ছিল বলেই বলছি, অবস্থা সত্ত্বেও তুই মানুষটাকে কোনদিন আকাশ-বাতাসের মুখ দেখতে দিলি না! নিজের স্বার্থে খাঁচায় পুরে রেখে দিয়েছিস, লজ্জা করল না তোর এই বুড়ো বয়সে এই কেলেঙ্কারিটা করতে? স্বামী হয়ে তুই ওর এত বড় একটা তীর্থযাত্রার সুযোগ পণ্ড করলি? সুযোগ বার বার আসে? বৌটা যে চিরদিন

আকাশ বাতাসের কাঙাল, তা জানিস না তুই? আর তাও যদি না হয়, হিন্দু বাঙালীর মেয়ে তো বটে! "বদরীনারায়ণ" যাত্রা করছিল, কত বড় আশাভঙ্গ হলো তার, সেটা তুমি বুঝতে পারলে না বড়বৌ?'

একসঙ্গে এত কথা কইতে সুবোধকে জীবনেও কখনো দেখেছে কিনা উমাশশী সন্দেহ, তাই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে আর বোধ করি কথাগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। সুবোধও বোধ হয় এই আবেগ প্রকাশ করে ফেলে লজ্জিত হলেন, তাই এবার শান্ত গলায় বলেন, 'মেজবৌমা মানুষটা আলাদা ধাতুর, ওঁকে তোমরা কেউ বুঝলে না। আর পেবোটা হচ্ছে—' চুপ করে যান।

তা কেউ যদি সকলের দুর্বোধ্য হয় তো সে দোষ কার? তাব, না সকলের?

বিন্দু আর গিরিবালা 'নে থো' করে রান্না সেরে তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ভাত চুকিয়ে নিচ্ছিল, কে জানে কখন কি খবর আসে। মল্লিকা নেই, কদিনের জন্যে শ্বশুরবাড়ি গেছে, শাশুড়ীর অসুখ শুনে। কাজেই চক্ষুলজ্জা করবার মত কেউ নেই। নইলে যা কট্‌কটে মেয়ে, খুড়ীদের এখন ভাতের কাঁসি নিয়ে বসা দেখলে কট্‌কট্‌ করে কথা শোনাত। নেই বাঁচা গেছে।

অতএব দুজনে ছেলেপুলেকে ভাত দিয়েই একই রান্নাঘরের দুই প্রান্তে দু কাঁসি ভাত বেড়ে নিয়ে বলাবলি করছিল, 'যা হবে তা তো দেখাই যাচ্ছে, তবে মেজদির এবার কি হবে তাই ভাবনা। চিরটা দিন তো ওই একটা মানুষের ওপর দাপট করে তেজ-আস্‌পদ্দার ওপরই চালিয়ে এলেন, এখন পড়তে হবে ছেলে-বৌয়ের হাতে!'

এরা দুজনে যে পরস্পরের প্রাণেব সখী তা নয়, দুজনের আলাদা অবস্থা, আলাদা কেন্দ্র। পাড়া-পড়শীর সঙ্গে দুজনের গলায় গলায় ভাব (যেটা মুক্তকেশীর আমলে সম্ভবপর ছিল না) হলেও সেই পড়শীরা ভিন্ন ভিন্ন দলের, এবং সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে পরস্পরের সমালোচনা করে বাঁচে। তবু একেবারে কথা বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধটা নেই, বরং মিলই আছে। ক্ষুদ্রতার সঙ্গে ক্ষুদ্রতাব, সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার, স্বার্থবোধের সঙ্গে স্বার্থবোধের এক ধরণের হৃদ্যতা থাকে, এ সেই হৃদ্যতা। গিরিবালা আছে, তাই বিন্দু একজনকে ঈর্ষা কবতে পায়, বিন্দু আছে, তাই গিরিবালা তার অহমিকা বিকাশের একটা ক্ষেত্র পায়—ওদের কাছে তারও মূল্য আছে বৈকি।

তা ছাড়া কেউ তো উদার নয় যে, একের অপরের কাছে 'ছোট' হয়ে যাবার প্রশ্ন আছে। উমাশশীর পয়সা নেই, তাই সে পয়সা খরচে কৃপন, কিন্তু হৃদয়ে কৃপণ নয় উমাশশী। তাই উমাশশীকে ওরা দেখতে পারে না।

তবু উমাশশীই যেচে যেচে আসে। বলে, 'কি রে সেজবৌ, আজ কি রাঁধলি?.. ওমা, ছোটবৌ তো খাসা মৌরলা মাছ পেয়েছিস!'

ওরা গ্রাহ্য করে উত্তর দিলে গল্পটা এগোয়, ওরা অগ্রাহ্য-ভাব দেখালে উমাশশী আস্তে সরে আসে। আজ ভাবছিল মেজবৌয়ের বাড়ির খবর নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ গল্প চালানো যাবে, কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। বারে বাবে কানে বাজছে, 'শুধু এইটাই তোমার চোখে পড়লো বড়বৌ?—'

বেশি কথা আর বলল না, রুগী সামলেছে, প্রাণের ভয় নেই, শুধু এই টুকুই জানিয়ে দিয়ে আস্তে চলে এল উমাশশী।

'তবে আর সাত-সকালে গিয়ে মরি কেন' মনে মনে এই কথাটুকু উচ্চারণ করে বাড়াভাতে এক-একখানা গামছা চাপা দিয়ে, দুই জা দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'ভাগ্যটা দেখলে? এ বাবা স্রেফ্ মেজদির ভাগ্যের জোরে—নইলে এ হলো শিবের অসাধ্যি ব্যামো!'

তা জগুও সেই কথাই বলতে বলতে এসেছিলেন এবং রুগীর বিছানার ধারে বসে পড়ে কেঁদে বলে উঠেছিলেন, 'কি রে পেবো, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চললি?'

প্রবোধ কণ্টে বলেছিল, 'যেতে আর পারলাম কই? এ হতভাগ্যকে যমেও ছোঁয় না। তোমাদের ভাদ্রবৌ তো বলে গেল, রোগ না ছল!'

গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে বললেও বুঝতে পারা গেল এবং বলা বাহুল্য অবাকই হলেন জগু। মেজবৌমা কি তাহলে সত্যিই 'মাথা খারাপ' রুগী? নচেৎ এই যমের দোরে পৌঁছনো মানুষটাকে এই কথা বলে?

অবিশ্যি মাথা খারাপ হলে কথা নেই, কিন্তু না হলে? নাঃ, মাথাটাই ঠিক নয়, দেখলাম তো—

কিন্তু খানিক পরে সহসা এই রুগীর বাড়িতেই সেই মানুষেরই হা-হা হাসির শব্দ ছাদে গিয়ে ধাক্কা খায়। 'অ্যাঁ, তাই নাকি? মেজবৌমা বদরী-নারায়ণ যাচ্ছিলেন, চলে আসতে হলো! ও, তাহলে আর দেখতে হবে না কানু, এ স্রেফ আমার মগজওলা ভায়ার কারসাজি! নাঃ, বুদ্ধি একখানা বার করেছে বটে!...কিন্তু ভারি অন্যায়। যাচ্ছিলেন একটা মহাতীর্থে! তাছাড়া নিজেরও বয়েস হয়েছে, যদি হয়ে যেত একটা কিছু? তখন তুমি পরিবারের হিল্লী দিল্লী যাওয়া বন্ধ করতে আসতে? যাক গে, ছলই হোক আর সত্যই হোক, ভায়া পটকে গেছে খুব। এখন স্রেফ জলবার্লি! পুরো তিনটে দিন স্রেফ জলবার্লি! বকুল রে, বাবা ভাত খেতে চাইলেও দিবি না।...যাই, সেই আশী-বছুরে বুড়ীটা মরছে ধড়ফড়িয়ে বলি গে তাকে।'

একে একে সকলকেই ধড়ফড়ানো থেকে রক্ষা করা হলো। শুধু জয়াবতীর বাড়িতে খবর দেবার কিছু নেই। জয়াবতীরা রওনা হয়ে গেছে। হয়তো এখন তাদের বিশ্বাস আর ভক্তির গলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'জয় বাবা বদরী-নারায়ণ! জয় বাবা বদরীবিশাল কি জয়!' পাণ্ডাঠাকুরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে হয়তো উদাত্ত হয়ে আকাশে উঠছে সেই স্বর।

কে জানে সুবর্ণলতার ওই ভক্তির ঘরটায় ফাঁকি ছিল কিনা। নইলে তার কণ্ঠস্বরটুকু আকাশে ওঠবার সুযোগ পেল না কেন?

জয়াবতীর ননদ, অতএব সুবর্ণরও সম্পর্কিত ননদ সেই কথাই বলাবলি করে, 'কেবলই তো হিমালয় দেখবো, হিমালয় দেখবো চিন্তা দেখলাম, বাবার নাম তো একবারও শুনলাম না।..ঠাকুর অন্তর্যামী, দেখছেন সব।

আশ্চর্য, ওই কথাই বলে লোকে।

ভয়ংকর এই ভুল কথাটা।

কোটি কল্পকাল ধরে বলে আসছে।

হয়তো বা আরো কোটি কল্পকাল ধরে বলবে। যারা উল্টো কথা বলতে চাইবে, তারা সমাজে পতিত হবে।

॥ ২৪ ॥

কিন্তু চিরদিনের উল্টো-পাল্টা সুবর্ণলতা কি সেদিন উল্টো কথা বলেছিল? না ওই কোটি কল্পকালের কথাটাই একবার উচ্চারণ করেছিল?

কে জানে! তারপরও তো আবার দেখা যাচ্ছে সুবর্ণলতা দুঃসহ স্পর্ধায় তার ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়েকে বলছে, 'সুনির্মলকে একবার ডেকে দে তো!'

যে ছেলেটা নাকি বাইশ বছরের।...

প্রবোধের নিজের আর সাহস হয় নি, এবার ছেলেকে এসে ধরেছিল, কিন্তু ছেলে মুখের ভঙ্গীতে একটা তাচ্ছিল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মুখের ওপর জবাব দিল, 'আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমার কী দরকার? যে যার নিজের ছাগল ল্যাজে কাটবে, আমি বাধা দেবার কে?'

'তা ও যদি পাগল হয়, সবাইকে তাই হতে হবে?'

'হবে। পাগলের কব্জার মধ্যে থাকতে হলেই হবে তাই।'

'ঠিক আছে, আমি পরিমলবাবুকেই বলছি গিয়ে।'

'কী বললেন?'

আগে বলত না, ইদানীং বাপকে 'আপনি' বলছে ভানু।

'বলব আবার কি!' প্রবোধ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বলব, তোমার ওই জোয়ান ছেলের এসে এসে আর আমার ওই ধাড়ি ধিঙ্গী মেয়েকে পড়াতে হবে না।'

পরিমলবাবু যদি বলেন, 'নিজের মেয়েকে না সামলে আমায় বলতে এসেছ কেন?'

কথাটা প্রণিধানযোগ্য, তাই প্রবোধ গুম হয়ে যায়, তারপর আবার বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ওই ছেলেটাকেই শাসিয়ে দিচ্ছি।'

ভানু যেন একটা মজা দেখছে এইভাবে বলে, 'দিতে পারেন। তবে সেখানেও অপমানিত হবার ভয় আছে! এযুগের ছেলে, ওদের গুরু-লঘু জ্ঞানটা তো ঠিক আপনাদের হিসেবমত নয়!'

প্রবোধের একটা কথা মুখে এসেছিল, সামলে নিয়ে বলে, 'তবে ওই হারামজাদা মেয়েকেই শায়েস্তা করছি আমি, রোসো। সুনির্মলদার কাছে পড়া করছেন! পড়ে আমার গুষ্টির মাথা উদ্ধার করবেন! কী করবো—শাঁখের করাতের নিচে পড়ে আছি আমি, নিজের সংসারে চোর, তা নইলে—'

তা নইলে কি হতো তা আর বলে না, চলে যায়।

ভানু কেমন একটা ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কী ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টিতে?

মানুষটা কী অপদার্থ?

যাক্, ভানুর দৃষ্টিতে কিছু গেল এল না, সুনির্মলের ওই বকুলকে পড়াতে আসা নিয়ে সংসারে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করলেন প্রবোধচন্দ্র এবং 'পদার্থে'র পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সেটি বন্ধ করতেও সমর্থ হলেন। কে জানে কি কলকাঠি নাড়লেন, পরিমলবাবুর স্ত্রী দীর্ঘদিন পরে এ বাড়িতে এলেন, এবং

আগুনের সেই চিরন্তন উদাহরণটি নতুন করে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন—'বুঝতাম যদি মেয়েকে ঘোষাল বামুনের ঘরে দিতে! শুধু শুধু কেন আমার ছেলেটাকে চঞ্চল করা ভাই! একেই তো ছোট থেকে—'

সুবর্ণ সহসা প্রতিবেশিনীর একটা হাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'নেবেন আপনি বকুলকে?'

ভদ্রমহিলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'আমি নিতে চাইলেই কি বকুলের বাবা দেবেন? তুমি না হয় আলাভোলা মানুষ, অত ধরবে না, তোমার ছেলেরা? তোমার কর্তা? না ভাই, গৃহবিচ্ছেদ বাধাতে চাই না আমি। মেয়ে পাহাড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিয়ে ফেল, আর পড়িয়ে কি হবে? চাকরি করতে তো যাবে না? মনে কিছু কোরো না ভাই, "সুনি" আর আসবে না।'

এরপরও কি সুবর্ণ বলবে, 'হাঁ, তাকে আসতে হবে!'

তা বলা সম্ভব নয়, তবু সেই সুনির্মলকে ধরেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সুবর্ণ। মাইনে করা মাস্টার ঢুকিয়েছিল বাড়িতে ষোল বছরের মেয়ের জন্যে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কোন এক সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন টিউশনি করে চালাচ্ছেন। চুক্তিপত্রে সই করে ছাত্র-ছাত্রীকে তালিম দেন। অনেক মেয়েই তো প্রাইভেটে পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে আজকাল।

বকুলের জ্যাঠামশায়ের চাইতে বয়েস বেশি, এ মাস্টারকে নিয়ে আর কিছু বলবার আছে?

রাস্তায় দেখার সুযোগ ক্রমশই কমছে, বাড়িতে আসার পাটটাও এই একটা ক্লেদাক্ত আলোড়নে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তবু একসময় দেখা হলো। মৃদু হাসলো বকুল, 'কি সুনির্মলদা, পেয়েছ খুঁজে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা? টাক মাথা, কুঁজো পিঠ—'

সুনির্মল এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বলে, 'পেলাম। ওঁদের জন্যে না হোক, আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যেই খুঁজতে হলো!'

'তোমাদের বাড়িটা তো আমাদের বাড়ির থেকে এক তিলও অগ্রসর নয়, সাহস করেছিলে কি করে তাই ভাবছি! হয়েছ তো এখন জব্দ?'

'জব্দ আবার কি, ভারি ফাজিল হয়েছিস!' বলে চলে যায় তাড়াতাড়ি।

তা জব্দ সে সত্যিই হয় নি। আগে থেকেই আঁটঘাট বেঁধেছিল।

সুবর্ণলতা যখন প্রস্তাব করেছিল, তখন সুনির্মল বিপুল পুলক গোপন রেখে 'আচ্ছা, আসবো সময় করে। এই আহ্লাদী, নভেল পড়াটা একটু কমাস—' বলে চলে গেলেও বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে বলেছিল, 'এই এক হলো ঝঞ্ঝাট! এমন সব অন্যায় অনুরোধ করে বসে মানুষ! ও-বাড়ির খুড়ীমা ডেকেডুকে অনুরোধ করে বসলেন কি জানো? রোজ গিয়ে ওই মেয়েটাকে পড়াতে হবে!'

বলা বাহুল্য, সুনির্মলের মা এতে পুলকিত হলেন না, ক্রুদ্ধই হলেন। বললেন, 'তার মানে?'

'মানে আর কি! ঘষটাচ্ছে তো এখনো থার্ড ক্লাসে। অথচ বুদ্ধি-সুদ্ধি

আছে মন্দ নয়। তাই বাসনা, গড়িয়ে-পিটিয়ে সামনের বছরেই প্রাইভেটে পাস দেওয়াবেন।'

'পাস দেওয়াবেন! মেয়েকে পাস দিইয়ে কি চতুর্বর্গ হবে শুনি?'

'তা কে জানে বাবা! বললেন! কথা এড়াবো কি করে?'

'কথা এড়াবো কি করে? চমৎকার! কেন—বললেই তো পারতিস আমার এখন এম-এ ক্লাসের পড়া—'

'বলেছিলাম, বললেন, একটু সময়-টময় করে। মুখের ওপর "না" করা যায়?'

পরিমল-গৃহিণীও এটা স্বীকার করেন। তাই শেষতক বলেছিলেন, 'বেশ, পড়াও তো ওর মা'র সামনে বসে পড়াবে।'

তাই চলছিল, এটাই জানতেন পরিমল-গিন্নী। কিন্তু জল অনেকদূর গড়ালো। অতএব রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হলো তাকে, বাষট্টি বছরের গণেশবাবুকে আসন ছেড়ে দিয়ে।

গণেশবাবু সম্পর্কে কী আর আপত্তি তুলবে সুবর্ণর সনাতনী সংসার?

এদিকে তো চতুর্দিক থেকে রকম রকম খবর আসছে ঝপাঝপ।

সুরাজের ছোট ছেলে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছে, সুরাজ সেই ছোটবৌকে সমাদরে ঘরে তুলেছে। বৌ-ছেলের জন্যে আলাদা বাবুর্চি ঢুকেছে বাড়িতে।

এদিকে সুবালা যে সুবালা, সেও নাকি একটা মেয়েকে বারেন্দ্র বামুনের ঘরে বিয়ে দিয়ে বসেছে, আর অমূল্য বলেছে, 'ঠিক আছে বাবা, আমায় সবাই যদি জাতে ঠেলে তো বাকি যে কটা পড়ে আছে ওই বারেন্দর-টারেন্দর দেখেই দিয়ে দেব!'

এদিকে...

উনিশ বছর বয়েস থেকে হবিষ্যি গিলে আর শুচিবাই করে করে যে মল্লিকার জন্মের শোধ আমাশার ধাত, হাতে-পায়ে হাজা, সেই মল্লিকার নিজের খুড়শ্বশুর ব্রাহ্মধর্ম না নিয়েও বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলেন।

আত্মীয়রা বলুক 'বেম্ম' করুক 'পতিত', অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করেই হলো সে বিয়ে।

তা ছাড়া হরদমই তো পথে-ঘাটে মেয়ে দেখা যাচ্ছে, ট্রামগাড়িতেই মেয়ে উঠে বসছে। মেয়ে-ইস্কুলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-মাস্টারনীও বাড়ছে; এই বন্যার মুখে মাস্টার নিয়ে খুঁতখুঁত করে আর কি হবে?

তবু শেষ চেষ্টা করেছিল প্রবোধ 'আমার অত পয়সা নেই' বলে। সুবর্ণ সংক্ষেপে বলেছে, 'তোমায় দিতে হবে না।' তারপর ঈশ্বর জানেন, সুবর্ণ কাকে দিয়ে দুখানা গহনা বিক্রি করে ফেলেছে।

কে জানে গিরি তাঁতিনী এই কাজে সহায় হয়েছে কিনা। বৌদের তো তাই বিশ্বাস। নইলে আজকাল এত আসে কেন ও?

আচ্ছা প্রবোধই বা নিজে কি করছে? এত বড় আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বসে আছে না? কারণ? কারণ ঘরে ঘরে বড় বড় মেয়ে রয়েছে পড়ে, সেই সাহস!

॥ ২৫ ॥

হ্যাঁ, চলছিল গিরির আনাগোনা।

মাঝে মাঝেই কাপড়ের বোঁচকা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে জল খেতে দেখা যায় তাকে এ বাড়িতে, পান চাইতে দেখা যায়। কাপড় না গছিয়েও চলে যাচ্ছে, আবার আসছে।

গিরি এখনো যেমনটি ছিল যেন ঠিক তেমনটিই আছে।

সুবর্ণলতার চেহারায় কত ভাঙচুর হলো, সুবর্ণলতার স্বাস্থ্যে কতই ক্ষয় ধরলো, গিরি অটুট অক্ষয়। শুধু কাপড়ের মোটের মাপটা একটু ছোট হয়েছে তার ইদানীং। তা সে বেশি বইতে পারে না বলে, না বেশি গছাতে পারে না বলে, তা কে জানে! আজকাল যেন লোকের তাঁতিনীর কাছে কাপড় কেনার থেকে দোকানের ওপরই বেশি ঝোঁক।

তাই গিরি আর মোটা আটপৌরের বোঝা বেশি বয়ে বেড়ায় না, বাছাই বাছাই জরিপেড়ে শান্তিপুরী, মিহি মিহি ফরাসডাঙ্গার আধুনিক ধরনের পাড়ের দু-চারখানি শাড়ি, এই নিয়ে বেরোয়।

আর এসেই বলে, 'শ'বাজারের রাজবাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি শাড়ি, ওতোরপাড়ার রাজাদের বেয়াইবাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি সাতখানা শাড়ি, নাটোরের মহারাণীর বাপের বাড়িতে দুকুড়ি শাড়ির বরাত আছে, যেতে হবে সেখানে।'

রাজবাড়ি ছাড়া কথা নেই আজকাল গিরির মুখে। দিন 'গত' হয়ে আসবার আভাস যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই কি শুধু প্রচারের জোরে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার চেষ্টা গিরির?

ঘটকালি তো গেছেই, এ ব্যবসাটাও যেন গেল গেল।

কিন্তু ঘটকালিটা কি একেবারে গেছে?

এ বাড়িতে তবে আজকাল কোন্ কাজে আনাগোনা তার? হ্যাঁ, সেই পুরনো ব্যবসাটাই আবার ঝালাতে বসেছে গিরি!

সুবর্ণলতার সেজ ছেলে মানুর জন্যে একটি কনের সন্ধান এনেছে!

মানুর বিয়ের বয়েস আগেই হয়েছিল, বছরের আড়াআড়ি পিঠোপিঠি ভাই তো ওরা—ভানু, কানু, মানু। তবে মানু কৃতী হয়ে বিদেশে চাকুরি করতে চলে যাওয়ার দরুন বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আর হয়তো বা সুবর্ণলতার অনাগ্রহেও গেছে।

নচেৎ মেয়ের বাপেদের তো মেয়ে নিয়ে ধরাধরির কামাই নেই।

সুবর্ণলতা বলে, 'ছেলে ছুটিতে বাড়ি আসুক, তখন কথা হবে।. আজকাল ছেলেদের নিজের চোখে দেখে নেওয়া রেওয়াজ হয়েছে।'

ইচ্ছে করে ছেলেকে এই বেহায়াপনা শিক্ষা দেবার ব্যাপারে বাড়ির কারুরই অনুমোদন নেই। যে দম্পতিযুগলের না দেখে বিয়ে হয়েছে, তারা সরবে বলে, 'কেন' বাবা, আমরা কি ঘর করছি না?'

তবু সুবর্ণ বলে, 'তা হোক। যে কালে যা ধর্ম'!'

ওই বলে বলে তো ছেলেটাকে বিদেশযাত্রায় প্ররোচিত করলো সুবর্ণই।

এই যে ছেলেটা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিল্লীতে পড়ে আছে, তাতে কি খুব সুখ হচ্ছে তোমার? প্রবোধ কি আপত্তি করে নি? বলে নি কি, 'এ বংশের কেউ কখনো "ভাত ভাত" করে দেশছাড়া হয় নি?'

সুবর্ণ বলেছে, 'কখনো হয় নি বলে কখনো হবে না? তোমার ঠাকুদ্দা প্র-ঠাকুদ্দারা তো কখনো গায়ে কাটা কাপড় তোলেন নি, পায়ে চামড়ার জুতো ঠেকান নি, তুমি মানছো সেই সব নিয়ম? নিয়ম জিনিসটা কি হিমালয় পাহাড় যে, সে নড়বে না?'

অতএব মানু দিল্লীতে চলে গিয়েছিল।

ছুটিছাটায় যখন আসে, মানুকে আর এক বাড়ির ছেলের মত লাগে। বেআন্দাজী বেপরোয়া আর শৌখিন তো ছিলই চিরকাল। এদের এই সনাতনী বাড়ির প্রলেপ যেন আর রঞ্জিত রাখতে পারছে না তাকে।

সুবর্ণর এটায় যেন আলাদা সুখ।

বললে লোকে 'ছি ছি' করবে, তবু মাতৃস্নেহের মুখ রাখে না সুবর্ণলতা।

মানু বরাবর বাইরেই থাকুক, ওখানেই সংসার পাতুক, এই তার একান্ত ইচ্ছে।

তা সম্প্রতি মানুর চিঠি পড়ে মনে হয় যেন ওই 'সংসার পাতা'র ইচ্ছেটা উঁকি মারছে। রাঁধুনে ঠাকুরের হাতে যে খাওয়া-দাওয়া ভাল হচ্ছে না এটা প্রায়শই জানাচ্ছে।

তবু সুবর্ণলতা ঔদাসীন্যের খোলস ত্যাগ করে বিয়ের তোড়জোড় করছিল না, হঠাৎ এই সময় গিরি একটি মেয়ের সন্ধান নিয়ে এসে ধরে বসলো।

একেবারে নেহাৎ গরীবের ঘর, অসহায় বিধবার মেয়ে, তবে মেয়ে পরমা-সুন্দরী। মেজবৌমার দয়ার শরীর বলেই গিরি এখানে এসে পড়েছে।

গরীবের ঘর!

অসহায়া বিধবার মেয়ে!

পরমাসুন্দরী!

এই তিনটে শব্দ যেন সুবর্ণকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে এনেছিল।

তারপরই গিরি শাড়ির ভাঁজ থেকে কনের একখানা ফটো বার করলে! বললো, 'এ ছবি তোমার ব্যাটাকে যদি পাঠিয়ে দাও দিও, মোট কথা গরীবের কন্যাদায়টা উদ্ধার করতেই হবে তোমায়।'

সুবর্ণ ফটোখানা চোখের সামনে তুলে ধরলো, আর তন্মুহূর্তেই যেন আত্মসমর্পণ করে বসলো।

আহা কী নম্র ভঙ্গী, কী নমনীয় মুখ, কী কোমল চাউনি! অথচ কেমন একটি দীপ্ত লাবণ্য! দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে!

গিরি এদিকে কথা চালিয়ে যায়, 'মেয়ের পিসের বুঝি ফটক তোলার শখ, তাই কবে একখানা ফটক তুলেছিল সেইটুকুই সম্বল, নইলে গরীব বিধবার মেয়ে, কে কী করছে! বংশ খুব উঁচু গো, তোমার মামার বাড়ির সঙ্গে কি যেন সুবাদ আছে!'

'আমার মামার বাড়ি?'

সুবর্ণ যেন চমকে ওঠে!

সুবর্ণর আবার মামার বাড়ি কোথায়? এদের এই বাড়িটা ছাড়া সুবর্ণর আর কোথাও কোনো 'বাড়ি' আছে নাকি? মাসীর বাড়ি, পিসির বাড়ি, দিদির

বাড়ি, জেঠি-খুড়ীর বাড়ি, যা সব থাকে লোকের? তাই মামার বাড়ি থাকবে?

সুবর্ণ ম্লান হাসির সঙ্গে বলে, 'আমার আবার মামার বাড়ি! ভূতের আবার জন্মদিন!'

গিরিও হাসে, 'আহা, তা উদ্দিশ তারা না করলেও, ছিস তো একটা মামার বাড়ি? ভুঁইফোঁড় তো নও!'

'আমার তো নিজেকে তাই মনে হয়।'

সুবর্ণ ছবিখানা আবার হাতে তুলে নেয়, দেখে নিরীক্ষণ করে।

গিরি আঁচল থেকে 'গুলের' কৌটো বার করে একটিপ দাঁতের খাঁজে রেখে বলে, 'তা তুমি খবরাখবর না রাখলেও তেনারা রাখে। এই মেয়ের যে দিদিমা তার সঙ্গে দেখা হলো। তিনিই বললো, তুমি পাত্তরের মাকে বোলো, আমি হচ্ছি তাঁর মায়ের জ্ঞাতি পিসি। পিসি ভাইঝি আমরা একই বয়সী ছিলাম, গলায় গলায় ভাব ছিল। কি যেন ছাই নাম ছিলো তোমার মায়ের? বললো সেই নাম—'

কিন্তু কাকে বলছে গিরি?

সুবর্ণ যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ।

তার মায়ের সমবয়সী পিসী?

গলায় গলায় ভাব ছিল?

কে সে? কী নাম তার?

সুবর্ণ যেন নিথর সমুদ্রে ডুবুরি নামাতে চেষ্টা করে! মা'র কাছে মা'র ছেলেবেলার গল্প শুনেছিল না?

'নাম জানো তাঁর—'

আস্তে বলে।

গিরি দেখে ওষুধ ধরেছে!

গিরি অতএব পান বার করে এবং পানটি খেয়ে একটু কালক্ষেপ করে বলে, 'জানি—নাম তো বললে বুড়ি। তোমার মায়ের পিসি হয় বললো, "পুণ্যি পিসি" না কি। বললো, "ওই বললেই বোধ হয় বুঝতে পারবেন"।'

পুণ্যি পিসি! পুণ্যি পিসি!

বিস্মৃতির কোন্ অতল থেকে ভেসে উঠল এ নাম? একখানি উজ্জ্বল হাসি হাসি মুখ থেকে ঝরে পড়তো না এই নামটি?

'আমি আর পুণ্যি পিসি, এই দুটিতে ছিলাম একেবারে দুষ্টুমির রাজা! ...একদিন আমি আর পুণ্যি পিসি, হি হি হি, দুজনে পাল্লা দিয়ে এমন সাঁতার কাটলাম যে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁথামুড়ি দিয়ে তেড়ে জ্বর! ...পুণ্যি পিসি ছিল এদিকে ভারি ভীতু—'

সুবর্ণ চোখ তুলে বলে, 'উনি মেয়ের কে হন বললে?'

'দিদিমা গো! খোদ মায়ের মা! অবস্থা একদা উঁচু ছিল, ভগবানের মারে পড়ে গেছে সে অবস্থা—'

সুবর্ণ স্থির গলায় বলে, 'তুমি এখানেই কথা কও গিরি ঠাকুরঝি, এই মেয়েই আমি নেব।'

এই মেয়েই আমি নেব।

এই মেয়েই আমি নেব।

যেন যপের মন্ত্র!

এই ছবির মুখে যেন কী এক শান্তির আশ্বাস পেয়েছে সুবর্ণ!

এই ছবির মুখে কি সুবর্ণর মা'র মুখের আদল আছে?

কিন্তু কেন তা থাকতে যাবে?

কোন্ রক্ত কোন্ দিকে গড়িয়েছে হিসেব আছে তার?

কোনো যুক্তি নেই, তবু সুবর্ণর মনে হতে থাকে, এই মেয়ের মধ্যে তার মা'র মাধুরী মাখানো আছে। আছে সুরে সুরে সাদৃশ্য। এই যোগসূত্র কে এনে ধরে দিল? নিশ্চয়ই ভগবান! সুবর্ণ নিজে তো যায় নি খুঁজতে?

তবে?

এ ভগবানের খেলা!

সুবর্ণর ভয়ানক শূন্যতার দিকটায় বুঝি পূর্ণতার প্রলেপ দিতে চান তিনি এতদিনে!

ছবিখানা মানুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হলে—হয় স্বামীকে, নয় পুত্তুরদের জানাতে হবে। সুবর্ণ তো আর পার্শেল করতে যাবে না? আগের মত দিন থাকলে সুনির্মলকেই বলতো। কিন্তু ওই পড়া আর পড়ানো নিয়ে এমন বিশ্রী একটা আবহাওয়া হয়ে গিয়েছে যে, তেমন স্বচ্ছন্দে আর ডেকে কাজ বলা যায় না।

অথচ এখুনি এই ছবির খবরটা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না কাউকে। এ যেন সুবর্ণর নিজস্ব গোপন ভারি দামী একটি সম্পত্তি।

একখানি মিষ্টি মুখ, এত প্রভাবিত করতে পারে মানুষকে?

'আমিই এই—,' মনে মনে একটু হাসে সুবর্ণ, তবে আর ভবিষ্যতে আমার ছেলেকে দোষ দেওয়া চলবে না। সে তো আত্মহারা হয়েই বসবে। ফটো আর পাঠিয়ে কাজ নেই, মূর্ছা যাবে।

ফটোটা পাঠাল না সুবর্ণ, এমনি একটা চিঠি লিখলো ছেলেকে।

তাতে জানালো, 'সে মেয়ে অপছন্দ হবার নয়, দেখলেই বুঝবে মা'র নজরটি কেমন। এক দেখায় বলা যায় পরমা সুন্দরী মেয়ে, তাই আর কাল-বিলম্ব না করে কথা দিয়ে দিয়েছি। তুমি পত্রপাঠ ছুটির দরখাস্ত করবে। গরীব বিধবার মেয়ে, বয়েসও হয়েছে, তারা একান্তই ব্যস্ত হয়েছে।'

আবার সেই বাড়ির কর্তাকে বাদ দিয়ে, বড় বড় ছেলেদের উপেক্ষা করে কথা দেওয়া!

শিক্ষা আর সুবর্ণর হবে না!

তা মাস্টার রাখা এবং কলেরা কাণ্ডের পর থেকে সুবর্ণকে যেন সবাই ভয় করতে শুরু করেছে।

ভক্তি নয়, ভয়!

চৈতন্য হয়ে সমঝে যাওয়া নয়, রাগে গুম হয়ে থাকা। অতএব এই 'কথা দেওয়া' নিয়ে আড়ালে যতই সমালোচনা চলুক, সামনে কেউ কিছু বলে না।

তবে সুবর্ণ যদি বলে বসে—'গিরির সঙ্গে একবার ওদের বাড়ি যাই না?' তাতেও চুপ করে থাকবে মানুষ?

বিরক্ত প্রবোধ না বলে পারে না, 'ওদের বাড়ি যাবে তুমি? ছেলের মা ছুটবে মেয়ের মা'র পায়ে তেল দিতে?'

'পায়ে তেল দিতে আবার কি?' সুবর্ণ বলে, 'শুনলে তো বাড়িতে পুরুষ

অভিভাবক তেমন নেই, মা আর দিদিমা। তা দিদিমা তো আমার থেকে সম্পর্কে বড়, গুরুজন, যেতে দোষের কি আছে?'

বলে এ কথা সুবর্ণ।

দোষের কিছু দেখে না সে।

কিন্তু কেউ যদি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দোষ-গুণের বিচার করে, সেটা তো সংসারসুদ্ধু লোক মানতে পারে না?

সুবর্ণ যদি ছেলের মা হয়েও হ্যাংলার মত মেয়ের বাড়িতে যায়, তারা তো এ কথাও ভাবতে পারে, নির্ঘাত ছেলের কিছু গলদ আছে, নচেৎ এত গরজ কিসের?

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। ঝুনো সংসারী লোকেরা তো এই ভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। যেখানেই দেখবে চুলচেরা হিসেবের বাইরে কিছু ঘটছে, সেখানেই ধরে নেবে নিশ্চয় কোথাও কোনো গলদ আছে, নচেৎ এমন বেহিসেবী কেন?

পাত্রপক্ষ সিংহাসনে আসীন থাকবে, পাত্রীপক্ষ জুতোর শুকতলা ক্ষয়াবে, এই নিয়ম! এর বাইরে যেতে চেয়ো না তুমি সুবর্ণ।

অতএব যাওয়া হয় না।

শুধু সুবর্ণ ভবিষ্যৎ বাংলার ছবিতে মেয়েদের জন্যে 'মড়ক' প্রার্থনা করে, 'বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর এমন কোনো মড়ক আসে না গো, যাতে দেশ মেয়ে-শূন্যি হয়ে যায়? তখন দেখি তোমরা মহানুভব পুরুষসমাজ কোন্ সিংহাসনে বসে ক্রীতদাসী সংগ্রহ কর? এ অহঙ্কার ফুরোবে তোমাদের। তোমাদেরই জুতোর শুকতলা ক্ষয়াতে হবে, এই আমি অভিশাপ দিচ্ছি।' নিজ মনে এই ভয়ানক কথা উচ্চারণ করে সুবর্ণ বলে, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—'

তবু এই বিয়ে উপলক্ষে আবার যেন ঝেড়ে উঠছে সুবর্ণ। আশ্চর্য, কোথায় লুকনো আছে তার এই অদম্য প্রাণশক্তি যে শতবার ভেঙে লুটিয়ে পড়ে পড়েও আবার ওঠে খাড়া হয়ে?

কতবারই তো মনে হয় এইবার বুঝি ফুরিয়ে গেল সুবর্ণলতা, আবার দেখা যায়, আরে এ যে আবার জীবন্ত মানুষের ভূমিকা নিয়েছে!

বকুলের বুড়ো মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তো দিব্বি কথাবার্তা শুরু করে দিয়ে মেয়ের পড়ার তত্ত্ব-বার্তা নিচ্ছিল, আবার তাঁকে ধরেই আলাদা এক অঙ্কর মাস্টার রাখিয়েছে, বছরের মধ্যেই মেয়েকে এণ্ট্রেন্স এক্‌জামিন দেওয়াবে বলে।

ভানু আর ভানুর বৌ হাসে আড়ালে।

বলে, 'মা তাঁর ছোট কন্যাটিকে গার্গী মৈত্রেয়ী লীলাবতী না করে ছাড়বেন না!'

কানু আর কানুর বৌ হাসে আর বলে, 'এ হচ্ছে সেই দাদার বন্ধুর বোনের ওপর আক্রোশ!'

আর কানুর বৌ আর ভানুর বৌ বলে, 'মা'র দেখছি মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন। মেয়েকে জলপানি না নিইয়ে ছাড়বেন না। তবে কিনা কথায় আছে, "হিংসেয় সব করতে পারে—বাঁজা পুত বিয়োতে নারে।" মগজে ঘি থাকলে তবে তো জলপানি!'

. ধরে নেয় নেই ঘি।

কিন্তু ওরাই কি পরম পাপে পাপী? সংসার তো এই নিয়মেই চলে।

বাহিদর্শ্য নিয়েই তো তার কারবার। কে কি করছে, সেটাই দেখে লোকে। কেন করছে তা কি অত দেখতে যায়? দেখতে যায় না, তাই নিজেদের হিসেব অনুযায়ী একটা কারণ নির্ণয় করে নিয়ে সমালোচনার স্রোত বহায়!

সুবর্ণর এই ব্যবহারটা হিংসুটে মনের আক্রোশের মতই তো দেখাচ্ছিল।

আবার মানুর বিয়েতে বেশি উৎসাহ দেখলেও নির্ঘাত লোকে বলবে, বেশি রোজগেরে আর দূরে-থাকা ছেলে কিনা! জগতের রীতিই তো 'বাইরের জামাই মধুসূদন ঘরের জামাই মোধো'।

এ ছেলে বাইরে আছে, নগদ টাকা পাঠাচ্ছে, অতএব মানু দামী ছেলে।

তবে দামী বৌ হচ্ছে না এই যা।

এ কথা জনে জনে বলছে।

চাঁপা তো গাড়িভাড়া করে এসে বলে গেল, 'রূপ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে মা? মেয়ে তো শুনছি ডোমের চুপড়ি-ধোয়া! মানুর মতন দামী ছেলেকে তুমি কানাকড়িতে বিকিয়ে দেবে? অথচ আমার পিসশ্বশুর অত সাধ্যসাধনা করলেন, তখন গা করলে না তুমি। উনি মেয়েকে মেয়ের ওজনে সোনা দিতেন, তার ওপর খাট-বিছানা, আর্শি, আলনা, ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি, সোনার বোতাম—'

সুবর্ণ হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, 'তা হলে তো স্যাকরার দোকানের সঙ্গে বিয়ে দিলে আরো ভাল হয় রে চাঁপা!'

চাঁপার ওই জমিদার পিসশ্বশুর সম্পর্কে সমীহর শেষ নেই, তাই চাঁপা রাগ করে উঠে যায়।

সুবর্ণ ভাবে, জঞ্জালের বোঝাকে এত বেশি মূল্য দেয় কেন মানুষ? সুবর্ণ ভাবে, চাঁপাটা চিরকেলে মুখ্যু!

তা হয়তো সত্যি। মুখ্যু চাঁপা মুখ্যুর মত কথা বলেছে।

কিন্তু মানু?

মানু তো মুখ্যু নয়?

মানু তো বিদ্যের জোরেই তিন-তিনশো টাকা মাইনের চাকরি করছে।

সে তবে এমন চিঠি লেখে কেন?

মানুর চিঠির ভাষা কৌতুকের। তবে বক্তব্যটা অভিন্ন। সেও বলেছে, এযুগে রূপের চেয়ে রূপোর আদর বেশি। তা ছাড়া হাড়দুঃখী বিধবার মেয়ে বিয়ে করে চিরকাল যে তাদের টানতে হবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। কাজ কি বাবা অত ঝামেলায়। বরং নিজেরই এখন নগদ কিছু টাকা হাতে পেলে ভাল হয় তার। একটা ভাল চাকরির সন্ধান পেয়েছে, দিল্লী-সিমলের কাজ—ভবিষ্যতের আশা আছে, তবে নগদ পাঁচটি হাজার জমা দিতে হবে।

অতএব এই বিয়েটাকেই তাক্ করে আছে মানু ওই টাকার সুরাহার ব্যাপারে। তা সে সুরাহার মুখও একটু দেখা যাচ্ছে। বর্তমান অফিসের বড়কর্তার নাকি তাকে জামাই করে ফেলবার দারুণ ইচ্ছে এবং সেই ইচ্ছের খাতে ওই টাকাটি দিতে পারেন। অবশ্য বিয়ের আনুষঙ্গিক দান-সামগ্রী, বরাভরণ,

মেয়ের গহনা ইত্যাদিতে কিছু ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু কি লাভ কতগুলো জঞ্জালের স্তূপে?

জঞ্জালের স্তূপ!

সুবর্ণলতার কথাটাই তো বলেছে তার ছেলে, তবে আর অমন সাপে-খাওয়ার মত স্তব্ধ হবার কি আছে সুবর্ণলতার?

ছুটি নিয়ে এল মানু বিয়ে করতে। বড়কর্তার স্ত্রীপুত্র পরিবার সবই কলকাতায়। সত্যিই তাঁরা জঞ্জালটা বেশি দিলেন না। তবে ঘটা-পটার ত্রুটি হলো না। এ পক্ষেও হলো না। বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বলে মানরক্ষার ব্যাপারে তৎপর হলো মানুর বাপ-ভাই।

সানাই বাজলো তিন দিন ধরে, আলো জ্বললো অনেক, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের লাইন চললো বরের সঙ্গে সঙ্গে, এদিকে ছাদ জুড়ে হোগলা ছাওয়া হলো, এঁটো গেলাস কলাপাতায় ফুটপাথ ভর্তি হয়ে গেল, কাকেরা আর কুকুরেরা সমারোহের ভোজ খেয়ে নিশ্চয় শতমুখে আশীর্বাদ করলো।

চাঁপা-চন্নন তো কাছের মেয়ে এলোই, দূরের মেয়ে পারুলও এলো।

আর মায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই চমকে উঠলো সে, 'এ কী চেহারা হয়েছে মা তোমার?'

তারপর গল্পপ্রসঙ্গে বললো, 'বেশ করছো ওকে লেখাপড়ায় এগোচ্ছো। বিদ্যেটা করে ফেলতে পারলে তবে তো এ প্রশ্ন তোলা যাবে—মেয়েমানুষই বা চাকরি করবে না কেন? মেয়েমানুষেরই বা চিরকুমারী থাকতে ইচ্ছে করলে সে ইচ্ছে পূরণ হবে না কেন? বলা যাবে—মেয়েদেরই বিয়ে না হলে জাত যায়, পুরুষের যায় না, এ শাস্ত্রটা গড়লো কে?'

তারপর বকুলের সঙ্গে একান্তে দেখা হলে হেসে বললে, 'প্রেমের ব্যাপারে কতদূর এগোলি?'

বকুল বললো, 'আঃ সেজদি!'

'আঃ কেন বাবু! তবু একজনেরও যদি জীবনে কোন নতুন ঘটনা ঘটে, দেখে বাঁচি।'

'খুব কবিতা লিখছিস বুঝি আজকাল?' বকুল অনেক দিন পরে সেজদিকে পেয়ে মনের দরজা খুলে যায় যেন তার। কতদিন একটু সরস কথার মুখ দেখে নি। তাই হেসে হেসে বলে, 'প্রেমের কবিতা? তাই এত ইয়ে—'

পারুল একটু চুপ করে থাকে, তারপরে বলে, 'নাঃ, কবিতা আর লিখি না।'

'লিখিস না? মূর্তিমান কাব্যতেই একেবারে নিমগ্ন হয়ে আছিস?'

'তাই আছি।'

পারুলের মুখে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মত একটা ম্লান হাসির আভা।

'এই শোন্ সেজদি, বেশি চালাকি করিস না, ইতিমধ্যে কটা খাতা ভরালি দেখবো। এনেছিস তো?'

পারুল উড়িয়ে দেয় সে কথা। তারপর একসময় হেসে উঠে বলে, 'প্রেমের কবিতা বড় ভয়ানক বস্তু রে! ও লোকবিশেষকে জলবিছুটি দেয়। প্রেম ব্যতীত প্রেমের কবিতা এ তার বিশ্বাসের বাইরে।'

'হুঁ!' বকুল আস্তে বলে, 'তার মানে—উচ্চশিক্ষা জিনিসটা শুধু একটা শার্টকোটের মত! গায়ের ওপর চড়িয়ে বাহার দেবার!'

পারুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কি জানি, সর্বত্রই তাই, না কোথাও কোথাও সেটা অস্থিমজ্জায় গিয়ে মিশে চিত্তকে উচ্চে তোলে!'

'এই সত্যি, সেজ জামাইবাবু প্রেমের কবিতা দেখলে চটে?'

'চটে! উঁহু না তো'.—পারুল হেসেই বলে, 'চটে না! শুধু বলে গুপ্ত প্রেম না থাকলে এত গভীর প্রেমের কবিতা আসতেই পারে না। পাতায় পাতায় এই যে "তুমি" আর "তোমার" জন্যে হাহাকার, তার লক্ষ্যস্থল যে হতভাগা আমি নয়, সে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। তা এই প্রেম যখন আইবুড়ো বেলা থেকেই আছে, তখন আর এ হতভাগার গলায় মালা দেওয়া কেন?'

'চমৎকার! কবিরা সব প্রেমে পড়ে পড়ে তবে—'

'থাক্ বকুল, ও কথা রাখ্। তোর কথা বল্, এতদিন এখানে কি হলোটলো বল্।'

'সে তো মহাভারত!'

পারুল হাসে। পারুল তার ভেতরের সমস্ত বিক্ষোভকে নিজের মধ্যে সংযত রেখে স্থির থাকবে, এই বুঝি পারুলের পণ! অভিমানের কাছে সব 'পরম'কে বলি দেবে এই বুঝি ওর জীবন-দর্শন!

তাই পারুল সব কিছুকে চাপা দিয়ে বলে, 'তবে তো হাতে সুপুরি হর্তুকি নিয়ে বসতে হয় রে। মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।'

তা যে যেভাবেই হোক, এ বিয়েটার উপলক্ষে আমোদ-আহ্লাদটা করলো খুব, নববিবাহিত মানু একদিন নিজের পয়সা খরচ করে সবাইকে নতুন একটা জিনিস দেখালো, বাংলা বায়োস্কোপ!

চন্নন একদিন নতুন বৌয়ের ছুতোয় গুষ্টিবর্গ সবাইকে নেমন্তন্ন করলো। শুধু সব কিছু আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত থাকলো সুবর্ণ। সুবর্ণকে আবার ঘুষঘুষে জ্বরে ধরেছে।

আর বকুল কোনো আমোদেতে যোগ দেয় না তার স্বভাবগত কুনোমিতে।

তবু সুবর্ণর যেন মনে হয়, অসুস্থ মা একা বাড়িতে পড়ে থাকবে এটা অনুমোদন করছে না বলেই বকুলের এতটা কুনোমি। নইলে সেজদি পারুলের সঙ্গে তো আছে হৃদ্যতা।

বায়োস্কোপ দেখতে, নেমন্তন্ন খেতে দুদিনই মায় প্রবোধ সবাই বেরিয়ে যায়। সুবর্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে, যেন দেওয়ালে কত কি লেখা আছে, পড়ছে সেই সব।

সুবর্ণর ছোট ছেলে সুবল কোথায় থাকে বোঝা যায় না, শুধু হঠাৎ এক এক বার এসে ঘরের মাঝখানে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে পড়ে আস্তে বলে, 'ওষুধ-টষুধ কিছু খাবার ছিল নাকি?' নয়তো বলে, 'বলছিলে নাকি কিছু?' অথবা বলে, 'খাবার রেখে গেছেন ও'রা?...জল আছে?'

'তোমার খাবার'—এত স্পষ্ট করে বলে না। শুধু 'খাবার'।

তবু মায়ের জন্যে যে উৎকণ্ঠিত সে, এটা বোঝা যায়।

কিন্তু সুবর্ণর এই ছোট ছেলে যদি এসে বিছানার ধারে বসে পড়ে বলতো, 'মা, তোমার কি বেশী জ্বর এল নাকি?'...কিংবা নীরবে কপালে হাতটা রেখে অনুভব করতে চেষ্টা করতো উত্তাপের মাত্রাটা কতখানি?

হয়তো সুবর্ণ বেঁচে যেত।

তা সে করে না।

শুধু মা'র ধারে-কাছে কোথায় যেন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু কাশির শব্দ পেলেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হয়তো ওর ইচ্ছে হয়, মা'র বিছানার ধারে বসে মা'র গায়ে হাত রাখে, অনভ্যাসের বশে পারে না। তাই শুধু তার চোখে-মুখে একটা বিপন্ন উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে ওঠে।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকলেও সুবর্ণ অনুভব করতে পারে সেই মুখচ্ছবি। তবু সুবর্ণও তো বলে না, 'আয় না সুবল, আমার কাছে এসে একটু বোস না।'

বলে না নয়, বলতে পারে না।

সুবর্ণর সমস্ত অন্তরাত্মা বলবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তবু বোবা হয়ে থাকে বাক্‌যন্ত্র।

যেন ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত সুবর্ণর হাতেই মজুত রয়েছে তার ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল, কিন্তু রয়েছে একটা সীল করা বাক্সে, আর সেই সীল ভেঙে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার ক্ষমতা সুবর্ণর নেই।

॥ ২৬ ॥

মেয়েরা একে একে বিদায় নিল।

পারুলের যাত্রাকালে বকুল আস্তে বলে, 'ভুল করিস না সেজদি! চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি তুই?'

পারুল ঈষৎ কঠিন হাসি হেসে বলে, 'চোরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে থালার দখলটা নেবার প্রবৃত্তিও নেই!'

'তা বলে তুই কবিতা লেখা ছেড়ে দিবি? অত ভাল লিখতিস?'

'বকিস না', পারুল হেসে ওঠে, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! ভারী তো লেখা! ছেড়ে দিলে পৃথিবীর ভারী লোকসান!'

'পৃথিবীর না হোক, তোর নিজের তো অনেক লোকসান।'

পারুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'লবণ-সমুদ্রে বাড়তি একমুঠো নুন ফেললে কি ইতরবিশেষ হয় বল্ তো? জীবনটাই তো লোকসানের।'

'কিন্তু সেজদি, অমলবাবু তো—'

'আরে কী মুশকিল, তোদের অমলবাবুর নিন্দে করছি নাকি আমি? মহদাশয় ব্যক্তি, স্ত্রীর একটু আরাম-আয়েসের জন্য ভাঁড়ার ভেঙে খরচা করতে পারেন, শুধু প্রেমের কবিতা চলবে না।'

'বেশ তো, ভগবানের বিষয় নিয়ে লিখবি—'

পারুল ওর মাথাটায় একটু আদরের নাড়া দিয়ে বলে, 'ভারী তো লেখা, তার জন্যে ভেবে ভেবে মুণ্ডুটা তোর গেল দেখছি! "বিদ্বান-মুখ্যু"দের নিয়ে আবার অনেক জ্বালা রে! ঈশ্বরই যে মানুষের আদি-অনন্তকালের প্রেমাস্পদ, এ ওদের মগজে ঢোকে না। আবেগ আর ব্যাকুলতা, এ দেখলেই তার মধ্যে

আঁশটে গন্ধ পায় ওরা। যাক গে মরুক গে, মাও তো জীবনভোর কত কি লিখলেন, তার পরিণাম তো নিজেই বললি!'

যদিও মা'র ওই লেখা সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না পারুলের, বরং মা'র তীব্রতা, মা'র আবেগ, মা'র সব বিষয়ে তাল ঠুকে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ করা, এসবকে পারুল খুব অবজ্ঞার চোখেই দেখতো, জানতো মা'র লেখাও ওই পর্যায়ের, কাজেই মূল্যবোধ কিছু ছিল না তার সম্বন্ধে, তবু এখন একটু উল্লেখ করলো।

ব্যর্থতার তুলনা করতে করলো উল্লেখ।

বকুল চুপ করে থাকলো।

বকুলের হঠাৎ সেই এক লহমার জন্য দেখা আগুনের আভায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা মুখটা মনে পড়লো।

সে মুখ পরাজিত সৈনিকের না অপরাজেয় কাঠিন্যের, আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারে নি বকুল।

তা হয়তো পরাজিতেরই।

হয়তো সুবর্ণ ওই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালের লেখা পড়ে না, লেখে সেখানে। অদৃশ্য কালিতে লিখে রাখে বঞ্চনা-জর্জর পীড়িত আত্মাদের ইতিহাস। না, শুধু তার নিজের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ আত্মার কথা। পরবর্তী-কাল পড়বে ওই লেখা।

কে জানে তখন আবার তার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেবে কিনা আর এক নতুন জাতি—উদ্ধত, অবিনয়ী, অসহিষ্ণু, অসন্তুষ্ট, আত্মকেন্দ্রিক।

দেওয়ালের লেখাও তো শেলেটের লেখার মত একবার লেখা হয়, একবার মোছা হয়।

আজ হয়তো এক হৃতসর্বস্ব সৈনিক পরাজয়ের কথা লিখে রেখে যাচ্ছে, আগামী কাল—

কিন্তু সত্যিই কি তবে এবার যাচ্ছে সুবর্ণলতা? তা নইলে এত ভেঙে পড়েছে কেন? উঠতে যদি পারেও, উঠতে চায় না।

বিছানাতেই রাতদিন।

মেজেয় মাদুরের ওপর পাতা বিছানা, ঘরমোছা-ঝি জ্ঞানদা এসে বলে, 'একটু যে উঠতে হবে মা—'

আগে আগে উঠছিল সুবর্ণ, আজকাল বলে, 'আর উঠতে পারি না বাপু, পাশ থেকে মুছে নিয়ে যাও।'

আর মাঝে মাঝে বলে, 'দক্ষিণের ওই বারান্দাটায় একটা চিক্ টাঙিয়ে দিলে ওইখানেই শুতাম—'

প্রবোধ শুনতে পেয়ে রাগ করে বলে, 'ওই খোলা বারান্দায় শোবে? এই নিত্যি জ্বর—'

'ঘুষঘুষে জ্বরে খোলা হাওয়া ভাল', সুবর্ণ একটু হেসে বলে, 'তাছাড়া দক্ষিণের বারান্দায় মরবার যে বড় সাধ আমার!'

'ওসব অলুক্ষুণে কথা বোলো না মেজবৌ—', প্রবোধ গুম্ হয়ে যায়।

সুবর্ণ বলে, 'অলুক্ষুণে কি গো? এখন মরলে জয়জয়কার! যাক্ গে, মরছি না তো—মরবোও না। তবে রাত্তিরে কেসে মরি, তোমার ঘুম হয় না—'

তা কথাটা মিথ্যে নয়।

ও দেওয়ালের একেবারে ওপ্রান্তে উঁচু খাটে ঝালর দেওয়া বালিশ-তাকিয়ায় ঘেরা যে বিছানাটি বড় আরামের শয্যা ছিল, প্রবোধের সেখানে আর নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাচ্ছে না।

ওই কাসি।

কাসির শব্দ হলেই কেমন যেন ঘরে টিঁকতে পারে না প্রবোধ, দরজা খুলে বেরিয়ে দালানের চৌকিতে এসে বসে।

তবু প্রতিবাদ করে প্রবোধ, 'বাঃ, শুধু আমার ঘুমটাই বড় হলো? তুমিও তো কেসে কেসে—', কিন্তু প্রতিবাদের সুরটা যেন দুর্বল শোনায়।

সুবর্ণ দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'তা নিজেকে তো নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার উপায় নেই?'

আজও আবার সেই কথাই ওঠে।

কারণ গতরাত্রে প্রবোধ প্রায় সারারাতই ভিতরদালানে কাটিয়েছে। তবু আজ যেই সুবর্ণ দক্ষিণের বারান্দায় 'চিক' ফেলার কথা বলে, প্রবোধ পাড়া জানিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'এই বকুল, দাদাদের বল্ মুটে ডেকে আমার খাটখানা ওই ছোট ঘরে নিয়ে যাক! ওখানেই শোবো আমি আজ থেকে। কাসির জন্যে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয় আমার, তাই একটা রুগী যাবে খোলা বারান্দায় শুতে!'

ঘরে দাঁড়িয়ে নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচায়।

সুবর্ণ যেন সেই চেঁচানিটার দিকেই একটা রহস্যময় ব্যঙ্গহাসির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ব্যবস্থাটা করে দিল সুবল।

বাবার নয়, মা'র।

কোথা থেকে যেন খানতিনেক চিক আর ত্রিপল এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে মা'র বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল সেখানে। নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে।

বলেছিলও সুবর্ণ সকলের অগোচরে।

সুবর্ণ কি ভেবেছিল, হাতে মজুত এই বাক্সটার সাঁজ্ আমি ভাঙবই? তাই বলেছিল সুবর্ণ, 'সুবল, কখনো তো কিছু অনুরোধ করি নি বাবা, একটা অনুরোধ রাখবি? দক্ষিণের বারান্দায় মরবার বড় শখ হয়েছে। করে দিবি ব্যবস্থা?'

সুবল উত্তর দেয় নি, বোঝা যায় নি করবে কিনা, কিন্তু খানিক পরেই দেখা যায় বারান্দায় পর্দা ঘিরছে।

কেদার-বদরি ফেরত মাসখানেক বারাণসীতে কাটিয়ে, দীর্ঘদিন পরে কলকাতায় ফিরলেন জয়াবতী। আর এসেই দুদিন পরে দেখতে এলেন সুবর্ণকে।

দেখলেন নতুন ব্যবস্থা।

দেখলেন জীর্ণ অবস্থা।

কাছে বসে পড়ে বললেন, 'মানুষের ওপর অভিমান সাজে সুবর্ণ, ইঁট-পাথরের ওপর অভিমান করে নিজেকে শেষ করার বাড়া বোকামি আর কি আছে?'

সুবর্ণ হেসে বলে, 'জানোই তো চিরকেলে বোকা! কিন্তু অভিমানটা ইঁট-পাথরের ওপর এ কথা কে বললো? যদি বলি সৃষ্টিকর্তার ওপর?'

'তা সে লোকটাও তো ইঁট-পাথর!'

'তবে নাচার।'

'বৌমা বলছিল, শরীরের ওপর অবহেলা করে-করেই নাকি রোগটি বাধিয়েছ!'

'ওরা "মা" বলে ব্যস্ত হয়, তাই ওকথা বলে, মরণকালে তো একটা কিছু হবেই?'

'তা "কাল"টাকে তো স্বেচ্ছায় ত্বরান্বিত করছিস! শুনলাম ওষুধ খাস না, পথ্যি খাস না, বৌরা সেবা-যত্ন করতে এলে নিস না—এটা তো ঠিক নয়

সুবর্ণর ব্যাধি-ম্লান চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো, তারপর ছায়া হয়ে গেল। বললো, 'ওই তো বললাম, চিরকেলে বোকা!'

জয়াবতী বললেন, 'তা তো জানি। সংসারে যে পুরো খাঁটিতে কাজ চলে না, ন্যায়ে আর অন্যায়ে, সত্যিতে আর মিথ্যেতে আপস করে নেওয়া ভিন্ন যে সংসার অচল, এ কথা তো কখনো বুঝিয়ে পারি নি তোকে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নাই বা সরে পড়লি? একজন তো কোন্‌কালে ফেলে চলে গেছে, তুই গেলে যে একেবারে নির্বান্ধব!'

সুবর্ণর সেই দীর্ঘ কালো চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে, তবু বুঝি সে চোখ আজও কথা বলতে ভুলে যায় নি। সেই চোখের কথার সঙ্গে মুখের কথাও মেশায় সুবর্ণ, 'যে ফেলে চলে গেছে, সে তোমাকে আজও ভরে রেখেছে জয়াদি, তোমার নির্বান্ধব হবার ভয় নেই।'

'বুঝলাম, খুব জ্ঞান দিলি। তবু দুটো মনের কথা বলারও তো সঙ্গী দরকার? আর তুই কি শেষটা হার মেনে চলে যাবি?'

'পণ ছিল হার মানব না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার যে সুবর্ণর ওপর বড় আক্রোশ, আর পারছি না। সেবা-যত্নের কথা বলছো জয়াদি, যে যা করতে আসে, কেউ কি অন্তর থেকে করে? সবই লোক-দেখানো!'

জয়াবতী হেসে ফেললেন। বললেন, 'চোখে যেটা দেখা যায় সেটাই দেখতে হয় সুবর্ণ, অন্তরটা দেখতে যাওয়া বিধাতার বিধানের ব্যতিক্রম।'

সুবর্ণ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলে, 'থাক জয়াদি, ও নিয়ে তর্ক করা বৃথা। এ কাঠামোয় নতুন করে আর কিছু হবে না। তার চাইতে তুমি

যা সব দেখে এলে তার কথা বলো।

জয়াবতী রুদ্ধ গলায় বলেন, 'সে আর বিশদ করে বলতে ইচ্ছে নেই সুবর্ণ। তোর কাছে চিরকালের লজ্জা রয়ে গেল আমার। তীর্থ করেছি না রাতদিন অপরাধের ভারে মরমে মরে থেকেছি—'

'ওমা শোনো কথা—,' সুবর্ণ ওকথা চাপা দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু জয়াবতী কথাটা শেষ করেন, শুধু আমি একা হলে তোকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু "দল" বড় ভয়ানক জিনিস! ও জিনিসের মায়া থাকে না, মমতা থাকে না, চক্ষুলজ্জা থাকে না। "যাব না" বললে খেয়ে ফেলতো আমায়। আমিই তো উদ্যোগী।'

সুবর্ণ বলে, 'যাবে না কি বল? তীর্থ বলে কথা! মহাতীর্থ! জীবনে দুবার সুযোগ আসে না, আমার ভাগ্য আমায়—'

হ্যাঁ, এই একটা জায়গা যেখানে সুবর্ণ সাধারণ মানুষের মত কথা কয়। ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করে।

'ঠাকুরপোর অসুখ যে শক্ত নয় সে আমি বুঝেছিলাম।' জয়াবতী একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'তবু যাওয়া আটকাতো না যদি ছেলেরা প্রতিকূল না হতো।'

সুবর্ণ হঠাৎ হেসে ওঠে।

খাপছাড়া ভাঙা-ভাঙা।

'শোনো কথা! জন্মলগ্নই যার প্রতিকূল, তার আবার কে অনুকূল হবে?' তা এইটাই হয়তো ঠিক কথা।

জন্মলগ্ন নাকি তার রাশি-নক্ষত্রের সৈন্যসামন্ত নিয়ে আজীবন তাড়া করে বেড়ায় মানুষকে, এটা একটা অঙ্কশাস্ত্রের কথা।

কথায় ছেদ পড়লো।

এক হাতে গেলাস, এক হাতে রেকাবি নিয়ে এসে ঢুকলো ভানুর বৌ। সহাস্যে বললো, 'জেঠিমা তীর্থ থেকে ফিরেছেন, আজ কিন্তু আপনাকে জল না খাইয়ে ছাড়বো না। দেখুন আমি তসর কাপড় পরে, পাথরের বাসনে করে নিয়ে এসেছি।'

জয়াবতী স্মিতমুখে বলেন, 'না জিজ্ঞেস করে এসব করতে গেলে কেন গো পাগলি মেয়ে! আজ যে আমার "সঙ্কটা", কিছু খাব না তো!'

'কিছু খাবেন না?'

'না গো মা-জননী, কিছু না। দেখো দিকি, শুধু শুধু কষ্ট পেলে।'

দুঃখের আর অবধি থাকে না বড়বৌমার, ম্লানমুখে চলে যায়।

চলে গেলে সুবর্ণলতা বলে, 'তুমি তো বেশ অভিনয় করতে পারো জয়াদি!'

জয়াবতী হেসে বলেন, 'উপায় কি? জগৎটা তো থিয়েটারই। তুমি অভিনয় করতে পারলে না বলেই হেরে মরলে!'

সুবর্ণলতা আস্তে ওঁর হাতটা মুঠোয় চেপে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলে, 'হেরেছি, কিন্তু হার মানি নি।'

জয়াবতী উঠছিলেন, প্রবোধ এসে দাঁড়াল, হৈ-চৈ করে বলে উঠল, 'এই যে নতুন বৌঠান, তীর্থ-টীর্থ হলো? ভালো ভালো। তা দেখছেন তো আপনার সইয়ের অবস্থা? অথচ এক পুরিয়া ওষুধ খাবে না, সেবা-যত্ন নেবে

না।' আবার এই খোলা জায়গায় এসে শোওয়া। নিজের দোষেই প্রাণটা খোওয়াবে মানুষটা।'

সুবর্ণলতা হঠাৎ দারুণ কাসতে থাকে।

থামতেই চায় না।

প্রবোধ ভয়ার্ত মুখে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই বকুল, কোথায় থাকিস সব? রোগা মানুষ, একটু জলও—আচ্ছা আমি দেখছি—' বলে বোধ করি নিজেই জলের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়।

॥ ২৮ ॥

গঙ্গার জল কত বাড়লো, পৃথিবীর গতি কত বদলালো, তবু 'সমাজ-সামাজিকতা'র লৌহনিগড় থেকে ছুটি নেয় না বুড়ো-বুড়ীরা। শ্যামাসুন্দরীকে এখন কেউ 'সামাজিকতা' করলো না বলে নিন্দে করবে না, তবু তিনি কানুর খোকা হয়েছে শুনে রুপোর ঝিনুকবাটি নিয়ে মুখ দেখতে এলেন। অর্থাৎ চিরকাল যা করে এসেছেন তা করবেন। সবাই বকতে লাগলো।

উনি বললেন, 'তা হোক তা হোক। প্রবোধের এই প্রথম পৌত্তুর। বড় নাতবৌ তো প্রথম "মেয়ে" দেখিয়েছে।'

পৌত্তুর!

তাই বটে।

জিনিসটা আরাধনার।

অথচ সুবর্ণলতা বেহুঁশ হয়ে বসেছিল। সোনার হার দিয়ে মুখ দেখার কথা যার। নিজের ত্রুটি দেখে না সুবর্ণ, কেবল পরের ত্রুটিই টের পায়।

সে যাক্, শ্যামাসুন্দরীর ছানি পড়ে আসা চোখেও অবস্থাটা ধরা পড়লো। প্রবোধকে ডেকে বললেন কথাটা, 'বৌমার কি হাল প্রবোধ? ডাক্তার-বদ্যি কিছু দেখিয়েছো?'

প্রবোধ মাথা চুলকে বলে, 'ডাক্তার-বদ্যি, মানে পাড়ার একজন খুব ভালো হোমিওপ্যাথ—তাঁর কাছ থেকেই ওষুধ এনে দিয়েছিলাম। কিন্তু খেলেই না ওষুধ। পড়ে থাকলো। চিরকালের জেদি তো। ওই মনের গুণেই কখনো শান্তি পেল না। তুমি তো দেখেছো মামী, চিরটাকাল সাধ্যের অতিরিক্ত করলাম। তবু কখনো মন উঠলো না।'

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত গলায় বলেন, 'আহা "মন মন" করেই বা দোষ দিচ্ছ কেন বাবা? মানুষের দেহেই কি ব্যাধি হয় না?'

শ্যামাসুন্দরী চলে যেতেই প্রবোধ পাড়ার ব্রজেন কবরেজকে ডেকে আনলো।

সুবর্ণলতাকে উদ্দেশ করে দরাজ গলায় বললে, 'এই যে কবরেজ মশাই এসেছেন। নাও এখন বলো, তোমার অসুখটা কী?'

এঁদের দেখেই চমকে উঠে বসে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছিল সুবর্ণ।

কবিরাজ মশাই 'কই দেখি তো মা হাতটা—' বলে নিজের হস্ত প্রসারণ করতেই দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আপনাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হলো কবিরাজ মশাই, কোথাও কোনো অসুখ আমার নেই।'

কবরেজ পাড়ার লোক, সমীহ কম, প্রবোধ তিরিক্ষি গলায় বলে ওঠে, 'অসুখ নেই? অথচ সমানে শুনছি ঘুষঘুষে জ্বর, কেসে কেসে অস্থির—'

সুবর্ণলতা মাথা নেড়ে বলে, 'ও কিছু না।'

'"কিছু না" বলে তো জেদটি দেখাচ্ছো, এদিকে আত্মীয়স্বজন এসে আমায় গালমন্দ করে যায়। কবরেজ মশাই যখন এসেইছেন, একবার না হয় দেখেই যান না? খামোকা দিন দিন শুকিয়েই বা যাচ্ছো কেন, সেটাও তো দেখা দরকার?'

সুবর্ণলতা আরো দৃঢ় গলায় বলে, 'না, দরকার নেই'। আপনাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হলো কবরেজ মশাই। আপনি আসুন গিয়ে।'

অর্থাৎ 'আপনি বিদায় হন'।

এমনি করে একদিন কুলপুরোহিতকে তাড়িয়েছিল।

ব্রজেন কবরেজ ফর্সা মানুষ, আরক্ত মুখটা আরো আরক্ত করে বলেন, 'বাড়িতে পরামর্শ করে তবে ডাক্তার-বদ্যিকে "কল" দিতে হয় প্রবোধবাবু!'

প্রবোধবাবু ঘাড় হেঁট করে সঙ্গে সঙ্গে নেমে যান।

'কবরেজ এসেছিলেন, দেখানো হয় নি কেন?' বহুকাল আগে যে-বাড়ি ছেড়ে এসেছে ভানু, আজও অবিকল সে বাড়ির একজনের মত মুখভঙ্গিমায় বলে উঠলো, 'এটার মানে?'

সুবর্ণলতা সে মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'দরকার নেই বলে।'

'দরকার আছে কি নেই, সেটা চিকিৎসকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হতো না?'

সুবর্ণ উঠে বসলো, স্থির গলায় বললো, 'সেই "ভালো"টা অবশ্যই তোমাদের? কিন্তু বলতে পারো, আজীবন কেবলমাত্র তোমাদের ভালোটাই ঘটবে কেন পৃথিবীতে?'

কবরেজের মত মুখ করে ভানুও উঠে গেলো। বলে গেলো—'সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাটাই এখন প্রধান কাজ হয়েছে তোমার!...আর এখনই বা কেন? চিরকালই!'

খাতার নীচে চিরদিনের মত ঢেরা টেনে দিয়ে চলে গেল বলেই মনে হলো।

আশ্চর্য, একটা মানুষ শুধু মনের দোষেই খাক্ করলো সবাইকে!

'রোগ হয় নি' বলে কবরেজ তাড়ালে। অথচ চিরশয্যা পেতে শুয়ে আছে। মানেটা কি?

তা মানেটা আবিষ্কার করে বৌরা।

চুপিচুপি বলাবলি করে সেটা তারা।

'দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে রোগটা ভালো নয়, কাসি রোগ ছোঁয়াচে রোগ, তবু ডাক্তার কবরেজ দেখালেই তো হাতেনাতে ধরা পড়া, মেয়ের বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে, তাই—'

তবু মানে একটা আবিষ্কার করেছে তারা, যেটির মধ্যে সুবর্ণলতার

সদবুদ্ধি আর সংসারের প্রতি শুভেচ্ছা দেখতে পেয়েছে তারা। পরের মেয়ে হয়েও পেয়েছে। বরং কানুর বৌ এটাও বলেছে, 'অতিরিক্ত অভিমানী মানুষ! অথচ বাবা একেবারে অন্য ধরনের—'

কিন্তু এসব তো তারা সুবর্ণলতার সামনে বলে না যে সুবর্ণলতা টের পাবে, তাকে কেবলমাত্র 'মন্দবুদ্ধি' ছাড়াও অন্য কিছু ভাবে কেউ কেউ।

তাড়িঘাড়ি রোগ নয়, তাই হুড়মুড়িয়ে দেখতে আসার কথা নয়। তবু চন্নন আজকাল মাঝে মাঝেই আসে। শ্বশুরবাড়িতে মনোমালিন্য চলছে, তাই ছুতো করে পালিয়ে আসে।

এসে মা'র কাছে বসে খানিকটা কুশল প্রশ্ন আর খানিকটা হা-হুতাশ করে উঠে যায়। থিয়েটার দেখার ঝোঁকটা প্রবল তার, সেই ব্যবস্থা করতেই ভাজেদের কাছে আসা। ওখান থেকে যেতে গেলেই তো একপাল জা ননদের টিকিটের দাম গুনতে হবে, ভেতরে যতই মনোমালিন্য থাক, বাইরে সৌষ্ঠব না রাখলে চলে না।

এখানে ও বালাই নেই, বৌ দুটোকে নাচালেই হয়ে যায় ব্যবস্থা। গিন্নী-বান্নী একটা ননদ সঙ্গে যাচ্ছে দেখলে আপত্তি করে না বরেরা। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস তো হলো চন্ননের, ঝিয়ের সঙ্গে চলে যায়, টিকিট কেনার ঝামেলা ঝিকে দিয়েই মেটে।

থিয়েটার দেখে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে বিদায়গ্রহণ। কদাচ চাঁপাও এসে জোটে। তবে তার ফুরসৎ কম। শ্বশুরবাড়িতে ভারী শাসন।

চন্নন এসেছিল—

যাবার সময় আবার মা'র কাছে একটু বসে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে বিদায় নেয় চন্নন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আবার সময় পেলেই আসবো মা!'

সুবর্ণলতা মেয়ের কথার উত্তর দেয় না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কানুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওদের সব বলে দিও কানু, আমার মরার আগে আর কারুর আসার দরকার নেই। মরলে পরে যেন আসে।'

বললো এই কথা!

মরতে বসেও স্বভাব যায় নি!

পেটের মেয়েকে এই অপমান করলো। মানুষকে অপমান করে করে ওটাই যেন পেশা হয়ে গেছে ওর।

কিন্তু মেয়ে বলে তো এই অপমানটা নীরবে হজম করতে পারে না চন্নন! ভাবতে পারে না রোগা মানুষের কথা ধর্তব্য নয়।

সেও 'আচ্ছা মনে থাকবে—' বলে গটগটিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। কানু পিছু পিছু যায় পৌঁছতে।

পরদিনই খবরটা চাঁপার কাছে পেশছে যায়। এবং বহুবার বলা কথাটাই আবার বলে দুজনে, 'আমরা সতীন-ঝি! আসল মেয়ে পারুলবালা আর বকুলবালা।'

তদবধি মায়ের আদেশ পালন করেই চলছিলো তারা, আসছিল না, কিন্তু মরতে যে বড় বেশী বিলম্ব করলো সুবর্ণলতা।

কানুর ছেলের অন্নপ্রাশন ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আট মাসে তুলেও যখন বিছানা

থেকে তোলা গেল না সুবর্ণকে, তখন প্রবোধ নিজেই হাল ধরে ঘটার আয়োজন করলো। নইলে লোকসমাজে যে মুখ থাকে না।

সেই সময় অনেক সাধ্য-সাধনা করে মেয়েদের নিয়ে এল প্রবোধ। তা তারা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিলেও মা'র কাছে ভার-ভার হয়েই থাকলো। শুধু যা একটু প্রণাম, তাও তো শোওয়া মানুষকে প্রণাম নিষেধ।

বকুল বেচারা একবার দিদিদের দিকে, আর একবার মা'র দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। পাছে কোনো এক পক্ষ চিরদিনের মত বেঁকে বসে।

কিন্তু বকুলের পরীক্ষা?

বকুলের জলপানি পাওয়া? তার কি হলো?

কিন্তু সে দুঃখের কথা থাক্।

পড়া আর এগোলো কই তার? সুবর্ণই কারণ।

সুবর্ণলতা পৃথিবীর দিক থেকে পিঠ ফিরিয়েছে, তবু যা বকুলকেই এখনো খুব ঠেলে সরায় নি। বকুল যদি দুধটা-সাবুটা এনে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে নেয়। আর কেউ আনলেই তো বলে, 'রেখে যাও, খাবো।'

তবু মাঝে মাঝে সুবর্ণ খোঁজ নেয়, 'তোর লেখাপড়ার কি হলো? মাস্টারকে বিদেয় করে দিয়েছে বুঝি?'

বকুল মনে মনে বলে, 'ভগবান মিথ্যে কথায় দোষ নিও না—', মুখে বলে, 'অসুখ করেছে মাস্টার মশাইয়ের।'

সুবর্ণ আর কথা বলে না, চোখটা বোজে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে এবার শেষ হয়ে আসছে। যে মানুষ চিরটাদিন শুধু কথাই বলেছে, 'আর বলবো না' প্রতিজ্ঞা করেও না বলে পারে নি—শুধু সংসারটি নিয়েই নয়, দেশ নিয়ে, দশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে, সভ্যতা নিয়ে—রাজনীতি ধর্ম-নীতি পুরাণ-উপপুরাণ সব কিছু নিয়ে কথা বলেছে, আর অপর কেউ তার বিপরীত কথা বললে তাল ঠুকে তর্ক করেছে, সে মানুষের যখন কথায় বিতৃষ্ণা এসেছে, তখন আর আশা করার কিছু নেই।

নেশাখোরের 'কাল সন্নিকট' ধরা যায় তখন, যখন তার নেশার বস্তুটায় অনাসক্তি আসে।

সুবর্ণলতার কথা নেই, এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা নিয়ে ছটফটিয়ে বেড়ায় তার চিরদিনের সব দুর্বাক্যের শ্রোতা, সব অভিযোগের আসামী। কালীঘাটে পুজো মানত করে আসে সে, ঠনঠনিয়া কালীর খাঁড়াধোয়া জল চেয়ে নিয়ে আসে।

মাটির ভাঁড়টা বিছানাটার অদূরে নামিয়ে রেখে ভাঙা-ভাঙা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'এটুকু মাথায় বুলিয়ে খেয়ে ফেলো দিকি, কষ্টের উপশম হবে।'

'উপশম হবে?' সুবর্ণ বলে, 'রাখো, রেখে দাও।'

বেশীক্ষণ ওই রুগীর সামনে বসে থাকতে পারে না প্রবোধ, আসে যায়।

আবার ঘুরে এসে বলে, 'অভক্তি কোরো না মেজবৌ, একেবারে সদ্য খাঁড়া ধোওয়া।'

॥ ২৯ ॥

সুবর্ণ একদিন উঠে বসে হাত বাড়িয়ে নিল জলটা, অনেকদিন পরে একটু হেসে বললো, 'তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, তাই না?'

তা প্রবোধ চমকে গেল বৈকি।

ভালবাসার কথা তুলছে সুবর্ণ!

চমকে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো, ধারে-কাছে কেউ আছে কিনা দেখলো। তারপর কাছে সরে এসে কাঁদো কাঁদো ব্যাকুল গলায় উত্তর দিল, 'এতদিন পরে এই প্রশ্ন তুমি করছো আমায়? মুখ ফুটে বলতে হবে সে কথা?'

নাঃ, সত্যিই সুবর্ণ বদলে গেছে।

হয়তো সুবর্ণ পৃথিবীকে ক্ষমা করে যাবে সংকল্প করেছে, তাই বলে উঠলো না—'না, মুখ ফুটে বলতে হবে না বটে, সারাজীবন কাঁটা ফুটিয়ে ফুটিয়েই তো সেটা জানান দিয়ে এসেছ!'

সুবর্ণ শুধু আর একটু হাসলো। তারপর বললো, 'না, বলতে হবে না অবিশ্যি। তবে ভালোই যখন বাসো, আমার একটা শেষ ইচ্ছে পূরণ করো না?'

'শেষ ইচ্ছে?' প্রবোধ গেঞ্জিটা তুলে চোখ মোছে, তারপর বলে ওঠে, 'একশোটা ইচ্ছের কথা বল না তুমি মেজবৌ—'

'একশোটা মনে আসছে না। আপাততঃ একটাই বলছি—মেজ ঠাকুরঝিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

মেজ ঠাকুরঝি!

তার মানে সুবালা?

প্রবোধ যেন শূন্য থেকে আছাড় খায়।

মেয়ে নয়, জামাই নয়, নাতি-নাতনী নয়, ভাই-ভাইপো নয়, দেখতে ইচ্ছে হল কিনা মেজ ঠাকুরঝিকে?

তাজ্জব!

তা তাজ্জব করাই পেশা ওর বটে।

বেশ, সেটাই হবে।

তড়বড় করে বলে উঠল প্রবোধ, 'এমন একটা আজগুবী ইচ্ছেই যখন হয়েছে তোমার, তা সেই ব্যবস্থাই করছি।'

প্রবোধের কথাটা অযৌক্তিক নয়, যে শুনলো সুবর্ণর শেষ ইচ্ছে, অবাকই হলো। আজগুবী ছাড়া আর কি? এত দেশ থাকতে—চারটে ননদের মধ্যে-কার একটা ননদকে দেখবো, এই হলো একটা মানুষের জীবনের শেষ ইচ্ছে? এই আবদারটুকু করেছে মুখ ফুটে?

তাও যদি সমবয়সী ননদ হতো!

তাও যদি জ্বলজ্বলাট অবস্থার হতো!

হাস্যকর!

কিন্তু অভাগার ভাগ্যে বুঝি তুচ্ছও দুর্লভ!

সেখানেও তো মস্ত বাধা!

সুবালা যে তার শেষদিকের মেয়েগুলোকে ঝপাঝপ যা-তা বিয়ে দিচ্ছে! একটাকে চক্রবর্তীর ঘরে, একটাকে ঘোষালের ঘরে, একটাকে নাকি বারেন্দ্রর ঘরে, আবার শোনা যাচ্ছে ছোটটাকেও নাকি ওইরকম কি একটা ঘরে দেবে বলে তোড়জোড় করছে।

শহরে নয়, ফ্যাশানি নয়, পয়সাওলা নয়। তবু এত সাহস! দেশে গ্রামে বসে এত স্বেচ্ছাচার!

মরুক গে যা খুশি করুক গে। ছেলেমেয়ের বিয়েতে 'পোস্টে' একটা পত্তর দেওয়া ছাড়া যোগাযোগ তো ছিলই না, কে ওই রাবণের গুষ্টিকে 'এসো বোসো' বলে ডাকবে? আসতে যেতে ভাড়া গুনতেই তো ফতুর হতে হবে। সবাই ভেবে রেখেছিল, অতএব এই পত্তরখানাও এবার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু এখন আবার এই সমস্যা!

অথচ ঝপ করে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রিণীর কাছে। তার উপায়? এ সমস্যার সমাধান করলো কানু। বললো, 'এ তো আর আপনি কোনো সামাজিক কাজে আনছেন না বাবা, এতে আর কি হচ্ছে? মা যখন মুখ ফুটে বলেছেন—'

ছেলের সমর্থন পেয়ে ভরসা পেলো কানুর বাবা।

অতএব সুবালা এল।

আনতে গেল ও-বাড়ির বুদো।

যে নাকি আশপাশের সকলেরই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! 'কারে' পড়ে প্রবোধ নিজে খরচাপত্তর ধরে দিয়ে অনুরোধ করে এল তাকে।

'মেজ জেঠির শেষ অবস্থা! তোমায় দেখতে চেয়েছে!'

এ খবর শুনে পর্যন্ত সেই যে কান্না শুরু করেছিল সুবালা, সে আর থামে না। চোখ মুছে মুছে আঁচলটা তার ভিজে শপ্‌শপে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো ফুলে লাল।

আরো দুটো দাঁত পড়ে সারা মুখটাই যেন তার আজকাল হাস্যকর বিকৃতির একটা প্রতীক! কেঁদে আরো কিম্ভূত!

বাড়ি ঢুকেই প্রবোধের পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে উথলে উঠে বলে, 'আছে?'

প্রবোধও উথলে বলে, 'আছে এখনও, তবে বেশীদিন থাকবে না।'

'বেশীক্ষণ নয়, বেশী দিন!' তবু ভালো।

'জ্ঞানে আছে?'

'তা টনটনে।'

'ঠাকুর রক্ষে কোরো! কথা-টথা বলছে?'

'বলছে অল্পস্বল্প।'

অতএব একটু ঠাণ্ডা হয় সুবালা, চোখেমুখে জল দিয়ে রুগীর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রবোধ চড়া গলায় বলে, 'মেয়েগুলোর অঘরে-কুঘরে বিয়ে দিচ্ছিস শুনলাম—'

সুবালা ওর স্বভাবে কান্নায় ফোলা চোখেও হেসে ফেলে।

'অঘর-কুঘর নয় মেজদা, তবে স্বঘর নয়।'

'তার মানেই তাই। তা এ মতিচ্ছন্নের কারণ?'

'কারণ আর কি?' সুবালা দিব্বি সপ্রতিভ গলায় বলে, 'অভাবেই স্বভাব

নষ্ট! হাতে নেই কানাকড়ি, ঘরে একগণ্ডা বিয়ের যুগ্যি মেয়ে! নীচু ঘরেরা অমনি হাতে নিয়ে গেল—'

'গলায় দড়ি তোর! এর চেয়ে মেয়েগুলোকে গলায় পাথর বেঁধে পুকুরে ফেলে দিলেই হতো!'

সুবালা শিউরে উঠে বলে, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা! কি যে বল মেজদা! আমার কুলীনগিরিটা ওদের প্রাণের থেকে বড় হলো? ভাল ঘরে পড়েছে, খেয়ে পরে সুখে আছে, এই সুখ। তাতে লোকে আমায় "একঘরে" করে করুক।'

বোনের সম্পর্কে কোনোকালেও কোনো দায়িত্ববোধ না থাকলেও তার এই দুঃসাহসী কথায় খিঁচিয়ে ওঠে দাদা, 'একঘরে করে করুক? ভারী পুরুষার্থ হলো! অমূল্যটাও বুঝি এমনি গাড়োল হয়ে গেছে আজকাল?'

সুবালা এ অপমান গায়ে মাখে না। শালা-ভগ্নীপতি সম্পর্ক, বলেই থাকে অমন। সুবালা তাই হেসে বলে, 'তা যা বলো! মোট কথা নিজের কুলের বড়াইটি নিয়ে বসে থাকবো, ওদের মুখ চাইবো না, এতো স্বার্থপর হতে পারলাম না মেজদা! স্বঘরের কেউ কি আমার মুখ চাইলো? আর আমার এসব কুটুমরা! একেবারে পায়ের কাদা। যাক্‌গে বাবা ওসব কথা, এখন যাকে দেখতে এসেছি...বাড়ি তো খাসা করেছ—মেজবৌয়েরই ভোগে নেই—,' আর একবার উথলে ওঠে সুবালা, আর একবার সে জল ঘষে ঘষে মুছে ফেলে দোতলায় উঠে যায় মেজদার পিছু পিছু।

'কেঁদেই মলো!'

সুবর্ণ বহুদিন পরে ভারী মিষ্টি হাসি হাসে। মুখের লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু কাঠামোটা আছে। সেই কাঠামোখানাই যেন উজ্জ্বল দেখায়।

সুবালা এসেই ওর বিছানার ধার চেপে বসেছিল, সুবর্ণ নিষেধ করে নি।

সুবর্ণ তার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সুবালার কান্না দেখে সেই হাতে একটি নিবিড় গভীর চাপ দিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, 'কেঁদেই মলো!'

'ভাল থাকতে আমি মরতে একবারও এলাম না!'

বুজে আসা গলায় আক্ষেপ করে সুবালা।

অন্যকে অভিযোগ করে না। বলে না, 'এত ছেলে-মেয়ের বিয়ে গেলো, একবার আনলে না আমায়!' ও অভিযুক্ত করলো নিজেকে, 'ভাল থাকতে একবার এলাম না আমি!'

সুবর্ণ হাতে ধরা হাতটায় আর একটু চাপ দিয়ে বলে, 'তোমার মতন মনটা যদি সবাইয়ের হতো মেজ ঠাকুরঝি! কাউকে দোষ দেওয়া নেই, কোথাও কোনো অভিযোগ নেই, সুন্দর!'

তারপর জিজ্ঞেস করে ওর ছেলে-মেয়েদের কথা।

কে কত বড় হলো, কার কার বিয়ে হলো? কিন্তু উত্তরের দিকে কি মন ছিল সুবর্ণর? প্রশ্ন করছিল শুধু, উপযুক্ত প্রশ্নের অভাবে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা, তোমার সেই বাউণ্ডুলে দ্যাওরটির খবর কি? সেই যাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই নি, দরজা থেকে দূর-দূর করে

তাড়িয়ে দিয়েছিলাম?'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা! তাড়িয়ে আবার কি!...অম্বিকা ঠাকুরপোর কথা বলছো তো?' সুবালা ব্যস্ত গলায় বলে, 'তুমি বলে তাকে কতো ভালোবাসো! সেও মেজবৌদি বলে—।' থেমে যায় সুবালা নেহাতই গলাটা বুজে আসায়।

'জানি!' সুবর্ণ একটু থামে, তারপর যেন কৌতুকের গলায় বলে, 'তা সে ঘর-সংসারী হয়েছে? না আবার জেলে ঢুকে বসে আছে?'

'ঘর-সংসারী?' সুবালা বিষন্ন গলায় বলে, 'পোড়া কপাল আমার! সে আবার ঘর-সংসারী হবে? সে তো বিবাগী হয়ে গেছে!'

'বিবাগী!'

হাত-ধরা মুঠোখানা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে। প্রশ্ন-হারানো বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকে সুবর্ণ যেন ওই অদ্ভুত কথাটার দিকেই।

সুবালা আঁচলের ভিজে কোণটা দিয়েই আবার চোখটা মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে, 'তা বিবাগী ছাড়া আর কি! কোথায় কোথায় ঘোরে, ন-মাসে ছ-মাসে একখানা চিঠি দেয়। পায়ে হেঁটে নাকি ভারত ঘুরছে। তোমাদের ননদাই বলে, আবার হয়তো লাগবে ব্রিটিশের পেছনে, তাই দল যোগাড় করছে। আমার তা বিশ্বাস হয় না ভাই। গেরুয়াই নেয় নি, নচেৎ ও তো সত্যিই একটা বৈরিগী উদাসীন! এ জগৎ ছাড়া, অন্য এক জগতের মানুষ! নিজের জন্য কানাকড়ার চিন্তা নেই, অথচ কোথাও কিছু অন্যায় অবিচার দেখলে তো আগুন। সেই যেবার এখানে এসেছিলো—' হঠাৎ একটু সামলে নেয় সুবালা। অবোধ হলেও যেন বুঝতে পারে, সেদিনের কথা আর না তোলাই ভালো। তাই বলে, 'সেই তার কদিন পরেই বাড়ি-ঘর বেচে দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, "এই ভারতবর্ষে বাংলা দেশের মতন অভাগা দেশ আরও কটা আছে দেখবো।"... মনে মনে তাই ভাবি মেজবৌ, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, গরাদে ভরা থাছিস, কী আর করবি? তুই যদি বেটাছেলে হতিস, নির্ঘাত ওই অম্বিকা ঠাকুরপোর মতন হতিস! সংসারবন্ধনে বেঁধে রাখা যেত না তোকে! সেরেফ কোন দিন "জগৎ দেখবো" বলে পথে বেরিয়ে পড়তিস!

'মেজ ঠাকুরঝি!'

সুবর্ণ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

সুবর্ণ আবার ওর হাতটা চেপে ধরে।

আর সুবর্ণর সেই আর্তস্বরটা যেন দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আস্তে ঝরে পড়ে, 'এই কথা ভাবো তুমি? অথচ কদিনই বা দেখলে তুমি আমাকে! আর যারা জীবনভোর দেখলো—'

সুবালা বুদ্ধিহীন, কিন্তু অনুভূতিহীন নয়। তাই সেই ঝরা-স্বরের মৃদু মূর্ছনার উপর আর কথা চাপায় না। শুধু চুপ করে বসে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে।

তারপর অনেকক্ষণ পর সেই নীরবতা ভেঙে উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'হাতটা যে তোমার বড্ড ঘামছে মেজবৌ!'

ওই ঘামটাই হলো শেষ উপসর্গ।

দু দিন দু রাত্তির শুধু ঘামছে।

হাত থেকে কপাল, কপাল থেকে সর্বাঙ্গ। মুছে শেষ করা যাচ্ছে না।

তা হয়, সকলেরই শুধু মরণকালে এরকম হয়।

ওই ঘামটাই যেন জানান দিয়ে বলে, 'পৃথিবীর জ্বর ছাড়ছে তোমার এবার!'

জেদী রুগী নিয়ে ভুগেছে এতদিন সবাই, চিকিৎসা করতে পারে নি সমারোহ করে, আর এখন তার জেদ মানা চলে না। এখন অভিভাবকদের হাতে এসে গেছে রোগী। অতএব দুদিনেই দুশো কান্ড! যেখানে যত বড় ডাক্তার আছে, সবাইকে এক-একবার এনে হাজির করাবার পণ নিয়েছে যেন সুবর্ণলতার ছেলেরা।

কদিন আগেই মানুকে চিঠি লেখা হয়েছিলঃ 'শেষ অবস্থা, দেখতে চাও তো এসো।' মানুও এসে পড়লো ইতিমধ্যে। আর চিকিৎসার তোড়জোড়টা সে-ই বেশী করলো।

বিয়ের ব্যাপারে মাকে মনঃক্ষুণ্ণ করেছিল, সে বোধটা ছিল একটু। এসে একেবারে এমন দেখে বড় বেশী বিচলিত হয়ে গেছে। তাই বুঝি ত্রুটি পূরণ করতে চায়।

প্রথমটা অবশ্য প্রবোধ অনুমতি নিয়েছে। সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে বলেছে, 'আর জেদ করে কি হবে মেজবৌ, চিকিচ্ছে করতে দাও! তুমি বিনি চিকিচ্ছেয় চলে যাবে, এ আপসোস রাখবো কোথায়?'

মেজবৌ ওই ঘামের অবসন্নতার মধ্যেও যেন হাসে একটু, 'আপসোস রাখবার জায়গা ভেবে কাতর হচ্ছ? তবে তো জেদ ছাড়তেই হয়! কিন্তু আর লাভ কি?'

'লাভের কথা কি বলা যায়?' মেজবৌকে এতগুলো কথা বলতে দেখে যেন ভয়টা কমে ভরসা আসে প্রবোধের। তাহলে হয়তো সত্যি নিদানকাল নয়, সাময়িক উপসর্গ। নাড়ি ছেড়ে গিয়েও বেঁচে যায় কত লোক!

তাই ব্যস্ত হয়ে বলে, 'লাভের কথা কি বলা যায়? চামড়া ফুঁড়ে ওষুধ দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল, তাতে নাকি মন্তরের কাজ হয়।'

'চামড়া ফুঁড়ে?' সুবর্ণ এবার একটু স্পষ্ট হাসিই হাসে। নীল হয়ে আসা ঠোঁটের সেই হাসিটা কৌতুকে ঝলসে ওঠে, 'তা দাও।'

পাওয়া গেল অনুমতি।

অতএব চললো রাজকীয় চিকিৎসা।

পরে আবার আপসোস রাখবার জন্যে জায়গা খুঁজতে হবে না সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্রকে।

শুধু চিকিৎসাতেই নয়, শেষ দেখা দেখতে আসার সমারোহও কম হল না। প্রবোধের তিনকুলে যে যেখানে ছিল, প্রবোধের এই দুঃসময়ের খবরে ছুটে এল সবাই। খবরদাতা বুদো। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এল।

মেজ জেঠিকে সত্যই বড় ভালবাসতো ছেলেটা ছেলেবেলায়। সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই অনুভূতি। হঠাৎ এই 'শেষ হয়ে যাচ্ছে'র খবরটা যেন উড়িয়ে দিয়ে গেলো সেই ধুলো।

তা বুদো বলেছে বলেই যে সবাই আসবে, তার মানে ছিল না। বুদো যদি নিজের মা'র শেষ খবরটা দিয়ে বেড়াতো, কজন আসতো?

সুবর্ণলতা বলেই এসেছে!

এটা সুবর্ণলতার ভাগ্য বৈকি।

এত কার হয়?

তা সুবর্ণলতার দিকে যে এরা সারাজীবন তাকিয়ে দেখেছে।

ভাগ্য সুবর্ণকে মগডালে তুলেছে, অথচ নিজে সে সেখান থেকে আছড়ে আছড়ে মাটিতে নেমে নেমে এসে ঘূর্ণি-ঝড় তুলেছে। এ দৃশ্য একটা আকর্ষণীয় বৈকি।

তাই তাকিয়েছে সবাই।

আর যার দিকে সারাজীবন তাকিয়ে থেকেছে, তার তাকানোটা জীবনের মত বন্ধ হয়ে যাবার সময় দেখবার সাধ কার না হয়?

আসে নি শুধু তাদের কেউ, যেখান থেকে সুবর্ণ নামের একটা ঝক্‌ঝকে মেয়ে ছিটকে এসে এদের এখানে পড়েছিল। তাদের কে খবর দিতে যাবে? তাদের কথা কার মনে পড়েছে? কে বলতে পারে খবর পেলেও আসতো কিনা? সেখানে তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে সুবর্ণর।

কিন্তু প্রবোধের গুষ্টিও তো কম নয়।

তাতেই বিরাম নেই এই দুদিন।

এসে দাঁড়াচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীৎকারে রোগিণীকে সম্বোধন করে আপন আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করে দিতে চাইছে, তাদের জানার জগতে মৃত্যুকালে কার কার এমন ঘাম হয়েছিল সেই আলোচনা করছে সেই ঘরে বসে, এবং রোগিণীর 'জ্ঞান-চৈতন্য নেই'ই ধরে নিয়ে হা-হুতাশ করছে।

তবে সকলেই কি?

ব্যতিক্রমও আছে বৈকি।

পুরুষরা সবাই এরকম নয়।

এদিক থেকে খবর নিয়েও বিদায় নিচ্ছে অনেকে।

জিজ্ঞেস করছে, 'কথা কি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে?...চোখ কি একেবারে খুলছেন না? গঙ্গাজল আছে তো হাতের কাছে? তুলসীগাছ নেই বাড়িতে?'

শুভানুধ্যায়ীরই কথা!

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, এ কথাটা সত্যি বৈকি।

নইলে মৃত্যুর হাতে হাত রাখা মানুষটাও কারুর শত ডাকেও চোখ খুলছে না, আবার কারুর এক ডাকেই টেনে টেনে খুলছে চোখ।

ময়লা কাপড় ছেঁড়া গেঞ্জি পরা আধবুড়ো দুলো যখন কাছে এসে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো 'মেজমামী!', তখন তো আবার কথাও বেরোলো গলা থেকে!' অস্পষ্ট, তবু শোনা গেল—'পালাও, মারবে!'

তা এ অবিশ্যি প্রলাপের কথা।

.এক-আধটা অমন ভুল কথা বেরোচ্ছে মুখ থেকে।

তবে ঠিক কথাও বেরোচ্ছে।

বিরাজের বর যখন এসে বসেছিল মাথার কাছে, বিরাজ চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মেজবৌ দেখ কে এসেছে!' তখন আস্তে হাত দুটো জড়ো করবার বৃথা চেষ্টায় একবার কেঁপে উঠে বলেছিল, 'ন-মোস-কার।'

ভুলটা বাড়লো রাত্রের দিকে।

সারারাত্তির ধরে কত কথা যেন কইল। কত যেন শপথ করলো। আবার একবার প্রবোধের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বললো—'ক্ষমা!'

ক্ষমা চাইলো?

না ক্ষমা করে গেল?

কে বলে দেবে সে রহস্য?

যারা কাছে ছিল তারা অবশ্য ধরেই নিলো ক্ষমা চাইলো। অনেক দৌরাত্ম্য তো করেছে স্বামীর ওপর!

কিন্তু তারপর এসব কথা বলছে কেন প্রলাপের মধ্যে?

'বলেছিলাম আর চাই না। যাবার সময় বলে যাচ্ছি, চাই। এই দেশেই, মেয়েমানুষ হয়েই!...শোধ নিতে হবে না?'

কে জানে কি চাইছিল সে, কিসের শোধ নেবার শপথ নিচ্ছিল!

প্রলাপ! প্রলাপের আর মানে কি?

সারারাত যমে-মানুষে যুদ্ধ চললো। রাত্রিশেষে যখন পূব আকাশে দিনের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে, তখন শেষ হলো যুদ্ধ।

পরাজিত মানুষ হাতের ওষুধের বড়ি আছড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো। বিজয়ী যম নিঃশব্দে অদৃশ্যপথে অন্তর্হিত হলো, জয়লব্ধ ঐশ্বর্য বহন করে।

ছড়িয়ে পড়লো ভোরের আলো।

তুলে দেওয়া হলো বারান্দা-ঘেরা ত্রিপল আর চিক্। দক্ষিণের বারান্দার পূব কোণ থেকে আলোর রেখা এসে পড়লো বিছানার ধারে। মৃত্যুর কালিমার উপর যেন সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে দিল।

সুবর্ণলতার শেষ দৃশ্যটি সত্যিই বড় সুন্দর আর সমারোহের।

এ মৃত্যুতে দুঃখ আসে না, আনন্দই হয়।

কেন হবে না? যদি কেউ জীবনের সমস্ত ভোগের ডালা ফেলে রেখে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়, তার মৃত্যুটা শোচনীয়, সে মৃত্যু দুঃখের। আবার বয়সের বিষকীটে জীর্ণ হয়ে যারা শেষ পর্যন্ত অপরের বিরক্তির পাত্র হয়ে উঠে প্রতিনিয়ত জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে অবশেষে মরে, তাদের মৃত্যুটা নিশ্চিন্ততার, হাঁফ ছেড়ে বাঁচার! যেমন মরেছিলেন মুক্তকেশী।

মুক্তকেশীর উনআশী বছরের পুরানো খাঁচাখানা থেকে যখন বন্দীবিহঙ্গ মুক্তিলাভ করলো, তখন তাঁর আধবুড়ো আর আধ-পাগলা ভাইপোটা লোক হাসিয়ে 'পিসিমা গো পিসিমা গো' করে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলেও, বাকী সকলেই তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। মুক্তকেশীর পরম মাতৃভক্ত ছেলেরা পর্যন্ত!

সে তো শুধু মুক্তকেশীর প্রাণপাখীর মুক্তি নয়, ছেলেদের আর বৌদেরও

যে পাষাণভার থেকে মুক্তি!

কিন্তু সুবর্ণলতার কথা স্বতন্ত্র।

সুবর্ণলতা পরিপূর্ণতার প্রতীক।

ফলে, ফুলে, ব্যাপ্তিতে, বিশালতায় বনস্পতির সমতুল্য।

এমন বয়সে আর এমন অবস্থায় মৃত্যু হলো সুবর্ণলতার যে, সে মৃত্যু অবহেলা করে ভুলে যাবারও নয়, শোকে হাহাকার করবারও নয়।

জ্বলজ্বলাট জীবন, জ্বলজ্বলাট মৃত্যু!

আজীবন কে না হিংসে করেছে সুবর্ণলতাকে? তার জায়েরা, ননদেরা, পড়শিনীরা, এরা-ওরা। সেই ছোট্ট থেকে দাপটের ওপর চলেছে সুবর্ণলতা! কাউকে ভয় করে চলে নি, রেয়াত করে চলে নি। অমন যে দুর্ধর্ষ মেয়ে মুক্তকেশী, তিনি পর্যন্ত হার মেনেছেন সুবর্ণলতার কাছে। সেই দাপটই চালিয়ে এসেছে সে বরাবর। ভাগ্যও সহায় হয়েছে। আশেপাশের অনেকের চাইতে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছিল সুবর্ণলতার।

টাকাকড়ি, গাড়িবাড়ি, সুখ-সম্পত্তি, কী না হয়েছিল? সংসার-জীবনে গেরস্তঘরের মেয়েবৌয়ের যা কিছু প্রার্থনীয়, সবই জুটেছিল সুবর্ণলতার ভাগ্যে।

তাই সুবর্ণলতার মৃত্যুতে 'ধন্যি-ধন্যি' পড়ে গেল চারিদিকে। সবাই বললো, 'হ্যাঁ, মরণ বটে! কটা মেয়েমানুষ এমন মরা মরতে পারে?'

কেউ কেউ বা বেশি কায়দা করে বললো, 'মরা দেখে হিংসে হচ্ছে! সাধ যাচ্ছে মরি!'

আর হয়তো বা শুধু কায়দাই নয়, একান্তই মনের কথা। বাঙালীর মেয়ে জন্মাবধিই জানে জীবনে প্রার্থনীয় যদি কিছু থাকে তো 'ভাল করে মরা'।

শাঁখা নিয়ে সিঁদুর নিয়ে স্বামীপুত্রের কোলে মাথা রেখে মরতে পারাই বাহাদুরি! বাল্যকাল থেকেই তাই ব্রত করে বর প্রার্থনা করে রাখে—'স্বামী অগ্রে, পুত্র কোলে, মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।'

মৃতবৎসা বিরাজ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সেই যে বলে না—পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণে গাই—ভাগ্যের কথাতেও সেই কথাই বলতে হয়। মরে না গেলে তো বলবার জো নেই "ভাগ্যবতী"? মেজবৌ গেল, এখন বলতে পারি কপালখানা করেছিল বটে! এতখানি বয়েস হয়েছিল, ভাগ্যের গায়ে কখনো যমের আঁচড়টি পড়ে নি। সব দিকে সব বজায় রেখে, ভোগজাত করে কেমন নিজের পথটি কেটে পালিয়ে গেল!'

তা বিরাজের কাছে এটা ঈর্ষার বৈকি। বিরাজ চিরদিনই তা মেজবৌকে ভালবেসেছে যেমন, ঈর্ষাও করেছে তেমন।

বিরাজের শ্বশুরবাড়ি অবস্থাপন্ন, বিরাজের বর দেখতে সুপুরুষ, তবু বিরাজের মনে শান্তি কোথায়? সর্বদাই তো হাহাকার।

কাছাকাছি বয়সে, একই সময়েই প্রায় সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে দুজনের, কিন্তু ফলাফল প্রত্যেকবারই দুজনের ভিন্ন। বড়লোকের বৌ বিরাজ, যেই একবার করে সেই সম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবতী হয়ে উঠেছে, তার জন্যে দুধের বরাদ্দ বেড়েছে, মাছের বরাদ্দ বেড়েছে, তার জন্যে ঝি রাখা হয়েছে। তবু পূর্ণতার পরম গৌরবে পৌঁছবার আগেই আবার শূন্য কোল আর ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এসে পড়তে হয়েছে তাকে, সেবা খেতে, সান্ত্বনা

পেতে।'

অথচ সুবর্ণলতা ?

সুবর্ণলতা আঁতুড়ে ঢেকবার ঘণ্টা পর্যন্ত দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়িয়েছে, দু-চার ঘণ্টার মেয়াদে হৃষ্টপুষ্ট একটা শিশুর আমদানি করেছে, আঁতুড়ঘরের সর্ববিধ বিঘ্নবিপদ অবহেলায় অতিক্রম করে যথানির্দিষ্ট দিনে ষষ্ঠীর কোলে একুশ চুপড়ি সাজিয়ে দিয়ে নেয়ে-ধুয়ে ঘরে উঠেছে।

সবটাই তো বিরাজের চোখের উপর।

বিরাজ গহনা-কাপড় ঝলমলিয়ে এসে বসতো, শ্বশুরবাড়ির মহিমার গল্পে পঞ্চমুখ হতো, বাপের বাড়ির সমালোচনায় তৎপর হতো, আর তারপর ভাইপো-ভাইঝিদের কোলে-কাঁখে টেনে তাদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে গাড়িতে উঠতো গিয়ে।

অন্য আর তিন বৌয়ের ছেলেমেয়ে তবু সরু-মোটায় মিশানো, মেজ বৌয়ের সব কটি পাথরকুচি!

কত বা দুধ খেয়েছে সুবর্ণ, কত বা মাছ খেয়েছে? গেরস্থঘরের চারটে বৌয়ের একটা বৌ, আর সব বৌ কটাই তো একযোগে বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে চলেছে। উমাশশী সব আগে শুরু করেছিল, সব শেষে ছোট বৌ বিন্দুর সঙ্গে সারা করেছে।

তবু ওদের তিনজনের কোনো না কোনো সময়ে কিছু না কিছু ঘটেছে, শুধু অটুট স্বাস্থ্যবতী মেজবৌয়ের 'জে'ওজ' ঘরে কখনো চিড় খায় নি। সে কথা নতুন করে মনে পড়লো বিরাজের।

এসেছিল উমাশশী, গিরিবালা, বিন্দু।

সুবর্ণলতার মরণ দেখে হিংসে করল তারাও।

বলল, 'ভাগ্যি বটে! ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা! তার সাক্ষী দেখ, চার ভাইয়ের মধ্যে মেজবাবুই বংশছাড়া, গোত্রছাড়া। চিরটাকাল মেজ-গিন্নীর কথায় উঠেছেন বসেছেন।...আর শুধুই কি স্বামীভাগ্য? সন্তানভাগ্য নয়? ছেলেগুলি হীরের টুকরো, মেয়েগুলি গুণবতী! ভাগ্যবতী ভাগ্য জানিয়ে মরলোও তেমনি টুপ করে।'

'টুপ করে' কথাটা অবশ্য অত্যুক্তি। স্নেহের অভিব্যক্তিও বলা চলে। তবু বললো।

বড় মেয়ে চাঁপাও কেঁদে কেঁদে আক্ষেপ করতে লাগলো, 'কপূরের মত উপে গেলে মা, প্রাণভরে দুদিন নাড়তে-চাড়তে অবসর দিলে না!'

ছেলেরা বৌরা অবিশ্যি বড় ননদের আক্ষেপে মনে মনে মুচকি হাসলো। কারণ ঝাড়া-হাত-পা গিন্নীবান্নী হয়ে যাওয়া চাঁপাকে অনেকবার তারা খোসা-মোদ করে ডেকেছে মাকে একটু দেখতে। শাশুড়ী বৌদের দূরে রাখতেন, যদি মেয়ে এলে ভাল লাগে!

চাঁপা তখন আসতে পারে নি।

চাঁপা তখন ফুরসৎ পায় নি।

চাঁপার সংসার-জ্বালা বড় প্রবল।

তখন চাঁপার শাশুড়ীর চোখে ছানি, পিসশাশুড়ীর বাত, খুড়শ্বশুরের উদরী, দ্যাওরপোদের হাম-পানবসন্ত, নিজের ছেলেদের রক্ত-আমাশা, হুপিং-কাসি। তা ছাড়া চাঁপার ভাসুরঝির বিয়ে, ভাসুরপোর পৈতে, ভাগ্নীর সাধ,

মামশ্বশুরের শ্রাদ্ধ, আর সর্বোপরি চাঁপার বরের মেজাজ। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। গামছাখানা এদিক-ওদিক থাকলে রাক্ষসের মত চেঁচায়, তামাকটা পেতে একটু দেরি হলে ছাত ফাটায়।

চাঁপা অতএব মাতৃসেবার পুণ্যঅর্জন করতে পেরে ওঠে নি। ভাইয়েরা যখনই ডেকেছে, চাঁপা তার সংসারের জ্বালার ফিরিস্তি আউড়ে অক্ষমতা জানিয়েছে।

তাছাড়া চাঁপা কোনোকালেই এটাকে বাপের বাড়ি ভাবে না।

চাঁপার সত্যিকার টান তো দর্জিপাড়ার গলির সেই বাড়িটার ওপর। যে বাড়িটার ছাতের সিঁড়ি আর গাঁথা হলো না কোনোদিন। তা চাঁপা সে অভাব অনুভব করে নি কখনো, সুবর্ণলতার মেয়ে হয়েও না। চাঁপার প্রিয় জায়গা রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুমার ঘর, জেঠির ঘর!

চাঁপা ওইটেকেই বাপের বাড়ি বলে জানতো, চাঁপা সংসার-জ্বালা থেকে ফুরসৎ পেলে ওইখানে এসে বেড়িয়ে যেত।

হয়তো সেটাই স্বাভাবিক।

চাঁপার পক্ষে এ বাড়িকে আপন বলে অনুভবে আনার আশাটাই অসংগত।

এ বাড়ির কোথাও কোনোখানে চাঁপা নামের একটা শিশুর হামাগুড়ি দেওয়ার ছাপ আছে কি? চাঁপা নামের একটা বালিকার পদচিহ্ন?

এ বাড়িতে চাঁপার অস্তিত্ব কোথায়?

দর্জিপাড়ার বাড়িটা চাঁপার অস্তিত্বে ভরা। তার প্রত্যেকটি ইঁট চাঁপাকে চেনে, চাঁপাও চেনে প্রতিটি ইঁট-কাঠকে।

চাঁপা তাই বাপের বাড়ি আসবার পিপাসা জাগলেই চেষ্টা-যত্ন করে চলে আসতো ওই দর্জিপাড়ার বাড়িতেই। ফেরার দিন হয়তো একবার মা-বাপের সঙ্গে দেখা করে যেত। কৈফিয়ত কেউ চাইত না, তবু শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, 'ঠাকুমা বুড়ীর জন্যেই ও-বাড়ি যাওয়া! বুড়ী যে কটা দিন আছে, সে কটা দিনই ও-বাড়িতে আসা যাওয়া! কবে আছে কবে নেই বুড়ী, "চাঁপা চাঁপা" করে মরে!' ঠাকুমা মরলে বলেছে, 'মল্লিকাটার জন্যে যাই!'

সুবর্ণলতা কোনোদিন বলে নি, 'তা অত কৈফিয়ৎই বা দিচ্ছিস কেন? আমি তো বলতে যাই নি, তুই ও-বাড়িতে পাঁচ দিন কাটিয়ে এ বাড়িতে দু ঘণ্টার জন্যে দেখা করতে এলি কী বলে?'

সুবর্ণলতা শুধু চুপ করে বসে থাকতো।

সুবর্ণলতা হয়তো কথার মাঝখানে বলতো, 'জামাই কেমন আছেন?' বলতো 'তোর বড় ছেলের এবার কোন্ ক্লাস হল?'

চাঁপা সহজ হতো, সহজ হয়ে বাঁচতো। তারপর শ্বশুরবাড়ির নানান জ্বালার কাহিনী গেয়ে চলে যেত।

আবার কোনোদিন ও-বাড়ির খাবারদালানে গড়াগড়ি দিতে দিতে চাঁপা এবাড়ির সমালোচনায় মুখর হতো। তখন সমালোচনার প্রধান পাত্রী হলো চাঁপারই মা!

মায়ের নবাবী, মায়ের বিবিয়ানা, মায়ের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিহীনতা, মায়ের ছেলের বৌদের আদিখ্যেতা দেওয়া, আর কোলের মেয়েকে আস্কারা দেওয়ার বহর এই সবই হলো চাঁপার গল্প করবার বিষয়বস্তু।

চাঁপা সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান, চাঁপা সুবর্ণলতাকে 'বৌ' হয়ে থাকতে

দেখেছে, অথচ দেখেছে তার অনমনীয়তা, আর দেখেছে বাড়িসুদ্ধ সকলের বিরূপ মনোভঙ্গী।

চাঁপার তবে কোন্ মনোভাব গড়ে উঠবে?

তাছাড়া মায়ের নিন্দাবাদে দর্জিপাড়ার সন্তোষ, মায়ের সমালোচনায় দর্জিপাড়ার কৌতুক, মায়ের ব্যাখ্যানায় ওখানে 'সুয়ো' হওয়া, এটাও তো অজানা নয় চাঁপার।

চাঁপা তাই ও-বাড়ির সন্তোষবিধান করেছে এ-বাড়িকে কৌতুক করে।

হয়তো আরও একটা কারণ আছে।

হয়তো চাঁপাও ভিতরে ভিতরে মায়ের প্রতি একটা আক্রোশ অনুভব করে এসেছে বরাবর। চাঁপার শ্বশুরবাড়ির শাসন একেবারে পুলিসী শাসন, লোহার জাঁতার নীচে থাকতে হয় চাঁপাকে, চাঁপা তাই মায়ের সেই চিরদিনের বেপরোয়া অনমনীয়তাকে ঈর্ষা করে, মায়ের এই এখনকার স্বাধীনতাকে ঈর্ষা করে।

চাঁপার মনে হয়, চাঁপার বেলায় মা চাঁপাকে যেমন-তেমন করে মানুষ করেছে, কখনো একখানা ভাল কাপড়জামা দেয় নি, অথচ এখন ছোট মেয়ের আদরের বহর কত! কাপড়ের ওপর কাপড়, জ্যাকেটের ওপর জ্যাকেট।

চাঁপা ক্রুদ্ধ হয়েছে, অভিমানাহত হয়েছে।

কিন্তু এখন চাঁপা কেঁদে কেঁদে আক্ষেপ করছে, 'কর্পূরের মত উপে গেলে মা, একটু নাড়বার-চাড়বার অবকাশ দিলে না!'

হয়তো এই মুহূর্তের ওই আক্ষেপটাও সত্য। ওই কান্নাটুকু নির্ভেজাল, তবু ভাইবৌরা মনে মনে হাসলো।

অবিশ্যি বাইরে তারাও কাঁদছিল।

না কাঁদলে ভালো দেখাবে না বলেও বটে, আর চাঁপার কান্নাতেও বটে। কান্না দেখলেও কান্না আসে।

শুধু সুবর্ণর মস্ত আইবুড়ো মেয়ে বকুল কাঁদলো না একবিন্দু। কাঠ হয়ে বসে রইলো চুপ করে। বোধ হয় অবাক হয়ে ভাবলো জ্ঞানাবধি কোনো-দিনই যে মানুষটাকে অপরিহার্য মনে হয় নি, সেই মানুষটা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে এমন করে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে কেন? সুবর্ণর বয়স্ক ছেলেরা প্রথমটা কেঁদে ফেলেছিল, অনেক অনুভূতির আলোড়নে বিচলিত হয়েছিল, সামলে নিয়েছে সেটা। তাদের দায়িত্ব অনেকখানি। এখন তারা বিষাদ-গম্ভীর মুখে যথাকর্তব্য করে বেড়াচ্ছে।

তাদের তো আর কাঠ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাদের ভূমিকা গম্ভীর বিষাদের। শিক্ষিত সভ্য ভদ্র পুরুষের পক্ষে ও ছাড়া আর শোকের বহিঃপ্রকাশ কি?

তবে হ্যাঁ, প্রবোধচন্দ্রের কথা আলাদা।

তার মত লোকসান আর কার?

প্রবোধ শোকের মত শোক করলো। বুক চাপড়ালো, মাথার চুল ছেঁড়ার প্রয়াস পেলো, মেঝেয় গড়াগড়ি খেলো, আর সুবর্ণলতা যে তার সংসারের সত্যি লক্ষ্মী ছিলো, আড়ম্বরে সে কথা ঘোষণা করতে লাগলো।

বড় ভাই সুবোধচন্দ্র ইদানীং হাঁটুর বাতে প্রায় শয্যাগতই ছিলেন, তবু সুবর্ণলতার মৃত্যুর খবরে আস্তে আস্তে লাঠি ধরে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া হলি এবার প্রবোধ।'

সেই শোকবাক্যে প্রবোধ এমন হাঁউমাউ করে কেঁদে দাদার পা জড়িয়ে ধরেছিল যে, পা ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পথ পান নি সুবোধচন্দ্র!

প্রবোধ হাঁক পেড়েছিলো, 'ও দাদা, ওকে আশীর্বাদ করে যাও!'

সুবোধ বলেছিলেন, 'ওঁকে আশীর্বাদ করি আমার কী সাধ্যি? ভগবান ওঁকে আশীর্বাদ করছেন।'

প্রবোধ এ-কথায় আরো উদ্দাম হলো, আরো বুক চাপড়াতে লাগলো। সেই শোকের দৃশ্যটা যখন দৃষ্টিকটু থেকে প্রায় দৃষ্টিশূল হয়ে উঠলো, তখন বড় জামাই আর ছোট দুই ভাইয়েতে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। জোর করে শুইয়ে দিয়ে মাথায় বাতাস করলো খানিকক্ষণ, তারপর হাতের কাছে দেশলাই আর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিয়ে চলে এলো।

মৃত্যুকে নিয়ে দীর্ঘকাল শোক করা যায়, মৃতকে নিয়ে দু ঘণ্টাও নিশ্চিন্ত হয়ে শোক করা চলে না। আচার-অনুষ্ঠানের দড়াদড়ি দিয়ে শোকের কণ্ঠরোধ করে ফেলতে হয়।

সমারোহ করে শেষকৃত্য করতে হলে তো আরোই হয়।

সুবর্ণলতার শেষকৃত্য সমারোহের হবে বৈকি! ভাল লালপাড় তাঁতের শাড়ি আনতে দিয়েছিল ছেলেরা, আনতে দিয়েছিল গোড়েমালা, গোলাপের তোড়া। ধূপ, অগুরু, চন্দন এসবের ব্যবস্থাও হচ্ছিল বৈকি। এ ছাড়া নতুন চাদর এসেছিল শ্মশানযাত্রার বিছানায় পাততে।

উমাশশী গিরিবালা বিরাজ বিন্দুর দল দালানের ওধারে বসে জটলা করছিলো। গিরিবালা বললো, 'সব দেখেশুনে মুখস্থ করে যাচ্ছি, বাড়ি গিয়ে ফর্দ করে রাখবো। মরণকালে বার করে দেব ছেলেদের। গোড়ে গলায় না নিয়ে যমের বাড়ি যাচ্ছি না বাবা!'

এই কৌতুক-কথায় মৃদু হাস্য-গুঞ্জন উঠল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বকুল তাকিয়ে দেখল, স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল।

তা ওরা বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হলো, বিরাজ তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ রে, পারুল তা হলে আসতে পারল না?'

বকুল মাথা নাড়ল।

গিরিবালা বললো, 'মায়ের মৃত্যু দেখা ভাগ্যে থাকা চাই। এমন কত হয়, বাড়িতে থেকেও দেখা যায় না। দুদণ্ডের জন্যে উঠে গিয়ে শেষ দেখায় বঞ্চিত হয়।'

বকুল ছেলেমানুষ নয়, তবু বকুল যেন কথাগুলোর মানে বুঝতে পারে না।

মায়ের মৃত্যু দেখা ভাগ্যে থাকা চাই?

দৃশ্যটা কি খুব সুখের?

বঞ্চিত হলে ভয়ঙ্কর একটা লোকসান? যে চোখ এই পৃথিবীর সমস্ত রূপ আহরণ করে করে সেই পৃথিবীকে জেনেছে বুঝেছে, সেই চোখ চিরদিনের জন্যে বুজে গেল, এ দৃশ্য মস্ত একটা দ্রষ্টব্য?

যে রসনা কোটি কোটি শব্দ উচ্চারণ করেছে, সেই রসনা একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল, এ কী ভারি একটা উত্তেজনার?

হয়তো তাই।

ওঁরা বড়, ওঁরা বোঝেন।

উমাশশী বললো, 'তা খবরটা তো দিতে হবে তাড়াতাড়ি। চতুর্থী করতে হবে তো তাকে?'

উমাশশীর এই বাহুল্য কথাটায় কেউ কান দিল না। এই সময় আস্তে ডাক দিলেন জয়াবতী, 'চাঁপা!'

'সুবর্ণলতার শেষ অবস্থা' এ খবর সকলের আগে তাঁর কাছে পৌঁছেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছেন তিনি। যতক্ষণ সুবর্ণলতার শ্বাসযন্ত্র কাজ করে চলেছিল, ততক্ষণ মৃদু গলায় গীতার শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন জয়াবতী, একসময় দুটোই থেমেছে। তারপর অনেকক্ষণ কী যেন করছিলেন, একসময় চাঁপাকে বললেন, 'ভাইদের একবার ডেকে দাও তো মা!'

চাঁপা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

ও-বাড়ির জেঠিমাকে সমীহ সেও করে বৈকি। বিলক্ষণই করে! জয়াবতীর শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির সবাই করে।

একে তো সুন্দরী, তার ওপর আজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের শুচিতায় এমন একটি মহিমময়ী ভাব আছে যে দেখলেই সম্ভ্রম আসে। বড়লোকের মেয়ে, সেই আভিজাত্যটুকুও চেহারায় আছে। ও-বাড়ির জেঠি ডাকছেন শুনে ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে কাছে এল।

জয়াবতী শান্ত গলায় বললেন, 'একটি অনুরোধ তোমাদের করবো বাবা, রাখতে হবে।'

সুবর্ণলতার ছেলেরা আরো ব্যস্ত হয়ে বললো, 'সে কী! সে কী! অনুরোধ কী বলছেন? আদেশ বলুন?'

জয়াবতী একটু হাসলেন।

বললেন, 'আচ্ছা আদেশই। বলছিলাম তোমাদের মায়ের জন্যে কালো ভোমরাপাড়ের গরদ একখানি, আর একখানি ভাল পালিশের খাট নিয়ে আসতে। এটা ওর বড় সাধ ছিল! পারবে?'

শুনে ছেলেরা অবশ্য ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কারণ এমন অভাবিত আদেশের জন্যে প্রস্তুত ছিল না তারা। এ একেবারে বাজেটের বাইরে। তা ছাড়া—সবই তো আনতে গেছে। শাড়ি, মালা, খাটিয়া।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওই শান্ত প্রশ্নের সামনে 'পারবো না' বলাও তো সোজা নয়!

এ উমাশশী জেঠি নয় যে, কোনো একটা কথায় ব্যঙ্গ হাসি দিয়ে দমিয়ে দেওয়া যাবে! হ্যাঁ, উমাশশী হলে বলতে পারতো তারা শান্ত ব্যঙ্গের গলায়, 'খাটটা কি শুধুই পালিশের, না চন্দন কাঠের?'

উমাশশী হলে বলতই।

কিন্তু ইনি উমাশশী নন, জয়াবতী। এঁর ব্যক্তিত্বই আলাদা। এঁর সামনে ছোট হতে পারা যাবে না, দৈন্য প্রকাশ করতে বাধবে।

তবু বাজেটের বিপদটাও কম নয়? মায়ের চিকিৎসা উপলক্ষেও তো কম খরচ হয়ে গেল না?

সব টাকা বাড়িতে ঢেলে, আর বহুদিন বাড়ি বসে বসে, প্রবোধের হাত তো স্রেফ ফতুর। টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না তিনি, যা করতে হবে ছেলেদেরই হবে। হয়তো বা বড় ছেলেকেই বেশি করতে হবে।

তাই বড় ছেলে শুকনো গলায় প্রশ্ন করলো, 'আপনি যদি বলেন অবশ্যই

আনা হবে জেঠিমা, তবে—ইয়ে বলছিলাম কি, ওটা কি করতেই হয়?'

জেঠি আরো স্নিগ্ধ আরো ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, ' "করতেই হয়" এমন অসঙ্গত কথা বলতে যাবো কেন বাবা? এতো খরচার ব্যাপার আর কজন পারে? তবে তোমরা তিনটি ভাই কৃতী হয়েছো, তাই বলতে পারছি। সুবর্ণর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল একখানি কালো ভোমরাপাড়ের গরদ শাড়ি পরে, আর একখানি ভাল খাট-গদিতে শোয়। মন খুলে কথা তো আমার কাছেই কইতো বেশিটা। কতদিন কথাচ্ছলে হাসতে হাসতে বলতো, "জন্মে কখনো খাটে শুলাম না জয়াদি, মরে যখন ছেলেদের কাঁধে চড়ে যাবো, একখানা পালিশ করা খাটে শুইয়ে যেন নিয়ে যায় আমায়!" '

জন্মে কখনো খাটে শুলাম না!

খাটে!

জন্মে কখনো!

এ আবার কি অদ্ভুত ভাষা।

ছেলেরা অবাক হয়ে তাকালো।

মনশ্চক্ষে সমস্ত বাড়িখানার দিকেই তাকালো। তাকিয়ে অবাক হলো, হতভম্ব হলো। এত বড় বাড়ি, ঘরে ঘরে জোড়া খাট, অথচ সুবর্ণলতার এই অভিযোগ!

মরার পর আর কেউ গাল দিতে পারবে না বলেই বুঝি ছেলেদের সঙ্গে এই অদ্ভুত উগ্র কটু তামাশাটুকু করে গেছে সুবর্ণলতা!

বড় ছেলের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল সেই বিস্ময়-প্রশ্ন, 'জন্মে কখনো খাটে শোন নি!'

জয়াবতী হাসলেন।

জয়াবতী থেমে থেমে কোমল গলায় উচ্চারণ করলেন, 'কবে আর শুতে পেল বল বাবা! সাবেকী বাড়িতে যখন থেকেছে, তখনকার কথা ছেড়েই দাও। ইট দিয়ে উঁচু করা পায়াভাঙা চৌকিতে ফুলশয্যে হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত তাতেই কাটিয়েছিল। দর্জিপাড়ার নতুন বাড়িটা হবার পর ঘরে ঘরে একখানা করে নতুন চৌকি হয়েছিল।...খাট নয়, চৌকি। তা কোলের ছেলে গড়িয়ে পড়ে যাবার ভয়ে তাতেই বা কই শোয়া হয়েছে, বরাবর মাটিতেই শুয়েছে। তোমাদের অবিশ্যি এসব ভুলে যাবার কথা নয়।...তারপর যদি বা জেদাজেদি করে চলে এসেছিল সেই গুহা থেকে, ঘরবাড়িও পেয়েছিল, কিন্তু ভোগ আর করলো কবে বল? তোমরা ঘেটের সবাই পর পর মানুষ হয়েছো, বৌমারা এলেন একে একে, নিজের বলতে তেমন একখানা ঘরই বা কই রইল বেচারার? ওই ছোট একটু শোবার ঘর! রাতে আলো জেলে বই পড়ার বাতিক ছিল ওর, অথচ তোমাদের বাবার তাতে ঘুমের ব্যাঘাত—' একটু হাসলেন জয়াবতী, বললেন, 'প্রবোধ ঠাকুরপোর তবু বসতে দাঁড়াতে বৈঠকখানা ঘরটা আছে, ও বেচারার নিজস্ব বলতে কোথায় কি? শেষটা তো বারান্দায় শুয়েই কাটিয়ে গেল!'

খুব শান্ত হয়ে বললেন বটে, তবু যেন শ্রোতাদের বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আর তাদের পশ্চাদবর্তিনী বৌমাদের মুখ লাল হয়ে উঠল। তবে কথা তারা বলল না তাড়াতাড়ি। শুধু মেজ ছেলে আরক্তিম মুখে বলল, 'কাশির জন্যে মা নিজেই তো আর কারুর সঙ্গে ঘরে শুতে চাইতেন না!'

জেঠি আরো নরম হলেন।

' মধুর স্বরে বললেন, 'সে কি আর আমিই জানি না বাবা! তোমরা তোমাদের মাকে কোনদিন অবহেলা করেছ, এ কথা পরম শত্রুতেও বলতে পারবে না। বহু ভাগ্যে তোমাদের মত ছেলে হয়। তবে কিনা মনের সাধ ইচ্ছের কথা তোমাদের কাছে আর কি বলবে? আমার কাছেই মনটা খুলতো একটু-আধটু, তাই ভাবলাম, এটুকু তোমাদের জানাই।'

জেঠি বললেন, 'এটুকু তোমাদের জানাই'!

জানার পর অতএব অজ্ঞতা চলে না!

অগত্যাই বাজেট বাড়াতে হলো।

মায়ের সাধের কথা ভেবে যতটা না হোক, ধনীদুহিতা জ্ঞাতি জেঠির কাছে নিজেদের মান রাখতেও বটে।

তবু বড় ছেলে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, 'নতুন জেঠিমার কথাটা শুনেছ?'

বৌ উদাস গলায় বললো, 'শুনেছি।'

'মানেটা ঠিক বুঝলাম না তো। মা'র গরদ শাড়ি ছিল না?'

বৌ গম্ভীর গলায় বললো, 'মানে আমিও বুঝতে অক্ষম। তিন ছেলের বিয়েতে তিন-তিনখানা গরদ পেয়েছেন কুটুমবাড়ি থেকে!'

'আশ্চর্য! যাক্ কিনতেই হবে একখানা।'

মেজ ছেলে বৌয়ের কাছে এল না, মেজবৌই বরের কাছে এল। মড়া ছুঁয়েছে বলে আর নিজ নিজ শোবার ঘরে ঢোকে নি, ছাদের সিঁড়ির ওধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বললো, 'এই বেলা বলে রাখি, আমার একখানা পুষ্পহার পরবার সাধ আছে! দিও সময়মত, নইলে আবার মরার পর ছেলেদের মুখে কালি দেব!'

মেজ ছেলে শুকনো মুখে বললো, 'এটা যেন জেঠিমার ইচ্ছাকৃত ইয়ে বলে মনে হলো। অথচ ঠিক এরকম তো নন উনি!'

মেজবৌ মৃদু হাসির মত মুখ করে বলে, 'কে যে কি রকম, সে আর তোমরা বেটাছেলে কি বুঝবে? জেঠিমার সঙ্গে কত রকম কথাই হতে শুনেছি—তা ছাড়া এয়োস্ত্রী মানুষকে কালোপাড় শাড়ী পরে শ্মশানে পাঠানো? শুনি নি কখনো!'

'যাক যেতে দাও। ও-রকম একখানা গরদের কাপড়ে কি রকম আন্দাজ লাগবে বলতে পারো?'

মেজবৌ ভুরু কুঁচকে বললো, 'তোমার ঘাড়েই পড়ল বুঝি!'

মেজ ছেলে বোধ করি একটু লজ্জিত হলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'ঘাড়ে পড়াপড়ি আর কি! একজন কাউকে তো যেতে হবে দোকানে। অবিশ্যি খুব ভাল খাপি জমি-টমির দরকারই বা কি? নেবে তো এক্ষুনি ডোমে!'

'হুঁ। তা নেহাৎ ফ্যারফেরে ঝ্যারঝেরে জমি হলেও, বারো-তেরো টাকার কমে হবে বলে মনে হয় না।'

'বারো-তেরো!'

মেজ ছেলে বিচলিত ভাবে চলে গেল। একবার নিজে একা টাকাটা বার করলে কি আর পরে ভাইদের কাছে চাওয়া যাবে?

তা হোক, কি আর করা যাবে? ত্রুটি না থাকে। কেউ না ভাবে তাদের 'নজর' নেই! দাদা খাটটার ভার নিক।

তা সেই ভাগাভাগি করেই খরচটা বহন করলো ছেলেরা। বড় ছেলে আনলো পালিশ করা খাট, মেজ ছেলে কালো ভোমরাপাড় গরদ। যে মানুষটাকে যখন তখন ষষ্ঠীমনসায় লালপাড় গরদ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, তার একখানা কালোপাড় গরদ হয় নি বলে আক্ষেপে মরে যাবে এমন ভাব-প্রবণতা অবশ্য কারো নেই, তবু দেখেশুনে কালো ভোমরাপাড়ই কিনে আনলো। বারো-তেরো কেন, চোদ্দ টাকা পড়ে গেল। ঢালাপাড়ের চেয়ে নক্শাপাড়ের দাম বেশি কিনা।

সেজ ছেলে নিজ মনেই আনলো ফুলের গাদা, আনলো ধূপের প্যাকেট, আনলো গোলাপজল এক বোতল।

এসব কথা কবে নাকি বলে রেখেছিল সুবর্ণলতা। হয়ত ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিল। তবু সেই হেসে হেসে বলা কথাটাই মনে পড়ে মনটা 'কেমন' করে ওঠা অসম্ভব নয়। সুবর্ণলতার সেজ ছেলে কথা বেশি বললো না। শুধু ধূপের গোছাটা জেবলে দিল,..শুধু ফুলগুলো সাজিয়ে দিল, আর গোলাপ-জলের সবটা ঢেলে দিল।

মড়ার গায়ে গোলাপজল ঢালা মুক্তকেশীর গোষ্ঠীতে যে এই প্রথম তাতে সন্দেহ কি?

মুক্তকেশীরই কি জুটেছিল? জুটেছিল শুধু একটা ফুলের তোড়া!

তাঁর মৃত্যুর দিন সুবর্ণই বলেছিল, 'একটা ফুলের তোড়া কিনে আন্ বাবা তোদের ঠাকুমার জন্যে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় সঙ্গে দেবার তো আর কিছুই থাকে না!'

বলেছিল এই সেজ ছেলেটাকেই।

হয়তো সেদিনের স্মৃতি মনে জেগেছিল তার, তাই অত ফুল এসেছিল। বিরাজ বলেছিল, 'মনে হচ্ছে তোদের মা'র বিয়ে হচ্ছে! বাসরের সাজ সাজাচ্ছি মাকে। আমার শ্বশুরবাড়িতেও মরণে এত ঘটা দেখি নি।'

নিজের শ্বশুরবাড়িটাকেই সর্ববিধ আদর্শস্থল মনে করে বিরাজ!

গিরিবালা বললো, 'যা বলেছ ছোট ঠাকুরঝি। এত দেখি নি বাবা!'

গিরিবালার বাপের বাড়ির সাবেকী সংসারে এত ফ্যাশান এখনো ঢোকে নি। ওদের বাড়িতে এখনো বাসরেই ফুলের তোড়া জোটে না, তা শ্মশানযাত্রায়!

আজন্মের সাধ মিটলো সুবর্ণলতার।

কালো ভোমরাপাড়ের নতুন গরদ পরে রাজকীয় বিছানা পাতা নতুন বোম্বাই খাটে শুলো, আশেপাশে ফুলের তোড়া, গলায় গোড়েমালা।

পায়ে পরানো আলতার 'নুটি' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, মাথার সিঁদুরের কণিকা প্রসাদ পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি বাধলো। কেবলমাত্র নিজের বৌ-মেয়েরাই তো নয়, এসেছে ভাসুরপো-বৌ, তার দ্যাওরপো-বৌদের দল, এসেছে জা-ননদ, পাড়াপড়শী বেয়ান-কুটুম।

সুবর্ণলতার শেষযাত্রা দেখতে তো লোক ভেঙে পড়েছে।

এসেছে ধোবা গয়লা নাপতিনী ঘুঁটেওয়ালী সবাই। সকলেই অসঙ্কোচে ধুলোকাদা পায়ে উঠে এসেছে দোতলায়, উঁকিঝুঁকি মারছে শবদেহের আশে-পাশে। এটা বাড়ির লোকের পক্ষে বিরক্তিকর হলেও, এ সময় নিষেধ করাটা শোভন নয়। এরাও যে তাদের ময়লা কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলছে, 'এমন মানুষ হয় না!'

চিরকাল বলেছে, এখনও বললো, 'এমন মানুষ হয় না!'

. এখন আর কোনোখানে কেউ বলে উঠলো না, 'তা জানি। ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে যে!'

মৃত্যু সকলকে উদার করে দিয়েছে, সভ্য করে দিয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যার মুখে সুবর্ণলতার শেষ চিহ্নটুকুও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। চিতার আগুনের লাল আভা আকাশের লাল আভায় মিশলো, ধোঁয়া আর আগুনের লুকোচুরির মাঝখান থেকে সুবর্ণলতা যে কোন্ ফাঁকে পরলোকে পৌঁছে গেল, কেউ টের পেল না।

মানু বললো, 'এটা হোক। যা খরচ লাগে, আমি "বেয়ার" করবো!'

মানুর দাদারা বললো, 'তা যদি করতে পারো, আমাদের বলবার কি আছে? ভালই তো।'

প্রবোধ হাঁউমাউ করে কেঁদে বললো, 'কর বাবা, কর তোরা তাই। আত্মাটা শান্তি পাবে তার। এই সবই তো ভালবাসতো সে।'

কে জানে মানুর এই সদিচ্ছা তার অপরাধবোধকে হালকা করে ফেলতে চাওয়া কিনা, অথবা অনেকটা দূরে সরে গিয়ে 'মা' সম্পর্কে তার মনের রেখাগুলো নমনীয় হয়ে গিয়েছিল কিনা!

নিত্য সংঘর্ষের গ্লানিতে যে জীবনকে খণ্ড ছিন্ন অসমান বলে মনে হয়, দূর পরিপ্রেক্ষিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্তৃতির মহিমায়, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিতান্ত নিকট থেকে যে আগুন শুধু দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো যোগায়।

দূরত্বেই সম্ভ্রম, দূরত্বেই প্রত্যয়।

শ্রাদ্ধের শেষে ওই যে এনলার্জ করা ফটোখানা দেয়ালে ঝুললো অবিনশ্বর একটি প্রসন্ন হাসি মুখে ফুটিয়ে, ওই ছবির বংশধরেরা কি কোনোদিন সন্দেহ করবে, এ হাসিটুকু কেবল ফটোগ্রাফারের ব্যগ্র নির্দেশের ফসল!

মানু হয়তো দূরে চলে গিয়ে তার মায়ের রুক্ষ অসমান কোণগুলো ভুলে গিয়ে শুধু স্থির মসৃণ মূর্তিটাই দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু পেল বড় দেরিতে। আর তখন কিছু করার ছিল না মানুর।

তাই মানু ভেবেচিন্তে ওই কথাটাই বললো, 'কাঙালী খাওয়ানো হোক এই উপলক্ষে।'

খরচাটা সে একাই বহন করবে।

তবে আর বলার কি আছে? তা খরচ আর ঝঞ্ঝাট দুটোরই ভার নিক।

তা নিল মানু।

অতএব সুবর্ণলতার শ্রাদ্ধে কাঙালীভোজন হলো। অনেক কাঙালী এল —আহূত, রবাহূত, অনাহূত। কাউকেই বঞ্চিত করলো না এরা। আশা করলো, সুবর্ণলতার বিগত আত্মা পরিতৃপ্ত হলো এতে। বিশ্বাস রাখলো, ছেলেদের আশীর্বাদ করছে সুবর্ণলতা আকাশ থেকে।

পরদিন মানু চলে গেল বৌকে বাপের বাড়ি রেখে দিয়ে। ছুটি ফুরিয়েছে তার।

তার পরের দিন তার বোনেরা, পিসিরা, জেঠি-খুড়ীরা। নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত ছিল সবাই, মিটলো তো সবই।

শুধু পারুল আসে নি এই বিরাট উৎসবে। পারুলের আসবার উপায় ছিল না।

॥ ৩৯ ॥

নিস্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ি, স্তিমিত হয়ে গেল দিনের প্রবাহ। রোগের বৃদ্ধি থেকে এই পর্যন্ত চলছিল তো উত্তাল ঝড়! ক্লান্ত মানুষগুলো এবার অনেক দিনের ক্লান্তি পুষিয়ে নিতে ঘুমিয়ে নেবে কিছুদিন দুপুর-সন্ধ্যেয়।

বকুলও ঘুমিয়ে পড়েছিল ভরদুপুরে, জেগে উঠলো বেলায়। তাড়াতাড়ি বুঝি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছুটে চলে এল বারান্দার দিকে। ভুল বুঝতে পারলো, আস্তে ফিরে এল, ছাতে চলে গেল।

দেখলো পশ্চিমের আকাশে বিশাল এক চিতা জ্বলছে। তার অগ্নিআভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের মাটিতে।

বকুল শ্মশানে যায় নি, মায়ের চিতা জ্বালা দেখে নি, তাই বুঝি নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সেদিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।...যখন আস্তে আস্তে নিভে গেল সে আগুন, মনে পড়লো আর একদিনের কথা। এই ছাতেরই ওই কোণটায় আর এক চিতা জ্বলতে দেখেছিল সে। কোনোদিন জানলো না কী ভস্মীভূত হয়েছিল সেদিন।

আজ ঘুমের আগে মা'র ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে দেখছিল সে, কোথাও পায় নি একটি লাইন ও হস্তাক্ষর। সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।

বকুল ছাতের সেই চিতার কোণটায় বসে রইল অন্ধকারে।

কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলেন জগুই।

অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এই রোদ্দুরে? কার সঙ্গে এসেছিস?'

'ঝিয়ের সঙ্গে।'

'ঝিয়ের সঙ্গে একা এলি তুই? বলিস কি? খুব সাহস আছে তো? কিন্তু কেন বল্ তো হঠাৎ?'

বকুল আস্তে বলে, 'জ্যাঠামশাই, আপনার প্রেস্‌টা দেখতে এলাম।'

'প্রেস্‌টা? আমার প্রেস্‌টা? এখন দেখতে এলি তুই?' হা-হা করে হেসে ওঠেন জগু, অথচ বকুলের মনে হয়, বুড়োমানুষটা যেন কেঁদে উঠলেন "হা-হা" করে।

হাসিই। হাসি থামিয়ে জগু কথাটা শেষ করেন, 'প্রেস্ আর নেই, প্রেস্ তুলে দিয়েছি।'

'তুলে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তুলে দেওয়াই ভালো', জগু হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান, জোরে জোরে বলেন, 'কে অত ঝামেলা পোহায়? ওই যে শূন্য ঘরখানা পড়ে আছে দাঁত খিঁচিয়ে!'

বকুল মুহূর্ত কয়েক স্বব্ধ থেকে বলে, 'আচ্ছা জ্যাঠামশাই, যে সব বই ছাপা হয়, তার পাণ্ডুলিপিগুলো কি সব ফেলে দেওয়া হয়?'

জগু সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'কেন বল্ দিকি?'

'এমনি, জানতে ইচ্ছে করছে।'

জগু তেমনি গলাতেই বলেন, 'এমনি? না তোর—ইয়ে, মা'র সেই খাতাটা খুঁজতে এসেছিস?'

'না এমনি। বলুন না আপনি, থাকে না?'

'থাকে, ছিল—', জগু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'গুদোমঘরে সব ডাঁই করা পড়েছিল। আদি অন্তকালের সব। ওই ব্যাটা নিতাই, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম আমি, প্রেস উঠিয়ে দিলাম দেখেই যেখানে যা ছিল ঝেঁটিয়ে শিশি-বোতলওয়ালাকে বেচে দিয়েছে! শুনেছিস কখনো এমন কাণ্ড? দেখেছিস এমন চামার? আমিও তেমনি। দিয়েছি দূর করে! আর হোক দিকিনি এমুখো।...আয়, বসবি আয়।'

'না থাক্, আজ যাই।'

'সে কি রে? এই এলি রোদ ভেঙে, বসবি না?'

'আর একদিন আসবো জ্যাঠামশাই—'

হেঁট হয়ে প্রণাম করে বকুল জ্যাঠাকে।

জগু ব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়ান, 'থাক্ থাক্। বুড়ী ঘুমোচ্ছে, দেখা হলো না।'

বকুল বোধ হয় ভুলে আরও একবার প্রণাম করে জ্যাঠাকে, তারপর বলে, 'যাচ্ছি তবে।'

'যাচ্ছিস! চল্ না হয় আমি একটু এগিয়ে দিই—'

'না না, দরকার নেই। আপনি বুড়োমানুষ এই রোদ্দুরে—'

'তবে যা, সাবধানে যাস।'

'আপনি বুড়োমানুষ'—এই অপমান গায়ে মেখেও দাঁড়িয়েই থাকেন জগু দরজায়। শেকলটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন না সঙ্গে সঙ্গে গটগট করে।

তার মানে বকুলের কথাই ঠিক। বুড়ো হয়ে গেছেন জগু।

বকুল রাস্তায় নামে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝি সেই দাঁত-খিঁচোনো ঘরটার উদ্দেশেই মনে মনে একটা প্রণাম জানিয়ে মনে মনেই বলে, 'মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।..

'যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না চায়, যদি অবজ্ঞার চোখে তাকায়, বুঝবো আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যা জৌলুসের ছলনা! ঋণ-শোধের শিক্ষা হয় নি তার এখনো!'

সামনের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যায় বকুল, পিছু পিছু আসা দেহরক্ষিণীটার কথা ভুলে গিয়ে!

—শেষ—